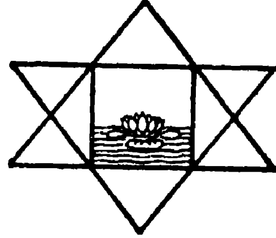
ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি

The Foundations of Indian Culture

শ্রীঅরবিন্দ



শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী-২

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী-২

অনুবাদক : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

প্রথম সংস্করণ, ২,২০০ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

Fourth Five-Year Plan—Development of modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of West Bengal.

মূল্য

Price:

প্রকাশকের নিবেদন

অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে মিঃ উইলিয়ম আরচার নামক একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক India and the Future নামে একখানা পুস্তকে ভারতীয়গণ বিজ্ঞানে, দর্শনশাস্ত্রে, ধর্মে, সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি কলাবিদ্যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সমাজতত্ত্বে—এককথায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে অতি নিম্নস্তরে, বর্বর অবস্থায় ছিল ও আছে, নানা প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে বিশেষভাবে প্রয়াস পাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাত মনীষী সার জন উডরফ "Is India Civilized?" "ভারত কি সভ্য?" নামক গ্রন্থে মিঃ আরচারের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া আংশিকভাবে তাহার যুক্তিকে খণ্ডিত করিয়াছেন আর বলিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা ও তাহার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যদি নষ্ট হয় তবে তাহাতে সমগ্র জগতের মহান অনিষ্ট সাধিত হইবে, সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের রক্ষণ ও বর্ধন করিবার জন্য ভারতবাসীকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই দুই গ্রন্থকে উপলক্ষ্য করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তৎ পরিচালিত 'আর্য্য' পত্রিকায় প্রথমতঃ 'Is India Civilized?' নাম দিয়া তিনটি A Rationalistic Critic on Indian Culture (ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একজন যুক্তিবাদী সমালোচক) নাম দিয়া ছয়টি, পরে A Defence of Indian Culture (ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন) নামে আঠারটি এবং Indian Culture and External Influence (ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বহির্জগতের প্রভাব) নামে একটি মোট এই আঠাশটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং এইগুলিকে একত্র করিয়া The Foundation of Indian Culture (ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি) নামক পুস্তক বাহির করা হইয়াছে।

সূচীপত্র



শ্রীঅরবিন্দ

ভারত কি সভ্য ?

ভারত কি সভ্য ?

প্রথম অধ্যায়

কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ উইলিয়াম আর্চারের অসংযত বাক্‌চাতুর্যের উত্তরে তন্ত্রতত্ত্বের লেখক বিখ্যাত পণ্ডিত সার জন উড্‌রফ্‌ 'Is India Civilised?' (ভারত কি সভ্য?) কতকটা চমকপ্রদ এই নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই সুপরিচিত নাট্য-সমালোচক (Mr. Archer) নিজের নিরাপদ স্বাভাবিক ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যেখানে কিছু বলিবার পক্ষে বিশাল ও প্রগল্‌ভ অজ্ঞতা ছাড়া আর কোন দাবি তাঁহার নাই সেই ভারতের কথা বলিতে গিয়া ভারতীয় সমগ্র জীবন ও সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, এমন কি তাহার সমস্ত মহৎ অবদান, তাহার দর্শন ধর্ম কাব্য চিত্রশিল্প স্থাপত্য উপনিষদ মহাভারত ও রামায়ণকে পাইকারী ভাবে গালি বর্ষণ করিয়াছেন, এ সমস্তকে অকথ্য বর্বরতার জঘন্য এক স্তূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই সময় অনেকে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে এই ধরনের সমালোচকের উত্তর দিতে গেলে এক প্রজাপতিকে হনন করা মাত্র হইবে অথবা এই ক্ষেত্রে হয়ত হুল ফুটানো যাহার স্বভাব তেমন এক ভ্রমরকে চক্রদ্বারা পিষ্ট করা হইবে। কিন্তু সার জন উড্‌রফ্‌ বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ অজ্ঞতাপ্রসূত আক্রমণকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে; দুই কারণে এই ভাবের সাধারণ আক্রমণ-সমূহের মধ্যে এটিকে বিশেষভাবে সমালোচনার উপযোগী বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছেন: প্রথম কারণ মিঃ আর্চার খৃষ্টান পাদরীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখিয়া প্রশ্নটি যুক্তি-বিচারের দিক হইতে তুলিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সমালোচনা এই ভাবের সমস্ত আক্রমণের অন্তর্নিহিত স্থূলতর উদ্দেশ্যগুলি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। কোন বিশিষ্ট সমালোচনার উত্তর রূপে সার জনের পুস্তকের সার্থকতা ততটা বেশী নহে, তাহার প্রধান উপযোগিতা এই যে তাহাতে ভারতীয় সভ্যতার জীবনমরণ সমস্যা রূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা অবতারণা করা হইয়াছে এবং সংস্কৃতিসকলের মধ্যস্থিত অপরিহার্য দ্বন্দ্বের প্রশ্ন প্রবল শক্তি ও দক্ষতার সহিত উত্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতে কোন সভ্যতা ছিল কিম্বা আছে কিনা এ প্রশ্ন এখন আর তর্ক-বিতর্কের বিষয় নহে, কেননা যাঁহাদের মতের কোন মূল্য আছে এরূপ সকলেই ভারতীয় সভ্যতাকে অনন্যসাধারণ প্রকৃতির এক বিশিষ্ট ও মহৎ সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সার জন উড্রফের এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতার সংঘর্ষ ও বিরোধ প্রকাশ করিয়া দেখানো, বিশেষ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার সুস্পষ্ট তাৎপর্য ও মূল্যের বিবরণ দেওয়া আর বর্তমানে এ সভ্যতা যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে এবং ইহা ধ্বংস হইলে জগতের যে দারুণ দুর্বিপাক উপস্থিত হইবে তাহা বর্ণনা করা। গ্রন্থকারের মত এই যে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এ সভ্যতাকে রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, আর তিনি বিশ্বাস করেন যে ইহা বর্তমানে প্রবল বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। যখন বর্তমান কালে উচ্ছ্বাস ও উৎক্ষেপের প্রবল ঝটিকাবর্তের ফলে বিপ্লব ও পরিবর্তনের এক বিরাট আক্রমণ সমগ্র মানবজাতির উপর প্রচন্ডবেগে আসিয়া আঘাত করিতেছে, সেই সময় ইউরোপের নব্যতন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত বস্তুতান্ত্রিকতার দ্বারা পরাজিত নিজ সন্তানগণের উদাসীনতা দ্বারা শত্রুহস্তে সমর্পিত প্রাচীন ভারতের সভ্যতা যাহার আশ্রয়ে ইহা রহিয়াছে তাহার সেই জাতীয় আত্মার সহিত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এই যে পবিত্র সম্পদ আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহার মূল্য অধিকতর সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করিতে ও যে উদ্যত বিপদ তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই অগ্নিপরীক্ষার সময় দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে এই পুস্তক আমাদিগকে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাইয়াছে। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভূমিকা রূপে এই পুস্তকের সারাংশ সংক্ষেপে যদি বর্ণনা করি তবে তাহা খুবই উপযোগী হইবে।

প্রকৃত সুখলাভই জগৎজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য, আর আত্মা, মন ও দেহের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আবিষ্কার ও রক্ষা করিতে পারিলেই তাহা লব্ধ হয়। যে সংস্কৃতি যে পরিমাণে এই সামঞ্জস্যের প্রকৃত সন্ধান দিতে পারে এবং তাহার আত্মপ্রকাশক উদ্দেশ্য ও গতিধারার সুসমঞ্জস প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারে সেই পরিমাণে হয় তাহার মূল্য নির্ধারণ। আর তাহার সকল তত্ত্ব ধারণা রূপ জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়োজিত করিয়া কোন সভ্যতা যে ভাবে সেই সামঞ্জস্যকে স্থাপিত করে, তাহার ছন্দোময় খেলা বা প্রকাশলীলা ফুটাইয়া তোলে, উদ্দেশ্য-সকল বজায় রাখে এবং তাহাদের পুষ্টিসাধন করে তাহার দ্বারাই সে সভ্যতাকে বিচার করিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন সভ্যতা বর্তমান ইউরোপের মত বস্তুতান্ত্রিক, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্মিলিত সভ্যতার মত কোনটি বা প্রধানতঃ মনোবুদ্ধিময়, আর এখনও ভারতে যে সংস্কৃতি চলিয়া আসিতেছে তাহার মত কোন সভ্যতা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক হইতে পারে। শাশ্বত আত্মাই

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব, সেই আত্মা এখানে জড়ের মধ্যে আবৃত সংবৃত ও অন্তর্নিহিত হইয়া আছে এবং ব্যষ্টি ব্যক্তিরূপে ক্রমপরিণতির ধারা অনুসরণ করিয়া জড় জগতে জন্ম জন্মান্তরের সাহায্যে সত্তার ক্রমোর্ধ্ব পরম্পরার মধ্য দিয়া মনোময় মানুষের স্তরে ভাবের জগতে সচেতন রূপে নীতি ও ধর্মের রাজ্যে পৌঁছিয়াছে। এই মহদর্জনে অচেতন জড়ের উপর এই বিজয় লাভে ব্যষ্টি-ব্যক্তির রূপরেখা পুষ্ট হয়, তাহার প্রসারতা বাড়ে, তাহার ঊর্ধ্বসীমার উন্নয়ন ঘটে, অবশেষে তাহার মননযন্ত্রের সাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক অংশের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ মানুষের মধ্যস্থ মনোময় ব্যষ্টিসত্তাকে মনের উপরে স্থিত শুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার সহিত নিজেকে পূর্ণরূপে এক করিয়া দেখিবার সামর্থ্য দান করে। তাহার সমাজপদ্ধতি এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার দর্শনে এই আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক চেতনা ও তাহার পরিণামের প্রতি আস্পৃহাই হইতেছে তাহার ধর্ম, শিল্পে ও সাহিত্যে রহিয়াছে সেই একই ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টি, তাহার স্বভাব তাহার সত্তার সমগ্র বিধান এই আদর্শের উপর স্থাপিত। প্রগতি সে স্বীকার করে কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক, সর্বদা উপচীয়মান সমৃদ্ধিশালী ও সার্থক জড় সভ্যতার বহির্মুখী আত্মপ্রসারণ নহে। এই সমুন্নত আদর্শের উপর তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত তাহার দিকে প্রবল প্রেরণা তাহার সভ্যতাকে দিয়াছে এক বিশিষ্ট মূল্য। মানবসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই উচ্চতম আদর্শের দিকে তাহার বিশ্বস্ততা ভারতবাসীকে সমস্ত মানবজগতের মধ্যে একটি পৃথক ও বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত করিয়াছে।

কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের আদর্শ এমন কি ইহার বিপরীত উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত অন্য অনেক সংস্কৃতিও আছে। জড়ময় বিশ্বজীবনের প্রথম বিধানই হইল সংঘর্ষ। এই বিধানের জন্য বিভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির একটা গভীর সংবেগ প্রতি সংস্কৃতিকে আত্ম-বিস্তার ও অন্য সকল বিভিন্ন বা বিরোধী সভ্যতাকে বিনাশ বা আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে বাধ্য করে। বস্তুতঃ সংঘর্ষ সংস্কৃতির চরম বা আদর্শ স্তর নহে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা অথবা বিবাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া অপরকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া এমন কি সকলের ভিত্তিরূপে এক একত্ব আছে এ বোধ লইয়া যখন প্রত্যেক সভ্যতা নিজস্ব পৃথক উদ্দেশ্যের পথে স্বাধীনভাবে পুষ্ট ও বর্ধিত হইতে থাকে কেবল তখনই এই দ্বন্দ্ববিহীন স্তর আসিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সংঘর্ষের নীতি প্রবল থাকে ততক্ষণ এই নিম্নতর বিধানের সম্মুখীন হইতেই হয়; যুদ্ধ চলিবার সময় অস্ত্রত্যাগ বিনাশকেই ডাকিয়া আনে। যে সংস্কৃতি তাহার সজীব পৃথক সত্ত্বা ত্যাগ করে, যে সভ্যতা সক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টাকে উপেক্ষা করে সে

সংস্কৃতি বা সে সভ্যতা অপরের দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং যে জাতি সে সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া ছিল সে জাতি নিজের আত্মাকে হারায় ও বিনষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতি বা নেশন ক্রমবিকাশশীল মানবাত্মার এক শক্তি, এবং নিজস্ব যে বিশিষ্ট তত্ত্ব সে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা দ্বারাই সে বাঁচিয়া থাকে। ভারত ভারতবর্ষেরই শক্তি, ইহা এক অতি মহান অধ্যাত্ম ভাব ও ধারণার জীবন্ত শক্তি, ইহার প্রতি বিশ্বস্ততাই তাহার অস্তিত্বের হেতু; কেননা কেবল এই বিশেষ গুণেই ভারত এক অমর জাতি হইয়া উঠিয়াছে; সে যে আশ্চর্যভাবে আজিও বাঁচিয়া আছে ইহাই তাহার গোপন রহস্য, ইহাই সর্বদা তাহাকে সেই শক্তি দিয়াছে যাহার বলে সে দীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে এবং যাহার বলে সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে।

এই সংঘর্ষের তত্ত্ব এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের বহু যুগব্যাপী এক বৃহৎ ঐতিহাসিক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সংঘর্ষের, পরস্পরের উপর এই সংঘাতের একটা বাস্তব দিক রহিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক একটা দিকও পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এ উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপ যেমন পুনঃপুনঃ এসিয়ার উপর আঘাত হানিয়াছে তেমনি এসিয়াও বারবার ইউরোপের উপর আপতিত হইয়াছে, আপতিত হইয়াছে জয় করিতে, আত্মসাৎ করিতে এবং আধিপত্য বিস্তার করিতে। এই দুই শক্তিসমুদ্র নিয়ত একে অন্যের উপর একবার অগ্রসর হইয়া গিয়াছে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক ধারার তীব্রতা বা স্পষ্টতা কখনও কিম্বা কোথাও কম বেশী থাকিলেও সমগ্র এসিয়ার মধ্যে তাহা সর্বদাই রহিয়াছে, কিন্তু এসিয়ার এই মূল ধারা, এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষেই বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপে এক সংস্কৃতি দেখা দিয়াছিল যাহাতে খৃষ্ট ধর্মের ধারণা—কিন্তু এ ধর্মেরও উৎপত্তিস্থান এসিয়া—প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ফলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হইয়াছিল; তখন এক প্রকার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় মহাদেশের ভাবসম্পদের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য দেখা দিয়াছিল; তথাপি মোটের উপর সংস্কৃতিগত প্রকৃতিতে ভেদ বরাবরই বর্তমান রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ হইয়াছে বস্তুতান্ত্রিক লুণ্ঠনপরায়ণ ও আক্রমণশীল এবং যাহা সভ্যতার প্রকৃত তাৎপর্য ও যথার্থ প্রগতির ফলপ্রসূ নিমিত্ত বা বিধান, মানুষের অন্তর ও বাহিরের সেই সামঞ্জস্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপাস্য দেবতা হইয়াছে জাগতিক সুখ-সম্ভোগ, জাগতিক প্রগতি ও জাগতিক কর্মকুশলতা। যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা এসিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং যাহা ভারতীয় আদর্শের উপর সকল ভীষণ আক্রমণেই প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সঠিক রূপ। আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী ভারত কখনই ইউরোপের উপর এসিয়ার স্থূল এই

আক্রমণে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহার ভাবধারাগুলিকে জগতের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করাই তাহার চিরাচরিত পদ্ধতি, বর্তমানেও যাহা আবার তাহার প্রগতির মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবে সে আজ ইউরোপ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে এবং এই বাস্তব বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়ের চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবীরূপে বিজড়িত আছে, আর সেই বিজয় কিছু অগ্রসরও হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইংরাজ-শাসন এখনও ভারতের নিজস্ব সত্তা ও সামাজিক ব্যবস্থা বজায় রাখিবার সামর্থ্য রক্ষা করিয়াছে; ইতিমধ্যে ইহা ভারতকে নিজের মধ্যে জাগাইয়াছে এবং যতদিন সে তাহার নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন না হইতেছে, ততদিন যে আক্রমণের প্রবাহ তাহাকে অন্যথা ডুবাইয়া দিতে ও তাহার সভ্যতা ভাঙিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল তাহার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে*। এখন তাহাকে আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইতে, বৈদেশিক ভাবের অনুপ্রবেশের হাত হইতে তাহার সাংস্কৃতিক জীবনকে রক্ষা করিতে, তাহার নিজস্ব প্রকৃতি মূলতত্ত্ব ও বিশিষ্ট রূপকে বজায় রাখিতে হইবে—বজায় রাখিতে হইবে তাহার নিজের মুক্তির এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

কিন্তু নানা প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই :—এই ধরনের আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করিবার মনোবৃত্তি পোষণ করা কি ঠিক কর্তব্য? মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতির পক্ষে মিলন সামঞ্জস্য ও পরস্পর বিনিময়ের প্রবৃত্তি ফুটাইয়া তোলাই কি আমাদের যথার্থ প্রকৃতি হওয়া উচিত নহে? একটা ঐক্যবদ্ধ বিশ্বসংস্কৃতি স্থাপনের চেষ্টাই কি ভবিষ্যতের বৃহত্তর পন্থা নহে? অতি-আধ্যাত্মিক কিম্বা অতিলৌকিক সভ্যতা—এ দুই-এর কোনটি কি মানুষের প্রগতি বা পূর্ণতার সুষ্ঠু পরিচায়ক? এ দুই-এর সুন্দর ও সুসমঞ্জস মিলনই আত্মা মন ও দেহের সামঞ্জস্য বিধানের উৎকৃষ্টতর উপায় বলিয়া কি মনে হয় না? তাহা ছাড়া ভারতীয় কৃষ্টির পূর্ণ অবয়ব এবং তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি পুরাপুরি রক্ষা করা উচিত কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের (মিঃ উড্রফের) উত্তর তাঁহার দ্বারা বর্ণিত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্রমিকতার বিধানের, তাহার পক্ষে ক্রমবিন্যস্ত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া চলিবার প্রয়োজনের মধ্যে রহিয়াছে।

* বিতর্কমূলক এই উক্তি অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করা যায় না; সমাজে ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না ইংরেজ শাসনের এই সাধারণ সিদ্ধান্তের জন্য সে সমস্ত সাক্ষাৎভাবে ও ভীষণ-রূপে আক্রান্ত হয় নাই, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যপূর্বক কোন সামাজিক চাপ দেওয়া হয় নাই ইহা সত্য; কিন্তু ইহা গোপনে ভারতজীবনের কেন্দ্র ও যন্ত্ররাজির ভিত্তিভূমি খনন করিয়া তাহাদের অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহাদের বাঁচিবার শক্তি হরণ করিয়াছে এবং এক প্রকার অননুভূত ছেদনক্রিয়া দ্বারা ভারতের সমাজ জীবনকে প্রসারতালাভের শক্তিশূন্য এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়শীল অন্তঃসারশূন্য খোলসে পর্যবসিত করিয়াছে, জড়তা ও অসাড়তার (যাহার অপর নাম স্থিতিশীলতা) শক্তি ছাড়া তাহার আত্মরক্ষার আর উৎকৃষ্টতর উপায় নাই।

প্রথম স্তর হইল সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতার যুগ, যাহা অতীতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে এবং বর্তমানেও মানবজাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেননা স্থূলতম বস্তুতান্ত্রিক সংঘর্ষ প্রশমিত হইলেও সংগ্রাম থাকিয়া যায়, সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব প্রবলতর হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ধাপ ঐক্যতানে উন্নীত করে, সকল সংস্কৃতি তখন সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়। তৃতীয় এবং শেষ পর্যায় আত্মোৎসর্গ দ্বারা চিহ্নিত যেহেতু তখন সকলের আত্মা যে এক এ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত, এ সময় প্রত্যেকে অপরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। অধিকাংশ সংস্কৃতির পক্ষে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তৃতীয় স্তর অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়াছেন, মুক্ত পুরুষ, পরমাত্মার সহিত যুক্ত জীবাত্মা সর্বসত্তাকে নিজের সত্তা বলিয়াই জানেন, তাঁহার পক্ষে আত্মরক্ষার বা আক্রমণের প্রয়োজন নাই। কেননা তাঁহার সত্তায় ধর্মে সংঘর্ষের আর স্থান নাই, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ তাঁহার সমগ্র কর্মের মূল উৎস। কিন্তু কোন জাতিই এই স্তরে পৌঁছে নাই; কোন তত্ত্ব বা বিধানকে অনিচ্ছা কিম্বা অজ্ঞানতাবশে স্বীকার করা অথবা আপন চেতনার সত্যের বিরোধী কিছুকে মানিয়া চলা মিথ্যাচরণ এবং তাহার ফল আত্মবিনাশ। ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত মেষশাবকের ন্যায় নিজেকে হত হইতে দিলে সত্তার পুষ্টি বা বিবৃদ্ধি ঘটে না, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও কোন কৃতিত্ব আনয়ন করে না। একতা ও ঐক্যতানতা উপযুক্ত সময়েই উপস্থিত হয়, কিন্তু সে একতার ভিত্তি অন্তরে, স্বাধীনভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই সে অবস্থা আসে, একে অপরকে গ্রাস অথবা অসংলগ্ন ও অসমঞ্জস মিশ্রণের দ্বারা নয়। জগৎ এই বৃহত্তর বস্তুরাজির জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্বে সে অবস্থা আসিতে পারে না। যুদ্ধকালে অস্ত্রত্যাগ নিজের ধ্বংসকেই ডাকিয়া আনে এবং ইহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কোন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক এ উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে ইহা ঠিক, কেননা আত্মাই মন ও দেহের মধ্য দিয়া কার্যসাধন করে। কিন্তু যে ধরনের শুধু বুদ্ধিগত বা নিরেট বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ইউরোপ বর্তমানে সমাদর করিতেছে তাহার হৃদয়ে মৃত্যুবীজ নিহিত, কেননা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনই সংস্কৃতির জীবন্ত লক্ষ্য। সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণরূপে সত্য বলিয়াই শাশ্বতের দিকে রহিয়াছে ভারতীয় প্রগতির সংবেগ আর তথাপি তাহার সংস্কৃতি ও নিজস্ব দর্শনের মধ্যে, নিত্যবস্তু ও ঐহিক ব্যাপারের মধ্যে একটা পরম সমন্বয় রহিয়াছে; ইহার জন্য তাহাকে বাহিরে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। সেই একই তত্ত্ব অনুসারে সুসমঞ্জস কোন সভ্যতার মধ্যে যাহাতে দেহ মন ও আত্মা পরস্পরের আশ্রয় হইতে পারে তেমন এক রূপ যেমন প্রয়োজন, তাহার শুদ্ধ আত্মাও সেইরূপই প্রয়োজনীয় বস্তু; কেননা রূপ

আত্মার অভিব্যক্তিরই একটা ছন্দ। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে যে রূপকে ভাঙিয়া দিলে আত্মার প্রকাশকে ব্যাহত করা হয় অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহাকে গভীর বিপদ-গহ্বরে ফেলা হয়। রূপের পরিবর্তন হইতে পারে, হইবেও বটে, কিন্তু নব রূপায়ণকে এক নূতন আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিসৃষ্টি হইতে হইবে এবং তাহাকে ভিতর হইতে গঠিত হইয়া উঠিতে হইবে। ইহাকে আত্মার বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইবে, দাসসুলভ মনোভাব লইয়া ভিন্ন প্রকৃতির কোন রূপায়ণ হইতে ধার করা কোন কিছু হইলে চলিবে না।

এখন দেখা প্রয়োজন তাহার প্রয়োজনের এই সংকটকালে ভারত বস্তুতঃ কোথায় দাঁড়াইয়া আছে এবং ইহা কতটা সত্য যে সে তাহার শাশ্বত ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা সে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে এবং এখনও সে বিপদমুক্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে অদূর ভবিষ্যতে বিপদ আরও ঘনীভূত আরও দৃঢ় আরও তীব্র ও ভীষণ আকার ধারণ করিবে। এসিয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে এবং সেই জন্যই প্রতিযোগিতার বিধান অনুসারে স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্তভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার পক্ষে এসিয়াকে গ্রাস করিবার চেষ্টা অতি তীব্র হইয়া উঠিবে এবং ইতিমধ্যে তাহা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। কেননা যদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপের দ্বারা এসিয়া বিজিত ও পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে যখন সে পুনরায় জগৎ-সভায় স্থান পাইবে তখন তাহার আদর্শ দ্বারা ইউরোপের আক্রান্ত হওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। ইহা একটা সংস্কৃতিগত বিবাদ, রাজনৈতিক প্রশ্ন ইহাকে জটিলতর করিয়াছে। ইউরোপের চেষ্টা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসিয়াকে তাহার একটি প্রদেশে এবং রাজনীতির দিক হইতে এসিয়াকে যদি ইউরোপীয় সংঘের অঙ্গীভূত করা নাও যায় তবু তাহাকে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন একটি শাখায় পরিণত করিতে হইবে; নতুবা নূতন জাগতিক ব্যবস্থায় ধনী পরাক্রান্ত ও বিশাল এসিয়ার জাতিসকলের প্রবল প্রভাবে ইউরোপকে এসিয়ার ভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িতে হইবে এবং সংস্কৃতির দিক হইতে ইউরোপই এসিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত হইবে। যে মতলব লইয়া মিঃ আর্চার মহাশয় আক্রমণ করিয়াছেন স্পষ্টভাবেই তাহা রাজনৈতিক। তাঁহার সকল গানের মূল ধূয়া এই যে ইউরোপীয় কাঠামোর মধ্য দিয়া যুক্তিবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া জগতের পুনর্গঠন করিতে হইবে। তাঁহার যুক্তি এই বলে যে ভারত যদি তাহার নিজের সভ্যতা আঁক্‌ড়িয়া ধরিয়া থাকে, যদি সে তাহার আধ্যাত্মিক আদর্শ পোষণ করে, তাহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক স্বরূপে যদি আসক্ত থাকে তাহা হইলে সে সব কিছু উত্তম বস্তুর এক জীবন্ত অস্বীকৃতি হইয়া দাঁড়াইবে, সুন্দর দীপ্ত যুক্তিবাদী এই জগতে সে শুধু এক কুৎসিৎ "কলঙ্ক" রূপে বিরাজ করিবে। হয় তাহার সমগ্র সত্তাকে ইউরোপীয়

ভাবাপন্ন যুক্তি ও বস্তুবাদী করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই পরিবর্তন দ্বারা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত করিতে হইবে, না হয় তাহাকে পরাধীন করিয়া রাখিতে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাহারা শ্রেষ্ঠতর তাহাদের দ্বারা শাসন করিতে হইবে। ত্রিশ কোটি মানুষের দ্বারা গঠিত এই ধর্মান্ধ বর্বর জাতিকে দৃঢ়ভাবে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং অতি মহৎ ও জ্ঞানালোকদীপ্ত নাস্তিক খৃষ্টান ইউরোপীয় চৌকিদার ও গুরুমহাশয়দের দ্বারা শিক্ষিত ও সভ্য করিয়া তুলিতে হইবে। যে ছক্ অঙ্কিত করা হইল তাহা হাস্যোদ্দীপক মনে হইতে পারে। কিন্তু আসলে ইহার মধ্যে তাহাদের মনোভাবের সারমর্ম নিহিত। বস্তুত এই আক্রমণের বিরুদ্ধে—যে আক্রমণ সর্বব্যাপক নয়, কেননা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝা ও তাহার মূল্য স্বীকার করা এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখা দিয়াছে—ভারত জাগিতেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সে চেষ্টা প্রচুর নহে, কেবলমাত্র যেরূপ সর্বান্তঃকরণে যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তি ও দৃঢ়সংকল্প লইয়া কার্য করিলে এ বিপদ হইতে সে উদ্ধার পাইবে তেমন ভাবের চেষ্টা হইতেছে না। আজ সঙ্কট অতি নিকটে, পথ বাছিয়া লইতে হইবে, কেননা এই সন্ধিক্ষণে জীবন বা মৃত্যু অনিবার্যরূপে তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে।

মিঃ উড্রফ্ প্রদত্ত এই সাবধান বাণীকে উপেক্ষা করা যায় না; ইউরোপের জননেতা ও রাজনীতিবিদেরা অধুনা যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, ভারতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধ সদ্য বাহির হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণ যেরূপ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে সে সমস্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছে তাহা এ বিপদের বাস্তবতার পরিচায়ক। বস্তুত বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিবেশ রহিয়াছে এবং প্রবল ও অবধারিত পরিবর্তনের এই মুহূর্তে মানবজাতির সংস্কৃতির যে ধারা দেখা যাইতেছে তাহা হইতেই অপরিহার্যরূপে এ বিপদ আসিতেছে। মিঃ উড্রফ্ তাঁহার পুস্তকে যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছেন তাহার সবগুলিকে অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার যে প্রশংসা করিয়াছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহা পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আমার মতে মধ্যযুগের মহদুদ্দেশ্য, শিল্পকলাপ্রবৃত্তির সৌন্দর্যবোধ, আধ্যাত্মিক আকূতির গভীরতা ও ঐকান্তিকতা—এ সমস্তই তখনকার নিষ্ঠুর অসহনশীলতা, অজ্ঞান ও অন্ধকারের আধিক্য, আদিমকালের টিউটনিক জাতিসুলভ বীভৎস কঠোরতা নৃশংসতা পাশবতা ও স্থূলতার দ্বারা নষ্ট হইয়াছে। আমার মনে হয় তিনি পরবর্তীযুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপর যেন একটু বেশী কঠোর হইয়াছেন। প্রবলভাবে অর্থনীতির প্রভাবাধীন এই সভ্যতা তাহার উপযোগিতা-মূলক জড়বাদের সুরের আধিক্যে যথেষ্ট পঙ্কিল, তাহা যদি আমরা অনুসরণ

করি তবে অত্যন্ত ভুল করিব, তথাপি ইহা কতকগুলি মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানবজাতির জন্য অনেক কিছু করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত আদর্শ যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে যথেষ্ট স্থূলতা ও অপূর্ণতা রহিয়াছে এবং ভারতীয় মনের পক্ষে সে সমস্ত পূর্ণরূপে গৃহীত হইবার পূর্বে তাহাদের তাৎপর্যকে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। আমি আরও মনে করি যে গ্রন্থকার ভারতের পুনরুজ্জীবনের শক্তিকে যেন একটু ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। এ শক্তির অর্থে বহির্জীবনে তাহার যে শক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে আমি তাহার কথা বলিতেছি না, কেননা তাহা দীনতাক্লিষ্ট, যে দিকে তাহার অনিবার্য গতি রহিয়াছে তাহার সেই প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলিতেছি। তিনি দাসসুলভ মনোগতিবিশিষ্ট সেই সমস্ত ভারতবাসীর কথা একটু বেশী করিয়া বলিয়াছেন যাহারা অপরূপ এক হীনভাবের অনুগত হইয়া এরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় যে "ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আদর্শ দ্বারাই ভারতীয় আকৃতি বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়", এরূপ লোক যাহার মুখপাত্র সেই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে; কিন্তু এ উক্তির সত্য একটি মাত্র ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে রহিয়াছে—এ ক্ষেত্র একটা বিশেষ ব্যতিক্রম; অবশ্য আমি স্বীকার করি ইহা এমন একটি ক্ষেত্র যাহা বিষম বিপদের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এখানেও গভীর পরিবর্তনের একটা প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে, যদিও তাহা এখনও নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই, এখনও তাহাকে শ্রমিক শাসিত রুশিয়ার যুদ্ধবাদী স্থূলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত ইউরোপীয় মতবাদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর একটি কথা, ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব ও ভাবনা ক্রমবর্ধমান ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, যাহা ভারতের পক্ষে ইউরোপীয় আক্রমণের নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্যুত্তর; মিঃ উড্রফ্ এই অনুপ্রবেশের যথোপযুক্ত মূল্য স্বীকার করেন নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র প্রশ্নটি এক নূতন আকারে দেখা দেয়।

সার জন উড্রফ্ প্রবলভাবে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শুধু মাত্র আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে পরাজয়ই হইবে তাহার শেষ ফল; যুদ্ধ যদি অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে তবে জীবন্ত ও সক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া প্রবলভাবে বিপক্ষকে আক্রমণই একমাত্র সুষ্ঠু রণকৌশল; কেননা সেই আক্রমণের শক্তি দ্বারাই আত্মরক্ষার চেষ্টাও কার্যকরী হইতে পারে। কোন কোন শ্রেণীর ভারতবাসী ইউরোপীয় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে কেন এখনও সম্মোহিত হইয়া আছে এবং আমরা সকলেই আজিও কেন রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্মোহিত রহিয়াছি? তাহার কারণ তাহারা ইউরোপীয়দিগের দিকে সকল শক্তি সকল সৃষ্টি সকল সক্রিয়তা সর্বদা দেখিতে পাইতেছে এবং ভারতের দিকে আছে কেবল নিষ্ক্রিয়তা অথবা

স্থিতিশীল আত্মরক্ষাচেষ্টার অক্ষম দুর্বলতা। কিন্তু যেখানেই ভারতীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছে, বীর্যের সঙ্গে আক্রমণ এবং সমারোহের সহিত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে তথায় ইউরোপীয় চোখ-ধাঁধানো যাদুর মোহিনীশক্তি তৎক্ষণাৎ হীনবীর্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ আর কেহ ইউরোপীয় ধর্মের আক্রমণের গুরুভার অনুভব করে না, যদিও প্রথমদিকে তাহা ছিল প্রবল, কারণ হিন্দুর পুনরুজ্জীবনের সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াবলি ভারতীয় ধর্মকে সজীব বৃদ্ধিশীল নিরাপদ বিজয়ী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাসমর্থ শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। আর দুইটি ঘটনা এই কার্যে তাহাদের প্রচ্ছন্নশক্তির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন, অপরটি শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ। কেননা যে শক্তির উপর ভারত দাঁড়াইয়াছে এই দুই ঘটনা সেই আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে প্রকাশ করিয়াছে, এখন আর শুধু আত্মরক্ষা-পরায়ণ নহে, সে আক্রমণশীল হইয়া উঠিয়াছে এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদী মনোভাবকে আক্রমণ করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজী শিক্ষা ও প্রভাবের ফলে সুকুমার শিল্পকলার ধারণায় ইংরেজী ভাবাপন্ন ও হীনচেতা হইয়া পড়িয়াছিল, যতক্ষণ না শিল্পে বঙ্গীয় কলাতন্ত্রের (Bengal school of arts) উজ্জ্বল আকস্মিক উদয়ের রশ্মিচ্ছটা টোকিও লন্ডন ও প্যারির মত সুদূর সহর হইতেও দেখা গেল। সংস্কৃতিগত সেই সার্থক ঘটনা দেশে রসবোধের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইয়া উঠে নাই বটে কিন্তু তাহার গতি আজ অপ্রতিহত, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও নিশ্চিত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই একই প্রকার ঘটনার বিস্তার ঘটিতেছে। এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তথাকথিত চরমপন্থী দলের কার্যপদ্ধতির আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই ছিল; কেননা এতকালের আপাত ধারণা ছিল যে ইউরোপীয় ধারাসমূহের অনুকরণ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ভারতবাসীর দ্বারা রাজনীতিতে নূতন সিদ্ধি অসম্ভব; স্বদেশী আন্দোলন এই ধারণা ভাঙিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। সাময়িকভাবে যদি তাহা বিফল হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ এই নয় যে তাহার প্রেরণা অসত্য ছিল, কারণ শত্রুপক্ষের চেষ্টা প্রবল ছিল এবং অতীতের অবনতিজনিত দুর্বলতা তখনও অপনীত হয় নাই; যদি তাহার প্রাথমিক সৃষ্টিগুলি ভাঙ্গিয়া বা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং যদি তাহাদের আদি তাৎপর্য হারাইয়া থাকে, তথাপি তাহা অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া ভবিষ্যদ্‌ যাত্রীর পথ দেখাইয়া দিতে থাকিবে। অধিকতর অনুকূল পরিবেশের বৃহত্তর দ্বার যখন উন্মুক্ত হইবে তখন সে চেষ্টার পুনরাবির্ভাব হইতে বাধ্য। সে চেষ্টার উদ্ভব ও সফলতা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ ইউরোপীয় রাজনীতিধারা তাহার সেই একই প্রকার সামাজিক ব্যবস্থাও সঙ্গে করিয়া আনিবে এবং তাহা ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির

মৃত্যু ঘটাইতে চাহিবে। আত্মরক্ষা যদি কার্যকরী করিতে হয় তবে আক্রমণকে কার্যকরী ও সৃষ্টিশীল করিতে হইবে।

এই বৃহৎ প্রশ্নকে যদি তাহার প্রকৃত রূপরেখায় দেখাইতে হয় তবে তাহাতে তাহার বিশালতর জগৎব্যাপী তাৎপর্য সমাবেশ করিতে হইবে। আজিও যুদ্ধ সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও পরিচালনা করিতেছে এবং আরও কিছুকাল তাহা করিবে, কেননা মানবজাতির পক্ষে এখনও যাহা অসম্ভব বোধ হয় তেমন কোন সৌভাগ্যের ফলে অদূর ভবিষ্যতে যদি বহির্যুদ্ধ রহিত হইয়া যায় তথাপি সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে, তখন তাহা অন্য আকার ধারণ করিবে। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে মানুষের জীবন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পরস্পরের নিকটতর হইতেছে, ইহা বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান ঘটনা। যুদ্ধ প্রবলভাবে ইহাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে; কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে এ ঘটনার নিহিত তাৎপর্য কি তাহা যেমন প্রকাশ হইতেছে, তেমনি বাধা-বিপত্তির প্রবল স্তূপও দেখা দিয়াছে। ইহা এখনও প্রকৃত সুরসঙ্গতিতে পরিণত হয় নাই, প্রকৃত একত্ব আরম্ভ হইতে আরও অনেক বিলম্ব আছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বর্তমান পরিস্থিতি জোর করিয়া আমাদের ঘাড়ে এক বাহ্য একত্ব চাপাইয়া দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই বাহ্য একত্ব অপরিহার্যরূপে মনের, সংস্কৃতির এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা পরিণাম আনয়ন করিবে। সম্ভবত প্রথমে ইহা সংঘর্ষ হ্রাস না করিয়া বরং বহুদিকে বাড়াইয়া তুলিবে, বহুপ্রকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম বৃদ্ধি পাইবে, সংস্কৃতিগত সংঘর্ষকেও ত্বরান্বিত করিবে। অবশেষে এমনও হইতে পারে যে আক্রমণশীল ইউরোপীয় ধরনের কোন এক সভ্যতা অন্য সকল সভ্যতাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া বা গ্রাস করিয়া একটা একত্ব আনয়ন করিবে। সে সভ্যতা কি মধ্যশ্রেণী পরিচালিত ও অর্থনৈতিক, শ্রমজীবীশাসিত ও জড়বাদী অথবা যুক্তিবাদচালিত ও বুদ্ধিপ্রধান হইবে তাহা পূর্ব হইতে ঠিক করিয়া বলা যায় না, কিন্তু বর্তমানে এই সম্ভাবনাই এক অথবা অন্যরূপে অধিকতর বাস্তব হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান অবস্থা হইতে কোন প্রকার একত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন এক সুরসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু যাহাতে প্রত্যেক জাতি পূর্ণরূপে পৃথক থাকিয়া নিজের স্বতন্ত্র সভ্যতাকে দৃঢ়রূপে পুষ্ট করিয়া তুলিতে এবং অন্য সকল প্রধান ভাবধারা ও সংস্কৃতিগত রূপকে বিরোধী মনে করিয়া বর্জনের বিধি অনুসরণ করিতে চায় সেরূপ কোন আদর্শ যে জয়লাভ করিবে তাহা মনে হয় না—যদিও কিছুকাল যাবৎ এ আদর্শ দেখা দিয়াছে ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। কেননা তাহা ঘটিলে প্রকৃতি যে একত্ব সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহার সকল উদ্দেশ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাই তাহা সম্ভবত ঘটিবে না কিন্তু সেরূপ মহা-বিপদ্পাত যে একেবারেই অসম্ভব তাহা বলা যায় না। ইউরোপই বর্তমানে

সমস্ত জগৎ শাসিত করিতেছে, তাই দৃঢ়রূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জড়জীবন ব্যবস্থার পরিপুষ্টি সাধনে রত ইউরোপীয় দৃষ্টিজাত একত্ববোধ যে অল্পসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ রাখিবার অনুমতি দিবে তাহাই শুধু যাহার মধ্যে স্থান পাইবে তেমন এক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জগৎ দেখা দিবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই স্বাভাবিক। এই সম্ভাবনাসিদ্ধির পথে আসিয়া ভারতের ছায়ারূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সার জন উড্‌রফ্ অধ্যাপক লোজ ডিকিনসনের (Lowes Dickinson) একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে ভারতের সঙ্গে বাকি সমস্ত জগতের যতটা মতবিরোধ আছে, এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ততটা নাই। এ উক্তির পশ্চাতে একটা সত্য আছে, কিন্তু এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যে একটা সংস্কৃতিগত বিরোধ আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিকতা ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; বুদ্ধিবিচার ও যুক্তিবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যতই গোপনে অবস্থান করুক না কেন অথবা অন্য কোন আবরণে যতই আবৃত হউক না কেন আধ্যাত্মিকতা মানবপ্রকৃতির একটি অপরিহার্য অংগ। কিন্তু তফাৎ এই যে কোথাও আধ্যাত্মিকতাকে বাহ্য ও আন্তর এ উভয় জীবনের চালক ও প্রধান নিয়ামক শক্তি করিয়া তোলা হয়, কোথাও বা তাহাকে দমিত রাখা হয়, কেবল ছদ্মবেশে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয়, অথবা এক গৌণশক্তিরূপে উপস্থাপিত করা হয়, তাহাকে বৃত্তিসমূহের রাজা বলিয়া মানা হয় না অথবা মননশক্তি বা প্রবল ও উদ্দাম জড় শক্তিকে স্থান দেওয়ার জন্য সরাইয়া রাখা হয়। এক সময় সকল সভ্য দেশে চীন হইতে পেরু পর্যন্ত সর্বত্র প্রাচীন জ্ঞানে সর্বজনীনভাবে এ দুই-এব পূর্ববর্তী ধারা গৃহীত হইত। কিন্তু অন্য সকল জাতি এ অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতার বৃহৎ সর্বব্যাপিত্ব হ্রাস পাইয়াছে, কোথাও কোথাও, যথা ইউরোপে, ইহা একেবারে লোপ পাইয়াছে। অথবা এসিয়ার মত বর্তমানে আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করিয়া তাহার স্থানে আক্রমণশীল অর্থনীতি বাণিজ্য শ্রমশিল্প ও আধুনিক ধরনের উপযোগিতামূলক ধারাকে বসাইবার বিপদ বরণ করিয়া লওয়া হইতেছে। কেবল একা ভারত তাহার আলোক ও শক্তির যতই হ্রাস বা বিচ্যুতি ঘটুক না কেন তৎসত্ত্বেও আধ্যাত্মিক প্রেরণার মূল শক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই। কেবল ভারত আজিও নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অদম্য হইয়া রহিয়াছে, কেননা তাহার সমালোচকেরা বলেন তুরস্ক চীন ও জাপান এই মূর্খতাকে অতিক্রম করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, একথার অর্থ এই যে এ সমস্ত দেশ বুদ্ধিবাদ ও জড়বাদ এ উভয়কে গ্রহণ করিয়াছে। জাতি রূপে কেবল এক ভারত—তাহার মধ্যস্থ ব্যক্তিবিশেষ এবং ক্ষুদ্রশ্রেণী বিশেষ যাহাই করুক না কেন—আজ পর্যন্ত তাহার আরাধ্য দেবতাকে ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, পশ্চিমের যে

সমস্ত সফলকাম লৌহদেবতা যুক্তিবাদ অর্থনীতিবাদ বাণিজ্যবাদ প্রভৃতি নামে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে ভারত আজিও তাহাদের নিকট নতজানু হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে নাই। সে প্রভাবিত ও আক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু এখনও পরাজিত হয় নাই। তাহার গভীরতর বুদ্ধি অপেক্ষা তাহার বাহিরের মন অনেক পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ, যথা স্বাধীনতা সমতা গণতন্ত্র ও অন্য অনেক কিছু স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহার বৈদান্তিক সত্যের সহিত সমন্বিত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তু সে পাশ্চাত্য রূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছে না এবং ইতিমধ্যেই তাহার নিজ ভাবনায়, যাহা আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন না হইয়াই পারে না, এ সমস্তের তেমন ভারতীয় রূপ দিতে চাহিতেছে। ইংরাজের ভাব ও সংস্কৃতি অনুকরণ করিবার প্রথম আবেগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অধুনা তাহার স্থানে আরও বিপজ্জনক একটা আবেগ আসিয়াছে, যাহা হইল সাধারণভাবে ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য সভ্যতাকে এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী রাশিয়ার স্থূল ও তীব্র ভাবধারাকে সর্বজনীনভাবে অনুকরণ। অন্যদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম ক্রমবর্ধমানভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে এবং এক আধ্যাত্মিক জাগরণ ও তাহার সার্থক গতিবৃত্তি অতি প্রবল ধারায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই দ্ব্যর্থ সন্ধিক্ষণে কেবল দুইটি পরিণামের একটি ঘটিতে পারে। হয় ভারত যুক্তিবাদী শ্রমশিল্পপরায়ণ জাতিতে পরিণত হইবে, তাহাকে আর ভারত বলিয়া চিনিতে পারা যাইবে না, সে আর ভারত থাকিবে না অথবা সে নবযুগের পুরোধা হইবে এবং তাহার নিজের উদাহরণ ও নিজ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দ্বারা ইউরোপে যে নূতন প্রকৃতি, নূতন ঝোঁক দেখা দিয়াছে তাহার সহায়তা করিবে এবং মানব জাতিকে আধ্যাত্মিকতায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। একমাত্র এই মূলগত দারুণ প্রশ্নই বিচার্য বিষয় :—ভারত যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রতিভূ তাহা কি ইউরোপকে জয় করিবে এবং তথায় পাশ্চাত্যের উপযোগী আধ্যাত্মিকতার নূতন রূপ সৃষ্টি করিবে অথবা ইউরোপের যুক্তিবাদ ও বাণিজ্যবাদ চিরকালের জন্য কি ভারতীয় ধরনের সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করিবে?

তাহা হইলে ভারত কি সভ্য ইহা আর প্রশ্ন নহে, প্রশ্ন এই যে-প্রেরণা ভারতীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে অথবা যে-প্রেরণা প্রাচীন ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং নব্য ইউরোপের জড়বাদকে সৃষ্টি করিয়াছে ইহাদের কোন্‌টি মানবজাতিকে পরিচালিত করিবে। কেবল যুক্তিবিচার দ্বারা প্রভাবিত অথবা বড় জোর অফলপ্রসূ আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণালোক দ্বারা স্পৃষ্ট আমাদের জড়-প্রকৃতির স্থূল বিধানের উপরই আত্মা মন ও দেহের সামঞ্জস্য কি প্রতিষ্ঠিত হইবে, অথবা আত্মার প্রভাবশালী শক্তি কি চালনার ভার গ্রহণ করিবে এবং

বুদ্ধি মন ও দেহের ক্ষুদ্রতর শক্তি সকলকে জোর করিয়া এক উচ্চতম সমন্বয়ে, বিজয়ী চিরবর্ধিষ্ণু সমতায় পোঁছিবার অধিকতর গৌরবজনক চেষ্টায় নিযুক্ত হইবে? তাহার প্রাচীন আদর্শকে আরও প্রবল অন্তরঙ্গ ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সভ্যতার রূপরাজি বা বাহ্য আকারাদিকে পুনর্গঠিত করিয়া ভারতকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এইভাবে ভারত হইতে মুক্ত এক আলোক-তরঙ্গমালা বিজয়ী আত্মপ্রসারণে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে থাকিবে—যে পৃথিবীর একদা সে অধীশ্বর ছিল অথবা অন্ততপক্ষে অতি প্রাচীনকালে যাহাকে সে আলোকিত করিয়াছিল; আর এই তরঙ্গমালাকে প্রবাহিত ও পরিচালিত করিবার জন্য তাহাকে প্রথম আক্রমণকারী হইতে হইবে। সংঘর্ষের একটি আকারকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিতে হইবে যতদিন বিরোধী সংস্কৃতির আক্রমণ বর্তমান থাকিবে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে অগ্রগামী চিন্তাধারা উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে যাহা সর্বোত্তম বস্তুত তাহার সহায়ক বলিয়া চরমে ইহা এক উচ্চতম ভূমিতে এক মহাসুর-সঙ্গতির প্রারম্ভে এবং একত্বের জন্য প্রস্তুতিতে পরিণত হইবে।

ভারত কি সভ্য ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

একবার এই বৃহত্তর বিচার্য বিষয় উপস্থিত হইলে ভারতীয় সভ্যতার এই প্রশ্নের সংকীর্ণ অর্থ আর থাকে না—তাহা অনেক বৃহৎ এক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। মানব জাতির ভবিষ্যৎ কেবল যুক্তিবিচার এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক সংস্কৃতির উপরই কি নির্ভর করে? যাহারা জড় বিশ্বের নিশ্চেতনার অন্ধকার হইতে উন্মিষিত হইয়াছে এবং নানা বাধা ও সমস্যার মধ্য দিয়া কিছু স্পষ্ট আলোক এবং নিশ্চিত আশ্রয়ের অনুসন্ধানে তাহারই মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে সেই সমস্ত ক্ষণবিধ্বংসী ব্যষ্টি ব্যক্তির সমষ্টিগত মনের সতত পরিবর্তনশীল একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে; এখন প্রশ্ন হইতেছে এই সমষ্টিমনের সাধনাই কি মানব জীবনের প্রগতির সমস্ত কিছু? আর যুক্তিবিচারলব্ধ জ্ঞান এবং যুক্তিচালিত জীবনধারার মধ্যে সেই আলোক এবং আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করিবার মানুষী প্রচেষ্টাই কি সভ্যতা নামে অভিহিত হইবে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বাহ্য জড় প্রকৃতির শক্তি সামর্থ্য ও সম্ভাবনা এবং মনোময় ও জড়ময় সত্তারূপে মানুষের মনস্তত্ত্বের সুগঠিত জ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমবর্ধমান ভাবে সামাজিক জীবনের মঙ্গল সাধন এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই জ্ঞানকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার, যাহাতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন আরও সুদক্ষ আরও সুসহ আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় আরও সুখকর হইয়া উঠে, যাহাতে সে-জীবনকে আরও ভালভাবে কাজে লাগান যায়, দেহ মন এবং প্রাণের সর্বপ্রকার সুখ ও ভোগ-বিলাস বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়—ইহাই হইবে জীবনের একমাত্র যথার্থ রীতি এবং প্রকৃত তাৎপর্য। আমাদের সকল দর্শন, সকল ধর্ম—অবশ্য যদি ধর্মের প্রয়োজন অতিক্রম বা তাহাকে বর্জন করা না হয়—সকল বিজ্ঞান, চিন্তন, শিল্প, সমাজ গঠন, বিধান এবং প্রতিষ্ঠান জীবনের এই ধারণার উপরেই স্থাপিত হইবে এবং এই একই উদ্দেশ্য ও তাহার প্রয়াসের সেবাতেই নিয়োজিত হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতা জীবনের এই সূত্র ও ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাকে কোনপ্রকারে সিদ্ধ করিয়া তুলিবার কঠোর সাধনায় আজিও লিপ্ত রহিয়াছে।

বুদ্ধিচালিত যান্ত্রিক যে সভ্যতা যুক্তি এবং উপযোগিতামূলক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় ইহাই তাহার বিধান ও ব্যবস্থা।

অথবা আমাদের যে সত্তা কিম্বা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে যে অন্তরাত্মা প্রকৃতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে নিজেকে জানিতে নিজেকে আবিষ্কার করিতে এবং নিজের চেতনার বিস্তার সাধন করিতে চাহিতেছে, তাহার সত্য কি এই নয় যে সে জীবনের এক বৃহত্তর পন্থা বাহির করিবে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে উন্নত ও পুষ্ট হইয়া উঠিবে, আত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ আলোকের এবং এক দিব্য আন্তর পূর্ণতার মধ্যে উন্মিষিত ও বর্ধিত হইবে? ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, চিন্তন, শিল্প, সমাজ, সমগ্র জীবনই কি এই উন্নতি ও পরিপুষ্টির উপায় মাত্র, চিৎ-পুরুষের নিজের কাজে ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র নহে? এই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি তাহাদের প্রধান এবং সর্বাগ্রে করণীয় অথবা অন্ততপক্ষে চরম অভিনিবেশের বস্তু নহে? ইহাই ভারতের জীবন ও সত্তার ধারণা এবং আদর্শ—সে দাবি করে তাহার জ্ঞানও বটে—, এই সেদিন পর্যন্তও ভারত এ আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই এবং তাহার প্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং স্থায়ী তাহা দিয়া সে আজিও এই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা হইল অধ্যাত্মভাবাপন্ন এক সভ্যতার সেই জীবনসূত্র বা জীবননীতি যাহা মন, প্রাণ এবং দেহের পূর্ণতা বিধানের মধ্য দিয়া এবং তদুপরি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আত্মার এক অত্যুচ্চ সংস্কৃতিতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহা হইলে প্রধান বিচার্য বিষয় হইতেছে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধি পরিচালিত যান্ত্রিক, অথবা অধ্যাত্মভাবাপন্ন বোধিচালিত ধর্মময়, এই দুই সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে কাহার উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশা নির্ভর করিতেছে। যুক্তিবাদী সমালোচক ভারত সভ্য আছে অথবা কখন ছিল একথা যখন অস্বীকার করেন, যখন তিনি বলেন উপনিষদ, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম, প্রাচীন ভারতের কাব্য ও শিল্পকলা সমস্তই স্তূপীকৃত এক বর্বরতা এবং যে মন বরাবরই বর্বর রহিয়া গিয়াছে তাহার সাধনার ব্যর্থ ফল, তখন তিনি সোজাসুজি ইহাই মনে করেন বলিতে হইবে যে, সভ্যতা এবং জড়ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবিচারের মতবাদ ও তদুপযোগী আচার-ব্যবহার একার্থবাচক এবং একীভূত, আর যাহা কিছু তাহার মানদণ্ডের নীচে পড়ে বা উপরে উঠিয়া যায় তাহা আর সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য থাকে না। তাহার মতে সকল দর্শন এবং সকল ধর্ম না হইলেও অতি আধ্যাত্মিক দর্শন এবং অতিমাত্রায় ধর্মপরায়ণ ধর্ম, সকল প্রকার ভাববাদ, এবং সমস্ত মরমী চিন্তাধারা ও শিল্প-কলা, সকল প্রকার গুহ্য জ্ঞান, যাহা কিছু জড়জগৎ লইয়া কারবারশীল যুক্তিবুদ্ধির সীমিত দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত কোন বিষয়কে জানিতে বা

পরীক্ষা করিতে চায়—সে সমস্তই সৃষ্টিছাড়া পাগলামী, মাত্রাতিরিক্তভাবে সূক্ষ্ম, অতিরঞ্জিত এবং অবোধ্য, যাহা কিছু অনন্তের বোধে সাড়া দেয়, যাহা কিছু শাশ্বতের ভাবে প্রভাবিত বা অভিভূত হয় এবং একমাত্র বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও জড়ভাবের উন্নতি ও কার্যকারিতা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া এই সমস্ত হইতে জাত ভাব ও ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে সমস্তের কিছুই সংস্কৃতির ফল বা পরিণাম নহে, বরং তাহা অসংস্কৃত সূক্ষ্ম বর্বরতারই সন্তান। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত স্পষ্টত মাত্রা ছাড়াইয়া যায়; মানবজাতির অতীতে যাহা কিছু বৃহৎ বা মহৎ বলিয়া পরিকীর্তিত আছে তাহার অধিকাংশই ইহাতে নিন্দার্হ হইয়া পড়ে। এমন কি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না, এ-মত স্বীকার করিলে বর্তমান ইউরোপীয় সংস্কৃতিজাত অনেক চিন্তা ও শিল্পকলাকেও অন্তত অর্ধবর্বরতা দোষে দুষ্ট বলিতে হয়। স্পষ্টত অতি-রঞ্জন বা অসম্ভবতার মধ্যে না পড়িয়া সভ্যতা শব্দের অর্থ এরূপভাবে সঙ্কুচিত এবং মানবজাতির অতীত সাধনার তাৎপর্যকে এরূপ ক্ষীণ ও খর্ব করিতে পারি না। ঠিক সম্মিলিত গ্রীকরোমান, খৃষ্টান, মুসলমান অথবা পরবর্তী নবজাগ্রত ইউরোপীয় সভ্যতার মত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও এক মহান সংস্কৃতির ফল রূপে জাত হইয়াছে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাতেও আসল প্রশ্ন রহিয়া গেল, শুধু মূল বিচার্য বিষয়ে বিরোধ সঙ্কুচিত করিয়া আনা হইল মাত্র। মিঃ আর্চার অপেক্ষা অধিকতর সংযত এবং সূক্ষ্মদর্শী যুক্তিবাদী সমালোচক ভারতের অতীত অবদানসকলের মূল্য স্বীকার করিবেন, বৌদ্ধ মত এবং বেদান্তকে নিন্দা করিবেন না, এবং ভারতের সকল শিল্পকলা, দর্শন এবং সামাজিক ভাবধারাকে বর্বরোচিত বলিবেন না, কিন্তু তিনি তথাপি বলিবেন যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ ইহাদের মধ্যে নাই। তাঁহার মতে প্রকৃত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে গেলে, ইউরোপীয় আধুনিকতা, বিজ্ঞানের মহাশক্তিশালী কার্যাবলী এবং মানবজাতির বর্তমান দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে; সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যের এবং বহু কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা গভীররূপে পরীক্ষিত, সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের যে ক্রমবর্ধমান বিপুল সম্পদ লাভ হইয়াছে তাহার উপরই এ পথের সাধনার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কোন ভাববিলাস বা কল্পনার উপর নহে। পক্ষান্তরে আপন আদর্শে একনিষ্ঠ ভারতীয় মন বলিবে যে মানুষের সাধনায় যুক্তিবিচার, বিজ্ঞান এবং অন্য সমস্ত সহকারী কার্যধারার স্থান আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়। আমাদের চরম পূর্ণতার রহস্য আমাদের, বস্তুরাজির এবং প্রকৃতির অন্তরের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আবিষ্কার

করিতে হইবে; প্রধানত এবং মূলত আমাদের চিন্ময় আত্মজ্ঞান এবং আত্ম-পূর্ণতার মধ্যে ইহাকে খুঁজিতে হইবে এবং আমাদের জীবন সেই আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

যখন বিচার্যবিষয় এই ভাবে বর্ণনা করা হয় তখন আমরা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবধানের সমুদ্র ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল এখন আর তত বিস্তৃত নাই। এখন তাহাদের মধ্যে সেতুবন্ধন আর তত অসম্ভব নহে। মৌলিক ভেদ এখনও আছে, পাশ্চাত্যের *জীবনযাত্রা এখনও বুদ্ধিবাদের ভাবধারা দ্বারা পরিচালিত এবং জড়ভাবের* দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহার চিন্তার শীর্ষদেশে এক বিশাল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে ও তাহা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং শিল্পকলা, কাব্য, সঙ্গীত এবং সাধারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা নিম্নের দিকে ক্রমশ অধিকতররূপে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য মন গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহিতেছে, যে সমস্ত আকৃতিকে নির্বাসিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে ক্রমশ বেশী করিয়া ফিরাইয়া আনা হইতেছে, যাহা এখনও লাভ হয় নাই তেমন উচ্চতর অনুভূতির দিকে একটা আবেগ দেখা দিয়াছে, পাশ্চাত্য মননের পক্ষে যাহা বহুকাল অপরিচিত ছিল এমন ভাবধারা-সকলকে আহ্বান করা আরম্ভ হইয়াছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় ও প্রাচ্য ভাবধারা এবং প্রভাব কতকটা অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, এমন কি এখন আমরা দেখিতে পাই যে স্থানে স্থানে প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শের উচ্চমূল্য বা শ্রেষ্ঠতর মহত্ত্ব ক্রমশঃ বেশী করিয়া স্বীকৃত হইতেছে। সুদূর প্রাচ্যের সহিত যখন ইউরোপের সংস্পর্শ নিবিড় হইয়াছে তাহারই প্রথম যুগে এই অনুপ্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইংরাজের ভারত অধিকার অত্যন্ত সাক্ষাৎভাবে সে অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু প্রথম দিকে ইহা সামান্য একটা বাহ্যস্পর্শমাত্র ছিল, বড়জোর তাহা কেবল কতিপয় শ্রেষ্ঠতর মনের উপর একটা মনোময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনীষী বেদান্ত সাংখ্য বৌদ্ধমত প্রভৃতি, হয় শুধু জানিবার জন্য অথবা তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, কখনও কেহ বা ভারতীয় দার্শনিক ভাববাদের মহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন; সোপেনহায়ার (Schopenhauer) এবং এমার্সন (Emerson)-এর মত মহামনীষী অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নতর কোন কোন পণ্ডিতের মনে গীতা ও উপনিষদ গভীর রেখাপাত করে; প্রথমে এইভাবে প্রাচ্য ভাবপ্রবাহ শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় ইউরোপে প্রবেশ করে। কিন্তু মনের উপর এই ছাপ ও প্রভাব তখন খুব অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, এবং তাহা যে স্বল্প প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত তাহাও যে-বৈজ্ঞানিক জড়বাদের প্রবল প্রবাহ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের জীবনের সমগ্র ধারণাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল তাহা দ্বারা প্রতিহত হইয়াছিল এবং এমন কি সাময়িক ভাবে মুছিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু বর্তমানে অন্য অনেক গতিধারা উদ্ভূত হইয়া তাহাদের চিন্তা ও জীবনকে সফলভাবে অধিকার করিয়াছে। দর্শন এবং চিন্তাধারা ইতিমধ্যেই যুক্তিচালিত জড়বাদ এবং তাহার নিঃসন্দিগ্ধ চরম মতবাদ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। একদিকে মহত্তর ভাবে চিন্তা করিবার এবং বৃহত্তর দৃষ্টি দ্বারা জগৎকে দেখিবার প্রথম চেষ্টার ফলে ভারতীয় অদ্বৈতবাদ অনেকের মনের উপর সূক্ষ্মভাবে ও শক্তিশালীরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যদিও অনেক সময় তাহা অদ্ভুত ছদ্মবেশে আসিয়াছে। অন্যদিকে অনেক নূতন দর্শন জাত হইয়াছে, যাহারা সাক্ষাৎভাবে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন নয়, বরং প্রাণধর্ম এবং বাস্তব জগতের প্রয়োজন সাধনের উপায় আবিষ্কারের দিকেই তাহাদের প্রবল ঝোঁক রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের দৃষ্টি প্রধানত অন্তরের দিকে বলিয়া তাহারা ভারতীয় চিন্তাধারার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির যে প্রাচীন সীমার প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিগতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রেতবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা চলিতেছে, মনোবিজ্ঞান অনেক নূতন ধারায় অগ্রসর হইতেছে। এমন কি চৈত্যতত্ত্ব এবং গুপ্ত বিদ্যালাভের দিকে অনুরাগ এবং উৎসাহ দেখানো অধিকতরভাবে চলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গোঁড়া ধর্ম এবং বিজ্ঞান এ উভয়ের অভিশাপ সত্ত্বেও ইহারা মানুষের মনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন এবং নবীন ধর্মমত সকলকে ব্যাপকভাবে একত্বে গ্রথিত করিয়া এবং প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থিওজফি (Theosophy) সর্বত্রই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে প্রভাব তাহার একান্ত অনুরাগীদের বাহিরেও বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অপবাদ এবং উপহাসের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহা কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ, সত্তার অন্য জগৎসকল, বুদ্ধি এবং চৈত্যসত্তার মধ্য দিয়া দেহগত আত্মার চিৎপুরুষের দিকে প্রবাহিত ক্রম-পরিণামের ধারা প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্বাস প্রচারের জন্য অনেক কিছু করিয়াছে, এবং এই সমস্ত ভাবধারা একবার গৃহীত হইলে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য। এমন কি বিজ্ঞান নিজেও এমন সকল সিদ্ধান্তে সর্বদাই পৌঁছিতেছে যাহা জড়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেই সমস্ত সত্যের পুনরুক্তি মাত্র, যাহা প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিক হইতে তাহার বেদ ও বেদান্তের মুখে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছিল। এই সমস্ত অগ্রগতির প্রত্যেকটি হয় সাক্ষাৎভাবে না হয় তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনকে পরস্পরের নিকটে লইয়া আসিতেছে এবং যে পরিমাণে তাহা সফল হইতেছে

সেই পরিমাণে পাশ্চাত্যের পক্ষে ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারা উৎকৃষ্টতরভাবে বুঝিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে।

কোন কোন দিকে মনোভাব পরিবর্তন আশ্চর্যভাবে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং মনে হইতেছে যে পরিবর্তন অবিচ্ছিন্নভাবেই বর্ধিত হইতেছে। সার জন উড্‌রফ্‌ এক খৃষ্টান ধর্মযাজকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উক্ত ধর্মযাজক বলিয়াছেন যে হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) যে পরিমাণে জার্মানি আমেরিকা এমন কি ইংলন্ডের ধর্মমতেব অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি আরও মনে করেন যে ইহার ক্রমবর্ধমান ফল পরবর্তী পুরুষের নিকট "আসন্ন বিপদ" রূপে দেখা দিবে। সার জন আর একজন লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে ইউরোপের সমস্ত উচ্চতম দার্শনিক চিন্তা ভারতের ব্রাহ্মণগণের পূর্ববর্তী চিন্তাধারা হইতে জাত হইয়াছে, তিনি দৃঢ়ভাবে আরও বলেন বর্তমানকালে বুদ্ধিগত সমস্যাসমূহের যে সমস্ত সমাধান হইতেছে তাহাদের সমস্তের পূর্বাভাসই প্রাচ্যে আছে ইহা দেখা যাইবে। একজন বিখ্যাত ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ কোন ভারতীয় পরিদর্শকের নিকট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে খাঁটি মনস্তত্ত্বের প্রধান সত্যসকল এবং বৃহৎ ধারাগুলি, বিস্তৃত পরিকল্পনাসমূহ ভারত ইতিপূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছে, ইউরোপ এখন কেবল যথাযথভাবে তাহার মধ্যের খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ করিতে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সমর্থন করিতে পারে। পাশ্চাত্যের মনোভাব পরিবর্তন ক্রমশঃ অধিকতর বেগে কোন্‌ দিকে চলিতেছে তাহা নির্ভুলভাবে বুঝিবার পক্ষে এই সমস্ত উক্তি অভ্রান্ত নিদর্শন।

কেবল যে দর্শন এবং উচ্চতর চিন্তার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহা নহে। কোন কোন দিকে ইউরোপের শিল্পকলা তাহার প্রাচীন ভাবধারা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইয়া উঠিতেছে এবং যে সকল প্রেরণা পূর্বে শুধু প্রাচ্য দেশে সম্মানিত হইত, নিজের ভাবে সে সমস্ত প্রেরণার দিকে সে নিজেকে খুলিয়া ধরিতেছে। প্রাচ্যের শিল্প ও রূপসজ্জা বা প্রসাধন বহুবিস্তৃতভাবে আদৃত হইতেছে এবং সূক্ষ্ম হইলেও এ সকল জিনিস প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কবিতা, এখন যদিও অনিশ্চিতভাবে তবু এক নূতন ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ যে জগৎব্যাপী যশের অধিকারী হইয়াছেন, ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাহা অভাবনীয় ছিল—এখন প্রায়ই একজন সাধারণ লেখকেরও কবিতায় এমন সমস্ত ভাব বা বাক্যাবলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, যাহার সদৃশ উক্তি বা অনুরূপ রচনা পূর্বে ভারতীয় অথবা বৌদ্ধ বা সুফী কবি ব্যতীত অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যাইত। সাধারণ সাহিত্যের মধ্যেও

অনুরূপ ঘটনার প্রাথমিক নিদর্শনসকল দেখা দিয়াছে। নূতন সত্যের অন্বেষণগণ ভারতেই তাহাদের আধ্যাত্মিক মাতৃভূমি রহিয়াছে বলিয়া ক্রমশ বেশী করিয়া অনুভব করিতেছে, অথবা তাহাদের প্রেরণার অধিকাংশ তথা হইতে পাইতেছে অথবা অন্ততপক্ষে তাহার আলোককে স্বীকার করিতেছে এবং স্বেচ্ছায় তাহার প্রভাবের অধীন হইতেছে। যদি এই পরিবর্তনের প্রবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে—ইহার গতিধারা বিপরীতমুখী হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না—তাহা হইলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার যে সমুদ্র-ব্যবধান রহিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে দূর না হইলেও অন্ততপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটা সেতু স্থাপিত হইবে, এবং ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের সমর্থন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা খুবই সবল হইয়া উঠিবে।

কিন্তু তাহা হইলে হয়ত ইহা বলা যায় যে পরস্পর মোটামুটিভাবে বুঝিবার যখন এরূপ নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে তখন ভারতীয় সংস্কৃতির আক্রমণপূর্বক আত্মরক্ষা অথবা কোন প্রকার আত্মরক্ষার আর প্রয়োজন কি? বস্তুত ভবিষ্যতে ভারতীয় সভ্যতার আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া পৃথকভাবে বাঁচিবার প্রয়োজন কি আছে? দুই বিপরীত দিক হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আসিয়া মিলিত হইবে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং তখন সম্মিলিত মানবজাতির জীবনে এক সর্বসাধারণ বিশ্বসংস্কৃতি স্থাপন করিবে। এই নূতন মিশ্রণে পূর্বের বা বর্তমানের সকল আকার সকল পদ্ধতি সকল বৈশিষ্ট্য মিশিয়া গলিয়া এক হইয়া যাইবে এবং তাহাদের সার্থকতা লাভ করিবে। কিন্তু সমস্যাটি এত সহজ, এত সুষম সরল নয়। কেননা, যদি আমরা ধরিয়াও লইতে পারিতাম যে যাহাতে এককে অপর হইতে পৃথক করিয়া চেনা যায় এমন কোন প্রবল বৈশিষ্ট্যের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং প্রাণের ক্ষেত্রে উপযোগিতা, ঐক্যবদ্ধ জগৎ-সংস্কৃতিতে থাকিবে না, তবুও সেরূপ একত্ব হইতেও আমরা এখনও বহুদূরে রহিয়াছি। আধুনিক যুগে অগ্রগামী চিন্তাধারায় যে অন্তর্মুখিতা এবং আধ্যাত্মিকতা দেখা দিয়াছে তাহা এখনও অতি অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা ইউরোপীয় সাধারণ বুদ্ধিমত্তার শুধু বাহ্য স্তরকে একটু রঞ্জিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা শুধু চিন্তার একটা গতি মাত্র; ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান প্রাণ-প্রেরণাগুলি যেখানে ছিল এখনও তথায়ই রহিয়াছে। মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাবনা দেখা দিয়াছে সেদিকে কোন কোন ভাব বা আদর্শ বৃহত্তরভাবে চাপ দিলেও, অব্যবহিত অতীতে জড়বাদের যে প্রবল গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছিল তাহা দূর করিতে এমন কি লঘুতর করিতেও তাহারা সমর্থ হয় নাই। ঠিক এই সংকটমুহূর্তে এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে সমগ্র মানবজগৎকে—এবং ভারতও তাহার অন্তর্ভুক্ত—অতি দ্রুত এক রূপান্তরের চাপে এবং তজ্জনিত দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

বিপদের আশঙ্কা এই যে এ-সময়ে প্রবল প্রতাপী ইউরোপীয় ভাব ও উদ্দেশ্যের অত্যধিক চাপ, সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের প্রলোভন, অবশ্যম্ভাবী দ্রুত পরিবর্তনের গতিবেগ গভীর ভাবনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে গড়িয়া এবং পুষ্ট হইয়া উঠিবার সময় দিবে না এবং এরূপ হইতে পারে যে তাহার ফলে, ভারত তাহার চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সুশৃঙ্খল না করিয়া লইতেই, বর্তমান পরিবেশে তাহার যে সমস্ত রূপ তাহার জাতীয় প্রয়োজনের সহিত মিলে না তাহাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তাহার নিজের বিশিষ্ট ভাব এবং আদর্শ দ্রুত পরিণতির জন্য দৃঢ়ভিত্তির উপর যাহাতে দাঁড়াইতে পারে তেমন ভাবের বিশিষ্ট নূতন শক্তি এবং রূপ সৃষ্টি করিয়া লইবার পূর্বে ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজপদ্ধতি হয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িবার, তাহার প্রাচীন সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম দেখা দিবে। তাহা হইলে সে মহাবিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, ইউরোপের কটাবর্ণবিশিষ্ট কপিসুলভ অনুকরণ এক ভারত দেখা দিতে পারে; হয়ত তাহাকে একটু পরিবর্তিত করিতে পারে তাহার প্রাচীন ভাবধারার তেমন কোন কোন উপাদান অবশিষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু তাহার সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করিবার সামর্থ্য আর তাহার নিজের থাকিবে না। অন্য সমস্ত দেশের মত ভারত তখন পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছাঁচে ঢালা হইবে; প্রাচীন ভারতের মৃত্যু ঘটিবে।

অবশ্য এমন লোক আছে যাহারা এ সম্ভাবনাকে কোন প্রকার বিপদ মনে করে না, বরং মনে করে যে পরমকাম্য এই ঘটনা ঘটিলে তাহা মঙ্গল ও সুখেরই বিষয়। তাহাদের মতে নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া অধ্যাত্ম ভূমিতে সে যে পৃথক হইয়া আছে তাহা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি ও নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন তাহার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তাহা যদি ভারত গ্রহণ করিত তাহা হইলে আধুনিক কালে সমগ্র মানবজাতির যে শিষ্টাচারের (World Comity) ফলে এক দেশের বিধান অন্য দেশে চলিতে দেয় ভারত অন্ততপক্ষে সেই শিষ্টাচারের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিত। যেহেতু নূতন বিশ্ব দরবারের মধ্যে ক্রমে অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক এবং অন্তর্মুখীন ভাব ও উপাদানসমূহ অনুপ্রবেশ করিতে থাকিবে হয়ত ভারতের নিজস্ব ধর্ম ও দর্শনের চিন্তাধারার অনেক কিছুই সে সংস্কৃতির মধ্যে স্থান পাইবে; আর তখন তাহার প্রাচীন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাহার নিজস্ব ভাবের আত্মপ্রকাশ নষ্ট হইয়া গেলে তাহা চরম ক্ষতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তখন তাহার সকল অবদান অধিকতর প্রগতিশীল নূতন জাতীয় জীবনে সমর্পণ করিয়া প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতও রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় জগৎ গ্রীক-রোমিয় সংস্কৃতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে এবং আরও বৃহত্তর ও জটিলতর সংস্কৃতির মধ্যে সে সংস্কৃতির অনেক ভাব ও উপাদান এখনও বাঁচিয়া আছে

ইহা সত্য বটে কিন্তু ইহাও সত্য যে গুরুতর ভাবে তাহার খর্বতাও ঘটিয়াছে। সে সংস্কৃতিতে উচ্চ এবং সুস্পষ্ট বুদ্ধির যে প্রভাব ছিল তাহা শোচনীয় ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহার চেয়েও আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রাচীন কালে যে সৌন্দর্যের উপাসনা ছিল তাহার ক্লেশকর অধঃপতন ঘটিয়াছে, আর যাহা এই ভাবে নষ্ট হইয়াছে, বহু শতাব্দী পরে আজিও প্রকৃতভাবে তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহার ফলে জাগতিক সম্পদ বিপুলতর ভাবে হ্রাস পাইবে, কেননা তাহার এবং ইউরোপীয় আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য আরও অনেক গভীর, ভারতের ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনন্যসাধারণ; যে বিপুল সম্পদ ও আন্তর অনুভূতির বহুবিচিত্র সহস্রধারার উত্তরাধিকার সে পাইয়াছে তাহার জটিল সত্য ও সক্রিয় শৃঙ্খলা এখনও কেবল একা ভারতই রক্ষা করিতে পারে।

স্বভাবতঃ পাশ্চাত্য মন নিম্নে এবং বাহিরে বাস করিয়া উপরে এবং ভিতরে পৌঁছিতে চায়। সে প্রাণময় এবং জড়ময় প্রকৃতির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর শক্তিসকলকে আহ্বান করে এবং তাহার স্বাভাবিক পার্থিব জীবনকে পরিবর্তিত এবং অংশতঃ উন্নত করিবার জন্যই এ সমস্ত শক্তিকে স্বীকার ও গ্রহণ করে। বাহ্যশক্তিরাজির দ্বারা তাহার আন্তর সত্তা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে, সর্বদাই ভারতের আদর্শ এক উচ্চতর অধ্যাত্মসত্যের মধ্যে জীবনের ভিত্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং ভিতরের চিন্ময় সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই বাহিরে বাস করা, মন প্রাণ এবং দেহের বর্তমান ধারাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া এবং বাহ্য প্রকৃতিকে প্রভুর মত আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। যেমন বেদের প্রাচীন দ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন "নীচীনাঃ স্থুর্ উপরি বুধ্ন এষাম্ অস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতব-স্যুঃ"; 'যখন তাহারা নিম্নে দাঁড়াইয়াছিল তখনও তাহাদের দিব্য ভিত্তি ছিল উপরে, ইহার রশ্মিমালা আমাদের অন্তরের গভীরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক'। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য শুধু অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মাত্র নহে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বিপুল এবং গভীর মূল্য আছে। কোন প্রকার আধ্যাত্মিক প্রভাবকে লইয়া ইউরোপ কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা বুঝা যায় খৃষ্টধর্ম ও তাহার আন্তর বিধান লইয়া তাহার আচরণ কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিয়া; বস্তুতঃ সে ধর্ম তাহার জীবনের ধারা রূপে সে প্রকৃত পক্ষে কখনই গ্রহণ করে নাই। কেবল মাত্র একটা আদর্শ এবং আবেগময় প্রভাব রূপে সে খৃষ্টধর্মকে আসিতে দিয়াছে, এবং টিউটন জাতির বিপুল প্রাণশক্তি ও ল্যাটিন জাতির নির্মল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মার্জিত রুচিকে সংযত করিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাবের কিছু রং দেওয়ার জন্যই কেবল তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নিম্নতর আদর্শকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার এবং খাঁটি

আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে নির্বন্ধাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিবার জন্য কোন সবল ও সজীব সংস্কৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে ইউরোপ নূতন কোন অধ্যাত্ম ভাবধারা গ্রহণ করিলে তাহাকেও সেইভাবে গ্রহণ করিবে এবং সীমিত বাহ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা ব্যবহার করিবে।

মানবের পূর্ণ প্রগতির জন্য ইউরোপের মন প্রাণ এবং দেহের উপর জোর এবং ভারতের আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক ভাবের আবেগ এই উভয় ভাবধারার বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক আদর্শই ব্যক্ত জীবনে সুষমা ও সামঞ্জস্যের বিজয়াভিযানের চরম পন্থা দেখাইতে পারে তখন ভারতের পক্ষে সর্বতোভাবে প্রয়োজন এ সত্যকে ধরিয়া থাকা, যে পরম তত্ত্বকে সে জানিয়াছে তাহাকে ত্যাগ না করা; যাহা হয়ত অধিকতর সহজে জীবনে কার্যকরী করিয়া তোলা যায় কিন্তু তথাপি যাহা নিম্নতর আদর্শ এবং তাহার চিরাগত প্রকৃতিগত সত্যের পক্ষে যাহা বিজাতীয় তাহার বিনিময়ে নিজের ভাবধারাকে বিসর্জন করা ভারতের পক্ষে কোন মতে কর্তব্য নহে। এই উচ্চতম আদর্শ সমষ্টিগত ভাবে সফল করিয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছে—তাহা যতই অপূর্ণ হউক না কেন এবং সাময়িক ভাবে তাহার মধ্যে যতই বিশৃঙ্খলা এবং অধঃপতন আসিয়া পড়ুক না কেন—তাহা যাহাতে বিলুপ্ত না হইয়া রক্ষা পায় তাহা দেখা সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও প্রয়োজনীয়। সর্বদাই ইহা তাহার নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধার এবং নিজের প্রকাশের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে পারে, কেননা যে চিৎপুরুষ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন তিনি কালের কোন রূপে বদ্ধ নহেন। তিনি চির নূতন অমর ও অনন্ত। প্রাচীন ভারতের স্বধর্মকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা এবং তাহাকে পাশ্চাত্য প্রকৃতির কোন বিধানে রূপান্তরিত না করাই হইবে সমগ্র মানবজাতির উন্নতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করিবার এবং বিশ্বমানবের সেবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইহা হইতেই দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষার এমন কি আক্রমণোন্মুখী আত্মরক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, কেননা বর্তমান যুগে সংগ্রাম যেভাবে চলে তাহাতে কেবল আক্রমণসমর্থ প্রতিরক্ষা কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু এখানে বিপরীত মনোভাববিশিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে প্রস্তুত এক প্রকৃতির লোকের বিরুদ্ধে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হয়। কেননা বর্তমানে বহু ভারতবাসী আছে যাহারা দুর্দমরূপে স্থিতিশীল রক্ষণের পক্ষপাতী এবং যেটুকু আক্রমণশীলতার ভাব ইহারা দেখাইতে চাহে, বলা চলে যে তাহা সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাধারণে প্রচলিত একরূপ চিন্তাশক্তিহীন উৎকট দেশপ্রেম, তাহারা এই মত পোষণ করে যে আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা আমাদের পক্ষে মঙ্গলময়, যেহেতু তাহা ভারতীয়, এমন কি ভারতে যাহা কিছু আছে তাহাই শ্রেষ্ঠতম বস্তু কেননা ঋষিরা তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের সংস্কৃতির এই সমস্ত

স্থাপয়িতাগণের প্রতি যথেষ্ট অসদাচরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের শিক্ষার যথেষ্ট অপপ্রয়োগ হইয়াছে, অনেক সময় তাঁহাদের নাম জাল পর্যন্ত করা হইয়াছে, আর পরবর্তী কালে যে সমস্ত কুৎসিত এবং বিশৃঙ্খল বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে তাহাও যেন তাঁহারাই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে স্থিতিকামী আত্মরক্ষার চেষ্টার কোন কার্যকরী মূল্য আছে কিনা। আমি বলি তাহার কোন মূল্য নাই, কেননা তাহা বস্তুসত্যের বিরোধী এবং তাহাতে অকৃতকার্য হওয়াই নিয়তিনির্দিষ্ট। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে জগতের শক্তি, শুধু জগতের কেন ভারতের মধ্যস্থ শক্তিও যখন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে তখন আমরা অন্ধ ও অনমনীয়ভাবে স্থাণুর মত থাকিবার চেষ্টা করিব। ইহা হইল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা অতীতে যে মূলধন সঞ্চয় করিয়াছি এবং যাহা আমাদের অযোগ্য ও অপব্যয়শীল হস্তে পড়িয়া ষোলো আনার স্থলে এক আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শুধু তাহা দ্বারা আমাদের অভাব পূরণ করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার সংকল্প; কিন্তু এ মূলধনের দ্বারা নূতন লাভ না করিয়া ইহা খরচ করিয়া খাইবার অর্থ পরিণামে দেউলিয়া এবং নিঃস্ব হইয়া পড়া। ভবিষ্যতে কোন বৃহত্তর লাভ, সম্পদ এবং পুষ্টির জন্যই অতীতকে সক্রিয় চলতি মূলধন রূপে খাটাইতে বা ব্যয় করিতে হইবে; কিন্তু বৃহত্তর কোন লাভের জন্যই আমরা ব্যয় করিব; আমাদের সম্পদের কিছু দান করিব, কিন্তু দিব আরও পাইবার এবং বর্ধিত হইবার এবং আরও সম্পন্নভাবে বাস করিবার জন্য—ইহাই জীবনের সর্বজনীন বিধান। তাহা না হইলে আমাদের ভিতরে জীবন গতিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং নিশ্চল জড়তার মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আত্মবিস্তার এবং পরিবর্তন হইতে সঙ্কুচিত হওয়া হইবে মিথ্যা দৌর্বল্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া। ইহার অর্থ ধর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের সৃজনশক্তি শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্যের সঙ্গে, সমাজ গঠনের শক্তি রঘুনন্দন ও বিদ্যারণ্যের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে ইহাই মানিয়া লওয়া। শিল্প ও কাব্যের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ এই হয় যে তাহারা হইয়া পড়িয়াছে প্রকাশ ও সৃষ্টিসামর্থ্যহীন এক শূন্যতা অথবা সুন্দর হইলেও যে সমস্ত রূপ ও প্রেরণা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মিথ্যা ও নির্জীব পুনরুক্তি। আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের যে ব্যবস্থা ধসিয়া পড়িতেছে এবং ধসিতে থাকিবে তাহাতে আসক্ত থাকার অর্থ এই যে তাহা যখন একেবারে ধূলিসাৎ হইবে তখন তাহার সঙ্গে আমরাও চূর্ণীকৃত হইয়া যাইব এই বিপদের মধ্যে বাস করা।

সাহসের সহিত বিপুল পরিবর্তন সাধনই প্রয়োজন, কেবল ছোটখাট প্রচেষ্টা লইয়া থাকিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু সেরূপ বিপুল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এই আপাত-যুক্তিযুক্ত আপত্তি তোলা যাইতে পারে যে কোন বৃহৎ সংস্কৃতির বাহ্যরূপ তাহার অন্তর্নিহিত আত্মারই খাঁটি

ছন্দোময় অভিব্যক্তি এবং যদি সে ছন্দকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই আত্মাকে বর্জন করা হইবে এবং সে সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও সুষমা চিরতরে নষ্ট হইবে। সত্য বটে, কিন্তু যদিও আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য বস্তু এবং তাহার সামঞ্জস্যের মূল তত্ত্বসকল অপরিবর্তনীয়, কিন্তু রূপের মধ্যে কার্যতঃ তাহার আত্মপ্রকাশের ছন্দ চিরপরিবর্তনশীল। স্বরূপ সত্তায় এবং সত্তার স্বরূপ শক্তিতে তাহা অপরিবর্তনীয় বটে কিন্তু জীবনের এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহা বিপুল রূপে পরিবর্তনশীল, ইহাই আত্মার ব্যক্ত জীবনের প্রকৃতি ও বিধান। আমাদিগকে ইহাও দেখিতে হইবে যে কার্যতঃ বর্তমান ছন্দ বা রূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে কিনা, অথবা নিকৃষ্ট এবং অজ্ঞান সঙ্গৎকারের হাতে পড়িয়া বর্তমানে সে ঐক্যতান নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও বেসুরা হইয়া পড়িয়াছে কিনা এবং জাতির প্রাচীন আত্মার অভিব্যক্তি তাহার মধ্য দিয়া যথাযথভাবে অথবা প্রচুর পরিমাণে হইতেছে কিনা। বাহ্যরূপের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করা মূল আত্মাকে অস্বীকার করা নহে, বরং যে সত্যকে আমরা অন্তরে পোষণ করিতেছি তাহার বৃহত্তর ভবিষ্য সমৃদ্ধি, পূর্ণতর অভিব্যক্তি এবং বাধাহীন সহজ প্রবাহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। অতীতে যাহা হইয়াছে তদপেক্ষা বৃহত্তর রূপে তাহার অভিব্যক্তি আমরা কার্যতঃ ঘটাইতে পারিব কিনা তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে, নির্ভর করিতেছে আমাদের মধ্যাস্থিত শক্তির শাশ্বত বীর্য জ্ঞান এবং আলোকে আমাদের সাড়া দেওয়ার সামর্থ্যের উপর এবং আমাদের কর্মকৌশলের উপর—সেই কর্মকৌশল যাহা যে শাশ্বত আত্মাকে আমরা আমাদের জ্ঞান অনুসারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহার সহিত যুক্ত হইয়া লাভ করিতে হয়, 'যোগঃ কর্মসুকৌশলম্'।

ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে ইহাই দেখিতে পাই আর ইহাই আমাদের প্রকৃতিগত প্রধান দিক এবং সর্বদা এই দিকের কথাই আমাদিগকে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া যুগধর্ম আমাদিগকে যে চাপ দিতেছে সেদিকও দেখিতে হইবে। কেননা ইহাও বিশ্ব-শক্তিরই ক্রিয়া, ইহাকে উপেক্ষা করিতে দূরে সরাইয়া রাখিতে বা তাহার প্রবেশ নিষেধ করিতে পারি না। এখানেও যথার্থ এবং কার্যকরী ভাবে চলিতে গেলে আমাদিগের পক্ষে নূতন সৃষ্টি-ধারা গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। আমাদের সুরক্ষিত তোরণের মধ্যে অচল এবং অনড় হইয়া বসিয়া থাকা কাম্য হইলেও তাহা আর সম্ভব নহে। সুদূরপ্রসারিত মরুসমুদ্রের বক্ষে অবস্থিত নির্জন দ্বীপের মত সমস্ত মানবজাতি হইতে পৃথক এবং তাহাদের সহিত সর্বসম্বন্ধ-পরিশূন্য হইয়া নিজেদের গণ্ডি হইতে বাহির না হওয়া এবং অপরকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না দেওয়া আর এযুগে সম্ভব নয়—আমাদের পূর্ব ইতিহাসে কখনও সেরূপ করিয়াছি কিনা তাহাতেও ঘোর সন্দেহ আছে।

কেননা শুভ বা অশুভ যাহাই হউক আজ সমগ্র পৃথিবী আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়াছে, আধুনিক ভাব ও শক্তিসকলের প্রবল প্রবাহ আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহা রোধ করিবার কোন উপায় নাই। আমাদের নিকট শুধু দুইটি পথ উন্মুক্ত আছে, একটি আশাভরসাহীন বৃথা বাধা দেওয়া অন্যটি তাহাদিগকে অধিকার ও বশীভূত করা। স্থাণুবৎ অবস্থান অথবা দৃঢ়তার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুধু যদি আমরা অবলম্বন করি, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে, যেখানে আমাদের দুর্গপ্রাকার সর্বাপেক্ষা ক্ষীণবল সেই স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, যেখানে তাহা দৃঢ়তর সেখানে তাহার ভিত্তি নষ্ট করিবে, যেখানে এ উভয়ের কিছু করিতে সমর্থ না হইবে সেখানে আমাদের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া গোপনে অতর্কিতে আসিয়া আক্রমণ করিবে। এইভাবে আগত যে সমস্ত ভাবকে আমরা পরিপাক করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিতে না পারিব তাহারা ধ্বংসশক্তির কাজ করিবে, তখন কতকটা বহিরাক্রমণের কিন্তু প্রধানতঃ ভিতর হইতে বিস্ফোরণের ফলে প্রাচীন ভারতীয় এই সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে। ইতিমধ্যেই চারিদিকে অশুভসূচক স্ফুলিঙ্গ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহই জানে না কি করিয়া তাহাদিগকে নির্বাপিত করা যাইবে, আর যদি তাহাদিগকে নির্বাপিত করা সম্ভব হইত তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইত না। কেননা যে মূল উৎস হইতে তাহারা নির্গত হইতেছে তাহা বিদূরিত করিতে না পারিলে বিপদাশঙ্কা বিদূরিত হইবে না। অতীতের নাম করিয়া বর্তমানকে যাহারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে এবং বজায় রাখিতে চায় তাহাদের প্রতি কথায় দেখা যায় নূতন চিন্তাধারা দ্বারা তাহারাও কত গভীর রূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। অধিকাংশ না হউক অনেকে কোন কোন ক্ষেত্রে নব্য প্রথাসকল আবেগভরে ও দৃঢ়তা সহকারে প্রবর্তিত করিতে চাহিতেছে, সে সমস্ত পরিবর্তন তাহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে ইউরোপীয়, এবং কোনরূপে মূলতঃ পরিপাক এবং ভারতীয় ভাবাপন্ন না করিয়া যদি তাহাদিগকে একবার আসিতে দেওয়া হয় তবে অবশেষে তাহারাই যাহাকে তাহারা এইভাবে রক্ষা করিবে বলিয়া তাহাদের ধারণা সেই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ভাবনার বিশৃঙ্খলতা এবং শক্তিহীনতার জন্যই ইহা হয়। ভাবনা করিতে পারি না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি করিতে পারি না বলিয়া আমরা বাহির হইতে ধার করিতে বাধ্য হই, এবং যাহা ধার করি তাহা পরিপাক করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিতে পারি না অথবা পরিপাক করিয়াছি এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি। অন্তরের উচ্চ এবং অনুশাসনক্ষম দৃষ্টি দিয়া আমরা কি করিতেছি তাহার পূর্ণ অর্থ অনুধাবন করিতে পারি না বলিয়া বিসদৃশ বস্তুসকল জড় করি অথচ তাহাদিগকে এমনভাবে সমন্বিত

করিতে পারি না যাহাতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। আমাদের এভাবের চেষ্টার ফল সম্ভবতঃ এই হইবে যে সমাজদেহ ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকিবে অথবা একটা দ্রুত বিস্ফোরণ আসিয়া সব ভাঙিয়া দিবে।

আক্রমণশীল আত্মরক্ষার নিভৃত অর্থ অন্তরের এক উচ্চভূমির নিয়ন্ত্রণক্ষম দৃষ্টি হইতে এক নূতন সৃষ্টি করা, সে সৃষ্টির দাবি আমাদের যাহা আছে তাহা ব্যক্ত করিয়া রূপের ক্ষেত্রে আরও সুন্দর এবং সবল ভাবে তাহাকে প্রকাশ করা, তেমনি আমাদের নবজীবনের পক্ষে যাহা প্রয়োজন বা উপযোগী, যাহা আমাদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সহিত সুসমঞ্জস করিয়া নেওয়া যাইতে পারে তাহা গ্রহণ এবং কার্যকরীভাবে আত্মসাৎ করা। আঘাত সংঘর্ষ এবং সংগ্রাম কেবল যে বৃথা ধ্বংসের দেবতা তাহা নহে, তাহাদের আবরণের মধ্য দিয়া মহাকাল ভীষণভাবে প্রবলরূপে অন্যোন্যবিনিময় সংসাধন করেন। এমন কি সম্পূর্ণ সাফল্যে বিভূষিত বিজয়ীও তাহার পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে অনেক কিছু লাভ করিতে পারে, যেমন সে কখনও কখনও তাহাকে আত্মসাৎ করে তেমনি আবার কখনও বা পরাজিত শত্রুর বন্দী হইয়াও পড়ে। পাশ্চাত্যের আক্রমণ প্রাচ্য সংস্কৃতিকে যে কেবল ভাঙিয়াই চলিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার নিজ সংস্কৃতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রাচ্য হইতে অনেক কিছু গোপনে ও নীরবে সূক্ষ্মভাবে ও বহুল পরিমাণে সে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের অতীতের গৌরবময় সম্পদের যতটা ইউরোপ এবং আমেরিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ শুধু তাহা সংগ্রহ করিয়া যদি তাহাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতে সচেষ্ট হই তবে তাহাতে আমাদের বাঁচিবার উপায় হইবে না। এরূপ উদার দানশীলতা আমাদের শত্রুর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও সবল করিবে কিন্তু তাহা আমাদিগকে কেবল এক বৃথা আত্মপ্রত্যয় দিবে, এমন কি যদি তাহা বৃহত্তর সৃজনশক্তির সংকল্পে রূপান্তরিত না হয় তবে তাহা আমাদিগকে বিপথগামীই করিবে। আমাদের পক্ষে কর্তব্য, যে আক্রমণ আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বৃহত্তর শক্তি লইয়া নূতন এমন ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়ানো যথা হইতে শত্রুকে পরাভূত করিয়া হঠাইয়া দিতে পারিব; কেবল তাহাই নহে, যেখানে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সুবিধা ও সম্ভব হইবে সেখানে শত্রুর নিজ দেশেও যুদ্ধক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিতে পারিব। সেই সঙ্গে যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় প্রকৃতির উপযোগী হইতে পারে বা তাহাতে সাড়া দিতে পারে, তাহা গ্রহণ ও সৃষ্টিমূলকভাবে সবলরূপে পরিপাক করিয়া আমাদের নবরূপের অঙ্গীভূত করিয়া লইব। কোন কোন ক্ষেত্রে—যদিও সে সমস্ত ক্ষেত্র এখনও সংখ্যায় অল্প—আমরা এই দুই ভাবের ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছি। অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা নির্বোধের মত এক সংমিশ্রণ শুধু সৃষ্টি করিয়াছি অথবা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কতকগুলি অসংস্কৃত ভাব ধার

করিয়াছি বা এখনও করিতেছি কিন্তু তাহাদিগকে পরিপাক করিতে পারি নাই। অনুকরণ করিলে, স্থূলভাবে যদৃচ্ছাক্রমে শত্রুর ভাবধারা এবং যন্ত্রসকল ধার করিলে সাময়িকভাবে সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা কেবল অন্যভাবে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করা। কেবলমাত্র গ্রহণ বা অধিকার করাই যথেষ্ট নহে, গৃহীত বস্তুকে সফলতার সহিত পরিপাক করিয়া ভারতীয় ভাবে রূপান্তর করা প্রয়োজন। সমস্যাটি পরিমাণে বিপুল, এবং তাহার সম্মুখে বর্তমানেই অতি প্রবল বাধা রহিয়াছে এবং আমরা পরিণত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত এখনও এ সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। অন্তর্দৃষ্টির শক্তিশালী এবং সুনিশ্চিত কর্মপদ্ধতিতে সজ্জিত হইয়া অবস্থাসংকট সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত এবং মৌলিক চিন্তা ও সচেতন ক্রিয়াধারা লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে—ইহাই আজ প্রবল প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উপযোগী নূতন উপাদানসকলকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া পরিপাক করা এবং তাহা নিজের শাশ্বত দেহের অংশ করিয়া নেওয়ার এক বিশেষ শক্তি অতীত কাল হইতে ভারতীয় প্রতিভায় বর্তমান আছে দেখা গিয়াছে।

ভারত কি সভ্য?

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু আর এক দিক হইতে দেখিলে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান আমাদের সম্মুখে স্থূলভাবে সংস্কৃতির উত্তেজনামূলক সংঘর্ষ রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা অন্য আকার ধারণ করে। তখন সংস্কৃতিগত বিরোধের পরিবর্তে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা, শুধু আমাদের নয়, জগতে যতপ্রকার সভ্যতা আছে তাহাদের সকলকে প্রভাবিত করিতে পারে তেমন এক চিন্তাধারাকে জাগাইয়া তোলে।

অতীতের কথা বলিতে গেলে মানবজাতির উন্নতি ও পুষ্টির জন্য বিভিন্ন সভ্যতার দানের মূল্য নিরূপণের দিক হইতে সংস্কৃতিগত বিচার্যবিষয়ের এই উত্তর দিতে পারি যে মানবজাতির ক্রমপরিণতিতে যত সভ্যতা দেখা দিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহার সংস্কৃতির রূপে ও প্রকাশে তাহাদের কাহারও অপেক্ষা মহত্ত্বে ন্যূনতর নহে; এ সভ্যতা ধর্মে মহৎ, দর্শনে মহৎ, বিজ্ঞানে মহৎ, ভাবধারার বৈচিত্র্যে মহৎ, সাহিত্য শিল্প ও কাব্যে মহৎ, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় মহৎ, কারুশিল্পে ব্যবসা ও বাণিজ্যে মহৎ। তাহাতে কলঙ্ককালিমা, সুস্পষ্ট অপূর্ণতা ও গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতি যে নাই তাহা নহে; কিন্তু কোন্ সভ্যতা আছে যাহা পূর্ণ? কোন্ সভ্যতা আছে যাহাতে বৃহৎ দাগ নাই, যাহার মধ্যে কঠোর নরক নাই? এ সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রে আছে শূন্যস্থান, অন্ধ বদ্ধ গলি, অসংস্কৃত বা বিকৃতভাবে সংস্কৃত অঞ্চল; কিন্তু কোন্ সভ্যতা আছে যাহার মধ্যে বিপরীতধর্মী গতি ও শূন্য প্রদেশ নাই? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সভ্যতার সঙ্গে কঠোরতম তুলনায়ও আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সমুন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে। গ্রীক্ সভ্যতা হইতে অধিকতর ঊর্ধ্বগামী সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যময় অনুসন্ধিৎসু ও গভীর, রোমান সভ্যতা হইতে অধিকতর মহান ও জনকল্যাণকর, প্রাচীন ইজিপ্টের সভ্যতা হইতে অধিকতর উদার ও অধ্যাত্মপরায়ণ, এসিয়ার অন্য সকল সভ্যতা হইতে অধিকতর বিশাল ও মৌলিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে অধিকতরভাবে মননশক্তিসম্পন্ন, এই সমস্ত সভ্যতায় যাহা কিছু ছিল তাহাতে সমৃদ্ধ এবং

তাহাদের মধ্যে যাহা ছিল না এরূপ বহু সম্পদে বিভূষিত এই ভারতীয় সভ্যতা সকল অতীত সংস্কৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনীশক্তিতে উদ্দীপিত এবং সুবিস্তৃত প্রভাবসম্পন্ন ছিল।

তাহার পর যদি আমরা বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রগতিশীল যুগধর্মের সফল কর্মধারার দিক হইতে দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আমাদের বর্তমান অধঃপতনের দিনেও সংস্কৃতিবিচারের হিসাবের খাতায় আমাদের সমস্তই যে কেবল খরচের ঘরে লিখিত হইবে তাহা নহে। ইহা সত্য যে বহু ক্ষেত্রে আমাদের সভ্যতার অনেক ধারা সৃজনীশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে অথবা বর্তমানের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন কোন স্থানে তাহার মৌলিক পরিবর্তন এবং নবায়নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও সমানভাবেই প্রযোজ্য; আধুনিককালে সে প্রগতিশীলতা লাভ করিয়াছে এবং অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে দ্রুততর মিলাইয়া লইবার শক্তি ও অভ্যাস তাহার আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার অনেক অঙ্গ ইতিমধ্যে দুষ্ট এবং অধুনা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পতন সত্ত্বেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রকৃতির মূল ভাবধারায়, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শসকলের মধ্যে শুধু ভারতকে নয় সমস্ত জগৎকে দিবার উপযুক্ত বাণী এখনও রহিয়াছে। আর ভারতবাসী আমরা মনে করি যে নূতন প্রয়োজন ও ভাবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের নিজের মধ্য হইতে নিজ শক্তি পুষ্ট করিয়া, আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে তাহার উপযুক্ত সমাধান আমরা নিজেই বাহির করিতে পারিব এবং এরূপ সমাধান আবিষ্কার করিব যাহা ইউরোপ হইতে যে পুরাতন সমাধানরাজি আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং তাহাদের সমান অথবা তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অতীতের এবং বর্তমানের প্রয়োজনের তুলনা ছাড়া আদর্শ ভবিষ্যতের একটা দিকও রহিয়াছে। মানুষের প্রগতি যেদিকে চলিয়াছে তাহার আরও দূরবর্তী লক্ষ্যরাজি আছে, বর্তমানে তাহার অতি অস্পষ্ট আকৃতিমাত্র দেখা গিয়াছে এবং আমাদের অব্যবহিত ভবিষ্যতে যাহা রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য আশা ও সাধনা করিতেছি তাহা সেই সমস্ত সুদূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের স্থূল প্রস্তুতির অবস্থামাত্র। ভাবরাজ্যের সে অনাগত ভবিষ্য আদর্শ আধুনিক মনের কাছে এক আনন্দময় স্বপ্নরাজ্যের অসম্ভব কল্পনা মাত্র, কিন্তু মানবজাতির অধিকতর পরিণতির ফলে তাহাদের নূতন পরিবেশে তাহা দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে; একদিন মানুষকে বর্তমানের এই সমস্ত সুপরিচিত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। মানবজাতির পক্ষে তাহার আজিও অনধিগত এই ভবিষ্যতের সম্মুখে ভারতীয় সভ্যতার কিছু দেওয়ার আছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। তাহার

মহান আদর্শ ও প্রভাবশালী শক্তি সেদিকে কি দিশারি আলোক ও কল্যাণ-সামর্থ্য রূপে কাজ করিতে পারিবে অথবা তাহারা কি তাহাদের নিজেদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে এবং পৃথিবীর সেই অনাগত ভবিষ্যৎ যুগের পরিণামধারার কোন সম্ভাবনা উন্মোচিত করিবে না?

মানুষের মধ্যে যে একটা প্রগতি বা ক্রমপরিণতি চলিতেছে, কেহ কেহ তাহা ভ্রান্তিমাত্র মনে করেন, কারণ তাঁহাদের কল্পনা এই যে মানবজাতি সর্বদা একস্থানে থাকিয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে। অথবা, এমন কি তাঁহাদের দৃষ্টিতে বোধ হয় বর্তমান অপেক্ষা অতীতেই অধিক পরিমাণে মহত্ত্ব বিদ্যমান ছিল এবং অগ্রগতির পথ ঊর্ধ্বমুখে না গিয়া নিম্নের দিকে, অধঃপতনের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ মত ভ্রান্ত, ভ্রান্তির কারণ আমরা অতীতের উচ্চ আলোকিত স্থানের উপর অত্যন্ত বেশী দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অন্ধকার ও ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশসকল দেখিতে পাই না, পক্ষান্তরে বর্তমানের তমসাবৃত স্থানগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়া ইহার আলোকময় শক্তি ও উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনাসকলও দেখি না। প্রগতির পথ অবন্ধুর নয়, চলিবার পথে পতন ও উত্থান আছে, আর তাহা হইতেই এ ভুল সিদ্ধান্ত জাত হইয়াছে। কেননা প্রকৃতি অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ, দিন ও রাত্রি, জাগরণ ও নিদ্রার ছন্দদোলার মধ্য দিয়াই ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; পরিণামের একটা ধারাকে পুষ্ট করিবার জন্য পূর্ণতার পক্ষে যাহা কম প্রয়োজন নহে তেমন অন্য এক ধারাকে সাময়িক ভাবে সে পশ্চাতে সরাইয়া রাখে;—শুধু বাহিরের দিকে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ তেমন চক্ষুর কাছে তাহা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার স্থানে অধঃপতন বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পরিচিত পথযাত্রী যেমন নিঃশঙ্কে সরল পথে চলে, যেখানে বাধা দিবার কেহ নাই, যে স্থান কাহারও দ্বারা অধিকৃত নয় অথচ যাহার মানচিত্র ভাল ভাবে জানা আছে তথায় সৈন্যদল যেরূপ নিরাপদ ঋজু গতিতে অগ্রসর হইতে পারে, প্রগতির পথ তেমন সহজ সরল হইতে পারে না। মানুষের প্রগতি অজানা দেশের মধ্য দিয়া এক দুঃসাহসিক অভিযান; সে অজানা দেশে প্রায়ই অজানিত আক্রমণ অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হয়; সব পণ্ড করিয়া ফেলিতে চায় এমন বাধা আসিয়া হানা দেয়, এ বন্ধুর পথে চলিতে বহুবার হোঁচট খাইতে হয়, অনেক স্থলে আসিয়া পথভ্রষ্ট হইতে হয়, অনেক সময় কোন স্থান অধিকার করিবার জন্য অন্য কোন অধিকৃত প্রদেশ কতক ছাড়িয়া দিতে হয় এবং অধিকতর বেগে ও বিস্তৃত রূপে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য প্রায়শঃ হয়ত পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হয়। যখন সমষ্টিগতভাবে দেখিলে মনে হয় অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তখনও অতীতের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান অনেক সময় উন্নত, ইহা সর্বদা মনে হয় না; তখনও হয়ত দেখা যায় যে আমাদের ভিতরের বা বাহিরের মঙ্গলের পক্ষে যাহা

প্রয়োজন এমন কোন কোন দিকে বর্তমান অতীতের নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও (গ্যালিলিওর ভাষায়) বলিতে হয় "তথাপি পৃথিবী অগ্রসর হইতেছে"। এমন কি বিফলতার মধ্যে সফলতার জন্য প্রস্তুতি চলে; আমাদের রাত্রি তাহাদের মধ্যে মহত্তর উষার গোপন রহস্য বহন করে। আমাদের ব্যক্তিগত প্রগতির ক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই দেখা যায়, মানবসমষ্টিও ঠিক তেমনি একইভাবে অগ্রসর হয়। প্রশ্ন এই আমরা কোন্ দিকে চলিয়াছি, প্রকৃত পথ কোন্‌টি এবং আমাদের এই সমুদ্রাভিযানে আমরা কোন্ বন্দরে পৌঁছিব?

পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার সফল আধুনিকত্বের গর্ব করে। কিন্তু লাভের অতি ঔৎসুক্যের ফলে অনেক কিছু সে হারাইয়া বসিয়াছে, এবং প্রাচীন যুগের মানুষ যাহার জন্য সাধনা করিত তাহার অনেক কিছু পাইবার জন্য সে চেষ্টাও করে নাই। তাহা ছাড়া অসহিষ্ণুতা বা অবজ্ঞার বশে এমন অনেক কিছু সে স্বেচ্ছায় দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে যাহাতে তাহার নিজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জীবন আহত হইয়াছে, তাহার সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। পেরিক্লেসের (Pericles) অথবা গ্রীক্ দার্শনিকগণের আবির্ভাবের সময়কার কোন প্রাচীন গ্রীক্ যদি বর্তমান শতাব্দীতে হঠাৎ আসিয়া পড়েন তবে মানুষের বুদ্ধি যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার মন যে বহুবিস্তৃত ভূমিতে ক্রিয়া করিতেছে, যুক্তি বিচারে অধুনা যে বহুমুখীনতা দেখা দিয়াছে, অফুরন্ত-ভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষার যে অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে আলোচনা ও জড়জগতের সর্বজনীন বিধান ও সূত্রগুলি আবিষ্কার করিবার যে শক্তিতে মানুষ বিভূষিত হইয়াছে তাহার বিশালতা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। জড় বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য উন্নতি ও পরিপুষ্টি, তাহার বিরাট আবিষ্কার, তাহার প্রভূত শক্তি, তাহার যান্ত্রিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও অতি বিস্তৃত বিবরণ এবং তাহার আবিষ্কারক্ষম ও উদ্ভাবনপটু মনীষার বিস্ময়কর কার্যকরী সামর্থ্যের প্রশংসা তিনি অকুণ্ঠ ভাবেই করিবেন। আধুনিক জগতের বিপুল হৃদ্‌স্পন্দন, বিশাল উত্তেজনা ও কর্মকোলাহল তাঁহাকে যতটা বিস্ময়বিমুগ্ধ ও মোহিত করিবে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আকুল ও অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহার মধ্যস্থিত কুরূপ ও নীচতার নির্লজ্জ স্তূপ, অমার্জিত বাহ্য উপযোগিতাবাদ, প্রাণের তাণ্ডবলীলা, যাহাসব গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যের অনেক কিছুতে যে রুগ্ন অতিবিবৃদ্ধি ও অন্তঃসারশূন্যতা রহিয়াছে—এ সমস্ত তাঁহাকে এত পীড়া দিবে যে তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবেন। ইহার মধ্যে তিনি অনেক কিছুর এমন অনতিছদ্মবেশী সাক্ষ্য পাইবেন যাহা বিজয়ী বর্বরতা যে তাহার মধ্যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিবে। তিনি ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা ও জীবনের যান্ত্রিক দিকে মনন ও বৈজ্ঞানিক বিচারধারার সূক্ষ্ম ও সতর্ক

প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন বটে, তবু তাঁহার নিজের দেশে মানুষের মন ও আত্মার অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় যুক্তিবিচার ধারার মহৎ প্রয়োগের স্পষ্ট-ভাবে যে শেষ সাধনা চলিয়াছিল তাহার সাক্ষাৎ এখানে মিলিবে না। তিনি দেখিতে পাইবেন যে এ সভ্যতায় সৌন্দর্য বিদেশীয় বস্তু হইয়া পড়িয়াছে এবং উজ্জ্বল ভাবময় মননকে কোন কোন ক্ষেত্রে হীনতর করিয়া কৃতদাসের মত নিয়োগ করা হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অবজ্ঞাত অজানা লোকের মত ব্যবহার পাইয়াছে।

আর অতীতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষী সাধুগণ যদি এ যুগে আসিয়া পড়েন তবে তাঁহারা বুদ্ধি ও জীবনের এই বিশাল কর্মকোলাহলের মধ্যে বেদনাদায়ক এক শূন্যতা অনুভব করিবেন। ইহার ভ্রান্তি ও অবাস্তবতার একটা অনুভূতি প্রতি পদে তাঁহাদিগকে পীড়া দিবে, কেননা তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে মানুষের মধ্যে যাহা মহত্তম এবং যাহা তাহাকে মনুষ্যত্বের উপরে উন্নীত করিয়া দেবতা করিয়া তুলিতে পারে তাহাই অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে বর্তমান অবস্থায় মানুষের মহত্তর আকৃতি ও আবিষ্কারের, তাহার আত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের দিকে যে আপেক্ষিক অবনতি ও ক্ষতি আসিয়া পড়িয়াছে—দীর্ঘকাল পর্যন্ত যাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে—জড় প্রকৃতির বিধানাবলির আবিষ্কার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

কিন্তু এক নিরপেক্ষ দৃষ্টি বর্তমান সভ্যতার এই যুগকে ক্রমবিকাশধারার একটি বিশেষ সোপান রূপে দেখা অধিক পছন্দ করিবে। মানুষের প্রগতির পক্ষে ইহা অপূর্ণ বটে কিন্তু আবশ্যকীয়। সে দৃষ্টির পক্ষে তখন দেখা সম্ভব হইবে যে মানুষের চরম পূর্ণতার পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক তেমন অনেক কিছু এ যুগ লাভ করিয়াছে, যদিও তাহার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হইয়াছে। জ্ঞান যে সর্বজনীনভাবে বহুবিস্তৃত হইয়াছে, বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির শক্তি ও ক্রিয়া পূর্ণতর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে শুধু তাহা নহে; কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা অনেক অগ্রসর এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য তাহার বিপুল প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার জন্য অগণিত উপায় আবিষ্কার এবং প্রবলভাবে সব কিছু কাজে লাগানো হইয়াছে। বিস্তৃতভাবে—এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও—সুখ সুবিধা বিধানের অসংখ্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, অপ্রতিহত শক্তিশালী যন্ত্রাবলির আবিষ্কার ও অক্লান্তভাবে প্রাকৃতিক শক্তি-সকলের ব্যবহার চলিতেছে। উচ্চতম সুরে বাঁধা না হইলেও অনেক শক্তিশালী আদর্শও অনেকটা গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; যতই বাহিরের দিক হইতে সুতরাং অপূর্ণভাবে হউক না কেন, সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে সে সমস্ত আদর্শ কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সত্য যে অনেক কিছু হারাইয়া

গিয়াছে বা খর্ব হইয়াছে কিন্তু কষ্টসাধ্য হইলেও পরিণামে সে সমস্ত ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে। একবার খাঁটি ক্রিয়াধারা আরম্ভ হইলে মানুষের অন্তর্জীবন দেখিতে পাইবে যে তাহা বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, সাবলীলতার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এক নূতনতর বিশালতা ও গভীরতা উদ্ভূত হইয়াছে; দেখিতে পাইবে যে বহুমুখীভাবে সকল দিকে পূর্ণতালাভের কল্যাণপ্রসূ অভ্যাস এবং উচ্চতম আদর্শের যথাযথ প্রতিবিম্বরূপে আমাদের সমষ্টিগত বাহ্য জীবনকে গড়িয়া তুলিবার এক ঐকান্তিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য আমরা লাভ করিয়াছি। বাহিরের কোলাহল ও বহির্মুখী সাধনার এই বর্তমান যুগের পরে বৃহত্তর আন্তর বিস্তৃতির যে যুগ আসিবে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাতে বর্তমানের সাময়িক খর্বতা আর গণনার মধ্যে আসিবে না।

পক্ষান্তরে উপনিষদের অথবা বৌদ্ধ বা তাহার পরবর্তী গৌরবময় ক্ল্যাসিক্যাল যুগের একজন প্রাচীন ভারতবাসীকে যদি বর্তমান ভারতে স্থাপিত করা হয় এবং তিনি বর্তমান অধঃপতিত যুগের জীবনধারার অধিকাংশ যদি দেখিতে পান তবে তাঁহার আরও অবসাদজনক ও পীড়াদায়ক এক অনুভূতি হইবে; তাঁহার মনে হইবে তাঁহার জাতির ও তাঁহার সভ্যতার এক আকস্মিক বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারা গৌরবের সুউচ্চ শিখর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া হতাশার গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতে পারেন যে প্রাচীন ভারতের এই অধঃপতিত বংশধরগণ অতীতের সে মহান সভ্যতাকে কি পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে! অধিকতর সিদ্ধিলাভের এবং নিজেদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবার পথে প্রেরণা ও প্রণোদনা দেওয়ার এত কিছু থাকিতে তাহারা ভারতীয় সভ্যতার উচ্চ আদর্শকে আরও গভীর ও উদার প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া দূরের কথা, নিজেরা এতটা অশক্ত ও জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে, নানা কুৎসিত বস্তুর গুরুভারে নিজেদিগকে এমন প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, এরূপভাবে কলঙ্ককালিমাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে এত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এমন কি আজ মৃত্যুর উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল তাহা ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইবেন। তিনি দেখিতে পাইবেন তাঁহার স্বজাতি আজ অতীতের বাহ্যরূপ, খোসা ও ছিন্নবস্ত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার মূল্যবান মহৎ বস্তুসকলের প্রায় চৌদ্দ আনা হারাইয়া বসিয়াছে। তিনি উপনিষদ ও দার্শনিক যুগের গৌরবময় আধ্যাত্মিক আলোক ও বীর্যের সঙ্গে পরবর্তী কালের মৌলিকতাবর্জিত দার্শনিক চিন্তার জড়তা, ক্ষুদ্রতা ও খণ্ড খণ্ড ভাবের ক্রিয়াধারা তুলনা করিয়া দুঃখিত হইবেন। ভারতের গৌরবময় যুগের উৎসুক মননশীলতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিপুষ্টি, সাহিত্য ও শিল্পের সৃজনশীল মহত্ত্ব, নানা ক্ষেত্রের মহৎ উৎপাদন-

শক্তির স্থানে পরবর্তী কালের এরূপ অধঃপতন, মননের এ দারিদ্র্য, এই নিষ্ক্রিয়তা, স্থিতিশীলভাবে একই বস্তুর এই পুনরাবৃত্তি, সৃষ্টিশীল বোধির এই আপেক্ষিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল-ব্যাপী এই শূন্যতা ও ক্রিয়াহীনতা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িবেন। অজ্ঞানের অভিমুখী এই নিম্নাবতরণ, পুরাতন ইচ্ছা ও তপঃশক্তির এই অধঃপতন, যেন ইচ্ছাপ্রসূত শক্তিহীনতার এই বরণ দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিবেন। প্রাচীনের অধিকতর সবল ও আধ্যাত্মিকতা প্রভাবিত যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার স্থানে তাঁহার দৃষ্টিতে নানা বিস্ময়কর বিশৃংখলা ধরা পড়িবে, দেখিবেন বর্তমান ব্যবস্থা কোন মূলবস্তুকে, সমন্বয়কারী কোন বৃহৎ ভাবকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়া উঠিতেছে না। কোন খাঁটি সমাজব্যবস্থা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে না, যাহা তাঁহার চোখে পড়িবে তাহার গতি অর্ধরুদ্ধ, যাহার অর্ধাংগ দ্রুত পচনের মুখে চলিয়াছে। যে মহান সভ্যতা বহিরাগত ব্যক্তি বা ভাবকে গ্রহণ এবং নিজ শক্তি বলে পরিপাক করিয়া নিজের অংগীভূত করিয়া নিতে সমর্থ হইত এবং যাহা সে গ্রহণ করিত তাহার দশ গুণ ফিরাইয়া দিতে পারিত, তাহার স্থানে আজ তাঁহার সম্মুখে যাহা অবস্থিত তাহা সহায়হীনতার মূর্ত বিগ্রহ, যাহা বহির্জগতের শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার অভিঘাত নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে সহ্য করিতেছে, নিষ্ফল বিদ্যুৎগর্ভ প্রতিক্রিয়ার আঘাত কখন কখন স্বল্প পরিমাণে শুধু ফিরাইয়া দিতেছে। কোন এক সময় তিনি দেখিতে পাইবেন যে বিশ্বাস-হীনতা ও আত্মপ্রত্যয়শূন্যতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে জাতির মধ্যস্থ বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ জাতির প্রাচীন ধর্ম ও আদর্শ আবর্জনা বলিয়া দূর করিয়া তাহার স্থানে বিদেশী সংস্কৃতিকে আমদানী করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। অবশ্য তিনি একটা পরিবর্তনের সূচনাও দেখিতে পাইবেন। তাহা কত গভীরে গিয়াছে অথবা তাহা সে সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মত শক্তিশালী কিনা, নিজের বহুকাল পোষিত জড়তা ও দুর্বলতা অপসারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে ঊর্ধ্বে তুলিবার সামর্থ্য তাহাতে আছে কিনা, প্রাচীন ভাব ও আদর্শের সার্থক নব রূপ গড়িয়া তুলিবার পক্ষে উপযুক্ত নূতন সতেজ সৃষ্টিশীল ক্রিয়া-ধারা পরিচালিত করিতে সক্ষম জ্ঞানালোকের সে অধিকারী হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হয়ত থাকিয়া যাইবে।

এখানেও ভালভাবে বুঝিয়া দেখিলে, বাহিরের দিকে দ্রুত ও চকিত দৃষ্টিতে যে একটানা নৈরাশ্য দৃষ্ট হয় তাহার স্থানে বরং আশারই সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। ভারতেতিহাসের সদ্য বিগত এই যুগটা প্রত্যেক জাতির প্রগতির পথে অতি দীর্ঘ ও উজ্জ্বল দিনের পরে সর্বদা যে রাত্রি আসে তাহারই একটা উদাহরণ। কিন্তু ইহা প্রথমে এমন রাত্রি ছিল যাহার মধ্যে বহু প্রদীপ্ত নক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান ছিল, এমনকি সে রাত্রি যখন ঘোরতমভাবে তমসাচ্ছন্ন

হইয়াছে তখনও তাহার বর্ণনা দেওয়া যায় কালিদাসের ভাষায় 'বিচেয় তারকা প্রভাত কল্পেব শর্বরী', 'রাত্রি ঊষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এখনও তাহার মধ্যে কয়েকটি তারকাকে খ‍ুঁজিয়া বাহির করা যায়' ইহা বলিয়াই। এমন কি অবনতির য‍ুগেও সব কিছ‍ু নষ্ট হইয়া যায় নাই; সে সময়ও প্রয়োজনীয় অনেক পরিণতি ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতের পক্ষে অতি উপযোগী আধ্যাত্মিক ও অন্য বিষয়ক বহ‍ু সম্পদ লাভ হইয়াছে। আর অবনতি ও বিফলতার চরমতম সময়েও ভারতের নিজস্ব প্রকৃতির ম‍ৃত্যু হয় নাই; তাহা শ‍ুধ‍ু অসাড় গ‍ুপ্ত ও শ‍ৃঙ্খলা-বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে; এক আত্ম-ম‍ুক্তিকামনার প্রবল অভিঘাতের সদাবর্তমান চাপে আজ জাগরিত হওয়ার সময় সে দেখিতে পাইতেছে যে তাহার নিদ্রা ছিল সেই ঘ‍ুমঘোরের আবরণের পশ্চাতে তাহার জাতির জীবনের ন‍ূতন অনেক অব্যক্ত-শক্তি ও সম্ভাবনার এক প্রস্তুতির সময়। প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যস‍ূচক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মন এবং তপস্যা বা আধ্যাত্মিক সংকল্পের প্রচণ্ড শক্তির স‍ুস্পষ্ট সাক্ষ্য অনেক কমিয়া গেলেও প‍ূর্বে যাহার অভাব ছিল চেতনার নিম্নতর ক্ষেত্রে তেমন আধ্যাত্মিক আবেগ ও প্রবেগ এবং তীব্র সংবেদনের অনেক ন‍ূতন সম্পদ এসময় লাভ হইয়াছে। ভাস্কর্য সাহিত্য চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্য প্রাচীন কালের গরিমা শক্তি ও মহত্ত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে কিন্তু লাবণ্য সজীবতা ও মাধ‍ুর্যপ‍ূর্ণ অন্য অনেক শক্তি ও প্রণোদনা উদ্ব‍ুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ শিখর হইতে নিম্নতর ভূমিতে অবতরণ ঘটিয়াছে কিন্তু অবতরণের পথেও আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও অন‍ুভূতির প‍ূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক সম্পদ সংগ‍ৃহীত হইয়াছে। এমন কি আমাদের অতীত সংস্কৃতির অবনতিকে তাহার প্রাচীন র‍ূপসকলের এমন এক ক্ষয় ও ম‍ৃত্যু বলিয়া মনে করিতে পারি যাহা শ‍ুধ‍ু যে এক ন‍ূতন স‍ৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছে তাহা নহে কিন্তু যদি আমরা সংকল্প করি তবে তাহা হইতে এক ব‍ৃহত্তর ও প‍ূর্ণতর বিস‍ৃষ্টি উদয় হইতে পারে।

কারণ মোটের উপর সত্তার সংকল্পই পরিবেশকে তাহার যথার্থ ম‍ূল্য অর্পণ করে এবং অনেক সময় সে ম‍ূল্য অপ্রত্যাশিত; আপাতদ‍ৃষ্ট বাস্তবতার বর্ণরাগ অনেক সময় ভুল নির্দেশই প্রদান করে। কোন জাতি বা সভ্যতার সংকল্প যদি ম‍ৃত্যুর অভিম‍ুখী হইয়া পড়ে, যদি তাহা ক্ষয়জনিত অবসাদকে ছাড়িতে না চায়, যদি আসন্নম‍ৃত্যুতেও উদাসীন থাকে অথবা যে সমস্ত প্রব‍ৃত্তি ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়, বর্জন করিবার শক্তি থাকিলেও যদি তাহাদের দিকে অন্ধভাবে ঝ‍ুঁকিয়া পড়ে, অথবা যদি তাহা ভবিষ্যতের শক্তিকে দ‍ূরে সরাইয়া দিয়া শ‍ুধ‍ু ম‍ৃত অতীতের শক্তিকে পোষণ করে, যদি ভবিষ্যতে যে জীবন লাভ হইতে পারে তাহার অপেক্ষা অতীতের জীবনকে অধিকতর বরণীয় মনে করে, তাহা হইলে কিছ‍ুই এমন কি প্রচুর শক্তি সম্পদ ও ব‍ুদ্ধি, বাঁচিবার বহ‍ু আহ্বান

এবং সর্বদা প্রদত্ত নানা সুযোগ ও সুবিধাও অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় ও ধ্বংসের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু নিজের উপর সবল বিশ্বাস যদি আসিয়া পড়ে, বাঁচিবার জন্য যদি সতেজ এক ইচ্ছা দেখা দেয়, ভবিষ্যতে যাহা আসিবে তাহার দিকে যদি উন্মুখতা থাকে, ভবিষ্যৎ ও তাহা যাহা দিতে চায় তাহা অধিকার করিতে যদি দৃঢ় সংকল্প হয়, এবং যেখানে বিরোধী মনে হয় সেখানেও বাধ্য করিবার মত শক্তি যদি থাকে তাহা হইলে বিপদ ও পরাজয়ের মধ্য হইতেও সে সংস্কৃতি অদম্য এক বিজয়ের শক্তিকে টানিয়া বাহির করিতে এবং আপাত অসহায়তা ও ক্ষয়ের মধ্য দিয়াও নবরূপ প্রাপ্তির এক প্রবল অগ্নিশিখা সহযোগে সমৃদ্ধতর এক প্রদীপ্ত জীবনে উঠিয়া যাইতে পারে। তাহার প্রকৃতির শাশ্বত শক্তি বলে ভারতীয় সভ্যতা সর্বদাই যাহা করিয়া আসিয়াছে বর্তমানেও তাহা করিবার জন্য সে পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে।

অতীত আদর্শের মহত্ত্বের মধ্যেই বৃহত্তর ভবিষ্যৎ আদর্শের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। অতীত সাধনা ও সামর্থ্যের পশ্চাতে যাহা ছিল তাহার নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণই কোন জীবন্ত সংস্কৃতির স্থায়িত্বের একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু ইহা হইতে দেখা যায় সভ্যতা ও বর্বরতা শব্দ দুইটির তাৎপর্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। কেননা পরিণতিশীল ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে দেখিলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই উভয় সভ্যতা উচ্চতম অবস্থায়ও তাহাদের উদ্দেশ্য অর্ধসম্পন্ন মাত্র করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে তরুণ ঊষার মাত্র আবির্ভাব হইয়াছে, তবে সে ঊষা ভবিষ্যতে যে সুপরিণত সূর্যালোক আনিবে তাহার ইঙ্গিত দেয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে ইউরোপ বা ভারত, মানুষের কোন জাতি দেশ বা মহাদেশ কেহই পূর্ণরূপে সভ্য হয় নাই; কেহই সত্য ও পূর্ণ মানব জীবনের সমগ্র রহস্য ধরিতে পারে নাই, এমন কি অল্প পরিমাণে তাহারা যাহা কিছু লাভ করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাও পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি অথবা পূর্ণ সতর্ক ঐকান্তিকতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে নাই। আত্মা, মন ও দেহের সুসামঞ্জস্যই যদি সভ্যতার সংজ্ঞা হয় তাহা হইলে কোথায় সে সামঞ্জস্য সমগ্র বা সম্পূর্ণ সত্য হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় সুস্পষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি এবং যন্ত্রণাদায়ক বিরোধ ও সংঘর্ষ নাই? কোন্ জাতি সামঞ্জস্যের সমগ্র রহস্য তাহার সকল অংশের সহিত পূর্ণরূপে ধরিতে পারিয়াছে? অথবা কোন্ জাতির পূর্ণ জীবন-সঙ্গীত বিজয়ী স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ স্থায়ী ও নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বগামী সুরসঙ্গতিরূপে উন্মিষিত ও পরিণত হইয়া উঠিয়াছে? সর্বত্রই মানুষের জীবনে সুস্পষ্ট কুৎসিত এমন কি "বীভৎস" কলঙ্ক কালিমা যে আছে শুধু তাহাই নহে কিন্তু এখন যাহা আমরা প্রশান্ত চিত্তে স্বীকার ও যাহা গৌরবের বিষয় বোধ করি ভবিষ্যৎ যুগের পরিণত মানুষের কাছে তাহা বর্বরতা অন্ততপক্ষে অর্ধবর্বরতা এবং অপরিণত অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিবেচিত

হইতে পারে। যে মহৎ কর্মকে আজ আমরা আদর্শস্থানীয় মনে করি ভবিষ্যতের বিচারে তাহা নিজ ভ্রমের দিকে অন্ধ আত্মতৃপ্ত অপূর্ণতা বলিয়া নিন্দিত হইবে; যে সমস্ত ভাব ও ধারণাকে আমরা জ্ঞানালোক বলিয়া গর্ব করি তখন দেখা যাইবে সে সমস্ত অর্ধালোক এমন কি অন্ধকার মাত্র। আমাদের জীবনের অনেক রূপকে আমরা আজ প্রাচীন এমনকি শাশ্বত বস্তু—জাগতিক কোন রূপকে কি শাশ্বত বলা যায়?—বলিয়া দাবি করি, তখন দেখা যাইবে যে তাহারা ব্যর্থ ও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে শুধু তাহা নহে, আমাদের সর্বোত্তম তত্ত্ব ও আদর্শের যে মনোময় রূপ দেওয়া হয় বড়জোর তাহা হয়ত ভবিষ্যতের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে কিছুটা আদর বা প্রশ্রয় পাওয়ার দাবি করিতে পারিবে। এমন বস্তু অতি অল্পই আছে যাহার প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটিবে না এবং সে পরিবর্তন হয়ত এরূপ হইবে যে পরিবর্তিত বস্তুকে আর পূর্ব বস্তু বলিয়া চেনাই যাইবে না—তখন এমন কিছু থাকিবে না যাহা এক নূতন সমন্বয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হইতে স্বীকৃত হয় নাই। আজ আমরা যে দৃষ্টিতে অসভ্য বন্য জাতি ও আদিম অধিবাসীদিগকে দেখি, অবশেষে ভবিষ্য যুগ, হয়ত সেই দৃষ্টিতেই বর্তমান ইউরোপ ও এসিয়ার সকল লোককে দেখিবে। ভবিষ্যৎ যুগ হইতে এই দৃষ্টি যদি আমরা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহভাবে এমন একটা আলোকদায়ী ও শক্তিশালী দাঁড়াইবার স্থান পাইব যথা হইতে আমরা বর্তমানকে বিচার করিতে সমর্থ হইব, কিন্তু সে দৃষ্টি তুলনামূলকভাবে বর্তমান ও অতীত সংস্কৃতিসকলের মূল্যায়নকে নিষ্ফল করিয়া দিবে না।

এই জন্যই অতীত ও বর্তমান ভবিষ্যতের বৃহত্তর সোপানাবলি প্রস্তুত করিতেছে এবং যাহা এই অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির স্থান অধিকার করিবে তাহার মধ্যেও ইহার অনেক কিছু বাঁচিয়া থাকিবে। আমাদের অপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপের পশ্চাতে এক নিত্য চিদাত্মা আছেন যাহাতে আমাদিগকে সংসক্ত থাকিতে হইবে এবং যাহা ইহার পরেও চিরস্থায়ী হইবে; কতকগুলি মৌলিক উদ্দেশ্য এবং স্বরূপগত ভাব-শক্তি (idea-forces) আছে যাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, কেননা তাহারা আমাদের সত্তার প্রাণতত্ত্বের অংগ এবং আমাদের মধ্যস্থিত প্রকৃতির লক্ষ্য—আমাদের স্বধর্ম। কিন্তু এই সমস্ত উদ্দেশ্য এই সমস্ত ভাব-শক্তি, জাতিগতভাবে হউক বা সমগ্র মানবতার দিক হইতে হউক, সংখ্যায় অতি অল্প এবং মূলতঃ সহজ ও সরল, এবং সর্বদা বিচিত্র ও ক্রমবর্ধমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। বাকি সব কিছু আমাদের সত্তার আন্তর স্তরের বস্তু ততটা নহে এবং ইহাদিগকে পরিবর্তনকারী চাপের অধীন হইতে এবং যুগধর্মের প্রগতিশীল দাবি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বস্তুর মধ্যে এই নিত্য চিদ্বস্তু এবং আমাদের প্রকৃতির এই বিধান, এই স্থায়ী

স্বধর্ম আছে; আর তাহা ছাড়া আছে পরম্পরাক্রমে রূপায়ণের বিধানসমূহের নানা ধারা যাহা তত পরিমাণে অবশ্যপালনীয় নহে—তাহারা আমাদের প্রকৃতির স্বভাব, রূপ, প্রবণতা ও অভ্যাসের ছন্দরাজি, ইহাদিগকে যুগধর্মের পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক জাতিকে স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের এই দুই তত্ত্বকেই মানিয়া চলিতে হয় নতুবা ক্ষয় ও অধোগতির দিকে চলিবার শাস্তি ভোগ করিতে হয় যাহা তাহার সজীব কেন্দ্রকে পর্যন্ত কলুষিত করিয়া তুলিতে পারে।

যাহা আমাদের সংস্কৃতিকে ভাঙ্গিয়া দিতে অথবা তাহার অনিষ্টসাধন করিতে চায় তেমন প্রত্যেক আক্রমণকে আমরা নিশ্চয়ই সবলে প্রতিহত করিব; কিন্তু তদপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজনীয় হইল আমাদের অতীত অবদান, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থাৎ আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি কি হইতে পারি তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ও স্বাধীন মতবাদ গড়িয়া তোলা। আমাদের অতীতে যাহা কিছু মহৎ, মৌলিক, উন্নয়নকারী, প্রাণশক্তিপ্রদ, জ্ঞানালোকদায়ী, বিজয়ী ও ফলপ্রসূ ছিল তাহাদিগকে বিশেষভাবে চিনিতে হইবে। আবার তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার পক্ষে নিত্য, মূল প্রকৃতিগত ও স্থায়ী বিধানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল তাহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে এবং যাহা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রণালীবন্ধ করা হইয়াছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। কেননা অতীতে যাহা কিছু মহৎ ছিল তাহার সব কিছুকে যেরূপে ছিল তদ্রূপে রক্ষা বা নিত্য পুনরাবৃত্ত করা সম্ভব নহে; অনেক নূতন প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছে, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অন্য অনেক নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অতীতের মধ্যে কি অপূর্ণতা ছিল, কাহাকে ভালভাবে ধরিতে পারা যায় নাই, অসম্পূর্ণভাবে কাহাকে প্রণালীবন্ধ করা হইয়াছে অথবা কি কি সেই যুগের বা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের শুধু উপযোগী ছিল তাহাও আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কেননা অতীতে যাহা কিছু ছিল—এমন কি যখন তাহা উচ্চতম অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল তখনও—তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রশংসনীয় ছিল এবং সেই ধরনের বস্তুর মধ্যে তাহা মানব মন ও প্রকৃতির উচ্চতম চূড়ান্ত অবদান ছিল এরূপ দাবি করা সম্পূর্ণ বৃথা। ইহার পরে আমাদের এই অতীতের সহিত বর্তমানের তুলনা করিতে হইবে, আমাদের অবনতির কারণগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং আমাদের রোগ ও ত্রুটিবিচ্যুতির ঔষধ ও প্রতিকার নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে যাহাতে আমাদের অতীত মহত্ত্বের বোধে সম্মোহিত হওয়ার সাংঘাতিক প্রলোভনে পড়িয়া আমরা জড়ত্বকে বরণ না করি; বরং তাহা হইতে নূতন করিয়া বৃহত্তর সম্পদ অর্জনের প্রেরণা যেন লাভ

করিতে পারি কিন্তু আবার আমাদের বর্তমানকে সমালোচনা করিতে গিয়া যেন একদেশদর্শী না হইয়া পড়ি অথবা নির্বোধিতাপ্রসূত নিরপেক্ষতা লইয়া আমরা যাহা হইয়াছি বা যাহা করিয়াছি তাহার সব কিছুকে যেন নিন্দা না করি। নিজেদের তোষামোদ অথবা আমাদের অধঃপতনের আপাতমনোরম মিথ্যা ব্যাখ্যা না করিয়া কিম্বা অন্যদিকে বিদেশীয়ের প্রশংসা পাইবার প্রত্যাশায় আমাদের নিজ গৃহকে কলুষিত করা হইতে বিরত থাকিয়া আমাদিগকে আমাদের বাস্তবিক দুর্বলতা ও তাহার কারণ জানিতে ও বুঝিতে হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের শক্তির মূল উপাদান, আমাদের স্থায়ী সম্ভাবনা, আমাদের আত্ম সঞ্জীবনের সক্রিয় ও সবল প্রবেগের উপর দৃঢ়তর মনোযোগের সহিত আমাদের দৃষ্টিকে নিবন্ধ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় আর একটা তুলনা করিতে হইবে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের সঙ্গে। ইউরোপ ও ভারতের অতীতের তুলনার সময় আমরা নিরপেক্ষভাবে পাশ্চাত্যের সফলতাগুলি, তাহারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাহা দান করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিব কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার বৃহত্তর ছিদ্রগুলি, তাহার বিস্ময়কর ত্রুটিবিচ্যুতি, তাহার ভীষণ এমন কি "বীভৎস" পাপ ও অকৃতকার্যতা-গুলিও পর্যবেক্ষণ করিব। তুলাদণ্ডের অন্য পাল্লায় আমাদিগকে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ভারতীয় অবদান ও অকৃতকার্যতাসকলকে তুলিয়া দিতে হইবে। এখানে আমরা দেখিতে পাইব যে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহার জন্য ইউরোপের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে হইবে, বরং এরূপ অনেক কিছু রহিয়াছে যাহাতে আমরা তাহার উপরে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিমেয় রূপে উপরে স্থান পাইতে পারি। কিন্তু তারপর আমাদিগকে আধুনিক পাশ্চাত্যের প্রবল সফলতা, প্রাণশক্তি ও বিজয়ী দাম্ভিকতার দিকগুলিকেও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার মধ্যে যাহা মহৎ আছে তাহা স্বীকার করিব কিন্তু তাহাদের মধ্যস্থিত দোষ ও অসম্পূর্ণতা, বিভ্রান্তি ও পতন এবং বিপদগুলিও গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিব। আর দেখিব বর্তমান ভারত, তাহার অধঃপতন ও তাহার কারণ, তাহার পুনরুজ্জীবনের সামান্যতম ইচ্ছা এবং এখনও যাহা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাহাকে শ্রেষ্ঠতর করিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্যের তেমন উপাদানসকল—এ সমস্তই ইউরোপের এই বিপজ্জনক মহত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য হইতে অপরিহার্যরূপে যে যে বস্তু আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার সব কিছু দেখিতে বা তাহার হিসাব লইতে হইবে এবং তাহা পরিপাক করিয়া কিরূপে আমাদের প্রকৃতি ও আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে প্রকৃতিসিদ্ধ শক্তির কোন উৎস আছে কিনা যাহা হইতে আমরা ইউরোপ যাহা দিতে পারে তদপেক্ষা

গভীর সঞ্জীবক এবং সতেজ প্রাণশক্তিপ্রবাহমালা বাহির করিয়া আনিতে পারি। কারণ তাহারা পাশ্চাত্য রূপ ও প্রযোজনা হইতে আমাদিগকে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিবে কেননা তাহারা আমাদের পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক, আমাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অধিকতর ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ, সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অধিকতর ভরপুর, ব্যবহারিক ভাবে অধিকতর সহজে গ্রহণ এবং পরিপূর্ণ রূপে অনুসরণযোগ্য।

কিন্তু এই সমস্ত প্রয়োজনীয় তুলনা অপেক্ষাও অধিকতর সহায়ক হইবে যদি আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা হইতে আমাদেরই—এবং কোন বৈদেশিকের নহে—ভবিষ্যৎ আদর্শের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কেননা আমাদের নিজেদের পরিণতির যে প্রণোদনা ভবিষ্যতের দিকে রহিয়াছে তাহাই আমাদের অতীত ও বর্তমানের প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্য প্রদান করে। ভারতের প্রকৃতি, তাহার জীবনব্রত, যে কর্ম তাহাকে করিতে হইবে, পৃথিবীর ভবিতব্যতায় তাহার যে অংশ আছে, যে স্বকীয় অনন্যসাধারণ শক্তির জন্য সে দাঁড়াইয়াছে—তাহা তাহার অতীত ইতিহাসে লেখা আছে এবং তাহাই হইল তাহার বর্তমান জ্বালাযন্ত্রণা ও অগ্নিপরীক্ষার গোপন উদ্দেশ্য। আমাদের আত্মপ্রকৃতির রূপরাজিকে পুনর্গঠন করিয়া লইতে হইবে; কিন্তু অতীতের রূপরাজির পশ্চাতে আমাদের যে প্রকৃতি ছিল তাহাকে বিমোচন ও রক্ষা করিতে এবং তাহাতে নূতন ও বীর্যবন্ত ভাবনার তাৎপর্য ও সংস্কৃতিগত মূল্য সঞ্চার করিতে তাহাকে এক নূতন যন্ত্র করিয়া লইতে তাহার এক বৃহত্তর রূপ দিতে হইবে। আর যতদিন আমরা এই সমস্ত মূল বস্তুকে স্বীকার করিব এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব ততদিন দেহ ও মনের কোন তীব্রতম নূতন যোজনা এবং সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে কোন চরম পরিবর্তনও আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সমস্ত পরিবর্তন ভারতীয় প্রকৃতিতে ও ছাঁচে করিতে হইবে, অন্য কোন ধরনে, আমেরিকা বা ইউরোপের প্রকৃতিতে, জাপান বা রুশিয়ার ছাঁচে হইলে চলিবে না। আমরা যাহা আছি আর আমরা যাহা হইতে পারি বা যাহা হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত এ উভয়ের মধ্যস্থিত বিরাট ব্যবধানকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু হতাশার মনোভাবের জন্য অথবা আমাদের ও আমাদের স্বভাবগত সত্যের অস্বীকৃতি রূপে যে ইহা স্বীকার করিব তাহা নহে, পরন্তু, আমাদিগকে কতটা অগ্রসর হইতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যই ইহা করিব। কেননা আমাদিগকে অগ্রসর হওয়ার খাঁটি ধারাগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে এবং আমাদের মধ্য হইতেই তাহাদের ধারণা ও তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবার উপযোগী আস্পৃহা ও অনুপ্রেরণা, সাধনাগ্নি ও শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

যদি আমাদিগকে এইভাবে দাঁড়াইতে হয়, এইভাবে অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে প্রয়োজন এক মৌলিক সত্যানুসন্ধানী ভাবনার, আর প্রয়োজন এক সবল ও সাহসী বোধির, আধ্যাত্মিক ও মানসিক এক অব্যর্থ শুচিতার। অজ্ঞতাপ্রসূত পাশ্চাত্য সমালোচনার আক্রমণ হইতে আমাদিগের সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার এবং আধুনিক যুগের বিশাল চাপের বিরুদ্ধে তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার সাহস আমাদিগকে প্রথমে লাভ করিতে হইবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপীয় নয় কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিবার সাহসও আমাদের থাকা চাই। ক্ষয় অথবা অবনতিকালীন সকল ঘটনা বাদ দিয়াও আমাদের জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত বস্তু নিজেরাই ভুল পথে চলিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, যাহারা আমাদের জাতীয় জীবনকে দুর্বল, আমাদের সভ্যতাকে অধোগামী, আমাদের সংস্কৃতিকে অবমানিত করিয়াছে, কোন প্রকার কূটতর্ক না করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে হইবে। নিম্ন ও অনুন্নত হরিজনগণের প্রতি আমাদের ব্যবহার ইহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এমন লোক অনেক আছে যাহারা অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে ইহা এক অপরিহার্য ভ্রান্তি বলিয়া ক্ষমার্হ মনে করে; অন্য অনেকে আছে যাহারা তর্ক করিয়া বুঝাইতে চাহে ইহাই ছিল তখনকার কালের সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান। আবার এমনও লোক আছে যাহারা এ ব্যবস্থার সমর্থন করে এবং কতকটা পরিবর্তন করিয়া আমাদের সামাজিক সমন্বয়ের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া তাহা দীর্ঘতরকাল স্থায়ী করিতে চায়। ক্ষমার কারণ থাকিতে পারে কিন্তু এ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বিষয়টির মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। যে সমাধান সমগ্র জাতির এক ষষ্ঠাংশকে অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, কেবল-পাশব জীবন হইতে তাহাদিগকে উচ্চস্তরে না তুলিয়া বরং স্থায়ী অপমান, নিরবচ্ছিন্ন কলুষতা এবং অন্তর ও বহির্জীবনের অশুচিতার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য করে তাহা কোন সমাধানই নহে, পরন্তু তাহা দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং সমাজদেহকে ও তাহার সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক মানসিক নৈতিক এবং বৈষয়িক মঙ্গলকে সর্বদাই দারুণভাবে আঘাত করিয়া তথায় স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করা। যে সমাজ-সমন্বয় আমাদের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ ও দেশবাসীগণকে অধঃপতনের স্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে রাখিয়া শুধু বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হইয়াই আছে, তাহারা যে ক্ষয় ও বিক্ষোভের মধ্যে গিয়া পড়িবে পূর্ব হইতেই তাহাদিগকে সে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়া আছে। ইহার কুফলগুলি বহুদিন পর্যন্ত চাপিয়া রাখা যাইতে পারে কিন্তু কর্মফলের সূক্ষ্মতর অলক্ষ্য বিধান অনুসারে তাহা ক্রিয়া করিয়া যাইবে; কিন্তু একবার সত্যের আলোক এই সমস্ত কালো দাগের উপর পড়িবার পর তাহাদিগকে

চিরস্থায়ী করিতে গেলে ধ্বংসের বীজকে বজায় রাখা হইবে এবং পরিণামে আমাদের উদ্বর্তনের সম্ভাবনা নষ্ট হইবে।

আবার আমাদিগকে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে আমাদের সংস্কৃতিগত ভাবধারাগুলি এবং আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার রূপরাজি কোথায় তাহাদের প্রাচীন নিজস্ব প্রকৃতি এবং প্রকৃত তাৎপর্য হারাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের অনেকগুলি এখন শুধু গাল-গল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে ভাবধারা তাহারা মানিয়া লইয়াছে তাহার অথবা জীবনের তথ্যাবলির সহিত তাহাদের মিল নাই। অন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা তাহাদের সময়ে উত্তম অথবা হিতকর থাকিলেও বর্তমানে আমাদের পরিণতির পক্ষে আর সুপ্রচুর নহে। এই সমস্তকে হয় রূপান্তরিত না হয় বর্জন করিতে এবং তাহাদের স্থানে সত্যতর ভাব ও উৎকৃষ্টতর রূপায়ণ-সকলকে বসাইতে হইবে। যে নূতন ভাবে তাহাদিগকে রূপায়িত করিব তাহা সর্বদা তাহাদের প্রাচীন তাৎপর্য ফিরিয়া না পাইতে পারে। যে নূতন গতিষ্মান সত্য আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে তাহাকে অতীত আদর্শের সীমিত সত্যের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অতীত ও বর্তমান আদর্শের উপর আত্মার সন্ধানী-আলোক ফেলিতে এবং দেখিতে হইবে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বা বর্ধিত করা অথবা নূতন উদারতর আদর্শের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট করা প্রয়োজন কিনা। আমরা যাহা কিছু করি বা সৃষ্টি করি তাহাকে ভারতের নিজস্ব স্থায়ী প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত করিতে হইবে, কিন্তু তাহার এমন রূপ দিতে হইবে তাহাকে এমন নমনীয় হইতে হইবে যাহাতে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদিগকে যাহা হইয়া উঠিবার জন্য আহ্বান করিতেছে তাহার বৃহত্তর ছন্দের সঙ্গে সুসমঞ্জস হইতে পারে। আমাদের নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আপন সংস্কৃতির নিজস্ব প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা স্থায়ী ও সবল জীবন লাভের পক্ষে যদি প্রথম বা প্রধান প্রয়োজন হয় তবে তাহার জন্য বৃহত্তর সম্ভাবনাসকল স্বীকার করা তদপেক্ষা কম প্রয়োজন নহে। যদি আমাদের অতীতকে অনুপ্রেরণাদায়ী আবেগ না করিয়া অতিরিক্ত আসক্তির বিষয় করিয়া তুলি তবে সুস্থ ও বিজয়ী উদ্বর্তন সম্ভব হইবে না।

আমাদের সভ্যতার নিজস্ব প্রকৃতি ও আদর্শরাজিকে প্রতিরক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা তাহাদের শ্রেষ্ঠ অংশে এবং স্বরূপে তাহাদের শাশ্বত মূল্য আছে। ভারত তাহার আন্তর ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহাদিগকে ঐকান্তিকতা ও বীর্যের সহিত কার্যকরী ভাবেই চাহিয়াছে। কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত জীবনে তাহাদের প্রয়োগ গুরুতর সঙ্কোচের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সে প্রয়োগ কখনই সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গীণ হয় নাই, আর যখন তাহার অধিবাসীগণের মধ্যে প্রাণশক্তির অবনতি ঘটিল তখন তাহা অধিক হইতে অধিকতর ভাবে সীমিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। এই দোষ, আদর্শ ও সমষ্টিগত আচরণের

মধ্যে এই বৃহৎ ব্যবধান মানবজীবনের সর্বত্র দেখা গিয়াছে, ভারতের যে ইহা বিশেষত্ব তাহা নহে; কিন্তু কালক্রমে এই অসঙ্গতি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং অবশেষে আমাদের সমাজের উপর দুর্বলতা ও বিফলতার এক বর্ধিষ্ণু ছাপ লাগাইয়া দিয়াছে। প্রারম্ভে অন্তরের আদর্শ এবং বাহিরের জীবনের মধ্যে একপ্রকার এক সামঞ্জস্য স্থাপনের বৃহৎ চেষ্টা ছিল; কিন্তু অবশেষে স্থিতিশীল এক সমাজব্যবস্থাই পরবর্তীকালে আসিয়া পড়িয়াছিল; অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক তত্ত্ব, পলায়ন কৌশল অবলম্বন-পরায়ণ এক একত্ববোধ এবং পরস্পর সহায়ক নির্দিষ্ট রূপরাজি সর্বদাই তথায় ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজে গণজীবনে দৃঢ় বন্ধন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ এবং ভেদজনক জটিলতার ক্রমবর্ধিষ্ণু উপাদানসকলও বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতা, একত্ব ও মানুষের মধ্যে ভগবত্তার মহান বৈদান্তিক আদর্শ ব্যক্তির আন্তর জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য রাখা হইয়াছিল। তার পর যখন ভারতের আত্মপ্রসারণ এবং অপরকে পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিবার শক্তি হ্রাস পাইল, যখন বাহির হইতে ইসলাম ও ইউরোপের প্রবল এবং আক্রমণশীল শক্তিরাজির অভিঘাত আসিয়া পড়িল তখন পরবর্তী যুগের হিন্দুসমাজ অবরুদ্ধ অবস্থায় এক স্থিতিশীল আত্মরক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট রহিল, কোনক্রমে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতি সে লাভ করিল। জীবনের প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি ক্রমশঃ অধিকতর রূপে সংকুচিত হইয়া পড়িতে এবং তাহার প্রাচীন নিজস্ব প্রকৃতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও ক্রমে সীমিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় পাওয়া গেল, উদ্‌বর্তন সম্ভব হইল কিন্তু সে সময় পরিণামে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত ও প্রাণশক্তিপূর্ণ সময় নহে আর সে উদ্‌বর্তনও বৃহৎ বীর্যবন্ত ও বিজয়ী রহিল না।

আর এখন আত্মপ্রসারণ ছাড়া উদ্‌বর্তনও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যদি আমাদিগকে আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে ভারতের সেই বৃহৎ প্রতিরুদ্ধ সাধনা পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে; ব্যষ্টিব্যক্তিতে ও সমাজে, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনে, ধর্ম ও দর্শনে, শিল্প সাহিত্য ও ভাবনায়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতের উচ্চতম নিজ প্রকৃতি ও জ্ঞানের পূর্ণ ও অসীম অর্থকে সাহসের সহিত গ্রহণ এবং সর্বতোভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। আর ইহা যদি আমরা করিতে পারি তাহা হইলে দেখিতে পাইব পাশ্চাত্য বেশে সজ্জিত হইয়া যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে তাহার মধ্যস্থিত সর্বোত্তম বস্তু আমাদের প্রাচীন প্রজ্ঞানের মধ্যে পূর্ব হইতেই অনুসৃত হইয়া আছে, এবং তথায় তাহার পশ্চাতে এক বৃহত্তর তাৎপর্য, এক গভীরতর সত্য ও আত্মজ্ঞান এবং মহত্তর ও অধিকতর আদর্শস্থানীয় রূপায়ণ গঠনের এক সংকল্পশক্তি রহিয়াছে। যাহা আমাদের

আত্মাতে সর্বদা জানা আছে এখন কেবল তাহাই জীবনে আমাদিগকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের অতীত সংস্কৃতির মূল অর্থ এবং আমাদের ভবিষ্যতের পরিবেশগত প্রয়োজনের মধ্যে আবশ্যকীয় সামঞ্জস্যের গোপন রহস্য এখানেই রহিয়াছে, অন্য কোথাও নাই।

এই দৃষ্টিতে দেখিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মুখে যে আসন্ন বিপজ্জনক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য এক সম্ভাবনা আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একই লক্ষ্য খুঁজিতেছে; কিন্তু বিভিন্ন মহাদেশ বা বিভিন্ন জাতি তাহাদের বিভিন্ন রূপায়ণ ও বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন দিক হইতে সেই একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্তর্নিহিত চরম দিব্য উদ্দেশ্যের একত্বকে চিনিতে বা বুঝিতে না পারিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রত্যেকে দাবি করে একমাত্র তাহার নিজের পথই সমগ্র মানবজাতির পথ। যে সভ্যতার মধ্যে তাহারা দৈবক্রমে জাত হইয়াছে, মনে করে তাহাই একমাত্র সত্য ও পরিপূর্ণ সভ্যতা, আর বাকি সকলকে হয় মরিতে হইবে নতুবা তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সভ্যতা এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে, কেননা আজিও মানবজাতি দশ ভাগের নয় ভাগ বর্বর রহিয়া গিয়াছে এবং এক ভাগ মাত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় মন পরিণতির তত্ত্বে সংগ্রামকেই প্রথম ও প্রধান স্থান দেয়; এবং সংগ্রামের সাহায্যেই তাহারা একপ্রকার সঙ্গতি আনয়ন করে। কিন্তু এই সঙ্গতিও প্রতিযোগিতা, আক্রমণ এবং আরও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পরিণতি সাধিত করিবার এক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা এমন এক শান্তি যাহা সর্বদাই, এমন কি নিজের মধ্যেও, ভাঙিয়া পড়ে, এবং তত্ত্ব ধারণা স্বার্থ জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে এক নূতন সংঘর্ষ দেখা দেয়; এমন এক ব্যবস্থা যাহা তাহার ভিত্তি ও কেন্দ্রে অনিশ্চিত কেননা তাহা অর্ধসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে অর্ধসত্য অধোগামী হইয়া সম্পূর্ণ মিথ্যায় পরিণত হয়; কিন্তু তথাপি ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে সবলে নানাপ্রকার সম্পদ অর্জন করিতে, বীর্যবন্তভাবে গড়িয়া উঠিতে এবং অপরকে গ্রাস ও আত্মসাৎ করিতে সমর্থ এখনও বা আজ পর্যন্ত রহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল যে সামঞ্জস্য এক একত্বের মধ্যে নিজের ভিত্তি আবিষ্কার করিতে, এবং তদপেক্ষা এক বৃহত্তর একত্বে পৌঁছিতে সচেষ্ট ছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল এমন এক স্থায়ী সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাহাতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হ্রাস, এমন কি একেবারে লোপ পাইবে। কিন্তু শেষের দিকে বর্জন বিভাগ এবং অচল স্থিতির মধ্য দিয়া ইহা এক প্রকার শান্তি ও স্থায়ী ব্যবস্থা আনয়ন করিল, নিজের চারিপাশে নির্বিঘ্নতার এক যাদু-বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া চিরতরে নিজেকে তাহার

মধ্যে আবদ্ধ করিল। অবশেষে তাহার আক্রমণের শক্তি হারাইয়া গেল, তাহার আত্মসাৎ করিবার শক্তি হ্রাস পাইল এবং নিজের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইল। যে নিশ্চল ও সীমিত সঙ্গতি সর্বদা আত্মবিস্তার না করে নমনীয় বা সাবলীল না থাকে আমাদের মানুষী অবস্থার অপূর্ণতার মধ্যে তাহা এক কারাগার অথবা এক নিদ্রা-কক্ষ হইয়া উঠে। সঙ্গতি তাহার রূপে অসম্পূর্ণ এবং সাময়িক না হইয়া পারে না, সে তাহার প্রাণশক্তি বজায় রাখিতে এবং নিজের চরম লক্ষ্য পূর্ণ করিতে কেবল তখনই সক্ষম হয় যখন সর্বদা প্রসারিত হইতে, উন্নতি লাভ করিতে এবং নিজেকে প্রয়োজনানুরূপভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্রতর একত্বগুলিকে উদারতর ও ব্যাপকতর একত্বের এবং সর্বোপরি অধিকতর প্রকৃত এবং আধ্যাত্মিক একত্বের দিকে বিস্তৃত ও পর্যবসিত হইতে হইবে। যে বৃহত্তর সংস্কৃতি ও সভ্যতা আমাদিগকে এখন লাভ করিতে হইবে তাহার মধ্যে এক প্রধান প্রযোজক শক্তিরূপে আধ্যাত্মিক ও মানসিক একত্বের এক বৃহত্তর বাহ্য অভিব্যক্তি থাকিবে কিন্তু তাহার সহিত এক বৈচিত্র্যও থাকিবে—ইউরোপের যান্ত্রিক পদ্ধতি যাহা সহ্য করিতে চায় না। আমাদের সাধনার আর এক ধারা হইবে মানবজাতির বাকি অংশের সঙ্গে একটা সঙ্গতি স্থাপন, একটা একত্ব লাভ যাহার মধ্যে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য স্বাধীনতা এ উভয়ই রক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু আজ যাহা সংগ্রাম বলিয়া বোধ হইতেছে হয়ত তাহা, পাশ্চাত্য জগৎ যাহা শুধু ধারণায় পাইয়াছে কিন্তু নিজের মধ্যে তদুপযোগী শক্তি না থাকাতে যাহা অর্জন করিতে পারিতেছে না, সমগ্র মানবজাতির সেই একত্ব প্রণালীবদ্ধভাবে লাভ করিবার পূর্ববর্তী প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সোপান। তাই ইউরোপ পরস্পর বিবদমান স্বার্থের আপোষ এবং যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শক্তির সাহায্যে সে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, কিন্তু এরূপ চেষ্টার ফলে হয়ত তাহার প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হইবে না অথবা তাহা শুধু বালুকার ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইবে। ইতিমধ্যে সে অন্য সকল সংস্কৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছে যেন শুধু তাহার মধ্যেই জীবনের একমাত্র অথবা সমগ্র সত্য রহিয়াছে, যেন আত্মার সত্য বলিয়া কিছু নাই। প্রাচীনকাল হইতে আত্মসত্ত্বের অধিকারী ভারতকেই এই উদ্ধত দাবি ও আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে যে কেহ দাঁড়াক না কেন, যে কোন গুরু দ্বন্দ্ব বা বিরোধ অথবা নবাগত কেহ বা কিছু আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন তৎসত্ত্বেও তাহাকে নিজের গভীরতর সত্যকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কেননা ভারতের এইভাবে নিজ সংস্কৃতিকে রক্ষা ও স্থাপনের মধ্যেই একমাত্র আশা আছে যে একটা নূতন মহাবিপ্লবের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া এবং পুনরায় তথা হইতে নূতন করিয়া তাহার প্রাচীন অন্ধ চক্রাবর্তনের মধ্যে না গিয়া মানবজাতি অবশেষে জ্ঞানালোকের মধ্যে উন্মেষিত হইয়া উঠিবে

এবং তাহার প্রগতি এমন ভাবে সিদ্ধ করিয়া তুলিবে যে তাহা জাগতিক পরিণতিকে আত্মার ক্রমাভিব্যক্তির পথে তাহার পরবর্তী উচ্চতর সোপানে তুলিয়া দিবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

প্রথম অধ্যায়

যদি আমরা কোন সংস্কৃতির গুণ ও মূল্য অবধারণ করিতে চাই আর তাহা যদি সেই সংস্কৃতি হয় যাহার মধ্যে আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি এবং যাহা হইতে আমাদের জীবন পরিচালনার আদর্শরাজি পাইয়াছি, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে দুইভাবে আমাদের ভ্রান্তি আসিতে পারে; আমরা উহার প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতদুষ্ট হইলে তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা আমরা ছোট করিয়া দেখি, পক্ষান্তরে অতি বেশী পরিচয় হেতু তাহার উৎকৃষ্ট দিকগুলি বা তাহাদের মূল্য সম্বন্ধে অনেক সময় সচেতন থাকি না; কিন্তু যাহারা এরূপভাবে অভ্যস্ত নয় সেইরূপ বাহিরের লোকের নিকট হয়ত সে সমস্ত সহজে প্রতিভাত হইতে পারে; এই জন্য অপরে সে সংস্কৃতিকে কিভাবে দেখে তাহা জানা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি হিতকর। ইহার অর্থ অবশ্য ইহা নহে যে আমরা আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিয়া সকল বিষয় তাহাদের দৃষ্টিতে দেখিব, কিন্তু এইভাবের আলোচনায় তাহাদের নিকট হইতে কোন নূতন আলোক পাইতে পারি যাহা আমাদের অন্তর্দর্শন ও আত্মপরীক্ষায় সহায় হইতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দেখিবার বিভিন্ন উপায় আছে। প্রথম যাঁহারা কোন সংস্কৃতির সহিত একীভূত হইয়াছেন এবং অতিসন্নিকটে আসিয়া বোধি ও সহানুভূতির সাহায্যে গভীরভাবে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছেন: এইভাবে আমরা ভগিনী নিবেদিতার Web of Indian Life-এর মত পুস্তক অথবা মিঃ ফিল্‌ডিং-এর (Mr. Fielding) ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিম্বা সার জন উড্‌রফের তন্ত্রসম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা পাইয়াছি। এই সমস্ত পুস্তকে সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া একটি জাতির অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা আছে। ইহা হইতে পারে যে তাঁহারা সমস্ত কঠোর বাহ্য তথ্য আমাদিগকে দেন নাই কিন্তু যাহার মধ্যে বৃহত্তর সত্য আছে এমন গভীরতর কিছুর উপরে তাঁহারা আলোকপাত করিয়াছেন; জাতির জীবনে যে সমস্ত অপূর্ণতা রহিয়াছে তাহার খবর না দিলেও, তাহার আদর্শ তাৎপর্যের পরিচয় ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। অন্তরাত্মা বা স্বরূপ সত্তা এক বস্তু, এই

কঠিন বাস্তব জীবনে তাহা যেসমস্ত রূপ গ্রহণ করে তাহা আর একটি বস্তু, এই সমস্ত রূপ অনেক সময় অপূর্ণ বা বিকৃত; কিন্তু যদি আমরা পূর্ণভাবে জানিতে চাই তবে এই দুইটির কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না। তাহার পর দ্বিতীয় এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ও পক্ষপাতশূন্য সমালোচকের মধ্যে; ইঁহারা মূলতঃ ও কার্যতঃ উদ্দেশ্য ও পরিণতি এই উভয়ভাবে বুঝিতে, আলো ও আঁধারের যথাযথ সমাবেশ রাখিতে চাহেন, গুণ ও দোষের প্রকৃত খতিয়ান করিতে চেষ্টা করেন, সফলতা ও বিফলতার কথা সত্যভাবে বলিতে চাহেন, যাহা ভাল বুঝেন তাহাকে সহানুভূতি ও প্রশংসা করেন এবং যাহা তাঁহাদের কাছে মন্দ বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইঁহাদের মতের সঙ্গে আমাদের সব সময় মিল না হইতে পারে। তাঁহারা ও আমরা ভিন্ন দিক দিয়া দেখি। তাঁহারা বাহির হইতে দেখেন, বোধিজাত অনুভূতি তাঁহাদের নাই, আমাদের সংস্কৃতির সহিত একীভূত হইয়া দেখেন না বলিয়া অনেক সময় মূল সত্যই দেখিতে পান না, তাঁহারা যাহার প্রশংসা অথবা নিন্দা করেন তাহার পূর্ণ অর্থও এইজন্য তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হয় না; তথাপি ইঁহাদের সমালোচনার দ্বারা আমরা লাভবান হই: ইহা দ্বারা আমরা যাহাকে ভাল বা মন্দ ভাবি হয়ত তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি হয়ত তাহার কতকটা সংশোধন করিতে পারি। অবশেষে তৃতীয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা বিরুদ্ধ সমালোচকের নিকট পাই, ইঁহাদের বিবেচনাধীন আমাদের সংস্কৃতির অপকর্ষতার বিষয়ে ইঁহারা নিঃসন্দেহ; ইঁহারা স্পষ্ট ও সরলভাবে যাহা তাঁহাদের সত্যপ্রতীতি এবং তাহার কারণসমূহ জ্ঞানতঃ অতিরঞ্জন না করিয়াই বলেন। আমাদের পক্ষে ইহারও প্রয়োজন আছে, এই প্রকার প্রতিবাদী সমালোচনা আমাদের আত্মা ও বুদ্ধির মঙ্গল সাধন করে যদি আমরা উহার দ্বারা অভিভূত ও পরাস্ত বা আমাদের জীবন্ত বিশ্বাস ও কর্মের উৎস স্বরূপ মূলকেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট না হই। মনুষ্যজগতে অধিকাংশ বস্তুই অপূর্ণ, আমাদের অপূর্ণতার সম্বন্ধে কঠোর বা তীব্র আলোচনার অনেক সময়ে প্রয়োজন আছে। অথবা আর কিছু না হউক বিরুদ্ধ পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কেন তাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন তাহার মূল কারণ আমরা জানিতে পারি; এইরূপ তুলনা দ্বারা জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি বর্ধিত হয়।

কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনাকেও যথার্থ মূল্যবান পদার্থ হইতে হইলে তাহাকে সমালোচনা হইতে হইবে, মিথ্যাসাক্ষ্য মিথ্যানিন্দা বা তীক্ষ্ম বাক্যবাণ-বর্ষণমাত্র হইলে চলিবে না। বিকৃত না করিয়া তাহাকে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিতে হইবে, বিচারের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ আদর্শ বা মান ও ন্যায়পরতার নিয়ন্ত্রণে, মানসিক সুস্থতার মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ভারত সম্বন্ধে

মিঃ উইলিয়াম আর্চারের এই সুপরিচিত পুস্তক অবশ্য এই জাতীয় নহে; ইহাতে বহু দোষ আছে এবং এই সমস্ত দোষের জন্যই আমাদের সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্য বা ভারতবিরোধী যে দৃষ্টিধারার বিশেষ প্রকাশ আছে তাহারই প্রতীক রূপে আমি এ পুস্তক গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের সংস্কৃতির কঠোর ও অকরুণ নিন্দা আছে, যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা যে শুধু অন্ধকার, তাহাতে যে আলোকের লেশমাত্র নাই কেবল তাহাই নহে; পরন্তু তাহাই ইহার সুপারিশ পত্র, কেননা যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে বা উৎসাহের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রশংসা করেন তাঁহাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি বিরোধী শয়তানের ওকালতী (Devil's advocate)* গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কাজই হইল এ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা যায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা এবং তীব্র ভাষায় তাহা বলা। সর্বক্ষেত্র-ব্যাপিয়া এই-যে আক্রমণ ইহার সম্মুখীন হইতে পারা আমাদেরও সুবিধার বিষয়, কেননা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শত্রুর পূর্ণ মকর্দমাটা কি তাহা ব্যাপকভাবে এখানে এক দৃষ্টিতেই আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তিনটি বিষয়ের দ্বারা তাহা কলুষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার একটি গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, "ভারতবর্ষ পূর্ণরূপে অসভ্য" ইহা প্রমাণ করিবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এ পুস্তক রচনার মূলে রহিয়াছে; ইহা করিতে পারিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভের পথ নষ্ট অথবা তাহার দাবিকে খণ্ডিত বা খর্ব করা যাইবে, এইরূপ বিজাতীয় উদ্দেশ্য তাঁহার সকল যুক্তিকে মূল্যহীন করিয়া দিয়াছে, কারণ লৌকিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি সর্বদা ইচ্ছাপূর্বক সর্ব বিষয় বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃতির তুলনা ও সমালোচনা ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে মানসিক ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কাদি দেখাইতে হইবে—সেখানে এরূপ মনোভাবের স্থান একেবারেই নাই।

প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক সমালোচনা নহে; ইহাকে সাহিত্যের অথবা বরং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাক্যের মুষ্টিযুদ্ধ বলা যায়। তবে সেখানেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার; ইহা ভারতের এক কৃত্রিম মূর্তি খাড়া করিয়া তাহার উপর ভীষণভাবে মুষ্টিচালনা; মিথ্যাবর্ণনা ও অত্যুক্তির সুদীর্ঘ ও উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে যখন খুশি এক জীবন্ত শত্রুকে ভূপাতিত করিতেছেন অভিনেতা তাঁহার অজ্ঞ দর্শকমণ্ডলীকে যেন ইহাই বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন। সুস্থ মন, সুবিচার, পরিমাণজ্ঞান ইহাতে একেবারেই নাই; অপ্রতিহতভাবে এমন ভীষণ আঘাত দেওয়ার ভাব দেখান হইতেছে যে শত্রু যেন আর নিজেকে সামলাইতে

* Devil's advocate-এর অর্থ Chamber's Dictionary-তে দেওয়া আছে :—an advocate at the papal court whose duty is to propose objections against a consideration।—অনুবাদক

পারিতেছে না; এই উদ্দেশ্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই; মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা একটা জাতির জীবনের ঘটনাসমূহকে অমার্জিতভাবে বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে; অতি অদ্ভুতভাবে অনেক দোষের ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহার বাস্তব ভিত্তি কিছুই নাই, অথচ এমনভাবে বলা হইয়াছে যাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই যেন স্বাভাবিক মনে হয়; আপাত জয়লাভের জন্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অসমঞ্জস কথা বলিতেও লেখক পশ্চাৎপদ হন নাই। এ সমস্ত একজন অভিজ্ঞ সমালোচকের মানসিক পিত্তের প্রকোপজনিত অদ্ভুত উক্তি বলিয়া মনে হয় না—ঐরূপ সমালোচক অত্যধিক বুদ্ধিবৃত্তির চালনার ফলে দায়িত্বজ্ঞান হারাইয়া যে বস্তুর উপর তাঁহার সহানুভূতি নাই তাহার চতুর্দিকে উদ্দাম বাক্যবিন্যাস ও রণতাণ্ডবের প্রচেষ্টার দ্বারা আপন পিত্তাধিক্য দূর করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। মাঝে মাঝে এই ভাবের অত্যুক্তি করিতে দেওয়া যাইতে পারে, হয়ত তাহা মনোহর ও সুখদায়কও হইতে পারে। রোমক কবি বলিয়াছেন যে যথাস্থানে ও যথাকালে বিদূষকের ভূমিকাও আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু মিঃ আর্চার সর্বদা সর্বক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জন করিয়া দোষ বর্ণনায় অভ্যস্ত, ইহা কোনক্রমেই পূর্বোক্ত ভাবের সাময়িক অভিনয় মাত্র নয়। তাঁহার দুষ্ট উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাপূর্বক পক্ষপাত অপেক্ষাও অতি গুরুতর একটি তৃতীয় দোষ তাঁহার লেখা হইতে আমরা শীঘ্রই আবিষ্কার করিতে পারি; তাহা এই যে, যে সমস্ত বিষয়ে তিনি নিঃসঙ্কোচে নিন্দাবাদ করিয়া যাইতেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেখানে যাহাকিছু নিন্দাবাদ পাঠ করিয়াছেন তাহা একত্রে সংগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে নিজের ভ্রান্ত ধারণা জুড়িয়া দিয়া যে অদ্ভুত জিনিস সম্পূর্ণ নিজের আবিষ্কৃত সারবান পদার্থ বলিয়া পরিবেশন করিতেছেন তাহা অপুষ্টিকর ও অপকারী অসত্য ভিন্ন অন্য কিছু নয়; তাহা তিনি পরের নিকট হইতে ধার করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু জোর করিয়া সানন্দে দৃঢ়কণ্ঠে বলিবার ভঙ্গীটি মাত্র তাঁহার নিজস্ব। এই পুস্তক পরকে প্রতারণা করিবার সাংবাদিক কৌশল মাত্র, নিরপেক্ষ সমালোচনা নহে।

স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে মিঃ আর্চার তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics) সম্বন্ধে কিছু জানেন না, এমন কি এ শাস্ত্রজ্ঞান লাভের চেষ্টা মানুষের শক্তির অপব্যয় মনে করেন, তথাপি ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি নিজে একজন যুক্তিবাদী, তাঁহার কাছে ধর্ম অযৌক্তিক একটা ভ্রান্তি, একটা মানসিক ব্যাধি, যুক্তির বিরোধী এক পাপ; ইহা সত্ত্বেও তিনি ধর্মসমূহের তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন এবং খৃষ্টধর্মকে সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন, প্রধানতঃ অধিকাংশ খৃষ্টান তাহাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস করে না বলিয়াই বোধ হয় এ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে আর হিন্দু-

ধর্মকে নিকৃষ্টতর স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন—পাঠক হাসিবেন না, তাঁহার পুস্তকে মিঃ আর্চার সত্যই গম্ভীরভাবে এই অদ্ভুত যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার তাঁহার নাই একথা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি ভারতীয় সঙ্গীত অতি নিকৃষ্ট একথা বলিতে তাঁহার বাধে নাই। শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে কোন অভিমত দেওয়ার পক্ষে তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে সামান্যতম তাহা স্পষ্ট হইলেও ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের নিকৃষ্টতা জোর গলায় প্রচার করিতে তাঁহার কুণ্ঠা হয় নাই। নাটক ও সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহার কাছে অনেক বেশী যোগ্যতা আশা করা যায়, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন এবং যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এত স্থূল এবং অগভীর যে তাঁহার যুক্তি বা বিচার আলোচনা করিতে গেলে কিরূপে তিনি নাটক ও সাহিত্য সমালোচক বলিয়া পাশ্চাত্যে পরিচিত হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়; হয় তাঁহার ইউরোপীয় সাহিত্যালোচনার পদ্ধতি অন্যপ্রকার, না হয় বলিতে হয় ইংলণ্ডে এই জাতীয় যশোলাভ অতি সহজপ্রাপ্য। সঠিক সংবাদ সংগ্রহ না করিয়া কোন ঘটনাকে মিথ্যাভাবে দেখাইবার শক্তি এবং যাহা তিনি পড়েন নাই তাহার সম্বন্ধে অবিচারে যাহা খুশি মত দেওয়ার দুঃসাহস—এই দুইটি তাঁহার ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার পক্ষে সম্বল; ইহারই বলে এই সংস্কৃতিকে অতি জোর গলায় পর্বতপ্রমাণ বর্বরতা বলিয়া বিদায় দিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন।

সুতরাং ভালভাবে অভিজ্ঞ একজন বাহিরের লোকের ভারতীয় সংস্কৃতি বা সাধনা সম্বন্ধে কি ধারণা তাহার জন্য অথবা এমন কি যাহাতে সত্য উপদেশ পাইব তেমন কোন বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য আমি মিঃ আর্চারের নিকট উপস্থিত হই নাই। যাহার নিজের প্রকৃত সংস্কৃতি ও সাধনা আছে মাত্র সেই ব্যক্তিই অবশেষে সংস্কৃতির মূলতত্ত্বে পৌঁছিতে বা কোন সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে পারে। বিদেশী সমালোচকের নিকট সংস্কৃতির তুলনা-মূলক সমালোচনায় সাহায্য পাইবার জন্য মাত্র যাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপরিহার্যও বটে। কিন্তু কোন কারণে যদি আমাদিগকে এই বিষয়ের নির্দিষ্ট ধারণার জন্য বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যাঁহাদের কিছু বলিবার অধিকার আছে স্পষ্টত তাঁহাদের নিকটই যাইতে হইবে। মিঃ আর্চার, ডক্টর গাফ্ অথবা সার জন উড্রফ্ যে ইংরাজ অধ্যাপকের কথা বলিয়াছেন অথচ নামোল্লেখ করেন নাই, তাঁহারা ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কি বলিলেন না বলিলেন তাহাতে কিছু আসে যায় না; ইমার্সন, সোপেনহায়ার অথবা নীট্শের মত তিনজন প্রধান মনীষী যাঁহারা এই ক্ষেত্রে অতি শক্তিশালী অথচ বিভিন্নভাবে মননশীল, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই জানা আমার

পক্ষে যথেষ্ট, অথবা কাজিন (Cousin) এবং শিলগেল-এর (Schlegel) মত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাহা বলেন তাহার মূল্য আছে, ভারতের ভাবপ্রবাহ পূর্ব-বর্তী যুগে কিরূপে ইউরোপের চিন্তাজগতকে ক্রমশ অধিকতর রূপে প্রভাবিত করিয়াছে এবং তথায় সমান্তরালভাবে অনুরূপ কি চিন্তাধারা চলিয়াছে তাহার আলোচনার প্রয়োজন আছে; আধুনিক কালে যে সমস্ত অনুসন্ধান ও আবিষ্কার হইতেছে তাহা দ্বারা আমাদের প্রাচীন ভারতের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সত্য কিরূপভাবে সমর্থিত হইয়াছে তাহা জানা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের ধর্মকথা শুনিবার জন্য অথবা আমাদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কোন অভিমত জানিবার জন্য মিঃ হ্যারল্ড বেগ্‌বি অথবা কোন ইউরোপীয় নাস্তিক বা যুক্তিবাদীর কাছে যাইব না। কিন্তু যাঁহাদের মন উন্মুক্ত—যাঁহারা নবভাব গ্রহণে সমর্থ, ধর্ম-ভাবাপন্ন ও ধর্মজীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের হইয়াছে আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা কি তাহা জানিতে চাহিব, এইরূপ অধ্যাত্ম-জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ বিষয়ে বিচার করিতে পারেন; উদাহরণ-স্বরূপ টলস্টয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথবা প্রকৃত সাধনসম্পন্ন কোন খৃষ্টান ধর্মযাজকের ধর্মসম্বন্ধীয় কথা তাঁহার অবশ্যম্ভাবী পক্ষপাত সত্ত্বেও শুনিতে চাহিতে পারি; এরূপ লোক ধর্মকে অসভ্যজনোচিত কুসংস্কার বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন না। ভারতীয় কলাশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ ইউরোপীয় কোন লোকের অভিমত জানিতে চাহিব না কারণ তাহারা ভারতীয় চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্য অথবা স্থাপত্যের গঠনরীতি (technique), তাহার অর্থ বা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। সৌধশিল্প সম্বন্ধে ফার্গুসনের মত সর্বজনস্বীকৃত বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিব; অন্যান্য বিষয়ে হ্যাভেলের মত সমালোচক ভারতের দিকে অতিরিক্তভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া যদি পরিত্যজ্য হন, তবে অন্ততপক্ষে ওকাকুরা বা লরেন্স বিনিয়নের নিকট কিছু শিক্ষা করিতে পারি। সাহিত্য বিষয়ে কাহারও নাম করা শক্ত, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য অথবা প্রাকৃত ভাষাসমূহের মূলগ্রন্থ পড়িয়াছেন এমন কোন বড় প্রতিভাশালী লেখক বা উচ্চপ্রশংসিত সমালোচকের কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না; অনুবাদ হইতে শুধু ভাবের বিচার করা চলে কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদে যে ভাব আছে তাহা মৃত, তাহাতে প্রাণের স্পন্দন একেবারেই নাই। তথাপি এখানে গেটের শকুন্তলা সম্বন্ধে সুবিদিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দ্বারা ইহাই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সমস্ত লেখা ইউরোপের সহিত তুলনায় অসভ্যজনোচিত ও নিকৃষ্ট নহে। সাহিত্যরসবোধ ও বিচারশক্তি সর্বদা একত্র পাওয়া না গেলেও হয়ত দু-একজন পণ্ডিত মিলিতে পারেন যাঁহাদের মধ্যে এই উভয় গুণই কতকটা বিদ্যমান আছে, ইঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সহায় হইতে পারেন। এইরূপ ভাবে খোঁজ করিয়া যাঁহাদের সন্ধান পাইব তাঁহাদের

কাছেও আমাদের সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য মতামত পাইব না কিন্তু নিম্নভূমিবাসী গাফ্, আর্চার বা বেগ্‌বি জাতীয় সমালোচকের হাত হইতে অধিকতর নিরাপদ ক্ষেত্রে পৌঁছিব।

ইহা সত্ত্বেও যে পাণ্ডিত্যাভিমানপূর্ণ এই সমস্ত রচনা আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি তাহার সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যের পক্ষেও মিঃ আর্চার যাহা লিখিয়াছেন তাহার সকল কথা কাজে লাগিবে না; তাঁহার অনেক লেখা এত অযৌক্তিক এত অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এত ন্যায়ান্যায় বিচার-পরিশূন্য ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ যে তাহা দেখিয়া শুধু উপেক্ষা করিয়া যাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি তিনি তাঁহার পাঠককে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতীয় দার্শনিকেরা শুধু বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের নাভিদেশের চিন্তা করিলে বিশ্বসত্যরাজির জ্ঞানলাভ হইবে ইহা বিবেচনা করেন কিন্তু ইঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অলস ও অচলভাবে বসিয়া বিশ্বাসী লোকের প্রদত্ত ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা মাত্র, তন্ময়চিত্তে ধ্যানে বসিবার একপ্রকার অঙ্গবিন্যাসকে অজ্ঞ ইংরাজের চক্ষুতে পশুসুলভ মূর্খতা ও স্বার্থ-পূর্ণ অলসতার মূর্তিরূপে উপস্থিত করিয়া তিনি ধ্যানকার্যটিকেই দোষারোপ করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায়ান্যায় জ্ঞানশূন্যতার পরিচায়ক এই উদাহরণ তাঁহার যুক্তিবাদী মনের জটিল গ্রন্থি প্রকাশ ছাড়া আমাদের অন্য কোন কাজে লাগে না। হিন্দুর জীবনে প্রকৃত নৈতিক ভিত্তি কিছু নাই ইহা যখন তিনি বলেন, যখন বলেন যে হিন্দুধর্ম নৈতিক শিক্ষা একটা কর্তব্য মনে করে না—অথচ সত্য ইহার ঠিক বিপরীত—অথবা যখন তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে জগতে যাহা কিছু নীচ ও অস্বাস্থ্যকর তাহার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটা প্রবণতা হিন্দু চরিত্রে রহিয়াছে, তখন এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে সত্যভাষণ অথবা সত্যভাষণের অভ্যাস গড়িয়া তোলা মিঃ আর্চারের নৈতিক চরিত্রের একটা অঙ্গ নয়, অন্ততপক্ষে যুক্তিবাদীর পক্ষে ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার সময়ে ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু না, সর্বশেষে এক স্থানে মিঃ আর্চার সত্যের বেদীতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে একবার প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বসিয়াছেন; কারণ প্রায় এক সঙ্গেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুরা ন্যায়নিষ্ঠতা বা সাধুতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলে এবং হিন্দুর লেখার মধ্যে অনেক প্রশংসার্হ নৈতিক মতবাদ আছে। কিন্তু তাঁহার মতে তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে হিন্দুদর্শন অযৌক্তিক, ইহাতে নীতিকথা আছে বটে কিন্তু থাকা উচিত হয় নাই, ইহা থাকাতে মিঃ আর্চার হিন্দুকে যে মসীবর্ণে চিত্রিত করিতে চান তাহার যে বাধা হয়! যুক্তিবাদের এই সমর্থক এবং প্রচারকের যৌক্তিকতা ও যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে! ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে

যাহাকে হিন্দুরা ধর্মশাস্ত্রের আসন দান করে সেই রামায়ণকেও তিনি নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দার কারণ শুনিবেন কি? রামায়ণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর উচ্চতম আদর্শস্বরূপ রাম ও সীতার চরিত্র তাঁহার রুচির পক্ষে এত সুন্দর ও এত উচ্চ হওয়া ঠিক হয় নাই। রামের চরিত্র এত পবিত্র ও মহান যে মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। খৃষ্ট অথবা সেন্ট ফ্রান্সিসের চরিত্র অপেক্ষা রামের নৈতিক চরিত্রে সততার মাত্রা বেশী আছে তাহা তো মনে হয় না, তথাপি আমি তো সর্বদাই ভাবিয়া আসিয়াছি যে তাঁহাদের চরিত্র মনুষ্যপ্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু হয়তো এই সমালোচক মহাশয় উত্তর দিবেন যে তাঁহারা মানবপ্রকৃতির সীমার বাহিরে অবস্থিত না হইলেও তাঁহাদের অত্যধিক ধর্মপরায়ণতা অন্তত-পক্ষে হিন্দুদের দৈনন্দিন আচরণপদ্ধতির মত—উদাহরণস্বরূপ বলিব কি যে হিন্দুরা যেমন দৈহিক পবিত্রতা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য আত্যন্তিক চেষ্টা করে অথবা প্রতিদিন যেমন করিয়া ধ্যান ও পূজার মধ্য দিয়া ভগবদভিমুখী হইতে চায়—এরূপ বস্তু "যাহার জন্য তাহাদের স্থান সভ্য জগতের বাহিরেই হওয়া উচিত ছিল"। কারণ তিনি বলিয়াছেন, দাম্পত্য পবিত্রতা ও সতীত্বের আদর্শস্বরূপ সীতার অত্যধিক ধর্মপরায়ণতা "তাহাকে পাপের উপকণ্ঠে লইয়া গিয়াছে"। বাস্তবিক পক্ষে অর্থশূন্য চটুল অতিরঞ্জন যখন এইভাবে মূর্খতার সন্নিকটে পোঁছিতে পারে তখন বুঝিতে হইবে যে তাহা তাহার উচ্চতম মাত্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আমি 'মূর্খতা' কথাটি ব্যবহার করিতে দুঃখবোধ করিতেছি কিন্তু মিঃ আর্চার 'বর্বরতা' এই বাক্যটি ভারতবাসী সম্বন্ধে এত অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন যে ইহা ব্যবহার না করিয়া পারা যায় না; তাঁহার ভাষায়ই বলি "এই শব্দটি ব্যাপারটির মূল স্বরূপ ব্যক্ত করে"। সমস্তই যদি এইরূপ হইত—দুঃখের বিষয় এই ভাবের উক্তি তিনি বহু স্থানে করিয়াছেন—তাহা হইলে ঘৃণাপূর্ণ নীরবতা তাহার একমাত্র সম্ভবপর উত্তর হইত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আমাদের এই তীরন্দাজ তাঁহার ধনুকের জ্যা প্রতিবারেই এতটা টানেন নাই যাহাতে ধনুকটাই ভাঙিগয়া যায়; তাঁহার সকল অস্ত্র এরূপ ভাবে অনভিজ্ঞের মত নিক্ষিপ্ত হয় নাই। তাঁহার লিখিত বিষয়ের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা শিষ্টভাবে প্রযুক্ত না হইলেও প্রথম দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সভ্যতার অদ্বিতীয় প্রকৃতির বিষয়ে পাশ্চাত্য জনসাধারণ যেভাবের বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা তাহা হইতে যেভাবে প্রতিক্ষিপ্ত হয় তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই ব্যক্ত হইয়াছে; ইহা এমন একটা বিষয় যাহা আমাদের জানা বুঝা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাহার মূল্য নিরূপণ করা কর্তব্য।

এই কার্যটিই আমি করিতে চাই, কারণ ইহার সার্থকতা আছে এমন কি তদপেক্ষা বেশী কিছু আছে। আমাদের এই মানবগোষ্ঠির বড় বড় জাতিসমূহ কি কি মানসিক বিভেদের মূল ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা জন-

সাধারণের মানসিক ধারণা হইতেই আমরা ভালভাবে বুঝিতে পারি। উচ্চ সংস্কৃতি ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এক জাতির সম্বন্ধে অন্য জাতির যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বা কুসংস্কার আছে তাহা হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে পারেন অথবা বিভেদ বা বিরোধ সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে বা যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারেন। মাঝারি মানুষ এই বিভিন্নতার স্থূল প্রকাশক্ষেত্র এবং ইহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে ভেদের পূর্ণশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে মিঃ আর্চার আমাদিগকে সুন্দরভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা যাহা চাই তাহা তাঁহার লেখা হইতে বাহির করিতে অনেক আবর্জনা যে সরাইতে হইবে না তাহা নহে। ভুল বুঝিবার যে সমস্ত জিনিস আছে তাহা যদি এইরূপ সব দিক দিয়া কিন্তু অধিকতর সরলভাবে উল্লিখিত হইত, ইহা অপেক্ষা কম বিদ্বেষপূর্ণভাবে যদি ব্যক্ত হইত, ইহাতে চটুলতার সহিত অবিচারের ঝাঁজ এত যদি না থাকিত, তবে তাহা অধিকতর আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেরূপ ভাবের কিছু পাইতেছি না। সুতরাং তাহাদের অন্তর্নিহিত মানসিক ভাবসমূহ কিরূপ তাহা বুঝিবার জন্য মিঃ আর্চারের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করা যাক। তাঁহার এই সমস্ত অপ্রীতিকর আলোচনা ও অপরিপক্ক ধারণার মধ্য দিয়া হয়তো আমরা এক মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের চিরাগত অনৈক্যের বা ভুল বুঝিবার যে কারণ রহিয়াছে তাহা উদ্ধার করিতে পারিব। প্রকৃত ভাবে ইহা করিতে পারিলে পরস্পরের একপ্রকার মিলন ও সামঞ্জস্যের পথে তাহা আমাদিগকে হয়তো সাহায্য করিতেও পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদের মূল্যাবধারণ করিবার জন্য যাঁহার লেখা হইতে আমরা উপাদান সংগ্রহ করিতে চাহিতেছি তিনি নিজে কি জাতীয় সমালোচক ঠিকভাবে তাহার ধারণা লইয়া কার্যারম্ভ করিতে পারিলে ভাল হয়। যিনি আমাদের আলোচনার সম্মুখে রহিয়াছেন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব পাশ্চাত্য জগতের খাঁটি মাঝামাঝি ধরনের লোকেরই মত; তিনি বেশ শিক্ষিত, যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়াছেন কিন্তু অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন বা প্রতিভাশালী ব্যক্তি নহেন, বরং তাঁহাকে সাধারণ বুদ্ধিমান একজন কৃতীপুরুষ বলা যাইতে পারে; তাঁহার মনে কোন নমনীয়তা বা উদার সহানুভূতি নাই; বহুমুখী সংবাদসংগ্রহ আছে কিন্তু ঐ সংবাদ সব সময় সত্য নহে, তাঁহার নিজের যে সমস্ত স্থির সিদ্ধান্ত করা আছে তাহা ঐ সমস্ত সংবাদের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জোরের সহিত উপস্থিত করিবার শক্তি ও অভ্যাস আছে। বস্তুত সংবাদপত্র পরিচালনায় অভ্যস্ত একজন মাঝারি গোছের ইংরেজের মধ্যে এইরূপ মন ও দৃষ্টিভঙ্গীই দেখা যায়। আমরা দেখিতে পাই ঠিক অনুরূপ প্রকৃতির এক বিরোধী মতের জন্য মিঃ রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং (Rudyard Kipling)—যিনি নিজেও একজন উচ্চতম শ্রেণীর সাংবাদিক ছিলেন, তবে একেবারে সাধারণ মানুষ নন, একজন শক্তিশালী মাঝারি লোক ছিলেন, তাঁহার একপ্রকার অসভ্যজনোচিত অসংস্কৃত বন্য প্রতিভার দীপ্তি ছিল বলিয়া বরং তাঁহাকে মাঝারি লোকের বর্ধিত সংস্করণ বলিতে পারি কিন্তু তাহাতে তিনি সাধারণ লোকের উপরে উঠিয়া যাইতে পারেন নাই—বলিয়াছিলেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকাল বিসদৃশ থাকিবে কখনও তাহাদের সামঞ্জস্য ও মিলন হইতে পারে না; আর এই বিরোধের প্রকৃতি ধরিবার জন্য ঠিক এই ভাবের একজনই আমাদের প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানসপ্রকৃতির মধ্যে এমন কি আছে যাহা এরূপ মননের কাছে অদ্ভুত ও ঘৃণ্য মনে হয় তাহা দেখা যাউক; ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ বর্জন করিয়া এই বিষয় যদি পক্ষপাতশূন্য ভাবে দেখিতে পারি তবে তাহা আমাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানালোক-প্রদায়ক হইবে।

রাজনৈতিক বিষয়ে এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিবাদী সমালোচককে—বিশেষ করিয়া যাহার মন শুধু আধুনিক ভাবধারার দ্বারা সমাচ্ছন্ন কিন্তু সে ভাবধারাও এখনই কতকটা অতীতের বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে—ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য মনের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে হয়ত কিছু আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। মহাদেশগুলির মধ্যে পরস্পরকে ভুল বুঝিবার হেতু বহুকালজাত ঐতিহাসিক পার্থক্যের ফল; এই পুস্তকে সেই পার্থক্যের যে একটিমাত্র দিক প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অতি আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিক কালে, যুক্তিবাদের আলোক-প্রদীপ্ত এই বৈজ্ঞানিক যুগে এই ভেদ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে; মতবৈষম্যের জন্য একে অপরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; সংস্কৃতিগত ভেদ কিছুতেই দূর হইতে পারে না এই জ্ঞান স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিঃস্বার্থবুদ্ধিজাত ঔৎসুক্যসম্পন্ন এবং উদার সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট বহুধা মননশীল একজন প্রাচীন গ্রীসবাসী, তাহার মতে নিজেকে জাতিগত ও সংস্কৃতিগতভাবে বর্বরজাতি হইতে উন্নততর মনে করিলেও, ভারতীয় মনের সঙ্গে যতটা অধিকতর নৈকট্য অনুভব করিতে পারিত, আধুনিক কালের খাঁটি ইউরোপীয় মন ততটা পারে না। পাইথাগোরাস (Pythagoras) অথবা প্লেটোর অনুগামী (Neo Platonist) নব্য দার্শনিকগণের কেহ অথবা আলেকজান্ডার (Alexander) বা মিনেন্ডার (Menander) অধিকতর সহানুভূতির সহিত এসিয়ার সংস্কৃতির মূল ধারা বুঝিতে পারিতেন ত বটেই, মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) মত সাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোকও ভিতরের তত্ত্ব পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও বর্তমান যুগের যুক্তিবাদিগণের তুলনায় অনেক পরিমাণে বুঝিতে ও দেখিতে পারিতেন ইহাই মনে হয়। পরধর্মবিদ্বেষী খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত মধ্যযুগের ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের মতে বিধর্মী ও পৌত্তলিকগণের সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করিতেন, তৎসত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের যত বিভিন্ন রকমের স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ও বোধশক্তির মিল ছিল বর্তমান সাধারণ ইউরোপীয়ের পক্ষে ততটা থাকা সম্ভব নয়; অবশ্য ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা এক নূতন ভাবধারাতে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে উভয় দেশের বিভিন্নতার যে সমুদ্রব্যবধান তাহা সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে, ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। যে যুক্তিবাদ পাশ্চাত্য মনের উপর প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে এমন কি যাহা ধর্মবিষয়ক ভাব ও ধারণাকে পর্যন্ত যুক্তির গন্ডিতে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে সেই যুক্তিবাদই এই দুর্লঙ্ঘ্য বৃহৎ ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের সমালোচক এই ব্যাপক বিরোধিতার এক শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি; তিনি সেই দলের লোক যাঁহারা গভীরভাবে কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া স্বাধীন চিন্তাশীল নামে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব নিজে গভীর ও মৌলিকভাবে

অনুধাবন করিতে পারেন নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই; কাজেই তাঁহার আপন সংস্কৃতিগত পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর মধ্য হইতে এবং এই যুগের মানসিক আবহাওয়া হইতে এ সমস্ত বিষয়ের ধারণা তাঁহাকে পাইতে হইয়াছে। যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে মতের বিরোধ আছে সে সমস্তকে তিনি স্বভাবত অত্যন্ত বাড়াইয়া দেখাইবেন, কিন্তু তাহার ফলে বিরোধগুলি আরও সুস্পষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের অথবা সম্যক্ অনুশীলনের যে অভাব আছে তাহা তাঁহার সহজাত বোধের স্পষ্ট ও সুতীব্র আক্রমণের দ্বারা পূরণ করিবেন।

এই দৃঢ় সহজাত বোধই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মকে তাঁহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। একটা জাতির সংস্কৃতিকে মোটামুটি-ভাবে তাহার প্রাণচেতনার অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। তিন ভাবে ইহার প্রকাশ—চিন্তা বা ভাবধারা, আদর্শ, ঊর্ধ্বাভিমুখী সংকল্প ও আত্মার আস্পৃহা ইহার একটা দিক; সৃজনী আত্মপ্রকাশ, গুণগ্রাহী রসবোধ, বুদ্ধি ও কল্পনা ইহার অন্য একটা দিক; আর তৃতীয় দিক হইতেছে তাহার বাস্তব ও বাহ্য রূপায়ণ। কোন জাতির দর্শন ও উচ্চচিন্তার মধ্যে আমরা পাই তাহার প্রাণ-চেতনা ও সক্রিয় জীবনাদর্শের মনোগঠিত বিশুদ্ধতম বৃহত্তম ও ব্যাপকতম রূপায়ণ; তাহার ধর্ম রূপায়িত করিয়া তোলে তাহার ঊর্ধ্বাভিমুখী ইচ্ছা-শক্তির তীব্রতম রূপ এবং তাহার উচ্চতম আদর্শ ও আবেগের সার্থকতা সাধনার দিকে আত্মার আস্পৃহা। তাহার শিল্প, কবিতা ও সাহিত্য আমাদের দেয় তাহার বোধি, কল্পনা, প্রাণের গতি ও সৃজনীবুদ্ধির সৃষ্টিশীল প্রকাশ ও প্রতীতি। তাহার সমাজ ও রাজনীতির কার্য হইল পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে তাহার অনুপ্রেরণাদায়ী আদর্শ, বিশিষ্ট প্রকৃতি ও ধর্মের যতটা রূপ স্থূলতর বাহ্য জীবনে প্রকাশ করা যায় তাহার ছাঁচ ও কাঠামো গড়িয়া তোলা; জীবনের স্থূল উপাদানসমূহের কতটা গৃহীত হইয়াছে, তাহা কিভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে এবং নিয়ন্ত্রণকারী চেতনা ও গভীরে স্থিত আত্মার কিছু প্রতি-ফলনের জন্য এই সমস্ত উপাদানের কতটার কোন্ রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা আমরা এখানে দেখিতে পাই। ইহাদের কোনটাই অন্তর্নিহিত গোপন আত্মার পূর্ণ রহস্য প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তথা হইতেই ইহারা প্রধান ভাবধারা ও সংস্কৃতিগত প্রকৃতি পাইয়া থাকে; ইহাদিগকে যথাক্রমে জাতীয় জীবনের আত্মা মন ও দেহ বলা যাইতে পারে। ভারতীয় সভ্যতাকে প্রধানত দর্শন এবং ধর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; দর্শন ধর্ম দ্বারা সক্রিয় ও শক্তিমান এবং ধর্ম দর্শন দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াছে; অন্য সমস্ত বিষয় যতদূর সম্ভব ধর্ম ও দর্শনকে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। বস্তুত এইখানেই অন্য সমস্ত সভ্যতা হইতে ইহার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য; এশিয়াবাসীগণের মধ্যে যাহারা অধিকতর উন্নত

তাহাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু ভারতেই অনন্যসাধারণ মাত্রায় সর্বক্ষেত্রে ইহা পূর্ণরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। যখন ইহাকে আমরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বলি তখন ইহাই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ এই নয় যে পৌরোহিত্য এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে: সংস্কৃতির কোন কোন নিম্নতর ধারায় আচারনিষ্ঠা বেশ প্রভাবশালী হইলেও সংস্কৃতির বৃহৎ ধারাসকল গঠন এবং পরিচালনায় পুরোহিতের নিজের কোন হাত ছিল না। কিন্তু ইহাই সত্য যে ইহার প্রধান গতি ও প্রেরণা দার্শনিকের চিন্তা এবং ধার্মিকের ভাবধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে--এই দার্শনিক ও ধার্মিক ব্যক্তি-বর্গের সকলে যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে। অবশ্য একটা শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল যাঁহাদের কর্তব্য ছিল আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, জ্ঞান এবং হিন্দুজাতির পবিত্র নিয়মাবলী রক্ষা করা, কেননা ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইতেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রকৃত কাজ, কেবল পৌরোহিত্য নয়। এই শ্রেণী বহু সহস্র বৎসর পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় মন ও আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সামাজিক তত্ত্ব, রূপ এবং আচরণ যে তাহারা নিয়ন্ত্রিত করিত তাহা এ জাতির একটা বিশেষত্ব দ্যোতক; এই কার্যও ব্রাহ্মণের যে একচেটিয়া ছিল তাহা নহে। ভিতরের সত্য এই যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রথম হইতেই আধ্যাত্মিকতা এবং অন্তরমুখী ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল এবং আজিও তাহাই আছে। অন্য সমস্ত বিষয় মৌলিক এবং কেন্দ্রগত এই বৈশিষ্ট্য হইতে জাত হইয়াছে অথবা কোন না কোন ভাবে ইহার উপর নির্ভরশীল কিম্বা ইহার অনুগত রহিয়াছে: এমন কি বাহ্যজীবনও আত্মার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

আমাদের সমালোচক এই কেন্দ্রগত বিষয়ের প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার তূণের সুতীক্ষ্ম বহু বাণ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন; অন্য সব বিষয়ে তিনি কতকটা উপেক্ষা করিতে ও কতকটা শৈথিল্য দেখাইতে পারেন কিন্তু এখানে তিনি কোনমতেই সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিতে রাজি নহেন। এখানকার সমস্তই অপকৃষ্ট ও ক্ষতিকর, অথবা যদি কোন ক্ষেত্রে অপকারক নাও হয় তবু যে মূলগত ধারণা ও উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রকৃত মঙ্গল সাধনে একেবারে অসমর্থ। এই মনোভাব বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক। তাহা ব্যতীত কলহ করিবার মতলব তো আছেই। ভারতীয় মনন ও সংস্কৃতি গভীরভাবে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ, তাহার চিন্তা ও ধর্মজ্ঞানের সমস্ত উচ্চ শিখরগুলি আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, তাহার শিল্প ও সাহিত্য, ধর্মাচরণ এবং সামাজিক বিধি ও তৎসম্বন্ধীয় ধারণা আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুসৃত, এমন কি সাধারণ লোকের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রভাবিত—ইহাই ভারতের দাবী। ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়—সহানুভূতিশীল ও পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধিৎসু মাত্রই ভারতীয় জীবনাদর্শ গ্রহণ না করিলেও এ দাবী স্বীকার করেন—ভারতীয় সংস্কৃতিও স্বীকৃত হয় এবং সে সংস্কৃতির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, এ সংস্কৃতি যুক্তিবাদী আধুনিকতাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া বলিতে পারে "আমাকে ধ্বংস করিবার, আমার স্থলে অন্য কোন সভ্যতাকে বসাইবার অথবা তোমার মত আধুনিক ঢঙে আমাকে সজ্জিত হইতে আহ্বান করিবার পূর্বে আমার মত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নিজে উন্নীত হও। যদিও ইদানীন্তন কালে আমি আমার নিজের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে অনেক নামিয়া পড়িয়াছি অথবা যদিই-বা আমার বর্তমান আচরণ ও বিধান দ্বারা মানব মনের সকল ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ না হইতেছি কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। পুনরায় আমি সেই উচ্চ স্তরে উঠিতে পারি, সে শক্তি আমাতে আছে। কেবল তাই নয় আমি হয়ত এমন এক আধ্যাত্মিক আধুনিকতা গঠন করিতে পারি যাহার সাহায্যে তুমিও নিজেকে অতিক্রম করিয়া, যাহা তুমি অতীতে পার নাই এবং বর্তমানে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার না তেমন এক উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ এবং এক বৃহত্তর সামঞ্জস্যে উন্নীত হইবে।" এ দাবীকে মূলেই নষ্ট করিতে হইবে, বিরোধী সমালোচকের সে জ্ঞান আছে। তাই তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে ভারতীয় দর্শনে আধ্যাত্মিকতা নাই, ভারতীয় ধর্ম জড়কে বা প্রাকৃতিক ঘটনাকে আত্মা বলিয়া দেখে, ইহা অযৌক্তিক এবং বিকৃত ও বিকট এক পদার্থ। ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দেখাইতে গিয়া তিনি সত্যকে যেন পায়ের উপর না করিয়া মাথার উপর দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন এবং এই অসম্ভব ব্যাপার করিতে গিয়া তিনি এমন আত্মবিরোধী অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাকে এতদূর অতিশয়োক্তি করিতে হইয়াছে যে তাহাতে তিনি যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহাই অপ্রমাণিত হইতে বসিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এই জগাখিচুড়ী হইতে দুইটি প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় পাওয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ও দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনাদর্শ এবং এই সমস্ত হইতে জাত ভাবধারা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত সংস্কৃতি অথবা যুক্তিবাদী বহির্মুখী বুদ্ধি ও ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট প্রবৃত্তি-মূলক বাহ্য জীবনের পরিতৃপ্তি এই দুই ভাবের কোন্ ভাব মানব জাতিকে প্রকৃত প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে অধিকতরভাবে সমর্থ হইবে ইহাই প্রথম প্রশ্ন। আর জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবধারার মূল্য ও শক্তি স্বীকৃত হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার যে ধারণা ও বিকাশ সাধন করিয়াছে তাহা শ্রেষ্ঠ কিনা এবং মানবজাতির উন্নতির পক্ষে

সর্বাপেক্ষা সহায় হইতে পারে কিনা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, প্রাচীনের ও নবীনের মনোভাবের তুলনা ও বিচারের পক্ষে ইহাই প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রকৃত পাশ্চাত্য মন প্রায় পূর্ণভাবে দ্বিতীয় আদর্শের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর এই মনোভাব দ্বারা ইহারা প্রধানত এখনও প্রভাবান্বিত, প্রাণের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদীর ছাঁচে ইহারা পুষ্ট ও বর্ধিত। জীবনের প্রতি ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কখনই দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, সম্মিলিত গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতি অতি অল্পদিনের জন্য দার্শনিক ভাবের প্রভাব পাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাও উচ্চ কৃষ্টিসম্পন্ন এক শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; বস্তুত ব্যবহারিক জ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনের দ্বারা ইহারা চিরদিন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যে সমস্ত যুগে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের ভাবধারা প্রাচ্যদেশ হইতে আসিয়া আক্রমণ এবং ইহাদের প্রাণ ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ইহারা সে সব যুগ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, সে যুগের প্রভাবকে ইহারা প্রধানত বর্জন করিয়াছে অথবা তাহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের বর্তমান ধর্ম প্রাণিক, পার্থিব এবং জাগতিক মানবসমাজের ধর্ম—আদর্শ মন ও বুদ্ধির পরিপুষ্টি, প্রাণের দক্ষতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও ভোগ এবং যুক্তি পরিচালিত সমাজ-ব্যবস্থা। এইরূপ মন ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ যে বিপ্রকৃষ্ট ও প্রত্যাহত হয় তাহার প্রথম কারণ এইরূপ সংস্কৃতির সহিত তাহার পরিচয়ের একান্ত অভাব, তারপর তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের সঙ্গে তাহার প্রভেদ এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পায় এবং অবশেষে তাহার পক্ষে অবোধ্য রূপ ও বিধিনিষেধের এত ছড়াছড়ি লক্ষ্য করে যে এ সমস্ত তাহার কাছে কেবলই অযৌক্তিক মনে হয়। তাহার দৃষ্টিতে এই সবের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্যই তাহাতে ভ্রান্তি বা মিথ্যারও তেমনই প্রাচুর্য রহিয়াছে ইহাই সে মনে করে, এমন কি সব জিনিষ তাহার বোধ হয় যেন স্বাভাবিক ধারা, যথাযথ পদ্ধতি এবং অভ্রান্ত উপায় হইতে দূরে সরিয়া গিয়া এমন এক কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে মিঃ চেষ্টারটনের ভাষায় বলা যায় "সব জিনিষই বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে"। প্রাচীন গোঁড়া খৃষ্টানের চক্ষুতে এ সংস্কৃতি নারকীয় ও সয়তানের অনৈসর্গিক সৃষ্টি মনে হয়; আধুনিক গোঁড়া যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা শুধু যে যুক্তিশূন্য তাহা নহে ইহা যুক্তিবিরোধী বিকৃতদর্শন এবং বিকলাঙ্গ বলিয়া অনুভূত হয়; এ সংস্কৃতির যুগ অতীত হইয়া গেলেও ইহার গুরুভার জাতীয় জীবনের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে; বড়জোর ইহা প্রাচ্যের অতীত যুগের একটি রঙ্গীন কল্পনা। ইহা অবশ্য মিঃ আর্চারের মত চরমপন্থী একদল লোকের মনোভাব, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে না বোঝা এবং রুচিবিরুদ্ধ

মনে করা পাশ্চাত্যমনের পক্ষে সাধারণ নিয়ম। ইহাদের মধ্যে যাহারা ভারতকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখিতে ও বুঝিতে চায় তাহাদের ভিতরেও এই মনোভাবের চিহ্ন সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধারণ লোকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাহাদের প্রথম দৃষ্টিজাত যে ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাতে তাহারা দেখে ইহা কেবল বিরাগজনক বা প্রতিহতকারী একটা বিপুল বিশৃঙ্খলা; সে মনে করে ভারতীয় দর্শন অবোধ্য, সূক্ষ্ম, অসার মেঘাড়ম্বর মাত্র। ভারতীয় ধর্ম নিস্ফল কঠোর তপশ্চর্যা এবং তদপেক্ষা নিষ্ফল স্থূল নীতিবোধশূন্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহুদেব-বাদের এক মিশ্রণ। সে দেখে ভারতীয় শিল্প স্থূলভাবে বিকৃত অথবা প্রাণহীন ও গতানুগতিক রূপরাজির এক বিশৃঙ্খল সমাবেশ আর অনন্তের আভাস ফুটাইবার জন্য এক অসম্ভব ও ব্যর্থ প্রয়াস। অপরপক্ষে প্রকৃত শিল্পকলা হইতেছে প্রকৃতি ও সসীম বস্তু-রাজির সুনিপুণ ও যুক্তিসঙ্গত প্রতিফলন অথবা তাহাদের নিখুঁত কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি। সে ভারতীয় সমাজকে সেকেলে অর্ধসভ্য পুরাতন মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দোষারোপ করে। এই মত বর্তমানে কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে এবং পূর্বের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ না করিলেও এ মনোভাব এখনও বর্তমান আছে এবং মিঃ আর্চারের তীব্র ভর্ৎসনার ইহাই একমাত্র ভিত্তি।

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। সাংবাদিকের বাক্যালঙ্কার বাদ দিলে দেখা যাইবে, যে সভ্যতা যুক্তিবাদের অতীত আধ্যাত্মিকতার নিকট যুক্তিকে নিম্নস্থান দান করিয়াছে, যাহা জীবন ও কর্ম হইতে বৃহত্তর ও মহত্তর অনুভূতির দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে সেই সভ্যতার প্রতি যুক্তিবাদ পরিচালিত প্রাণসত্তায় অধিষ্ঠিত ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বাভাবিক বিদ্বেষবশেই এ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। দর্শন এবং ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা, এ দুইটি পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, একে অপর হইতে পৃথক করা যায় না। ভারতীয় দর্শনের সমগ্র উদ্দেশ্য, তাহার অস্তিত্বের একমাত্র হেতু অধ্যাত্ম সত্তা বা আত্মার জ্ঞান লাভ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক জীবনে পৌঁছিবার প্রকৃত পথ নির্ণয় করা; ধর্মের মুখ্য অভিপ্রায় ও তাৎপর্যও তাহাই। ভারতীয় ধর্মের বিশিষ্ট মূল্য ও রূপ অধ্যাত্ম দর্শন হইতে প্রাপ্ত, অধ্যাত্ম দর্শনই তাহার গভীরতম আস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ ও আলোকিত করিয়াছে; এমন কি তাহার নিম্নতর স্তরে ধর্মানুভূতি পর্যন্ত বহু পরিমাণে এই দর্শনের রঙে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমত দেখা যাক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে মিঃ আর্চারের আপত্তিগুলি কি। বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রথম আপত্তি কেবল এই দাঁড়ায় যে ইহা অতিমাত্রায় দার্শনিক।

দ্বিতীয় অভিযোগ হইল একে তো ইহা সেই অসার তাত্ত্বিক দর্শন, তাহার উপর ইহা বড় বেশী অধ্যাত্ম জ্ঞানালোচনাপরায়ণ। তাঁহার তৃতীয় অভিযোগ যাহা সবচেয়ে বড় এবং প্রধান যুক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা এই যে দুর্বলতার জনক, দুঃখবাদ তপশ্চর্যা কর্মবাদ জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি মিথ্যা ধারণার দ্বারা ইহা ব্যক্তিসত্তা ও ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল ও নষ্ট করিয়া দেয়। এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকের যে সমালোচনা তিনি করিয়াছেন তাহা যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে ইহা বাস্তবিক যুক্তিযুক্ত নিরপেক্ষ সমালোচনা নহে; কিন্তু মানসিক বিরাগ এবং প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যের এক অতিরঞ্জিত প্রকাশ মাত্র।

ভারতীয় মন যে দার্শনিক চিন্তার শক্তি ও তাহার ক্রিয়াশীলতা দেখাইয়াছে জগতে তাহার তুলনা নাই, এবং তাহার ফলে যে প্রভূত পরিমাণে দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মিঃ আর্চার অস্বীকার করিতে পারেন না—অসম্ভব কথা বলার অসাধারণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে অধ্যাত্ম দর্শনের সঙ্গে পরিচয় এবং সে দর্শনের সমস্যাসমূহ বহুল পরিমাণে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত আলোচনা করিবার শক্তি জগতের অন্যান্য জাতি হইতে ভারতবাসীতে অনেক বেশী রহিয়াছে। এমন কি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন ভারতবাসী এই প্রকারের যে সমস্ত বিষয় বুঝিতে বা আলোচনা করিতে পারেন, তাঁহার তুল্য সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন পাশ্চাত্য সে সমস্ত বুঝিতে গিয়া অগাধ জলে পড়িয়া যান; মিঃ আর্চার নিজে যে অগাধ জলে পড়িয়াছেন তাহা তাঁহার এই পুস্তক পড়িলেই বুঝা যায়। কিন্তু এই সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় এবং সূক্ষ্ম দর্শনের শক্তি ভারতবাসীর গভীর মানসিক শক্তির কোন প্রমাণ দেয় একথা তিনি স্বীকার করেন না--যদিও "অবশ্যম্ভাবী-রূপে" কথাটি তিনি 'প্রমাণ দেয় না' কথার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন, আমার মনে হয় পাছে প্লেটো (Plato) স্পিনোজা (Spinoza) অথবা বার্কলের (Berkeley) কোন গভীর মানসিক শক্তি ছিল না এ কথা ইঙ্গিত করা হয় এই ভয়ে উক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমিও বলি হয়ত 'অবশ্যম্ভাবীরূপে' সেরূপ কোন প্রমাণ দেয় না, কিন্তু এক শ্রেণীর মহৎ সমস্যা সম্বন্ধে একটা বৃহৎ ও অত্যন্ত কঠিন মননশক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ-ভাবে ইহারা যে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছে যাহা অন্য কোন জাতি পারে নাই তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণ করে। ইউরোপীয় সাংবাদিকের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং তৎসঙ্গে বলিতে পারা যায় যে শিল্প সাহিত্য ও নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার একপ্রকার যোগ্যতার পরিচয় দিবার সামর্থ্য, "অবশ্যম্ভাবী" রূপে তাঁহার গভীর মননশীলতা প্রমাণ করে না, কিন্তু সাধারণ ইউরোপীয় মনের

যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, বিস্তৃতভাবে এসব বিষয়ের খবর যে সে রাখে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে তাহার একটা সাধারণ শক্তি জন্মিয়াছে তাহা প্রমাণ করে। তিনি যে সমস্ত অপরিণত ধারণা পোষণ বা অপরিপক্ক মত প্রকাশ করেন তাহা কোন কোন সময় বাহিরের লোকের কাছে কিছুটা "বর্বরোচিত" মনে হইতে পারে; কিন্তু তবু তাহাতে প্রমাণিত করে যে তাহাদের মধ্যে একটা সংস্কৃতি একটা সভ্যতা ও প্রভূত মননশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, বুঝা যায় যে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে এবং সেই অধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে সচেতন আছে। অন্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সূক্ষ্মতর ও দুরূহতর বিষয়গুলি সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না হয় এজন্য মিঃ আর্চারকে চেষ্টা করিতে হইয়াছে; সেইজন্যই দর্শন শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই ইহা তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে; তাঁহার কাছে ইহা ভারতীয় মনের অজ্ঞেয়কে জানিবার, যাহা মনের অগোচর তাহাকে মনের মধ্যে ধরিবার অসাধারণ অথচ বিফল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু কেন?—কারণ তাঁহার মতে দর্শন এমন এক জগতের বিষয় আলোচনা করে বাহ্য পরীক্ষার দ্বারা যাহার মূল্য নিরূপণ করা যায় না, এবং যেহেতু ইহা ঐরূপ পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না সুতরাং সেরূপ ভাবনার মূল্য অতি সামান্য অথবা কোনই মূল্য নাই ইহাই তিনি বলিতে চাহেন।

এখানে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনের বিরোধের এমন একটি কারণ উপস্থিত দেখিতে পাই যাহা সে মনের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে—ইহার আলোচনা সত্যই বেশ চিত্তাকর্ষক। বলিতে গেলে ইহা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদীর সন্দেহবাদ হইতে জাত যুক্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা পাশ্চাত্য মনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সে মনের স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রত্যক্ষের দিকে, সাধারণ ইয়োরোপীয় মনের ভাব ও প্রকৃতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে মিঃ আর্চার যাহা বলিয়াছেন তাহা সেই মনোভাবেরই এক চরম অভিব্যক্তি। ইয়োরোপের উচ্চতম মানসিক শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে গভীর ও বৃহৎভাবে দর্শন শাস্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখিয়াই সে চর্চা হইয়াছে; দর্শন সেখানে হইয়াছে সমুজ্জ্বল ও সমুচ্চ কিন্তু কার্যকরী নয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে দর্শন জীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সভ্যতার উপর ব্যবহারিক হিসাবে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এমন কি সাধারণ চিন্তা এবং কার্যের মধ্যেও পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে; ইয়োরোপে দর্শন কখনই জীবনের ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ষ্টোয়িক (Stoic) এবং এপিকিউরিয়ান (Epicurean) নামধেয় দার্শনিকগণের যুগে

দর্শন অনেকটা দৃঢ়ভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে প্রভাব উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; বর্তমান যুগেও ঐ ভাবের কিছু পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। নীট্‌শে (Nietzsche) অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, ফ্রান্সের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং জেমস্ (James) ও বার্গসোঁ (Bergson) প্রণীত দর্শনসমূহ সাধারণের দৃষ্টি কিছুটা আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু এসিয়াতে যেরূপভাবে দর্শনশাস্ত্র কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সাধারণ ইয়োরোপীয় তাহার জীবন পরিচালনার মূল সূত্রগুলি প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষের যুক্তি হইতে গ্রহণ করে, দর্শন হইতে নহে। সে মিঃ আর্চারের মত পূর্ণরূপে দর্শনকে ঘৃণা করে না, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রকে সে "মনুষ্যকৃত ভ্রম" মনে না করিলেও ইহার চর্চাকে জীবন হইতে দূরস্থিত অস্পষ্ট এক নিষ্ফল কাজ মনে করে। সে দার্শনিকগণকে সম্মান করে কিন্তু তাঁহাদের রচিত দর্শনশাস্ত্রকে সভ্যতার পুস্তকাগারে সর্বোচ্চ তাকে রাখিয়া দেয়, দুই একজন অসাধারণ মনন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণে তাহা নীচে নামাইয়া আনে না বা ব্যবহার করে না। দার্শনিককে সে শ্রদ্ধা করে কিন্তু বিশ্বাস করে না। প্লেটোর মতে সমাজের শাসন ও পরিচালনার ভার দার্শনিকের উপর থাকা উচিত, কিন্তু ইয়োরোপীয়েরা এ প্রস্তাব সৃষ্টিছাড়া মনে করে, ইহা কখনই যে কার্যকরী বা সুফলপ্রসূ হইবে তাহা বিশ্বাস করে না। তাহারা মনে করে যেহেতু দার্শনিক ভাবরাজ্যে বিচরণ করে সেইহেতুই প্রকৃত জীবনের উপর তাহার কোন আধিপত্য থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। অপরপক্ষে ভারতীয় মনের ধারণা এই যে ঋষি, চিন্তাশীল দার্শনিক ও অধ্যাত্মসত্যের দ্রষ্টা শুধু যে ধর্ম ও নৈতিক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচালক তাহা নহে, ব্যবহারিক জীবন এবং সমাজেরও তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়ন্তা ও নেতা; সম্বোধিজাত জ্ঞানের দ্বারা সভ্যতার পরিচালনা ও আদর্শ নির্ণয়ের ভার সে ঋষিকেই দেয়। যিনি অধ্যাত্ম সত্য ও জ্ঞানের দ্বারা তাহার জীবন গড়িয়া তোলার আদর্শকে সাহায্য করিতে এবং ধর্ম নীতি ও সমাজ এমন কি রাষ্ট্রনীতিকে তাঁহার সৃষ্টিশীল ভাব ও প্রেরণার দ্বারা উন্নয়ন করিতে পারেন তাঁহাকে এখনও ঋষি নামে অভিহিত করিতে সে সর্বদা প্রস্তুত ও উৎসুক। ইহার কারণ ভারত আত্মার সত্যরাজিকেই শেষ ও চরম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, আত্মার এই সত্যরাজিই তাহার সত্তার মৌলিকতম সত্য এবং তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুফলপ্রসূ, এই জ্ঞানই প্রবলভাবে তাহার অন্তরজীবন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং ইহাই কল্যাণকর হইয়া তাহার বাহ্য জীবনের উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ। ইয়োরোপীয়ের নিকট অধিকাংশ সময় চরম সত্যসকল ভাবনাগত বা বিশুদ্ধ যুক্তিগত বুদ্ধির সত্য; কিন্তু এইসব চরম সত্য বুদ্ধি বা অধ্যাত্ম যে কোন রাজ্যেরই হউক না কেন তাহা মন, প্রাণ ও দেহ সাধারণত যে

ক্ষেত্রে কার্য করে তাহার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, আর ইয়োরোপের মতে শুধু এই ক্ষেত্রেই "মূল্য নিরূপণের পরীক্ষা" দৈনন্দিনভাবে চলে; এইভাবে পরীক্ষার উপায় বাহ্য তথ্যের সজীব অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়োপলব্ধিজাত ব্যবহারিক যুক্তিবিচার শুধু দিতে পারে। সাধারণ ইয়োরোপীয়ের নিকট তাই বাকি সব-কিছু কল্পনামাত্র, তাহাদের প্রকৃত স্থান ভাব জগতে, জীবনময় বাহ্য জগতে নহে। এইখানে আমরা মিঃ আর্চারের দ্বিতীয় আপত্তির মূল কারণস্বরূপ ভিন্ন প্রকারের এক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই। তিনি বিশ্বাস করেন সমস্ত দর্শনশাস্ত্র গবেষণামূলক কল্পনা (speculation) ও অনুমানের (guessing) উপর প্রতিষ্ঠিত; সাধারণ প্রত্যক্ষ ঘটনা, বাহিরের জগৎ এবং আমাদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া, পদার্থবিজ্ঞানের প্রদত্ত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত মনোবিজ্ঞানের সত্যগুলিকে কেবল আমরা পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি মনে করেন যে ভারতীয় দর্শন গবেষণামূলক কল্পনাকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করে, সেই কল্পনাকে সিদ্ধান্তের ছদ্মবেশে উপস্থিত করে এবং আঁধারে হাতড়ানোকে দেখা বলে, অনুমানকে জ্ঞান নামে অভিহিত করে, এই অভ্যাসের জন্য তিনি ভারতীয় দর্শনকে নিন্দা করিয়াছেন; তাঁহার মতে ইহা "অনাধ্যাত্মিক" অভ্যাস—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই একমাত্র জ্ঞেয় পদার্থ; দেহের জ্ঞানই আত্মার এবং চিৎস্বরূপের জ্ঞান ইহা ধরিয়া লইলেই বোধ হয় খাঁটি আধ্যাত্মিক অভ্যাস হইত! দার্শনিকভাবে ধ্যান ও যোগসাধনা যে প্রকৃতির মূল সত্য নির্ণয় এবং বিশ্বগঠন প্রণালীর জ্ঞানলাভের সর্বোত্তম উপায় এই ধারণাকে তিনি অতি তীব্রভাবে উপহাস ও আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অজ্ঞতার জন্য ইহার ভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মিঃ আর্চার ঘোর রূপে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী সাধারণ পাশ্চাত্য মন অপরিহার্যরূপে যে মত গ্রহণ করে তিনি মূলত তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুত ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র অনুমান ও কল্পনাকে ঘৃণা করে। ইয়োরোপীয় সমালোচকগণ উপনিষদ, তত্ত্ববিদ্যা এবং বৌদ্ধ দর্শনের ভাবধারা ও সিদ্ধান্তসমূহকে অনুমান ও কল্পনার ফল সর্বদা এ কথা বলিলেও ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁহাদের চিন্তা প্রণালীর এ বর্ণনা একেবারেই অস্বীকার করিবেন, আমাদের দর্শনশাস্ত্র অজ্ঞেয় অচিন্ত্য চরম বস্তুর কথা স্বীকার করিলেও যুক্তি-বাদীরা যে মনে করে তাহাতে ঐ চরম রহস্যময় তত্ত্বরূপের বিশেষ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ শুধু দেওয়া আছে তাহা সত্য নহে; যাহা জানা বা বুঝা যায় তাহার উচ্চতম তত্ত্ব এবং নিম্নতর ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা আছে দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে। যে সমস্ত সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন তাহা যদি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের মূল সূত্র—যাহাদিগকে মন গড়া উক্তি বলা হইয়াছে—করিতে চাহিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা

এ সমস্তকে অনুভূতির এক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন —যে সমস্ত উপায়ে ইহার পরীক্ষা সম্ভব হইতে পারে যে কোন ব্যক্তি সেই যথার্থ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহার সত্য নিজেই প্রমাণ করিতে পারিবে। কোন বস্তুর মূল্য এবং সত্য নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বাহ্যজগতের বিষয়-সকল এবং সাধারণ জীবনে সর্বদা মনোজগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহার আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার যে উপায় অবলম্বন করেন তাহাই যে একমাত্র উপায় ভারতীয় মন তাহা স্বীকার করে না,–বাহ্যত যাহা দেখা যায় তাহা মনস্তত্ত্বের এক ক্ষুদ্র গতিবৃত্তি মাত্র, তাহার অন্তরালে গোপন অবচেতনার গভীরে এবং অতিচেতনার উচ্চতার মধ্যে অতি বিশাল প্রদেশসমূহ রহিয়াছে। এই সমস্ত অধিকতর সাধারণ বা বাস্তব ঘটনাবলির মূল্য কোন্ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হয়? স্পষ্টতঃ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, যুক্তিবিচারের এবং বোধিজাত জ্ঞান দ্বারা আমি বিশ্বাস করি আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান বোধিজাত জ্ঞানের মূল্য স্বীকার করে। অপরদিকে সূক্ষ্মতর জগতের সত্য এবং তথ্যও পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, পরীক্ষা-মূলক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এবং বুদ্ধি ও বোধিজাত জ্ঞানের দ্বারাই নির্ণীত হয়। তবে এই সমস্ত আত্মার এবং চিদ্‌বস্তুর সত্য বলিয়া তাহার পরীক্ষা মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দ্বারা শুধু সম্ভব হইতে পারে; সে পরীক্ষা বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণ চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে অথবা কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তিভাবিত দেহের ক্ষেত্রে চলিতে পারে; যাহা উচ্চতর ক্ষেত্রে সত্যবস্তু ও সত্তার সম্ভাবনা-সকল দেখিতে পায় এমন এক বৃহত্তর সম্বোধির দ্বারা শুধু পরীক্ষা সম্ভব হইতে পারে; যে যুক্তিবিচার নিজেকে অতিক্রম করিয়া একটা বৃহত্তর কিছু আছে তাহা স্বীকার করে, আমাদের জাগ্রত চৈতন্য অপেক্ষা উচ্চতর কোন কিছুর দিকে উর্ধ্বদৃষ্টিতে তাকাইতে পারে এবং তথা হইতে প্রাপ্ত উচ্চতর জ্ঞানের কথা মানুষের বুদ্ধির নিকট যথাসম্ভব উপস্থিত করিতে চেষ্টা করে সেই যুক্তি-বিচারই মাত্র এজন্য ব্যবহার করা চলে। মিঃ আর্চার যে যোগকে এত সনির্বন্ধভাবে ত্যাগ করিতে আহ্বান করিতেছেন সেই যোগ এই উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিবার এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা লাভের সুপরীক্ষিত একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছাড়া কিছু নহে।

মিঃ আর্চার ও তাঁহার তুল্য মানসিক গতি ও শক্তি বিশিষ্ট লোকেরা এই সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন সে আশা করা যায় না; তথ্য ও ধারণার যে সংকীর্ণ গন্ডী তাঁহাদের জ্ঞানের সমগ্র পরিধি এ সমস্ত তাহার বাহিরে অবস্থিত। এমন কি তাহার কিছু জানিতে পারিলেও তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার কোন পার্থক্য হইত না; যুক্তিবাদের অতিপ্রবলতা বশতঃ যে বোধকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন সে বোধকে কিছুমাত্র খর্ব না করিয়া ঘৃণার সহিত তিনি

তাহা অগ্রাহ্য করিতেন; তাহার মধ্যে তাঁহার অপরিচিত কোন সত্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য তাঁহার থাকিত না। প্রত্যক্ষবাদী সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে মতের মিল হইবে। এরূপ মনের পক্ষে এ সমস্ত বিষয় মূলতঃ অসম্ভব, গ্রীক অথবা হিব্রুভাষার চেয়ে দুর্বোধ্য, যদিও এ সমস্ত ভাষাতে খুব সম্মান ও প্রশংসার্হ অনেক পন্ডিত আছেন; কিন্তু এ সমস্ত দুর্বোধ্য লিপিপূর্ণ বিষয়ের পাঠোদ্ধার ভারতবাসী বা থিয়োসফিস্ট (Theosophist) নামধেয় গুপ্তবিদ্যা বিষয়ের অনুষ্ঠান-কারীগণ সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু ইঁহারা সকলেই ঘৃণার্হদের দলভুক্ত; ইঁহাদের মতের মূল্য কি? এরূপ মন আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবের যুক্তিবিচার বা কোন প্রকার মতবাদ অথবা ধর্মযাজক ও বাইবেল এ সমস্তকে হয়ত বিশ্বাস না করিলেও বুঝিতে পারে অথবা প্রচলিত প্রথা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে এরূপ গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্য, সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে এরূপ আধ্যাত্মিক তথ্যাবলী এই জাতীয় লোকে ধারণাই করিতে পারে না। এরূপ ধারণা এই মননের নিকট বিদেশীয় বস্তু, এ সমস্ত কথা তাহাদের নিকট অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। যে ধর্মে বলে ইহা কর বা ইহা করিও না সেরূপ শাসনাত্মক ধর্ম যদিও তাহারা গ্রহণ করে না তথাপি তাহারা বুঝিতে পারে: তাহারা বলে "যুক্তিতে অসম্ভব মনে হইলেও ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি"। কিন্তু গভীরতম ধর্মরহস্য, দার্শনিক চিন্তার উচ্চতম সত্য, মনোময় অনুভূতির সুদূরতম চরম আবিষ্কার, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুব্যবস্থিত-ভাবে আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণ, একটা সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধির দিকে আত্ম-গঠনের আন্তর সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেখানে একে অন্যের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়া একই ফল লাভ করে, যাহাতে অধ্যাত্ম জ্ঞান বিচারবুদ্ধি এবং সমস্ত আন্তর জীবনের এবং তাহার গভীরতম প্রয়োজনের একটা সাম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় সেই ক্ষেত্রে, মহৎ ও শাশ্বত ভারতীয় প্রাচীন সাধনা দৃঢ়ব্রত অধ্যবসায়ের সহিত অনুসন্ধান করিয়া যে এরূপ বিজয় লাভ করিতে পারে প্রত্যক্ষবাদী সাধারণ পাশ্চাত্য মন তাহাতে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্ত্য জগৎ যে সত্য শুধু অন্ধভাবে অনুসন্ধান করিয়াছে এবং অবশেষে হারাইয়া ফেলিয়াছে সেই জ্ঞান কাহাকেও লাভ করিতে দেখিলে সে বিহ্বল হইয়া উঠে। তাহার নিজের আত্মবিভক্ত সংস্কৃতির নিম্নতর সাম্যের অপেক্ষা মহত্তর কিছু দেখিলে সে বিরক্ত ও হতবুদ্ধি হয় এবং ঘৃণার সহিত তাহাকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। কেননা, কেবলমাত্র যে ধর্মানুসন্ধান ও তাহার অনুভূতির সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে তাহা সর্বদাই দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত, অথবা তাহা অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং দ্বন্দ্বাকীর্ণ আত্ম-

প্রত্যয়শীল অবিশ্বাসের মধ্যে সর্বদা দুলিতে থাকে। ইউরোপে দর্শনবিদ্যা কোন কোন সময়ে ধর্মের পরিচারিকা হইয়াছে, কখনও সহোদরা হইতে পারে নাই; কিন্তু অধিকাংশ সময় দর্শন শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা অবজ্ঞার সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরাজ্যের প্রায় সর্বাপেক্ষা প্রধান ঘটনা। এমন কি দর্শন এবং বিজ্ঞানও একমত হইতে পারে নাই; ইহারাও কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছে। এই শক্তিগুলি সেখানে এখনও সহ-অবস্থিত কিন্তু সুখী পরিবার নহে—গৃহযুদ্ধই তথাকার স্বাভাবিক আবহাওয়া।

ইহসর্বস্ববাদী মনের নিকট ইহাই স্বাভাবিক বোধ হয়: দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে যেখানে সুপরীক্ষিত মানসিক অভিজ্ঞতার মিলন ও সামঞ্জস্য এবং পরস্পরের মতৈক্য দেখা যায় সেইরূপ চিন্তাধারা ও জ্ঞান হইতে এরূপ মন যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? তাহার পক্ষে অপরিচিত এই জ্ঞানের সঙ্গে বিচার করিবার আহ্বান যখন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহা এড়াইবার সহজ পথ দেখিতে গিয়া সে বলিয়া বসে যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান নিজের দ্বারা সম্মোহিত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার জঙ্গল মাত্র, ভারতীয় ধর্ম যুক্তিবিরুদ্ধ অতিবর্ধনশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আগাছা মাত্র। ভারতীয় দর্শন অবাস্তব ও কাল্পনিক ভাবনার সুদূর এক মেঘলোক মাত্র। আত্মতৃপ্ত এইরূপ মনোগতির মানসিক শান্তির এবং মিঃ আর্চারের সুদক্ষ সর্বচ্ছেদকারী সমালোচনা পদ্ধতির পক্ষে অত্যন্ত বিপদ ও আক্ষেপের বিষয় এই যে আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশও এইভাবের ভাবনা ও আবিষ্কারের পথে এরূপ অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে যে আশংকা হয় এই সমস্ত অপ্রীতিকর পর্বতপ্রমাণ বর্বরতা সে যেন সমর্থন করিবে এবং ইউরোপকেও এইরূপে বিকৃত ও বীভৎস ভাবধারার দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। ক্রমশ ইহা স্পষ্টতর হইতেছে যে বর্তমান দর্শনশাস্ত্রের চিন্তাধারা যেসব সিদ্ধান্ত করিয়াছে বা করিতে চাহিতেছে, ভারতীয় দর্শন তাহার নিজস্বভাবে তাহার অধিকাংশ পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছে; এমন কি ইহাও দেখা যাইতেছে যে ইহারা যে সমস্ত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিল অনুসন্ধানের অন্যপ্রান্ত হইতে জড় বিজ্ঞান আসিয়া তাহাদের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। মিঃ আর্চার ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) এবং শারীর বিজ্ঞান (Physiology)-এর সহিত মনোবিজ্ঞানকে (Psychology) ভিত্তিহীন শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত এবং চতুরতার সহিত উদ্ভাবিত অনুমানমাত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত, কারণ অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এ সমস্ত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার পক্ষে আরো দুঃখকর বিষয় এই যে মনোবিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা আধুনিক আবিষ্কারসমূহ ভারতীয় মনোবিজ্ঞানকে ক্রমশ অধিকতররূপে সমর্থন

করিতেছে। ভারতীয় ধর্মের মূল ভাবধারাসকল এরূপ ভাবের বিজয় লাভ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে যে তাহারাই এক নূতন ও সার্বভৌম ধর্মের এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রধান ভাবনা ও মনোবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। পাশ্চাত্যের কয়েক প্রকার চিন্তাধারা যাহা এখনও অন্ধভাবে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে অথবা অনুমানমাত্র করিতেছে, আর একটু অগ্রসর হইলে তাহারা ভারতীয় যোগশাস্ত্রের শারীর-মনোবিজ্ঞানকে (Psycho-Physiology) যে সমর্থন করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? আবার সহজে অনুভবযোগ্য জড় জগৎ ছাড়া অন্য সূক্ষ্মতর জগৎসমূহের যে কথা ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে উল্লেখ আছে এমন কি হয়ত তাহাই যে অদূর ভবিষ্যতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহসর্বস্ব মনের এখনও ভয়ের কারণ নাই, এই মনের প্রভাব এখনও অত্যন্ত বেশী, এখনও চিন্তাজগতে ইহার আধিপত্যের গৌরব ও গোঁড়ামি পূর্ণরূপে বিরাজিত; চিৎস্বরূপের গোপন উপকূলের দিকে প্রবল বন্যার বেগে মানবজাতিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার পূর্বে মনের বহু চিন্তা-ধারাকে পূর্ণতর হইতে এবং সকলকে আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতে হইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

তৃতীয় অধ্যায়

এ-যাবৎ এই সমালোচনাটি মারাত্মক নহে; তীক্ষ্ণভাবে মিথ্যাবর্ণনা ভিন্ন যদি ইহার অন্য কোন ধার থাকে তবে তাহা আক্রমণকারীকেই আঘাত করে। দর্শনশাস্ত্রকে উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাহার দ্বারা আমাদের সত্তার নিগূঢ়তম রহস্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা, জীবনের ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে দার্শনিক চিন্তার আলোকসম্পাত করা, গভীরভাবে যাঁহারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা উচ্চতম ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাঁহারা অধিগম্য জ্ঞানের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় হইয়াছেন, এরূপ চিন্তাশীল মনীষীদের দ্বারা সমাজ শাসিত ও গঠিত করা, আচার ও ধর্মমতকে দার্শনিক মনের পরীক্ষা ও বিচারাধীন করা, ধর্মবিশ্বাসকে আধ্যাত্মিক শক্তিলব্ধ সম্বোধি, দার্শনিক চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা এ-সমস্ত বর্বরতার কিম্বা হীনতর অজ্ঞ সংস্কৃতির চিহ্ন তো নহেই, পরন্তু এক অতি উচ্চাঙ্গ সভ্যতার পরিচায়ক। ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহার জন্য আমাদিগকে জড়বাদ বা যুক্তিবাদের প্রতিমার নিকট নতিস্বীকার করিতে হইবে; এমন কিছুই নাই যাহার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানালোকিত চিন্তাশীল দার্শনিক ভাবধারাযুক্ত উচ্চ প্রাচীন যুগের অথবা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রবল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিক যুগের গতি ও প্রকৃতির নিকট ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিন্দুমাত্র নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি নিকৃষ্ট নহে বরং যে অসাধারণ উচ্চ ধারণা সে পাইয়াছে এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে যে মহৎ সাধনা করিয়াছে তাহার জন্য স্পষ্টতঃ তাহার মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠতার উপাদান বর্তমান আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতির এই উচ্চতার উপর জোর দিয়া বলিবার প্রবল প্রয়োজন আছে কারণ কোনও সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণে ইহাই যে প্রধান দেখিবার বিষয় এবং তাহার গুণাগুণ নির্ণয়ের প্রথম কষ্টিপাথর তাহা শুধু নহে, আরও কারণ এই যে, আক্রমণকারিগণ সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই এমন দুইটি বাহ্য বিষয়ের সাহায্য

লইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতে এবং প্রকৃত বিচার্য বিষয়কে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছে। ভারত যখন ভূলুণ্ঠিত এবং ধূলি-ধূসরিত, বাহ্য ঐশ্বর্যের বিষয়ে ভারতীয় সভ্যতা যখন অধঃপতনে এবং প্রবল পরাভবের মধ্যে শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তখন তাহারা ভারতকে আক্রমণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। এই সাময়িক সুবিধায় বলীয়ান হইয়া শিকারীর জালে আবদ্ধ পীড়িত আহত সিংহিনীকে পায়ের ক্ষুর দ্বারা আঘাত হানিয়া তাহার চতুর্দিকস্থিত ধূলি ও কর্দম উত্থিত করিবার মত মহৎ ও অতি চমৎকার সাহস তাহারা সহজেই দেখাইতে পারে, তাহারা অতি সহজে লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারে যে, কোন দিনই এ সিংহীর কোন শক্তি ও মহত্ত্ব ছিল না। যুক্তিবাদের মহান অনুশীলনের এই যুগে যখন ধন ও বিজ্ঞান নরবলিভুক দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছে, যখন ঐহিক 'সফলতা' মহাদেবীর আসন পাইয়াছে এবং তাহার পিত্তলনির্মিত মূর্তির এমন নির্লজ্জ-ভাবে পূজা করা হইতেছে যাহা পূর্বে কোন সভ্য বা সংস্কৃতিবান জাতি পারে নাই তখন এই কার্য আরও সহজ হইয়াছে। যে যুগে তাহার সভ্যতার গৌরব রাহুগ্রস্ত ও ম্লান হইয়াছে, যখন অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত যে বহুমুখী সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতি অতি প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইবার পর সাময়িকভাবে তাহার সবই সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই যুগে ভারতীয় সভ্যতাকে জগতের সমক্ষে বিকৃত করিয়া দেখাইবার আরও সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু সে সভ্যতা বহুকাল দীপ্তিশূন্য মলিনতায় ঢাকিয়া থাকিলেও আজিও বাঁচিয়া আছে এবং বর্তমানে তাহার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতার বিফলতা ও ক্ষণিকের এই রাহুগ্রাসের এক তাৎপর্য সম্বন্ধে অন্যত্র কিছু বলিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতির ও আধ্যাত্মিকতার মূল্য সম্বন্ধে এইভাবের আপত্তি তোলা হইয়াছে বলিয়া আরও বিশদরূপে এ-বিষয় পুনরায় কিছু বলিতে হইবে। এখানে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হয় যে পার্থিব সফলতার দ্বারা কোনও সংস্কৃতির বিচার করা যায় না, আর এই কষ্টিপাথরে আধ্যাত্মিকতাকে যাচাই করা একেবারেই চলে না। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যরসিক প্রখর বুদ্ধিশালী গ্রীস যে-সময়ে অকৃতকার্য ও অধঃপতিত হইয়াছিল, সেই সময়ে সমরকৌশলী যুদ্ধপ্রিয় রোমকজাতি জয় ও সফলতা লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা বলিয়া সেই বিজয়ী ও সাম্রাজ্য-বিস্তারকারী জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা যে গ্রীস অপেক্ষা উচ্চতর বা মহত্তর ছিল একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে না। ইহুদীদের দেশ বা তাহাদের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের ধর্মোন্নতি অপ্রমাণিত হয় নাই বা তাহাতে তাহার মূল্য কমিয়া যায় নাই; পক্ষান্তরে সেই ইহুদী জাতি পৃথিবীর বহুস্থানে

ছড়াইয়া পড়া সত্ত্বেও যে বাণিজ্যপ্রতিভা দেখাইয়াছে তাহাতে তাহাদের ধর্ম-সংস্কৃতি প্রমাণিত হইয়াছে অথবা তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে একথাও বলা চলে না। কিন্তু আমি নিজে স্বীকার করি এবং প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারাও স্বীকার করিয়াছে যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও বাহ্যৈশ্বর্য মানুষের সভ্যতার পূর্ণ সাধনার একটা অপরিহার্য অংশ, যদিও তাহা প্রধান বা মুখ্য অংশ নয়। এ-বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহার সংস্কৃতিগত চেষ্টার সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রাচীন বা মধ্য যুগের যে কোন দেশের সংগে সমান আসন দাবী করিতে পারে। বর্তমান যুগের পূর্বে কোন জাতি ধনগৌরবে, বাণিজ্যের ঐশ্বর্য ও সফলতায়, বাহ্য জগতের জ্ঞানে ও সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এ কথার প্রমাণ মিলিবে ইতিহাসে, প্রাচীন দলিলে অথবা সমসাময়িক সাক্ষীগণের দেওয়া বিবরণে; যদি কেহ ইহা অস্বীকার করে তবে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে সে নিজেই পূর্বসংস্কার দ্বারা একান্তভাবে অভিভূত এবং তাহার দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন অথবা সে বর্তমান অবস্থার দ্বারা প্রাচীন কালের সত্য ঘটনাকে কাল্পনিক ও বিকৃতভাবে পাঠ করিতেছে অথবা তাহার এমন কল্পনাশক্তি নাই যাহাতে সে ভারতের সেই সময়কার অবস্থা বুঝিতে পারে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীগণ এসিয়া তথা ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যকে "হিন্দ্ ও অর্মুজের" ধনসম্পদকে এক সময় অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া কলঙ্ক কালিমা অর্পণ করিত; এই বর্বরদের গৃহদ্বার পর্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া কথিত হইত। কালের চক্র আশ্চর্যরূপে ঘুরিয়া গিয়াছে, ধনশালী বর্বরতা এবং যাহা অনেক কম পরিমাণে সুরুচিসম্পন্ন অর্থের সেরূপ প্রবল জাঁকজমক এখন লন্ডন, নিউইয়র্ক অথবা প্যারী নগরে দেখা যায় এবং ভারতবাসীর নগ্নতা এবং মলিন দারিদ্র্য তাহার সংস্কৃতির অসারতার পরিচায়ক বলিয়া তাহাকে উপহাস করা হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামরিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা কম গৌরবের ছিল না; ইহার যে প্রমাণ আছে তাহা এ-বিষয়ে যাঁহারা সন্ধান রাখেন না তাঁহাদের অজ্ঞানতা, সাংবাদিকের বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনা অথবা স্বার্থপর রাজনৈতিক মতবাদকে সহজেই খণ্ডন করিতে পারে। ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার কোন উপাদান যে তাহাতে ছিল না এমন নহে, কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় ব্যাপক ও সামগ্রিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা প্রায় অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে সেই ধারায় চলিলে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত জগতের কোন সভ্যতা টিকিতে পারে না। অবশেষে ভারতীয় সভ্যতার পতন ঘটিয়াছিল বটে, তাহা তাহার সংস্কৃতির অবনতির জন্য, কিন্তু তাহার মধ্যে যে পরমমূল্যবান সারবস্তু ছিল তাহার জন্য

নহে। উত্তরকালে তাহার সংস্কৃতির প্রধান মূল উপাদান রাহুকবলিত হইয়া পড়া তাহার আদিম মূল্যকে অপ্রমাণিত করে না। ভারতীয় সভ্যতাকে প্রধানতঃ তাহার বহু সহস্র বর্ষের সংস্কৃতি ও মহত্ত্বের দ্বারা বিচার করিতে হইবে, পরবর্তী কালের কয়েক শতাব্দীর অজ্ঞতা এবং দুর্বলতার দ্বারা নহে। যে কোনও সংস্কৃতির মূল্য বিচারের মাপকাঠি হইবে প্রথমতঃ তাহার মূল প্রকৃতি, দ্বিতীয়তঃ তাহার শ্রেষ্ঠ সাফল্য এবং সবশেষে সকল ভাগ্যবিপর্যয়ের পরেও উদ্বর্তনের বা পুনরুজ্জীবনের অথবা মানবজাতির স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার নবতর ক্ষেত্রে নিজেকে উপযোগী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা। সাময়িক অবনতির দুর্যোগে যে অব্যবস্থা বিশৃংখলা অথবা দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যেও এ সভ্যতার যে মুক্তিপ্রদ শুভ মূল ভাব বজায় আছে তাহা এ সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে নিশ্চিত এবং তাহার স্থায়ী আদর্শের মহত্ত্ব প্রোজ্জ্বল ও বীর্যবন্তভাবে ফিরাইয়া আনিবার প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে; কিন্তু বিরোধী সমালোচক ইহা দেখিতে বা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। স্থিতিস্থাপক গুণোপেত ইহার প্রতিক্ষেপের অদম্য শক্তি এবং অবস্থার উপযোগী ভাবে নিজেকে পরিবর্তন করিবার অপরিমিত প্রাচীন সামর্থ্য পুনরায় ক্রিয়াশীল হইয়াছে, ইহা এখন কেবল আর আত্মরক্ষাতেই নিযুক্ত নয়, বরং সাহসী ও আক্রমণোদ্যত; শুধু উদ্বর্তনই নহে, জয় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ইহার ললাটে অঙ্কিত।

যে ভারতীয় সভ্যতা এত উচ্চ যে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনার আক্রমণের পক্ষে দুর্ভেদ্য, তাহার উত্তুঙ্গ আদর্শ ও মহান গতিপ্রকৃতিকে আমাদের এই সমালোচক যে শুধু অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি তাহার প্রধান প্রধান ভাবধারাগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন, ব্যবহারিক জীবনে তাহার কোন মূল্য দেখিতে পান নাই; তাহার পরিণাম প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। এই নিন্দাপূর্ণ সমালোচনার বাস্তবিক কোন মূল্য আছে কিনা অথবা জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত ভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী থাকিবার এবং আমাদের প্রকৃতির উচ্চতম তাৎপর্য ও সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ পোষণ করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁহার যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে নিজের প্রকৃতিগতভাবে এ সমালোচনা তাহারই শুধু অভিব্যক্তি কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যদি আমরা আক্রমণের ধরন ও ভাষার দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব যে তাহা সাধারণ বাহ্যজীবনের ভাব ও মূল্যে আসক্ত ইহসর্বস্ব মনের দিক হইতে একটি অত্যন্ত স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার নিন্দাবাদ মাত্র, যে সংস্কৃতি মানুষের গতানুগতিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চাতে একটা বৃহত্তর কিছু দেখিতে পায় এবং জীবনযাত্রাকে শাশ্বত সনাতন অনন্তের দিকে চলিবার পথমাত্র মনে করে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে

যে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা নাই; পরন্তু এখানে আধ্যাত্মিকতার সুস্থ ও সবল সকল বীজ নষ্ট করা হইয়াছে—ইহা একটা অপরূপ অশুভ আবিষ্কার বটে! স্পষ্টতঃই এখানে মিঃ আর্চার আধ্যাত্মিকতা শব্দ তাঁহার নিজের মনগড়া অভিনব চিত্তাকর্ষক এবং নিছক পাশ্চাত্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন! লোকে আধ্যাত্মিকতা শব্দে এযাবৎ প্রাণ ও মন অপেক্ষা বৃহত্তর কিছুর স্বীকৃতি এবং প্রাকৃত মনোময় ও প্রাণময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এক পবিত্র মহান ও দিব্যচেতনার দিকে আস্পৃহাকে বুঝিত; আমাদের নিম্নতর প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার অন্তরস্থিত এক গোপন বৃহত্তর বস্তুর দিকে মানবাত্মার ঊর্ধ্বগতির এক প্রবল ধারাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া জানিত; অন্ততঃ ইহাই ভারতের ধারণা ও অভিজ্ঞতা, তাহার ভাবনার মূলকথা। কিন্তু যুক্তিবাদী আত্মাকে এইভাবে বিশ্বাসই করে না, তাহার কাছে বাহ্যজীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তিবিচার শ্রেষ্ঠতম দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা বাস্তবিক যে জিনিস ব্যক্ত করে তাহার অস্তিত্ব তিনি যখন অস্বীকার করেন তখন এ শব্দ ব্যবহার না করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল; ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহাকে ইহার একটি অভিনব অর্থ দিতে হইয়াছে; ইচ্ছাশক্তি, যুক্তিবিচার, মানসিক অনুভূতির প্রবল আবেগ ও চেষ্টা, যাহা অনন্তাভিমুখী না হইয়া সান্তের দিকে চলিয়াছে, যাহা শাশ্বত সত্তার দিকে না তাকাইয়া ঐহিক ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, বাহ্যজীবনের ঘটনাকে অতিক্রম করিয়াও তাহার আশ্রয় স্বরূপে বর্তমান আছে এমন কোন বৃহত্তর সত্যকে লক্ষ্য না করিয়া যাহা বাহ্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকেই আধ্যাত্মিকতা নাম দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে "যে জাতীয় চিন্তা ও দুঃখ হোমারের আদর্শ-ললাটে রেখাপাত করিয়াছে" তাহাই সুস্থ ও পৌরুষব্যঞ্জক আধ্যাত্মিকতা। বুদ্ধের অজ্ঞান ও বেদনা-জয়ী শান্তি ও করুণা, সাধক যখন সনাতন সত্যস্বরূপের ধ্যানে মানসিক ভাবনার উপরে উঠিয়া আত্মার পরম জ্যোতির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন তখনকার সেই সমাধি, বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত এক পরম প্রেমস্বরূপের সঙ্গে পূতহৃদয় ভক্ত প্রেমের দ্বারা যখন পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছেন তখনকার সেই পরমানন্দ, অহংগত কামনা ও বাসনার ঊর্ধ্বে উন্নীত কর্মযোগীর নৈর্ব্যক্তিক সর্বজনীন ভাগবত ইচ্ছার অনুগত সংকল্প—এই সমস্তকে ভারতবর্ষ সর্বোচ্চ মূল্য দিয়াছে এবং তাহার মহত্তম অমর সন্তানগণ তাঁহাদের পরম সাধনার বিষয় করিয়াছেন; কিন্তু এসব নাকি সুস্থ ও পৌরুষব্যঞ্জক আধ্যাত্মিকতা নহে! বলিতে হইবে যে ইহা আধ্যাত্মিকতার খাঁটি পাশ্চাত্য ও অতি আধুনিক ধারণা। এতদনুসারে আমবা কি এই বলিব যে এখন হইতে হোমার (Homer), শেক্সপিয়র (Shakespeare), র‍্যাফেল (Raphael), স্পিনোজা (Spinoza), ক্যান্ট (Kant),

সার্লিম্যান (Charlemagne), এব্রাহাম লিনকন (Abraham Lincoln), লেনিন (Lenin), মুসোলিনী (Mussolini)—ইঁহারা শুধু বড় কবি ও শিল্পী, চিন্তাজগতের ও কর্মক্ষেত্রের বীরপুরুষ শুধু ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও নায়ক ও আদর্শ? আমরা আর বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য, সেন্ট ফ্রান্সিস (St. Francis) বা রামকৃষ্ণকে সেই আসন দিব না; কারণ তাঁহারা হয় পূর্বদেশীয় অর্ধবর্বর অথবা প্রাচ্য ধর্মের নারীভাবাপন্ন এক বাতুলতা দ্বারা স্পৃষ্ট ও প্রভাবিত। সংস্কৃতিসম্পন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে উৎকৃষ্ট রন্ধন, ভাল বেশভূষা, সুন্দর পূর্তকার্য, বিদ্যালয়ের উত্তম শিক্ষকতাই খাঁটি সৌন্দর্য, এই সমস্ত বিষয়ের অনুকরণই সুস্থ পৌরুষ-ব্যঞ্জক সুন্দর ধর্মপ্রণালী এবং সাহিত্য চিত্রশিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিদ্যা কাগজের উপর বৃথা হিজিবিজি লেখা বা পাগলের মত অর্থহীন পাথর কাটা এবং পটের উপর হীনবীর্য আনাড়ীর মত রং লাগান মাত্র; যদি তাঁহাকে শুনানো হয় যে ডা ভিন্সি (Da Vinci), এঞ্জেলো (Angelo), সোফোক্লিস (Sophocles), দাঁতে (Dante), শেক্সপিয়র (Shakespeare) বা রোদিন (Rodin) শিল্পজগতে প্রধান স্রষ্টা নহেন পরন্তু ভবন (Vauban), পেস্টোলজ্জি (Pestolozzy), ডাঃ পার (Dr. Parr), ভতল (Vatal) এবং বো ব্রুমেল (Beau Brummel) প্রকৃত রসস্রষ্টা তবে এ সমস্ত কথার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার মনে যে ভাব আসিবে মিঃ আর্চারের এ সমস্ত উক্তি একজন ভারতবাসীর মনে ঠিক তেমনি ভাব জাগাইবে। তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন বিচারে ও তুলনায় তাহা টিকে কিনা সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। আমরা ইত্যবসরে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা ও বিরুদ্ধতা দেখিয়া লইব এবং ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের বিভেদের মূলগত কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় দর্শনের কার্যকারিতা ও মূল্যের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগের স্থূলমর্ম এই যে ইহা জীবন, প্রকৃতি, প্রাণ-সংকল্প ও জাগতিক কার্য হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। ইহা জীবনের কোন মূল্য স্বীকার করে না এবং প্রকৃতির পর্যালোচনা না করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চায়। ইহা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে বলে, জগতের অলীকতা প্রচার করে, জাগতিক সুখসুবিধা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিতে চায়, অতীত ও ভবিষ্যৎ অশেষ জীবন ও জন্মের তুলনায় বর্তমান ক্ষণের উপর কোন গুরুত্ব স্থাপন করে না। দুর্বলতার সঙ্গে ইহার অধ্যাত্মদর্শনকে নৈরাশ্যবাদ, বৈরাগ্য, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদের মিথ্যা ধারণার দ্বারা জটিল করা হইয়াছে; এই সমস্ত ভাবধারা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নামক পরম আধ্যাত্মিক (!) পদার্থটির পক্ষে সাংঘাতিক। আমরা প্রথমেই বলি যে ইহা ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে

হাস্যোদ্দীপকভাবে অতিরঞ্জিত ভ্রান্ত ধারণা, গভীরভাবে কালিমা লেপন করিয়া ভারতীয় মনোজগতের একাংশকে মাত্র এখানে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; মনে হয় বাহ্য বাস্তববাদী বর্তমানকালের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে মিঃ আর্চার এই অপরূপ বিচিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। কখনও বা অজ্ঞতার জন্য কখনও বা তথ্যের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া ইউরোপীয় মন অতীতে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মনোভাব গঠিত করিয়া লইয়াছে মূলতঃ ইহা ভাষায় ও ভাবে তাহারই স্পষ্ট ও খাঁটি বিবরণ। শুধু তাহাই নহে, এই ভ্রান্তির গভীর কালোছায়ায় শিক্ষিত ভারতীয় মনকে সাময়িকভাবে অভিভূত করিয়া তাহাতেও কোন প্রকারে ঐরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা প্রথমে এই চিত্রের বর্ণসামঞ্জস্য ঠিক করিয়া দিতে চাই তাহা হইলে এই সমালোচনার অন্তরালে যে বিরুদ্ধ মনোগতি আছে সে সম্বন্ধে আরও ভালভাবে বিচার করিতে পারিব।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র মানুষকে প্রকৃতির পর্যালোচনা হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে ইহা বলিলে মিথ্যা বলা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সুসমৃদ্ধ ইতিহাসকে অস্বীকার করা হইবে। প্রকৃতি বলিতে যদি জড় প্রকৃতিই বুঝায় তবে প্রকৃত সত্য এই যে বর্তমান যুগের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয়েরা যতদূর এবং যেরূপ বিপুল সফলতার সহিত জড়বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়াছে সে যুগের কোন জাতিই ততদূর বা সেরূপ করে নাই। যাহারা জানিতে চায় তাহারা দেখিবে যে ইতিহাস এ সত্যই প্রকাশ করিতেছে, একথা সুপ্রথিতযশা ভারতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ যে আবিষ্কার করিয়াছেন ও সজোরে প্রচার করিয়াছেন অথবা এ সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন কেবলমাত্র তাহা নহে, ইউরোপীয় মনীষীগণের মধ্যে যাঁহারা তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করিবার কষ্টস্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও ইহা ইতিপূর্বেই জানিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, শল্যবিদ্যা (surgery) প্রভৃতি বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা প্রাচীনকালে আলোচিত হইত তাহার সকলগুলিতে ভারত যে শুধু প্রধান শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল তাহা নহে; বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভ্যাস হারাইয়া ফেলিবার পর যে জাতির নিকট হইতে ইউরোপ তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তি হইতে আধুনিক বিজ্ঞান যাত্রারম্ভ করিয়াছে সেই আরব জাতিকে গ্রীকগণের সঙ্গে ভারতবর্ষই বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে। বহু বিভাগে ভারতবর্ষই নূতন সত্য প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে; এইরূপ অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে আমরা মাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইটি উদাহরণের কথা বলি, অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রণালী সর্বপ্রথম ভারতেই আবিষ্কৃত হয়, পৃথিবী যে সচল পদার্থ—'চলা পৃথ্বী স্থিরাভাতি'—'পৃথিবী যে চলিতেছে স্থিরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র'

এ সত্য গ্যালিলিওর বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় জ্যোতিষী বলিয়া গিয়াছেন। যদি এ জাতির চিন্তাশীল ও বিশ্বান ব্যক্তিগণ অধ্যাত্মদর্শনের দ্বারা প্রকৃতির পর্যালোচনা হইতে দূরে নীত হইতেন তবে তাঁহাদের দ্বারা গভীরভাবে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সম্ভবপর হইত না। ভারতীয় মনীষীদের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে ইঁহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং এরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন যে প্রত্যেক বিভাগ একটি শাস্ত্র একটি বিজ্ঞানের শাখায় পরিণত হইয়াছে। অন্ততপক্ষে বলিতে হয় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রেরণা সুষ্ঠুভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল; এ সংস্কৃতিতে যে কেবলমাত্র অসার অধ্যাত্মদর্শনের চর্চার চিহ্ন ছাড়া আর কিছু ছিল না তাহা সত্য নহে।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে ভারতের বিজ্ঞানচর্চা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং অন্ধকার ও নিষ্ক্রিয়তার একটা যুগ দেখা দেয় যাহার জন্য ভারত বিজ্ঞানচর্চায় আর অগ্রসর হয় নাই, অথবা বর্তমানে বিজ্ঞান জগতে যে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহাতেও অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু অধ্যাত্মদর্শননিষ্ঠ মনোভাবের বৃদ্ধি বা তজ্জাত অসহিষ্ণুতা জাতীয় মনকে বাহ্যপ্রকৃতির অনুশীলন হইতে টানিয়া লইয়াছে ইহা তাহার কারণ নহে। এই সময় সাধারণভাবে মনের সকল ক্ষেত্রে নূতন গবেষণায় একটা ছেদ পড়িয়াছিল; কারণ প্রায় ঐ সময়েই দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিও রুদ্ধ হইয়াছিল। শেষ যুগের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানীর নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের সময়ের মাত্র এক বা দুইশত বৎসর পর পর্যন্ত বৃহৎভাবে আধ্যাত্মিক দর্শনের মৌলিক গবেষণা দেখা যায়। ইহাও সত্য যে বর্তমান ইউরোপীয় দর্শন যেরূপ প্রধানতঃ জড়প্রকৃতির রাজ্যের সত্যসমূহের আলোকে সত্তার সত্য নির্ণয়ের বৃথা চেষ্টা করিয়াছে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন তাহা করে নাই। এই প্রাচীন জ্ঞানের ভিত্তি বরং আন্তর পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান ও গভীর চৈত্য বিজ্ঞানের (psychic science) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই সমস্ত বিজ্ঞানে ভারত জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর সফলতার সহিত অনন্য-সাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল—কিন্তু মন এবং অন্তরের শক্তিসমূহের চর্চা ও অনুশীলন নিশ্চয়ই প্রকৃতির চর্চা ও অনুশীলনেরই অন্তর্গত। ভারতের পক্ষে ইহা না করিয়া চলিত না, কারণ সত্তার আধ্যাত্মিক সত্যই সে খুঁজিতে-ছিল, এবং এই ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে প্রকৃতভাবে মহৎ ও স্থায়ী দর্শনশাস্ত্র উদ্ভূত হইতে পারে না; ইহাও সত্য যে তাহার সংস্কৃতি দার্শনিক সত্য, মনোবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতের সত্যের সঙ্গে যেরূপ গভীর-সামঞ্জস্য স্থাপিত করিয়াছিল, জড়জগতের সত্যের সহিত সেই পরিমাণে সামঞ্জস্য

স্থাপিত করিতে পারে নাই; জড়বিজ্ঞানের সে সময়ে তত উন্নতি হয় নাই যাহার ফলে এইরূপ হইতে পারিত; আধুনিককালে যে সার্বভৌম বৃহৎ নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার জন্য এইরূপ সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইহা উল্লেখ করা উচিত যে অতিপ্রথমে বৈদিকচিন্তার সময় হইতে ভারতীয় মন আধ্যাত্মিক মানসিক ও জাগতিক সত্তায় একই সাধারণ নিয়ম ও শক্তির খেলা অনুভব করিয়াছিল। প্রাণের সর্বব্যাপিত্বও ভারতীয়েরা আবিষ্কার করিয়াছিল; প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভিদ পশু ও মানবদেহের মধ্য দিয়া আত্মার ক্রমাভিব্যক্তি তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল; দার্শনিক প্রেরণা আধ্যাত্মিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা হইতে অনেক সত্যের বিবরণ তাহারা দিয়াছিল, যে সমস্ত সত্য বর্তমানে জড়বিজ্ঞানের গবেষণা তাহার জ্ঞানের বিশিষ্ট দিক হইতে পুনঃ-স্থাপিত করিতেছে। নিশ্চয়ই এ সমস্ত বস্তু অসার ও অনুর্বর দর্শনশাস্ত্রের ফলে অথবা কেবলমাত্র নাভিমূলে নিবদ্ধদৃষ্টি গরুর মত অজ্ঞ স্বপ্ন ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সাধিত হয় নাই।

ভারতীয় সভ্যতা জীবনের কোন মূল্য দেয় না, জাগতিক বিষয় ও কার্য হইতে বিরত থাকিতে চায় এবং বর্তমান জীবন অকিঞ্চিৎকর মনে করে—এইরূপ যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহাও সমভাবেই ভুল বর্ণনা। ইউরোপীয়গণের এই সমস্ত বিষয়ক মন্তব্য পড়িয়া মনে হয় ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মায়াবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নাই, ভারতের সকল শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক চিন্তার সমস্ত বর্ণনায় জাগতিক সবকিছু মিথ্যা এবং ভ্রম এবং তাহা হইতে ফিরিয়া দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নাই। সাধারণ ইউরোপীয়গণ ভারতের সম্বন্ধে এইসব কথা শুনিয়াছেন অথবা ইউরোপীয় মনীষীগণ এই সমস্ত চিন্তাধারার দ্বারা আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়াছেন বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ইহাই ভারতের সমগ্র চিন্তার ভাণ্ডার, তথায় ইহার অতিরিক্ত কিছু নাই—এ সমস্ত ইউরোপীয়ের প্রভাব যতই বেশী হউক না কেন তাহাতেও ইহাকেই একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রথমে বাসনা ও সম্ভোগ তাহার পর শরীর ও মনের প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে বাহ্য ভৌতিক বিষয়, অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ, তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণ ও ন্যায়ধর্মের পথে বিচরণ এবং অবশেষে আধ্যাত্মিক মুক্তি; এই চারি উদ্দেশ্য—এ দেশের ভাষায় কাম অর্থ ধর্ম ও মোক্ষ—মানুষের এই চতুর্বর্গ সাধন ভারতীয় পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ অতি স্পষ্টভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার কার্যই ছিল মানুষের মধ্যে এই সকল ভাবে জীবন যাপন এবং এই সমস্ত বিষয়ের রক্ষণ ও সম্ভোগ এবং ইহাদের রূপ ও উদ্দেশ্য-সকলের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন। অতি বিরল ক্ষেত্র ভিন্ন, সর্বত্র

এই সমস্তের মধ্যে প্রথম তিনটি পার্থিব উদ্দেশ্যের পরিতৃপ্তি-সাধন মোক্ষ-রূপ শেষ উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ববর্তীরূপে গৃহীত হইত; বিধান ছিল জাগতিক জীবনের ওপারে পদক্ষেপ করিবার পূর্বে চাই সে জীবনের পরিপূর্ণ পুষ্টি-সাধন। সমাজ সংসার ও দেবগণের নিকট মানুষের যে ঋণ আছে তাহা কখনই উপেক্ষার বস্তু ছিল না। স্বর্গের মহিমা অথবা পরমতত্ত্বের শান্তির স্থান, জগতের সব কিছুর উপরে হইলেও মানুষের উপর জগতের ও সংসারের খেলার যে দাবী আছে তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। ব্যাপকভাবে পর্বতগুহার আশ্রয় গ্রহণ বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য প্রচারকার্য কখনও চালান হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের জীবনে ও প্রকৃতিতে যে সুসঙ্গতি এবং তাহার সাহিত্যে জীবন্তভাবে যে বৈশিষ্ট্য ও বহুমুখিতা ছিল তাহা ইহবিমুখতা এবং একান্ত-ভাবে পারলৌকিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টির সহিত মিলে না। অতি বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য মানবজীবনেরই সাহিত্য; কেবল কিছু পরিমাণ দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক রচনায় জাগতিক জীবন পরিহারের কথা পাওয়া যায় কিন্তু এই সমস্ত রচনাও সাধারণতঃ জীবনের মূল্য সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে না। ইহসর্বস্ববাদী যাহাই বলুন না কেন, কোন প্রকারের আধ্যাত্মিক মুক্তি মানবাত্মার বিকাশের যে চরম ও পরম সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আর ভারতীয় মন এই মুক্তির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী বোধ করিলেও, ইহা ছাড়া আর কিছুর যে কোন প্রয়োজন নাই একথা বলে নাই। নৈতিক জীবন, আইন, রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞানের নানা শাখা, নানা বিষয়ক শিল্প ও কারুকার্য, মানবজীবনের সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে তাহার সমস্তের দিকে সে সমানভাবে নজর দিয়াছে। এ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও গভীরভাবে সে ভাবনা করিয়াছে এবং তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া সবলভাবে প্রকাশ করিয়াছে। মাত্র একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক; শুক্রনীতি—রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কি অপূর্ব প্রতিভাদীপ্ত কীর্তিস্তম্ভ এই শুক্রনীতি শাস্ত্র, একটি মহৎ সভ্যতার বাস্তব জীবনের কি সুন্দর স্বচ্ছ মুকুর! ভারতীয় শিল্প সর্বদা কেবলমাত্র এমনকি প্রধানতঃ ধর্মবিষয়ক ছিল না কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রমাণ আছে, আবার মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলীতেও দেখা যায় যে, শিল্প মন্দির অথবা আশ্রমের সঙ্গে রাজসভা এবং নগরেও সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরে বা পর্বতগুহায় উহার প্রধান কীর্তিসকল আজিও বর্তমান থাকাতে উহা ধর্মবিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিল এরূপ মনে হয়। বর্তমান সময়ের পূর্বে যতপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই যত গভীর ও পূর্ণভাবে এবং যত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় নাই; যে কেহ

অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে উৎসুক তাহাদের জন্য এ সমস্ত বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণের দলিলসমূহ বর্তমান আছে। ভারতীয় সভ্যতা তাহার প্রকৃতিতে যে ব্যবহারিকজ্ঞানশূন্য অধ্যাত্মধর্মী, কর্মবিমুখ এবং প্রাণধর্মবিরোধী এই ভ্রান্ত ধারণার তোতাবুলি অবিলম্বে বন্ধ করিয়া তাহার অভিজ্ঞ ও সত্যমূল্য নিরূপণের সময় আসিয়াছে।

কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য যে মানুষের মধ্যে যাহা সাধারণ জাগতিক বিষয়ের তন্ময়তা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছে, ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বদাই তাহাকে পরম মূল্য অর্পণ করিয়াছে, আমাদের ছোট আমিকে অতিক্রম করিবার দুষ্কর ও মহান আদর্শ মানুষের সাধনার যে চরম বস্তু ভারত চিরদিন একথা অন্তরে জাগরূক রাখিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক শক্তি ও ভোগ অপেক্ষা অধ্যাত্ম জীবন মহত্তর এবং কর্মী অপেক্ষা মনীষী, আর মনীষী অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সাধক উচ্চতর। জড়জগৎ বা বাহ্যমন লইয়া যাহা থাকে অথবা যাহার দৃষ্টি প্রাণময় ও মনোময় দেহের দাবি ও ভোগের দিকে শুধু নিবন্ধ সেই আত্মা অপেক্ষা যে আত্মা ভগবানে বাস করে সে যে পূর্ণতর ইহাই সে মনে করে। প্রকৃত পাশ্চাত্য এবং প্রকৃত ভারতীয় মনের পার্থক্য এখানেই স্পষ্টতর। পাশ্চাত্য মন স্বভাবতঃ ধর্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অধিকৃত নহে, ধর্ম তাহার পক্ষে একটি উপার্জিত বস্তু মাত্র, এই উপার্জিত বস্তুও সে খুব জোরের সহিত আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে নাই। কিন্তু ভারত চিরকাল বিশ্বাস করিয়াছে যে উচ্চতর এরূপ বহু জগৎ আছে এই জড়জগৎ যাহাদের বহির্বাটি মাত্র। সর্বদাই সে দেখিয়াছে যে আমাদের অন্তরে এই অহং বা মন ও প্রাণময় সত্তা হইতে একটি বৃহত্তর আত্মা আছে। সে বিশ্বাস করিয়াছে যে তাহার পার্থিব সত্তা যাহার মধ্যে অবস্থিত তেমন এক শাশ্বত সত্তা অতি নিকটে সদা বর্তমান আছে এবং মানবাত্মা আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার দিকে ক্রমশ অধিকতররূপে ফিরিতেছে, আর ভারতের হৃদয় ও মন সর্বদা এই সত্তাকেই প্রণতি জানাইয়া আসিয়াছে। জগন্মাতার পরম ভক্ত সুগায়ক বাঙ্গালী কবি (রামপ্রসাদ সেন) "এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা" এই অপরূপ গানে মানবজীবন সম্বন্ধে প্রকৃত ভারতীয় অনুভূতিই প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই যে মহত্তর আধ্যাত্মিক বিকাশের সম্ভাবনা আছে তাহাই ভারতকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। পুরাতন আর্যসংস্কৃতি মানুষের সকল সম্ভাবনাই স্বীকার করিয়াছে কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে এবং তদনুসারে মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল ধারা রূপে চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের সহায়ে সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। বৌদ্ধধর্মই প্রধানতঃ একান্ত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ এবং সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার প্রবল আবেগের উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়াছে

এবং প্রাচীন ভারতের মধ্যবর্তী ধারাগুলি মুছিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াছে। তাহার বিজয়ী ব্যবস্থা কার্যতঃ গৃহী ও ত্যাগী, সন্ন্যাসী ও সাধারণ লোক, সমাজকে কেবলমাত্র এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত এই বিভাগই বর্তমান রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই সমাজধর্মকে এইভাবে বিপর্যস্ত ও সমাজ জীবনকে দুর্বল করিবার জন্য নৈতিক উপাখ্যানের আবরণের ভিতর দিয়া বিষ্ণুপুরাণ বৌদ্ধধর্মকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে, কেন না ইহার তীব্র অতিরঞ্জন এবং গৃহী ও ত্যাগীর বিরোধের কঠোরতা অবশেষে সামাজিক জীবনকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অন্য আর এক দিকও ছিল যাহার গতি ছিল কর্ম এবং সৃষ্টির দিকে, যাহার বলে সে জীবনকে এক নূতন আলোক ও নূতন অর্থ দিয়াছিল এবং তাহাকে নৈতিকতার ও আদর্শশক্তির দিকে অভিনব ভাবধারায় উন্নীত করিয়াছিল। তাহার পর ভারতীয় সংস্কৃতির বিখ্যাত দ্বি-সহস্র বৎসরব্যাপী মহত্তম যুগের শেষে আসিল শঙ্করের সমুচ্চ মায়াবাদ; অবশ্য তখন হইতে জীবনকে অসত্য, আপেক্ষিক একটা ঘটনা বলিয়া অবজ্ঞা করা হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত এ জীবনযাপন করিবার, এ জীবনের কর্মে লিপ্ত থাকিবার অথবা এ জীবনের প্রেরণা অনুসারে চলিবার কোন সার্থকতা নাই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে এই মতবাদ সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই এবং কোথাও বিরোধ ভিন্ন স্বীকৃতি পায় নাই; এমন কি এ মতের বিরোধী পক্ষ শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় মন মায়াবাদের দ্বারা প্রবল-ভাবে অভিভূত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ লোকের চিন্তা ও অনুভূতি ইহা দ্বারা কখনই পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। যে ভক্তিধর্ম জীবনকে ভগবানের লীলা বা খেলারূপে দেখিয়াছে, মায়াবাদের অর্ধ-অন্ধকার অর্ধ-আলোকে শাশ্বত শুভ্র নীরবতাকে বিকৃত করিয়া দেখে নাই, তাহা গভীররূপে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; যদিও তাহা মায়াবাদকে পরাহত করিতে পারে নাই তবু তাহার কঠোর আদর্শকে অনেকটা কোমল ও মানবীয় করিয়াছে। মাত্র এই আধুনিক কালে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ ইংরাজ ও জার্মান পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিয়া শঙ্করের মায়াবাদকে ভারতের একমাত্র দর্শন মনে না করিলেও কিছুকালের জন্য তাহাকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই ভাবের বিরুদ্ধেও প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে, তাহার ফলে জীবনের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য আধ্যাত্মিকতার স্থানে আধ্যাত্মিকতার সহিত সম্বন্ধশূন্য জীবন যে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে তাহা নহে, বরং দেহমনপ্রাণকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অধিকৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তথাপি ইহা সত্য যে এই বৈরাগ্যের আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সংস্কৃতির যুগে শাশ্বত সত্তার উত্তুঙ্গ চূড়ায় উঠিয়া গিয়াছে; পরে ইহাই পরবর্তীকালে তাহার গুরুভার-শীর্ষ গম্বুজ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার নগ্ন ও গৌরবময় মহত্ত্বের চাপে সমাজসৌধের বাকী অংশগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে।

কিন্তু এখানেও সকল প্রকার অতিরঞ্জন ও মিথ্যা দোষের চাপ বর্জন করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত অবস্থা দেখিতে হইবে। মিঃ আর্চার প্রাণধর্মবিরোধী ভারতীয় ধারণার তালিকার মধ্যে কর্মবাদ ও পুনর্জন্মকেও টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা, অতীত ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের অসীমতার তুলনায় বর্তমান জীবনের কোন মূল্য নাই পুনর্জন্ম একথা প্রচার করে, যাহারা এরূপ কথা বলে তাহারা না বুঝিয়া মূর্খের মতই উক্তি করে। পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ আমাদিগকে বলে যে আত্মার একটা অতীত জীবন ছিল তাহাই তাহার বর্তমান জন্ম ও জীবনকে গঠিত করিয়াছে; আর তাহার একটা ভবিষ্যৎ আছে, আমাদের বর্তমান জীবনের কর্ম যাহাকে গড়িয়া তুলিতেছে; এই অতীত ও ভবিষ্যৎ যথাক্রমে জগতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ রূপে দেখা দিয়াছে এবং দিবে; আমাদের নিজ নিজ কর্ম একটা শক্তি, যে শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া অন্তর ও বাহিরের পরিণতি সাধন করে, আমাদের পূর্ণ প্রকৃতি গড়িয়া তোলে এবং অবশেষে আমাদিগকে পুনরায় জন্মের মধ্যে লইয়া যায়। ইহার ভিতরে বর্তমান জীবনের মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়ার কোন কথাই নাই। পক্ষান্তরে এ মতবাদ আমাদের সম্মুখে অতি বিশাল দৃশ্যবীথী উন্মুক্ত করে এবং কর্ম ও সাধনার মূল্য বহুল পরিমাণে উন্নীত করে। শুধু আশু ফললাভ মাত্র নহে পরন্তু আমাদের উত্তরকালীন ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবে বলিয়া বর্তমান কর্মের মূল্য অপরিমেয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য হউক বা বাহ্যিক বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য হউক বর্তমানে সর্বান্তঃকরণে তন্ময় হইয়া কর্ম ও তপস্যায় রত হওয়া যে তাহার সর্বশক্তিসম্পন্ন উপায় একথা ভারতীয় সকল সাহিত্যের মধ্যে সর্বদা অতি ব্যাপকভাবে দেখা যায় আর এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে গভীরভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। যাহারা জীবনকে বিশাল কালসাগরের ক্ষণস্থায়ী ঢেউ-মাত্র মনে করে, যাহারা মনে করে যে জীবনের পুনরাবৃত্তি নাই অথবা ইহার পশ্চাতে ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব কিছু থাকিবে না, এই জীবনই যাহাদের একমাত্র সুযোগ তাহারা বর্তমান জীবনের যে অতিমাত্রায় মূল্য দিবে ভারত সেরূপ মূল্য দিতে চাহে নাই, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু বর্তমানকে সঙ্কীর্ণভাবে অতিরঞ্জিত করিবার অর্থ মানুষের আত্মাকে বর্তমান ক্ষণের কারাগারে নিক্ষেপ করা; ইহাতে কর্মের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ আতিশয্য আসিতে পারে কিন্তু ইহা স্থৈর্য আনন্দ ও আত্মার মহত্ত্বের প্রতিকূল। তাহা ছাড়া ইহা নিঃসন্দেহ আমাদের বর্তমান দুঃখ-ভোগ আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল একথা মনে করিয়া ভারতীয় মন যে তাহাতে কিরূপ শান্তির সহিত সম্মতি দেয় এবং নির্ভরতার সহিত সহ্য করে চঞ্চল পাশ্চাত্য বুদ্ধির পক্ষে তাহা বুঝা বা স্বীকার করা কষ্টকর: তবে ইহা সত্য যে

কখনও কখনও জাতীয় দুর্বলতা ও অবসন্নতার দুর্দিনে এ বোধ বিকৃত হইয়া কর্মবিমুখ অদৃষ্টবাদে পরিণত হইতে এবং তাহার ফলে জাতীয় জীবনের প্রতিবিধানক্ষম সাধনাগ্নি নির্বাপিত হইতে পারে। কিন্তু এই মতের অনিবার্য গতি সেদিকে নহে এবং ইহা দেখা গিয়াছে যে আমাদের সংস্কৃতি যখন প্রবল ছিল সেই প্রাচীন যুগে ইহার গতি ঐরূপ নিশ্চলতার দিকে যায় নাই। তখন জাতীয় জীবনে কর্ম ও তপস্যার সুরই বাজিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধযুগে যখন পুনর্জন্ম কর্মের বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল এবং যখন জন্ম ও কর্মের পাশ হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত নীরবতার মধ্যে আত্মার প্রবেশ জীবনের শেষ কাম্য হইয়া উঠিল তখন এ মতবাদ আর এক দিক লক্ষ্য করিয়া চলিল। এই নূতন ধারণা হিন্দুত্বকে প্রবলভাবে অভিভূত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে যে কর্ম-বিমুখতার যুগ দেখা দিয়াছিল বস্তুতঃ জন্মান্তরবাদ হইতে তাহা আসে নাই; ইউরোপের প্রাণোদ্দীপ্ত ভাবনা যাহাকে ইহ-বিমুখ দুঃখবাদ বলিয়া কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার কোন কোন উপাদান তখন মানুষকে ভগ্নোদ্যম করিয়াছে।

কিন্তু এই নৈরাশ্যবাদ বা দুঃখবাদ কেবল ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য নহে; সকল উন্নত সভ্যতার চিন্তাধারার মধ্যে ইহার ছাপ কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃতির ইহা একটি চিহ্ন; যে মন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, জীবনধারা পরিমাপের চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে উহা দুঃখ ও জ্বালাময়, জাগতিক সুখ ও সাফল্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, জগতে নূতনত্ব কিছুতে নাই, যদি বা নূতন বলিয়া কিছু দেখা যায় তাহার নূতনত্ব অতি ক্ষণস্থায়ী—এই সমস্ত ভাব যে মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই মনের পরিণত ফল দুঃখবাদ। দুঃখ ও বৈরাগ্যবাদের প্রসারতা ভারতবর্ষে যতটা ইউরোপেও তদপেক্ষা কম হয় নাই; সকল লোকের মধ্যে জড়বাদী যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে দুঃখবাদ তাহার জীবনের মূল্য খর্ব করিয়াছে তখন সত্যই বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। কারণ মানবজীবনকে অতি ক্ষণস্থায়ী এবং পূর্ণভাবে জড়সত্তা মনে করা অপেক্ষা নৈরাশ্যজনক আর কি হইতে পারে? কোন কোন ইউরোপীয় দুঃখবাদ মানবজীবনকে যে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন চিরদুঃখের দুর্যোগ রাত্রির চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে সেখানে বর্তমানে আনন্দ নাই, ভবিষ্যতে কোন আশা নাই; এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিস্তৃতভাবে মৃত্যু ও দেহের বিলয়কে যেরূপ মহাদুঃখ ও ভীতির চক্ষুতে দেখা হইয়াছে, ভারতীয় মনের অতি কঠোর তপশ্চর্যার মধ্যেও সে-জাতীয় কিছু পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্মে আমরা অনেক সময় যে কঠোর দুঃখবাদের সুর শুনিতে পাই, তাহা খাঁটি পাশ্চাত্য দেশজাত, কারণ যীশুখৃষ্টের নিজ শিক্ষার মধ্যে ইহা নাই।

ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্মে দেখিতে পাই দুঃখযন্ত্রণার প্রতীক ক্রুশই (cross) তাহার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্ন, দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়াই মুক্তির পথ, তাহার মতে ইহজগৎ সয়তান কর্তৃক অধ্যুষিত, কামনা বাসনার দ্বারা জর্জরিত। মৃত্যুর পর মানুষের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে এক চিরনরকের দুঃখদাহ; এইভাবের খৃষ্টধর্মে যে দুঃখ ও ভীতির চিত্র দেখিতে পাই ভারতীয় মন তাহা দেখিতে অভ্যস্ত নয়; ধর্মের সঙ্গে ভীতির সম্বন্ধ সে কখন কল্পনাও করে নাই। জগতে দুঃখ আছে বটে কিন্তু দুঃখের পরপারে যে আধ্যাত্মিক শান্তি ও পরমানন্দ আছে এ দুঃখ গিয়া তাহাতে মিশিয়া বিলয় হইয়া যায়। জগতের দুঃখ ও ক্ষণস্থায়িত্বের উপর বুদ্ধের শিক্ষা খুব জোর দেয় বটে কিন্তু নৈতিক জগতে আত্মজয়ের মহাবীর্য এবং প্রশান্ত জ্ঞানদ্বারা লব্ধ বৌদ্ধদের নির্বাণ এক অনির্বচনীয় পরমশান্তি ও আনন্দের অবস্থা, খৃষ্টানগণের স্বর্গের মত সেখানে পৌঁছিবার অধিকার শুধু কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় পরন্তু তাহার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত, সে নির্বাণ পাশ্চাত্য দেশীয় দুঃখবাদীর দুঃখময় নির্বাণের মত দুঃখ ও সংঘর্ষ হইতে যান্ত্রিক ভাবের শূন্যময় এক মুক্তি বা জড়-বাদীর নির্বাণের মত সব কিছুর নিঃশেষে অবসান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এমন কি মায়াবাদও দুঃখের বার্তা প্রচার করে নাই, সমস্ত জগৎ ও তাহার সুখ-দুঃখের অন্তিম মিথ্যাত্বের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ইহাও জীবনের ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিবে তাহাদের পক্ষে জীবনের নানা ক্ষেত্রের যথাযথ মূল্য দিতে কোন দিন অস্বীকার করে নাই। ভারতীয় অন্যান্য তপস্বীর মত মায়াবাদীও মহৎ প্রচেষ্টা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জ্ঞানানুশীলন এবং সংকল্পের প্রবল আবেগ দ্বারা এক নিত্য শাশ্বত সত্তা ও অচ্যুত আনন্দে উন্নীত হওয়ার পরম সম্ভাবনা মানবাত্মার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক জীবনে দুঃখবাদ স্বীকার করিয়াছে কিন্তু তাহা হীন নহে, মানবজীবনের অপূর্ণতা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছে, তাহার অর্থহীন অন্ধকার ক্ষুদ্রতা এবং অজ্ঞানের জন্য একটা বিতৃষ্ণা বোধ করিয়াছে; কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক পরিণতি সম্বন্ধে অজেয় আশা পোষণ করিয়াছে ইহাই তাহার মনোগতির আর একটা দিক। হয়ত ইহা মানবজাতির বাহ্যোন্নতির বিশালতা অথবা পার্থিব ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক জীবনের পূর্ণ পরিণতিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রত্যেক জীব আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া জীবনের সর্বপ্রকার সংঘাতের অধীনতার ঊর্ধ্বে যে উঠিতে এবং এক চরম পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে একথা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছে। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে জীবন যে দুঃখময় ইহাই যে একমাত্র সুর তাহাও নহে; অধিকাংশ লোকে যে ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে তাহাতে তাহারা জীবনকে শ্রীভগবানের লীলা ও খেলা বলিয়া মনে করে এবং প্রত্যেক মানুষই যে সেই

লীলাময়ের অতি নিকটে আছে, বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলে প্রত্যেকেই যে তাহা অনুভব করিতে পারিবে, চরমে জ্যোতিষ্মান ভগবদ্ভাবে উন্নীত হইবার শক্তি প্রত্যেক মানুষের আছে ইহা তাহারা বিশ্বাস করে। এরূপ মতকে অবসাদজনক দুঃখবাদ বলা কি চলে?

অন্ততঃ কিছু পরিমাণ তপশ্চর্যা ভিন্ন কোন সংস্কৃতি মহত্ত্ব ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; কারণ যাহা দ্বারা মানুষ তাহার নিম্নপ্রকৃতি ও আবেগ দমন করিয়া তাহার সত্তার উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে পারে সেই ত্যাগ ও আত্মজয়ই তপস্যার প্রকৃত অর্থ। ভারতীয় তপশ্চর্যা দুঃখ ও করুণাত্মক অথবা পীড়াদায়ক প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর শারীরিক পীড়ন মাত্র নহে, পরন্তু মহত্তর আনন্দলাভ ও পরিপূর্ণতম অধ্যাত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মহৎ প্রচেষ্টা। ইহার অনুভূতিতে সকলের অন্তরে আত্মজয়ের বৃহৎ আনন্দ, অন্তর্জীবনের শান্তি ও সুখ এবং ক্ষুদ্র আমিত্বকে চরমভাবে অতিক্রম করিবার এক সবল উল্লাস আছে। যে মন দৈহিক ভোগে নিমজ্জিত, বাহ্যজীবন ও তাহার অস্থির প্রয়াস এবং অস্থায়ী তৃপ্তিতে যাহা বিমোহিত কেবল তাহাই তপস্যারত অধ্যবসায়ের মহত্ত্ব ও আদর্শ উচ্চতা অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু কালক্রমে সকল আদর্শই অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট হইয়া উঠে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মানুষের পক্ষে যে আদর্শপালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তাহাতেই এ দোষ-ত্রুটি বেশী দেখা দেয়; প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে তপস্যা কেবল ধর্মোন্মত্ত আত্মপীড়নে অথবা প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে দমনের প্রয়াসে পর্যবসিত হইতে পারে, অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের জন্য যে দুঃখবরণ করিতে, যে প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় দুর্বলের পক্ষে তাহা ত্যাগ করিয়া অলস জীবন পালনের যে ইচ্ছা আসিতে অথবা শ্রান্ত হইয়া জীবনের ক্ষেত্র হইতে পলায়নের যে চেষ্টা দেখা দিতে পারে তাহাই তপস্যার নিন্দার রূপ ধারণ করে। অল্প লোকের মধ্যেই অন্তরের ডাক আসিয়া থাকে, শুধু এই অল্পেরই আচরণের জন্য না রাখিয়া যখন তপস্যার কঠোরতম আদর্শ সাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা হয়, যখন সে ধর্মগ্রহণ জন্য যাহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, এরূপ অসংখ্য লোক এই পথে চলিতে চায় তখন তপস্যার আদর্শের অধোগতি হয়, অনেক মেকী চলিতে আরম্ভ করে, জাতীয় প্রাণের সাবলীলতা নষ্ট হয়, উন্নতির পথে দ্রুত চলিবার সামর্থ্য লোপ পায়। ভারতে যে এরূপ দোষ কখনও দেখা দেয় নাই, এরূপ প্রতিকূল ফল প্রসব করে নাই একথা বলা চলে না। কেবলমাত্র তপশ্চর্যার আদর্শই যে মানুষের জীবনসমস্যার সমাধানের একমাত্র প্রকৃষ্ট আদর্শ তাহা আমি অবশ্য স্বীকার করি না। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একথা বলা চলে যে তপশ্চর্যার মাত্রাতিগ অনুশীলনের দোষাবলীর পশ্চাতে এমন একটা মহত্তর ভাব আছে যাহা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে

প্রাণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভোগবিলাসের ভিন্নপ্রকার দোষের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সে যাহা হউক তপশ্চর্যা এবং মায়াবাদ এক্ষেত্রে বিচারে গৌণ, এখানে প্রকৃত বিষয় হইতেছে যে ভারতে তপশ্চর্যা তাহার সমৃদ্ধির যুগে বা তাহার অন্তরতর তাৎপর্যে কখনই শ্রান্ত নৈষ্কর্ম বা গতানুগতিক সন্ন্যাসধর্মে পরিণত হয় নাই; পক্ষান্তরে ইহা বাসনা ও প্রাণময় ভোগের জগৎ হইতে মানুষের আত্মাকে উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নীত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা জাগাইয়া দিয়াছে এবং যেখানে আধ্যাত্মিক নীরবতা, মহত্ত্ব, শক্তি, জ্ঞান, ভগবদুপলব্ধি, স্থির শান্তি এবং আনন্দ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে সেইখানে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক মনের বহির্মুখী কর্মোন্মত্ততা, এই দুইকে সম্মুখে রাখিয়া প্রশ্ন হইতেছে, মানুষের চরম পরিপূর্ণতা লাভের পক্ষে এরূপ সাধনা অপরিহার্য কিনা? এবং যদি তাহাই হয় তবে তাহার পরে এই প্রশ্ন উঠে যে ইহা কি শুধু কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ এক বিশেষ শক্তিরূপে থাকিবে অথবা ইহাকে সমগ্র মানবজাতির মহান সংস্কৃতির সর্বপ্রধান প্রেরণাদায়ী শক্তি করিয়া তোলা যাইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের জীবন-মূল্যের (life-value) যথার্থ বিচার ভারতীয় ধর্মের জীবন-মূল্যের যথার্থবোধের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে বিজড়িত; এই সংস্কৃতিতে ধর্ম ও দর্শন এত প্রগাঢ়ভাবে যুক্ত ও একীভূত যে এককে অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না। ভারতীয় দর্শন অধিকাংশ ইউরোপীয় দর্শনের মত শূন্যগর্ভ শুদ্ধ যুক্তিতর্কের নিছক ব্যায়াম অথবা ভাবনা ও বাক্যের এক অতিসূক্ষ্ম বুনানি মাত্র নহে; ইহা হইল যাহা কিছু ভারতীয় ধর্মের আত্মা, ভাবনা, সক্রিয় সত্য, যাহা কিছু তাহার অনুভূতি ও শক্তির মর্ম তৎসম্বন্ধে বুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত সুসংগঠিত মানসিক মতবাদ অথবা তাহাদের সম্বোধিজাত উপলব্ধির সুবিন্যস্ত বিবরণ। কর্ম ও অনুভূতিতে প্রযোজিত আধ্যাত্মিক দর্শনের নামই ভারতীয় ধর্ম। বিশাল সমৃদ্ধ সহস্রমুখী অতি দৃঢ় ভিত্তিতে গঠিত অথচ সর্বদিকে নমনীয় হিন্দুত্ব নামে পরিচিত এই ধর্মের মধ্যে যাহা কিছুর উদ্দেশ্য এই বিবরণের সহিত মিলে না—লৌকিক ব্যবহারে যাহাই হউক না কেন—তাহারা নানা কারণে আসিয়াছে;—তাহাদের কতকগুলি আসিয়াছে সমাজ গঠনের দিক হইতে আবার কতকগুলি এই ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন কালে আচারের যে প্রাচীর বা উপস্তম্ভ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল তাহার বর্ধিতাংশ বা ধ্বংসাবশেষ; অথবা কালক্রমে সকল ধর্মের ভাবনা ও সাধনার মধ্যে যে বহু দোষত্রুটির মিশ্রণ ক্রমশ অধিকতররূপে দেখা দেয়, ইতর সাধারণের মধ্যে ধর্মের সত্য ও তাৎপর্যের যে অবনতি ঘটে এবং যে সমস্ত জঞ্জাল আসিয়া পুঞ্জীভূত হয় ইহাদের কতকাংশ তাহারই ফল হইতে পারে; কিম্বা ভূগর্ভস্থ মৃত প্রাণীর অস্থি যেমন কালক্রমে প্রস্তরীভূত (fossilised) হয় সেইরূপ যে যুগে ধর্ম প্রাণশক্তি হারাইবার পরে প্রাচীন অনড় অভ্যাসমাত্রে পর্যবসিত হয়, তখন ইহার কতকগুলি দেখা দিয়াছে, আবার কতকগুলি শুধু বহিরাগত পদার্থ যাহারা ইহার বিশাল দেহে ক্রমশ সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু পরিপাক হইয়া জীবনে অঙ্গীভূত হয় নাই। তাহার আন্তর তত্ত্বে সকল ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরমতসহিষ্ণু

এবং গ্রহণশীল; খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্ম যেমন নিজ নিজ ভাবধারার গন্ডীমধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ থাকিয়া অপর সকল ধর্ম হইতে নিজেরা কঠোরভাবে পৃথক থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে হিন্দুধর্ম তাহা করে নাই; নিজ প্রকৃতির শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য এবং নিজ সত্তার বিধান নষ্ট না করিয়া অপরের নিকট হইতে যতটা গ্রহণ করা যায় তাহা সে গ্রহণ বা অর্জন করিয়াছে, নিজের মধ্যে সমন্বিত, নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। চতুর্দিক হইতে সর্বদা নানা বস্তু সে গ্রহণ করিয়াছে, এবং নিজের আধ্যাত্মিক হৃদয় ও অন্তরাত্মার প্রজ্বলিত শুভ্র তাপে যে সমস্ত উপাদান হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিবার আশা নাই তাহাদিগকে পর্যন্ত গলাইয়া পরিপাক করিয়া ও নিজের অধ্যাত্মসত্তার অংশ করিয়া লইবার তাহার যে শক্তি আছে তাহাকে মুক্তভাবে কার্য করিতে দিয়াছে এবং তাহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ধর্মানুমোদিত ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এমন কি আছে যাহা শত্রু-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সমালোচকের মনে সুতীব্র ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উদ্ভূত অতি-প্রাচীন তথাপি আজ পর্যন্ত সতেজ ও জীবন্ত, সর্বগ্রাহী ও চিরবর্ধিষ্ণু এই হিন্দুধর্মের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে তাহার কি বলিবার আছে তাহা বিবেচনা করা সমীচীন মনে করি। কেননা তাহার অনেক কিছু বলিবার আছে এবং মুক্তকণ্ঠে অপরিমিত ভাবেই তাহা বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে একশ্রেণীর খৃষ্টান সাহিত্যের নমুনাই এই যে নিন্দা প্রবৃত্তির উন্মত্ততায় অপ্রকৃতিস্থভাবে তাহাতে মিথ্যাসাক্ষ্য, ঘৃণা, সংকীর্ণচিত্ততা এবং যাহা কিছু মলিন, যাহা কিছু অনাধ্যাত্মিক, যাহা কিছু অধোগামী তাহার উদ্‌গীরণ দেখা যায়; সার জন উড্‌রফ্‌ মিঃ হ্যারল্‌ড বেগ্‌বী নামক অন্য এক ব্যক্তির লেখা হইতে এইরূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য পরিবেশনের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা দেখাইয়াছেন; যদি উগ্রভাবে আক্রমণ করিলে তাহা পৌরুষব্যঞ্জক হয় তবে হয়ত এরূপ লেখা 'পৌরুষব্যঞ্জক' হইতে পারে কিন্তু নিশ্চয় ইহা সুস্থ মন ও নির্মলবুদ্ধিপ্রসূত নহে; হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মিঃ আর্চার যদিও পূর্বোক্ত খৃষ্টান সাহিত্যের মত এত-দূর পর্যন্ত যান নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার লেখাতে অপরিমিত ভর্ৎসনারাশির দেখা পাই, যেখানে নিন্দার সামান্য কিছু তিনি পাইয়াছেন সেখানে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা নিছক অযৌক্তিক এমন সব কথা বলিয়াছেন এমন কি ইচ্ছাপূর্বক হর্ষোৎফুল্লচিত্তে মিথ্যা বর্ণনা দিয়াছেন। তথাপি স্থূল ও অমার্জিত বর্ণনার এই বিশাল স্তূপের মধ্য হইতেও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্যের বিদ্বেষের কি কি প্রধান ও বিশিষ্ট কারণ আছে তাহা বাহির করা সম্ভব, যে বিদ্বেষ তথাকার অনেকে বিচার বিবেচনা না করিয়া পোষণ করে এমন কি

অনেক বিচারশীল সমালোচকের মধ্যেও দেখা যায়; আমাদের পক্ষে এই কারণগুলি বাহির করিয়া দেখার আবশ্যকতা শুধু আছে।

মিঃ আর্চারের আক্রমণের প্রধান বিষয় হইল হিন্দুধর্মের সামগ্রিক অযৌক্তিকতা। তিনি একথা প্রসঙ্গত স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় ধর্মের মধ্যে একটা দার্শনিক উপাদান আছে; সুতরাং তাহা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে তাহার মধ্যে একটা যুক্তিপূর্ণ উপাদানও রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি তিনি যেসবকে এই ধর্মমূলক দর্শনের মূল ও প্রধান ভাবধারা বলিয়া বুঝিয়াছেন অথবা বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন এবং মিথ্যা ও নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকারক বলিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। হিন্দুধর্মের সর্বব্যাপী অযৌক্তিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা তিনি এই বলিয়া করিতে চাহিয়াছেন যে প্রকৃত বস্তু ছাড়িয়া তাহার রূপের দিকে, ভাব ছাড়িয়া বাক্যের বা তাহার বাহিরের আকারের দিকে নামিয়া পড়িবার একটা প্রবল প্রবণতা ভারতবাসীর চরিত্রে সর্বদা দেখা যায়। বলা যাইতে পারে যে এই অধোগতিপ্রমুখতা মানবপ্রকৃতির একটা সর্বজনীন লক্ষণ; শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নহে, সমাজে রাজনীতিতে সাহিত্যে শিল্পে এমন কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহা দেখা যায়। মানুষের যাবতীয় কর্মে রূপের পূজা ও তাহার আন্তর সত্তার বিস্মরণ, প্রচলিত প্রথায় মগ্নতা, বাহ্য বিষয়ে অভিনিবেশ ও চিন্তাহীন গোঁড়ামী চীন হইতে পেরু পর্যন্ত সকল দেশের লোকের মধ্যে সাধারণভাবেই প্রত্যক্ষ করা যায়; ইহা পথিমধ্যস্থ ইউরোপকে বাদ দিয়া যায় নাই। গোঁড়ামী, নিছক বুলি, আনুষ্ঠানিকতা এবং গীর্জা শাসনতন্ত্রের স্বপক্ষে মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতা যতপ্রকার উপায় কল্পনা করিতে পারে তত উপায়ে যে-ইউরোপ সর্বদা যুদ্ধ, নরহত্যা, অগ্নিদাহন, কারানিপীড়ন, নিষ্পেষণ ও নির্যাতন করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই, যে-ইউরোপ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি কর্তব্যসম্পাদন বলিয়া এই সমস্ত অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে সেই ইউরোপের এমন কোন কৃতিত্ব নাই যাহার জন্য সে প্রাচ্যের মুখের উপর এইরূপ গালিবর্ষণের অধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে এই অধঃপতন, শাঁস ফেলিয়া খোলা লইয়া থাকিবার এই প্রবৃত্তি, অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মকেই বেশী অভিভূত করিয়াছে। সংস্কারপরায়ণ কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোথাও উচ্চতর হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায় না; প্রচলিত হিন্দুত্ব, লোক-সাধারণের দ্বারা আচরিত হিন্দুধর্ম কিম্ভূতকিমাকার প্রাচীন জনশ্রুতি ও পুরাকাহিনী দ্বারা পরিচালিত একটা পূজাপদ্ধতিমাত্র, ইহাতে কল্পনা পর্যন্ত প্রপীড়িত ও জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়,—এক্ষেত্রেও সৃষ্টিসমর্থ কল্পনার জড়তা ত নহেই বরং বাহুল্য ঘটিয়াছে এই অভিযোগই ভারতীয় মনের বিরুদ্ধে আনা যাইতে পারে। তাঁহারা আরও বলেন জড়ে চৈতন্যের আরোপ ও যাদুবিদ্যা

(animism and magic) এ ধর্মের প্রচলিত বৈশিষ্ট্য। ভারতবাসীগণ নাকি যুক্তিবিচারের শক্তিকে আবিল ও বিভ্রান্ত করিয়া ধর্মকে প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান ও জড়ত্বে পরিণত করিয়া তাহার অবনতিসাধনের অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছে। ভারতে মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যদি জন্মিয়া থাকেন তবু তাঁহাদের ভাবনারাজি হইতে ভারতবাসীগণ কোন যুক্তিসঙ্গত মহনীয় ধর্ম বাহির করিয়া নিতে পারে নাই; তুলনায় স্পেন অথবা রুশ দেশীয় কৃষকগণের ভক্তি ইহাপেক্ষা অধিকতর যুক্তি ও জ্ঞানালোকপূর্ণ দেখা যাইবে। অযৌক্তিকতা ও যুক্তিবিরুদ্ধতা, কষ্টকল্পিত এবং মাত্রাতিগ এই অভিযোগ সর্বদা করা হইয়াছে; মিঃ আর্চার-গীতিকার ইহাই মূল সুর।

আধুনিকতার প্রবল বন্যা ও তাহার ধ্বংসকর উপযোগিতামূলক স্বাধীন চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া যায় নাই এইরূপ প্রাচীন ধর্মভাব অথবা প্রাচীন ধরনের বৃহৎ ধর্মমতগুলি ভারতবর্ষ হইতে কিছুতেই বিলুপ্ত হইতে চায় না ইহা দেখিয়া এই সমালোচক বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য জগৎ ত দূরের কথা, চীন ও জাপান পর্যন্ত বহুকাল যে সমস্ত ভাব-ধারাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ভারতবর্ষ এখনও তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। পূজা অর্চনা ও ক্রিয়াকর্মবহুল এ ধর্ম কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছু নহে, আধুনিক মানুষের জ্ঞানালোকিত স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ মন ইহা সহ্য করিতে পারে না। এইরূপ দৈনিক আচার-অনুষ্ঠান ভারতবাসীকে সভ্যতার ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ধর্মের অনুষ্ঠান শিষ্টভাবে শুধু রবিবারে ভজনালয়ে গমন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়কার উপাসনা এবং মাংসভোজনের পূর্বে প্রার্থনায় যদি পর্যবসিত হইত তবে তাহাকে হয়ত-বা মানবীয় ধর্ম বলা যাইত অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহা সহ্য করা চলিত! যেরূপ অবস্থায় ইহা রহিয়াছে তাহাতে বর্তমান জগতের পক্ষে এ ধর্ম কালাতিক্রম দোষদুষ্ট; ত্রিশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার কোন সংস্কার হয় নাই, ইহা পৌত্তলিক, অবিশোধিতভাবে পূর্ণরূপে পৌত্তলিক; ইহার প্রবণতা সংস্কার ও শুদ্ধির দিকে না গিয়া মলিনতা ও অপবিত্রতার দিকেই গিয়াছে বলিয়া জগতের ধর্ম-সমূহের মধ্যে কাহারও সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না, ইহার স্থান সর্বনিম্নে। প্রতিকারের একটি অদ্ভুত উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম ইউরোপে পৌত্তলিকতা ধ্বংস করিয়াছে : সুতরাং অবিলম্বে বা অতি দ্রুত-গতিতে অবিশ্বাসী স্বাধীন চিন্তার বিজয়লাভ রূপ পরম সুখকর অকস্মাৎ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব হইতেছে না বলিয়া জ্ঞানালোকবর্জিত কলুষিত ও অশুদ্ধ হিন্দুদিগকে সাময়িকভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—যদিও সে ধর্মও যুক্তিহীন ও অসার এবং ইহসর্বস্ববাদীর যুক্তির প্রবল আলোকে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিকৃত বলিয়াই দৃষ্ট হয়; খৃষ্টধর্মকে

পছন্দ করিবার কারণ, এই ধর্ম বিশেষতঃ ইহার প্রটেষ্টান্ট শাখা নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়তার মহান স্বাধীনতা, এবং কলঙ্কশূন্য পবিত্রতার দিকে চলিবার পথে অন্ততঃপক্ষে প্রস্তুতির সোপানের কাজ উত্তমরূপে সাধিত করিতে পারিবে। দুর্ভিক্ষের সময় কিছু লোককে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করানো গেলেও সকলে যে ইহা করিবে ইহা মনে হয় না; কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারও যখন আশা করা যায় না তখন অন্ততঃপক্ষে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে কোন উপায়ে একটা শুদ্ধির ব্যবস্থা আনয়ন করা প্রয়োজন এবং এই প্রকার স্বাস্থ্যানুকূল পরিবর্তন যতদিন না আসিবে ততদিন পর্যন্ত ভারতকে অন্য সভ্য জাতির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যাইবে না অথবা অন্যজাতির সহচর হওয়ার জন্য তাহার দাবি অস্বীকার করিতে হইবে!

আমরা দেখিতে পাই, যুক্তিহীনতা ও তাহার সঙ্গে উপস্থাপিত পৌত্তলিকতা এই দুই অভিযোগের সমর্থনজন্য প্রসঙ্গক্রমে আমাদের ও আমাদের ধর্মসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তৃতীয় আর একটি গুরুতর ও সম্ভ্রমহানিকর অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে—হিন্দুধর্ম নাকি নৈতিক জীবনের মূল্য এবং নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাই। বর্তমান কালে এমন কি ইউরোপও ক্রমশ অধিকতর ভাবে অনুভব করিতেছে যে যুক্তি মানুষী মনের শেষ কথা নহে, সত্যে পৌঁছিবার পক্ষে বিচারবুদ্ধি যে একমাত্র অথবা প্রধানতম পন্থা একথাও পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইতেছে না; ইহাই ধর্ম ও অধ্যাত্মসত্যের একমাত্র নিয়ামক নহে। পৌত্তলিকতার অভিযোগ দ্বারাও প্রশ্ন সুমীমাংসিত হয় না, কেননা এই অনুপযোগী নিন্দাসূচক নাম দিয়া খৃষ্টানগণের অজ্ঞতা প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় জড় করিয়া রাখিয়াছে বস্তুত তাহার মধ্যে মহান, সত্য ও সুন্দর বস্তু যে আছে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এখন তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পাইতেছেন; এই সমস্ত প্রাচীন মহৎ রূপ ও প্রবর্তক শক্তিকে হারাইয়া জগৎ যে সত্য সত্যই লাভবান হইয়াছে একথাও সত্য নহে। বাস্তব আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণ মানুষে দুই বিপরীতভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ রহিয়াছে; একদিকে তাহার মধ্যে সরলতা আছে কিন্তু তাহা ফলোৎপাদনে একেবারেই অসমর্থ, সে সুনামযুক্ত বা নৈতিক চরিত্রবিশিষ্ট হইতে চায়, অন্যদিকে তাহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা ও অর্ধকপটতাও দেখা যায়; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে যাহাই করুক না কেন তাহার নৈতিক সংস্কারের নিকট সর্বদাই কার্যকরীভাবে আবেদন করা যায়। সকল ধর্মই নৈতিক চরিত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে চায়, এবং যে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করিতে চায় এরূপ বিদ্রোহী ও মানব-বিদ্বেষী ছাড়া অন্য সকলে, তা তাহারা ধার্মিকই হউক বা বৈষয়িকই হউক নিজেরা নৈতিক জীবন পালন করিতেছে ইহা বলে অথবা অন্ততঃপক্ষে নিজেদের জীবনে নৈতিকতার আদর্শ

রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। সুতরাং কোন ধর্মের বিরুদ্ধে যত প্রকার অভিযোগ আনা যায় এই অভিযোগই তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। কিন্তু যিনি নিজেই অভিযোগকারী ও বিচারক এই উভয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহার উত্তেজিত গালিবর্ষণ ও কটূক্তি আমরা আলোচনা করিতেছি তিনি নিঃসঙ্কোচে এবং মাত্রাজ্ঞান রক্ষা না করিয়াই ইহা করিয়াছেন। তিনি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম মানুষকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারে না, এমনকি নৈতিক জীবন গঠনেও সাহায্য করে না; ইহা সদাচার বা পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে বটে কিন্তু নৈতিক শিক্ষা দেওয়া ইহার কর্তব্য-কর্ম বলিয়া কখনও দাবি করে নাই। কোন ধর্ম যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য পালন না করিয়া পবিত্রতা ও সদাচারের কথা বেশ বলিতে পারে—তাঁহার এই উক্তিটি সমচতুর্ভুজ কোন ক্ষেত্র চারিবাহুবিশিষ্ট হওয়ার দাবি করিতে পারে না, এইরূপ বাক্যের মতই অদ্ভুত বোধ হয়; কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। পাশ্চাত্য জাতিসুলভ কতকগুলি স্থূলতর পাপ হইতে হিন্দুচরিত্র যদি অধিকতরভাবে মুক্ত থাকিয়া থাকে—হয়ত শুধু এখনও মুক্ত আছে এবং যতদিন পর্যন্ত খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বা অন্য উপায়ে "সভ্যতার সীমার" মধ্যে প্রবেশ না করিবে ততদিনই ইহা সম্ভব থাকিবে—তবে তাহার কারণ এই যে তাহার চরিত্রে নৈতিক কোন গুণ বা শক্তি আছে তাহা নহে; কারণ এই যে এই সকল পাপ তাহার নিকট উপস্থিত হয় নাই! তাহার সামাজিক জীবন ধর্মের এবং দিব্য ও মানুষী, সর্বজনীন ও ব্যষ্টিগত, নৈতিক ও সামাজিক বিধানের বর্বর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতি পদে তাহার দ্বারা সমর্থিত বলিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতা এইভাবে নীতি লঙ্ঘনের যে সমস্ত সুযোগ এত প্রভূত পরিমাণে দিয়াছে হয়ত ভারতীয় সমাজ মূর্খতাবশতঃ সে সমস্ত সুযোগ মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে পারে নাই, ইহাই নির্দেশ করে! বেশ ধীরভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে যাহা কিছু বীভৎস ও অস্বাস্থ্যকর তাহারই প্রতি সমগ্র হিন্দু প্রকৃতির এক অবসাদজনক আসক্তি আছে—আর এই প্রকৃতিই তাহার জাতীয় চরিত্র! উচ্চতম সুরে অপরিমিত ভর্ৎসনার গান গাহিয়া মিঃ আর্চার মর্যাদা-হানির বীভৎস ও অস্বাস্থ্যকর নৃত্যে নিযুক্ত থাকুন, আমরা ইত্যবসরে তাঁহার স্বভাবের মধ্যে এই বিরক্তি ও ক্রোধের উৎপত্তিস্থান কোথায় তাহা পৃথক করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

বিশেষতঃ দুইটি বস্তুর দ্বারা সাধারণ ইউরোপীয় মনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—কেননা কতিপয় মহাত্মা বা কয়েকজন গভীর চিন্তাশীল মনীষীর কথা অথবা যে যুগে ইউরোপে অস্বাভাবিকভাবে ধর্মের আবেগ বাড়িয়া গিয়াছিল সেই স্বল্পকালস্থায়ী সময় বা যুগগুলি বাদ দিয়া তাহার জীবনের প্রধান সুরগুলির দিকেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই দুইটি

বৈশিষ্ট্যের একটি হইতেছে প্রাণধর্মের অপরটি অনুসন্ধিৎসু সংজ্ঞাদায়ক কার্যকরী বাস্তব যুক্তিবিচারের পূজা ও আরাধনা। এই দ্বৈতশক্তির ঊর্ধ্বগামী প্রবল অনুপ্রেরণাতেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল বন্যা আসিয়াছে; গ্রীক্ সংস্কৃতির যুগে অথবা কনস্টানটাইনের (Constantine) পূর্ববর্তী কালের রোমান অভ্যুদয় কিম্বা চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন নবজাগরণ আসিয়াছিল সেই রেনেসাঁসের (Renaissance) যুগে অথবা বর্তমানে ইউরোপ যখন এক দিকে শ্রমশিল্প অন্য দিকে জড়বিজ্ঞান এই দুই বিরাট মূর্তিপূজায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে তখনও এই শক্তিপ্রবাহের প্রবল ক্রিয়াই আমরা দেখিতে পাই। যখনই এই দুই শক্তিতে ভাঁটা ধরিয়াছে তখনই ইউরোপ অতি মাত্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জীবনে অন্ধকার ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। কোন কোন নৈতিক ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার দিকে যাহা করুক না কেন তৎসত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে এ ধর্ম ইউরোপ যে দুই প্রবল সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে; যুক্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং পূর্ণজীবনের উদ্যমশীলতা এবং সম্ভোগের পরিতৃপ্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এসিয়াতে যেমন যুক্তিবাদের অথবা প্রাণধর্মের এই অতি প্রাধান্য কোনদিনই ছিল না তেমনি ইহাদিগকে ধর্মজীবনের পরিপন্থী বলিয়াও কখন গণ্য করা হয় নাই। এসিয়ার শ্রেষ্ঠ যুগসমূহে যে যে সময়ে আধ্যাত্মিক আলোকধারার কল্লোল আসিয়াছে, ধার্মিক ও ধর্মানুগত দার্শনিক মন প্রবলভাবে অথবা গভীররূপে উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়াছে, মহত্তম উজ্জ্বলতম মধুরতম সত্যসকল প্রকাশ পাইয়াছে বা অনুভূতিতে ধরা দিয়াছে, দেখা গিয়াছে যে তখনই তাহাদের উপর ভর করিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবলভাবে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে,—ভারতবর্ষে উচ্চ বৈদিক যুগারম্ভ, উপনিষদের মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলন, বৌদ্ধধর্ম বেদান্ত-সাংখ্য-পুরাণ এবং তান্ত্রিকধর্মের প্রবল বন্যা আসিয়াছে অথবা দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব এবং শৈবধর্ম জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই সমস্ত যুগেই বুদ্ধি, চিন্তাধারা, কবিত্ব, শিল্প ও কলাবিদ্যা এমন কি বাহ্য-জীবন সমস্তই প্রোজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে যখন আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ভাঁটা দেখা দিয়াছে তখনই অন্য এই সকল শক্তি দুর্বল ও ম্লান হইয়া গিয়াছে, প্রগতি ও সক্রিয়তা বর্জিত হইয়া যেন এক প্রস্তরীভূত স্থিতির যুগে পৌঁছিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে তখন প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, অবনতি, ক্ষয় ও ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। যদি আমাদিগকে পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্যের প্রধান ধারাগুলি বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে এই সূত্র ধরিয়া বিচার করিতে হইবে।

মানুষকে সর্বাঙ্গীণভাবে না হইলেও আত্মার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে

নতুবা সে তাহার ঊর্ধ্বায়নী গতির শক্তি হারাইয়া বসিবে; কিন্তু আত্মার গোপন শক্তিসমূহে পৌঁছিবার বিভিন্ন পন্থা আছে। মনে হয় ইউরোপকে জীবন ও যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহাদেরই চরমোৎকর্ষ সাধনের ফলে আধ্যাত্মিক সত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে; যীশুখৃষ্ট মানুষকে যেরূপ অবিলম্বে বলপূর্বক স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে বলেন, ইউরোপ তাহা পারিবে না। সে প্রচেষ্টায় তাহার বিচারশক্তি বিভ্রান্ত ও তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার প্রাণের সহজজ্ঞান (life instincts) তাহাতে বাধা দেয়, পরিশেষে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, অধ্যাত্ম সত্যকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং তাহার নিজস্ব প্রকৃতির বিধানে ফিরিয়া যায়। কিন্তু এসিয়া, অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষ ঊর্ধ্ব হইতে আগত আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে স্বভাবতই বাস করিতে পারে, একমাত্র সেই ভাবধারাই তাহার মধ্যে প্রাণ ও মনের উচ্চতর শক্তিসমূহকে চিন্ময় ভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলে। এই দুইটি মহাদেশ সমগ্র মানবজাতি-গোলকের দুইটি দিক এবং যতদিন পর্যন্ত এ উভয়ে মিলিত ও একীভূত না হইয়া যাইতেছে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেককে নিজ সত্তার নিয়ম বা স্বধর্ম অনুসারে চলিয়া মানবজাতিকে উন্নতি বা অধ্যাত্ম জীবনের উচ্চস্তরে যতটা তোলা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জগতে যদি একটা দিক থাকে, তাহাতে কেবল একটি সংস্কৃতির সুরই বাজিতে থাকে তাহা হইলে সেই সমরূপতা ও একটানা সুরের জন্য তাহার দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পাইবে; যাঁহার মধ্যস্থিত এক উদার আলোক সবকিছুকে সকল উচ্চতম ভাবনা অনুভূতি ও জীবনধারাকে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া পরম সমন্বয়ে পূর্ণ করিয়া তোলে, সেই চিৎপুরুষের অনন্ত সত্তার মধ্যে যতদিন আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারিতেছি ততদিন আমাদের পক্ষে নানামুখী বহু ধারায় অগ্রসর হইবার প্রয়োজন আছে। এক পক্ষে জড়বাদী ইউরোপকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে এরূপ ভারতবাসী অন্য পক্ষে এসিয়ার বা ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদাহানি এবং ঘৃণায় তাহার শত্রুতা সাধন করে এরূপ ইউরোপীয়, উভয়েই এ সত্যকে ভুলিয়া যায়। এখানে প্রকৃতপক্ষে বর্বরতা ও সভ্যতার কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ জগতের জনসাধারণ সর্বত্রই বস্তুতঃ বর্বর, সভ্য হইবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র। কিন্তু যে মানবজাতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত হইয়া উঠিতেছে তাহার পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থক্যগুলির মধ্যে ইহা শুধু একটি।

দুর্ভাগ্যক্রমে দুই মহাদেশের এই পার্থক্য ইহাদের ধর্মের এবং অন্য প্রায় সর্ববিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে সর্বদা একটা সংগ্রামশীল বিরোধ জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং ইহাই পরস্পরকে বুঝিবার পক্ষে অল্পবিস্তর অসামর্থ্য সৃষ্টি করিয়াছে, এমন কি পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সুনিশ্চিত কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য মনের ঝোঁক জীবনের উপর, অপর সকল কিছুকে অতিক্রম করিয়া

বাহ্যজীবনের গুরুত্বই তাহার নিকট প্রধান, যাহা ধরা-ছোঁওয়া যায়, দেখা যায়, তাহা লইয়াই তাহার প্রধান কারবার। আন্তজীবনকে সে বুদ্ধি দিয়া বাহ্য জগতের প্রতিবিম্বরূপে দেখিতে চায়, সব কিছুর সুদৃঢ় আকার দান করিবার, সুষ্ঠুভাবে সমালোচনা করিবার এবং প্রকৃতি যে সমস্ত বাহ্য বস্তু যোগাইয়া দেয় সে সকলকে পরিমার্জিত করিবার এবং তাহা গঠনকার্যে ব্যবহার করিবার জন্য তাহার যুক্তি বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। বর্তমান জীবনের প্রয়োজনেই, সম্পূর্ণ এই জীবনের জন্যই এই জীবনধারণ ইউরোপের একমাত্র অভিনিবেশের বিষয়। তাহার বর্তমান ব্যক্তিজীবনকে তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্থূল অস্তিত্বকে এবং মানবজাতির বর্ধনশীল মন ও জ্ঞানকে মাত্র লইয়া সে ডুবিয়া থাকিতে চায়। এমন কি পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মের নিকটও দাবি করিয়া বসে যে তাহাকে লক্ষ্যে ও ফলাফলে এই সমস্ত প্রয়োজনের, প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান জগতের এই উপ-যোগিতার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। গ্রীক ও রোমানেরা ধর্মমতকে তাহাদের নাগরিক জীবনের সমর্থনরূপে অথবা রাষ্ট্রের প্রকৃত স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা সম্পাদনের একটা শক্তিরূপে দেখিত। ইউরোপে মধ্যযুগটা তাহার পূর্বেকার জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন; এই সময়ে খৃষ্টধর্মধারা সেখানে উচ্চাবস্থায় পৌঁছিয়াছিল; এই যুগে পাশ্চাত্য জগৎ তাহার হৃদয় ও মন দিয়া প্রাচ্যদেশের এক ভাবধারা ও আদর্শ গ্রহণ ও পরিপাক করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে কখনই সে আদর্শগত জীবন দৃঢ়ভাবে যাপন করিতে পারে নাই এবং অবশেষে তাহাকে বর্জন করিয়াছে অথবা কেবল মৌখিক উক্তি দেখাইবার জন্য রাখিয়া দিয়াছে। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানে এসিয়াতে পূর্ব জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এক নূতন যুগ আসিয়াছে এবং সে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী ও পার্থিব বিষয়ে আবদ্ধ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিতেছে, তাহার বুদ্ধি ও জীবন দিয়া সেই ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার আত্মা ও প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে যে এসিয়াও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিজাতীয় বিধান ও ভাবধারা তাহার জীবনে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। প্রকৃত খৃষ্টধর্ম অন্তর্দৃষ্টির উপর প্রবল ঝোঁক দেয়, পরলোকের দিকে তাহার যে দৃষ্টি আছে তাহা সে কিছুতেই অন্যদিকে ফিরাইতে চাহে না; কিন্তু ইউরোপে এই খৃষ্টধর্মকেও পাশ্চাত্য প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করিয়া চলিতে হইয়াছে এবং তাহা করিতে গিয়া তাহার অন্তররাজ্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পরিশেষে খাঁটি পাশ্চাত্য প্রকৃতি জয়লাভ করিয়াছে এবং ধর্মকে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় যুক্তি এবং জাগতিক ও ব্যবহারিক ভাবের বশে আনিয়াছে এবং প্রকৃত ধর্মভাবের প্রায় বিনাশ সাধন করিয়াছে। ধর্ম ক্রমশঃ কৃশ ও ক্ষীণ ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়া যাহারা তাহাকে একেবারে নির্বাসিত করে নাই তাহাদের জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশে এবং তাহাদের প্রকৃতির আরও

সংকীর্ণ এক কোণে কোনরূপে বাঁচিয়া আছে এবং সেখানে মৃত্যু বা নির্বাসন দণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে; আর এদিকে চার্চের বহির্দ্বারে বাহ্যজীবন ও বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবিচার এবং জড়বিজ্ঞানের লৌকিক ঐশ্বর্য মহাসমারোহে সদর্পে তাহাদের বিজয়যাত্রায় অগ্রসর হইতেছে।

অন্তরতম অন্তর্দৃষ্টির সহিত সম্বন্ধশূন্য জীবন ও বিচারবুদ্ধির আরাধনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামই ধর্মবিমুখতার দিকে ঠেলিয়া দেয়। প্রাচীন ইউরোপ ধর্ম ও জীবনকে পৃথক করে নাই, কেননা তাহার পক্ষে ইহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাহার ধর্মের মধ্যে গূঢ় রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের প্রাচ্যসুলভ যে অংশটি ছিল তাহাকে যখন সে একবার বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল তখনই তাহার ধর্ম লৌকিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, ইহা এই জড়জীবন পরিচালনার একটা স্বচ্ছন্দ সহায়রূপে জড়াতীতের একটা অনুমোদন ছাড়া ধর্মের নিকট আর কোন বৃহৎ বস্তু আশা করে নাই। এমন কি আদি ধর্মভাবের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়া যুক্তির সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়ার দিকে ইহার প্রবল ঝোঁক ছিল; যুক্তিবিচারের ঊর্ধ্বস্থিত জীবন নিয়ন্ত্রণ ও গঠনকারী রহস্যের যে ক্ষুদ্র ছায়া তখনও তাহার উপর প্রসারিত ছিল তাহা নির্বাসিত করিতে এবং তর্কশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহারিক বিচারশক্তির প্রখর সূর্যালোকে বাস করিতে ইহা উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ইউরোপ এইদিকে আরও অগ্রসর হইয়া এ পথের শেষে আসিয়া পেণীছিয়াছে। খৃষ্ট ধর্মমত প্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ধর্মকে সমগ্র জীবনব্যাপী করিবার দাবি জানায়, পশু-ধর্মী অসংস্কৃত মানুষের প্রাণপ্রকৃতি যে কোন প্রতিবন্ধক ও বাধা আনিয়া উপস্থিত করুক না কেন তাহা অতিক্রম করিয়া মানুষের সমগ্র সত্তা ও ক্রিয়াকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় অভিষিক্ত ও রূপায়িত করিতে চায়; কিন্তু বর্তমান ইউরোপ খৃষ্ট ধর্মমতের এই আবেশ ও প্রভাব হইতে অধিকতর কার্যকরীভাবে মুক্ত হইবার জন্য জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, কারুকলা ও রাজনীতি হইতে এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও সমাজজীবনের বৃহত্তর অংশ হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। যাহাতে সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে এবং ধর্মের অনুমোদন বা অতীন্দ্রিয় রহস্যের কোন সাহায্য তাহার প্রয়োজন না হয় এই জন্য সে মানুষের নৈতিক জীবনকেও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবহারিক যুক্তির ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে অবশেষে নীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ইউরোপের জীবনেতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা দিয়াছে এবং বর্তমানে আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই শক্তি এই মনোভাব নৈতিক বোধকেও নষ্ট করিতে চায়, গূঢ় রহস্য ভাবময় আধ্যাত্মিক অনুভূতি দাবি করে যে চিৎপুরুষের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্তায় উত্তীর্ণ হইলে নীতিবোধের আর প্রয়োজন থাকে না, ইউরোপ সেভাবে যে নীতিবোধ অতিক্রম

করিতে চাহিয়াছে তাহা নহে, সে শুধু নিম্নতর ক্ষেত্রের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া বিজয়োল্লাসমত্ত প্রাণশক্তির নিরঙ্কুশ খেলার সুযোগ দিয়াছে। এই ভাবের পরিণামে ধর্মকে কতকগুলি নিঃস্ব বিশ্বাস ও আচারের সমষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে, মানুষের প্রাণ ও মনের যাত্রাপথে এ ধর্ম মানিয়া চলা বা না চলায় বিশেষ কিছু যায় আসে না। জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রঞ্জিত ও প্রভাবিত করিবার যে শক্তি ধর্মের ছিল তাহাকে ক্ষীণ ও ন্যূনতম মাত্রায় নামাইয়া আনা হইয়াছে; আমূল সংস্কারের এই প্রক্রিয়ার ফলে হৃদয়ের ভাব ও অনুভূতির উপর ধর্মগত মতবাদের অতি বাহ্য ক্ষীণ রেখামাত্র অবশিষ্ট আছে।

এমন কি ধর্মের জন্য যে অতি ক্ষুদ্র কোণ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যুক্তিবাদ ক্রমে তাহাকেও বিচারের আলোক দ্বারা যথাসম্ভব পরিপ্লাবিত করিতে চাহিয়াছে। ইহা মনের অধস্তন ভূমিতে ধর্মের আশ্রয়স্থল সংকীর্ণ করিতে চাহিয়াছে তো বটেই, মনের অতীত ভূমিতেও তাহার দাঁড়াইবার স্থান লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বহুদেববাদী পুরাকালীন পৌত্তলিক প্রতীকবাদ সকল প্রকৃতিতে, জীবন ও জড়ের প্রতি বিন্দুতে, সকল প্রাণীজীবনে এবং মানুষের সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়াতে এক দিব্যসত্তা ও এক মহত্তর জড়াতীত জীবন ও শক্তি বর্তমান আছে—এই সুন্দর প্রাচীন ধারণা পোষণ করিত; অসভ্য জাতিগণ শিলা বিদ্যুতাদি নৈসর্গিক পদার্থে প্রাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে —ইহাকে অধিপ্রাণবাদ বা এনিমিজ্‌ম্ (animism) বলা হয়, ইউরোপে বৈষয়িক বিচারবুদ্ধি পূর্বোক্ত প্রাচীন মতবাদকে মনের ক্ষেত্রের অধিপ্রাণবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং নিজ জীবনের ক্ষেত্র হইতে এ মতকে ইতিমধ্যেই নিষ্ঠুরভাবে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। ভগবান পৃথিবী ত্যাগ করিয়া বহুদূরে জাগতিক ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া অন্য জগতে অন্তরীক্ষে কোন স্বর্গলোকে সাধু ও অমর আত্মাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু অন্য কোন জগতের অস্তিত্বই বা থাকিবে কেন? প্রগতিশীল বুদ্ধি বলিল, "যে জগতের সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় ও বিচারবুদ্ধি সাক্ষ্য দেয়, আমি কেবল সেই জড়জগৎকে স্বীকার করি।" শীতপ্রপীড়িত পত্রঝরা বৃক্ষের অবশিষ্ট দু-একটি পত্রের মত যে প্রাচীন অধ্যাত্মবোধ বা ধর্মান্ধ ভ্রান্তি কোনক্রমে বর্তমান রহিয়াছে তাহার তৃপ্তির জন্য হিমশীতল অস্পষ্ট বস্তুনিরপেক্ষ বাস্তুহারা দুরধিগম্য এক অধ্যাত্ম সত্তা শুধু রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে ঈষদুষ্ণ কিন্তু ভাবলেশশূন্য এক আস্তিকতা বা থিইজম (Theism) অথবা যাহার মধ্যে কোথাও খৃষ্টের নাম বা অস্তিত্ব নাই যুক্তিসর্বস্ব তেমন এক খৃষ্টধর্ম (Rationalised Christianity) মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচক সেটুকুই বা রাখিবে কেন? জড়জগতের নৈতিক এবং ভৌতিক বিধান রূপে যাহাকে গ্রহণ করা যায়—এরূপ একটা যুক্তিবুদ্ধি বা শক্তির অস্তিত্বই তাহার

পক্ষে যথেষ্ট, উপযুক্ততর কোন নাম না পাওয়াতে ইহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে—ইহাই ডিইজম (Deism) নামে পরিচিত শূন্যগর্ভ বুদ্ধিসিদ্ধ ধর্মবাদ। অথবা এই ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? যুক্তি ও ইন্দ্রিয়গণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য যখন দেয় না, বড়জোর ঈশ্বরকে লইয়া আপাত যুক্তিযুক্ত একটা ধারণা তাহারা খাড়া করে, তখন এরূপ অন্তঃসারশূন্য ধারণার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা প্রকৃতিই যথেষ্ট, প্রকৃতিই একমাত্র পদার্থ যাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ অকাট্য যুক্তিপ্রণালীর মধ্য দিয়া আমরা ইহসর্বস্ববাদীর অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিকতায় পোঁছিয়া যাই, অস্বীকৃতির ইহাই পরাকাষ্ঠা; ঐহিক বুদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর! আর এখানে পোঁছিলে জীবন ও যুক্তি তাহার উপযুক্ত ভিত্তি লাভ করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে বিজিত এক দেশের উপর রাজত্ব করিতে পারে—অবশ্য এ সকলের পশ্চাতে অবস্থিত অস্পষ্ট ও অবগুণ্ঠিত অসীম একটা কিছু উদ্বেগকরভাবে ভবিষ্যতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শান্তির বিঘ্ন যদি না ঘটায়!

এইরূপ প্রকৃতি বা এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অতিযৌক্তিক বা অনন্ত কিছুর জন্য কোন প্রবল ও ঐকান্তিক চেষ্টাতে যে অবশ্যই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক। বড়জোর ইহা চিন্তাশীল অথবা কল্পনাপ্রবণ শিল্পীমনের দিক হইতে অল্পমাত্রায় এই সমস্ত মনোরম চিত্তবিভ্রমকে খেলা হিসাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করিতে পারে যতক্ষণ তাহা সত্যিকার কোন ব্যাপার হইয়া না উঠে অথবা অনাহূতভাবে আসিয়া জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে। কিন্তু তপশ্চর্যা, পরলোকপরায়ণতা ইহার প্রকৃতির নিকট অবজ্ঞেয় বস্তু, ইহার দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রাণাপহারক। এই জীবনকে, একমাত্র যাহাকে আমরা জানি এবং একমাত্র যাহার মধ্যে আমরা বিচরণ করি সেই পার্থিব জীবনকে বশে আনিতে এবং বিচার সহকারে অথবা আমাদের শক্তি অনুসারে সবলে ভোগ করিতে হইবে। বড়জোর অল্পমাত্রায় মানসিক ও নৈতিক কঠোরতা অর্থাৎ সরল ও অনাড়ম্বর-ভাবে জীবন ও জীবিকা অবলম্বন করিতে এবং উচ্চ চিন্তায় প্রবৃত্ত থাকিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরের পরম আনন্দোদ্ভাসিত কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা এ বিচারবুদ্ধির নিকট একটা অপরাধ, প্রায় একটা পাপ। প্রাণগত একপ্রকার নৈরাশ্যবাদকে বরং কোনরূপে বা সাময়িকভাবে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, কারণ নৈরাশ্যবাদী স্বীকার করে যে জীবন অনর্থময় হইলেও মানুষকে বাঁচিতে হইবে, ইহা বিচারপ্রতিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কুঠারাঘাত করে না। কিন্তু স্পষ্টতঃ বিচারমূলক খাঁটি দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন যেরূপ আছে সেই-ভাবেই গ্রহণ করিতে এবং ইহার যতটা সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহা করিতে চায়, ইহার মিশ্রিত ভাল ও মন্দ কার্যতঃ যতটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায় ততটা আনিতে চেষ্টা করে এবং আদর্শ রূপে একটা আপেক্ষিক পূর্ণতা

লাভের কিছু আশা পোষণ করে। এ-মতে আধ্যাত্মিকতার যদি কোন অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে তাহার আদর্শ ও প্রধান কর্ম হইবে উচ্চমনীষা, যুক্তিচালিত ইচ্ছাশক্তি ও সীমিত সৌন্দর্য, মঙ্গল, নীতিপরায়ণতা প্রভৃতির উপযুক্ত উৎকর্ষ সাধন করা এবং এই সমস্তের সহায়তায় যে জীবন বর্তমান তাহার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে প্রবলভাবে সচেষ্ট থাকা; কিন্তু মানবতার অতীত, যাহা কখনও লাভ করা যাইবে না এরূপ কোন অনন্ত অথবা চরম তৃপ্তির দিকে বৃথা দৃষ্টি না দেওয়া। ধর্মকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহার কার্য হইবে এই প্রকার আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুসরণ, তাহা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে আমাদের জীবনে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য আনয়ন করিবে কিন্তু তাহাকে জাগতিক বুদ্ধি ও ব্যবহারিক বিচারের সীমার মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে, ধর্ম যেন এইরূপ প্রকৃতিস্থ ও সতেজ আধ্যাত্মিকতার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। আমাদের দেওয়া পাশ্চাত্যের এই বিবরণে তাহার প্রধান প্রধান ভাবের সূত্রগুলিকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে এবং এদিকের বা ওদিকের ব্যতিক্রমকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, আর মানবের প্রকৃতিতে ব্যতিক্রম, অনেক সময় নিরতিশয় ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকিবে। তথাপি আমার বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগৎ অবিচলিতভাবে যে ক্ষেত্রে থাকিতে চায়, তাহার চরিত্র ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর যে বিশিষ্ট ধারার দ্বারা সে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট তাহার বুদ্ধিবৃত্তির যে স্বাভাবিক স্থিতি দেখা দিয়াছে, এই বিবরণে তাহা যথাযথরূপে এবং অতিরঞ্জনদোষ-পরিশূন্যভাবেই বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ নিজের ভাবে সম্পূর্ণ এক নিশ্চল স্থিতিতে পৌঁছিয়াছে, আর মানুষ যখন তাহার স্বাভাবিক পরিণতির শেষ সীমায় পৌঁছে তখন তাহার পূর্বস্বভাবানুযায়ী গতির ধারা পরিবর্তন বা তাহার নিজেকে অতিক্রম করিবার প্রয়োজন অপরিহার্য রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃতির এমন এক শক্তি আছে যাহার জন্য হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে নতুবা সে গতিরুদ্ধ হইয়া বিচূর্ণিত এবং ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে না পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে স্থায়ীভাবে থাকিবার কোন স্থান বা তাহার চিৎসত্তার কোন অপরিবর্তনীয় বাসগৃহ মিলিবে না।

কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, চিন্তা ও সংস্কৃতির আজিও যে শক্তি অবশিষ্ট আছে, এই পাশ্চাত্য মন যখন তাহার সম্মুখীন হয় তখন সে দেখিতে পায় যে তাহা ইহার নিজের দ্বারা স্থাপিত সকল মান ও আদর্শকে অস্বীকার করে বা অতিক্রম করিয়া যায় অথবা ক্ষুদ্রতর মনে করে এবং যাহা ইহা সম্মানার্হ বলিয়া মনে করে তাহাকে দ্বিতীয় স্থান দেয় এবং যাহাকে ইহা বর্জন করিয়াছে তাহাকে এখনও সম্মান করে। এখানে এমন এক দর্শন শাস্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহার ভিত্তি অনন্তের, অপরোক্ষ সত্যের এবং পরাৎপর তত্ত্বের নির্বন্ধাতিশয়যুক্ত দাবির উপর

প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব শুধু বিচার-বিবেচনার বস্তু নয় পরন্তু ইহা এক বাস্তব ও সদাবর্তমান শক্তির প্রকাশ যাহার দাবিই হইতেছে মানবাত্মা এবং তাহাকেই সে আবাহন করে। এখানে সে মনোভাব আদিতে মধ্যে ও অন্তে, প্রকৃতিতে, মানুষে পশুতে ও জড়জগতে সর্বত্র সর্ববিষয়ে ভগবানকে দেখিতে পায়। বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষ কোন সম্পর্কশূন্য শুধু কবিকল্পনার নিছক এক খেলা রূপে যে এরূপ করিতে দেওয়া হয় তাহা নহে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে উপলব্ধি করিবার এবং তদনুযায়ীভাবে জীবনযাপনের জন্য ইহা ভারতবাসীর নিকট উপস্থাপিত করা হয় এমন কি বাহ্য কর্মের পশ্চাতে এ সত্যকে স্থাপিত করিয়া তাহাদের মনন অনুভূতি ও আচরণের উপাদান করিয়া লওয়া হয়! আর এই উদ্দেশ্য সাধনার জন্য নানাপ্রকার সমগ্র সাধন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও লোকে সেই সমস্ত পদ্ধতি অনুসারে সাধনা করে! এমন কি অদ্বয়, অনন্ত পরাৎপর তত্ত্ব পরমপুরুষ বিশ্বব্যাপী ভগবানকে উপলব্ধি করিবার জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা হয়! আর এই জড়াতীত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মানুষ এখনও তাহার বাহ্যজীবন, তাহার সমাজ, তাহার গৃহ ও পরিবার, তাহার সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তুকে, যুক্তিবাদী মনের পক্ষে যাহা সারভূত ও একমাত্র যাহার নিরূপণযোগ্য মূল্য আছে তৎসমস্তকে সন্তুষ্টচিত্তে ত্যাগ করিতে উৎসুক! ইহা এমন এক দেশ যেখানে গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী সর্বত্র দেখা যায় এবং তাহারা এখনও শ্রেষ্ঠ আসন পায়; জগদতীত সত্তাকে পরম সত্য বলিয়া এখনও প্রচার করা হয়; এখানকার মানুষ পরলোক, পুনর্জন্ম ও প্রাচীন-কালে প্রচলিত এইরূপ আরও বহু প্রাচীন ভাব ও ধারণা জীবন্তভাবে বিশ্বাস ও পোষণ করে যাহার প্রমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞানের যন্ত্রাবলীর নিকট একেবারেই পাওয়া যায় না; আর এ দেশে যোগজ অনুভূতি বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত সত্যের সঙ্গে সমান অথবা শ্রেষ্ঠতর আসন দাবী করে এবং তাহা পায়। যাহা স্পষ্টতঃ ভাবনা করা যায় না এমন বিষয়ের ভাবনা করিতে এখানে দেখা যায়; ভাবনা করা যায় না, তাহার কারণ পাশ্চাত্য যুক্তিশীল মনন এরূপ ভাবনা বন্ধ করিয়াছে। যাহা স্পষ্টতঃ অজ্ঞেয় তাহা জানিবার চেষ্টা এখানে বর্তমান, অজ্ঞেয়,—কেননা আধুনিক মন এ সমস্ত বিষয় জানিবার সকল চেষ্টা বর্জন করিয়াছে। যুক্তিবিচারবিমুখ এইসব অর্ধবর্বরের মধ্যে এই সমস্ত অবাস্তব পদার্থকে জীবনপথের সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান বা শেষ গম্যস্থান করিবার এমন কি ইহাদিগকে শিল্প সংস্কৃতি এবং জীবনের আচার-ব্যবহারের গঠন ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি রূপে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায়! কিন্তু এই সকল যুক্তিবাদীরা আমাদিগকে বলেন যে বিচার করিয়া দেখিলে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পক্ষে শিল্প সংস্কৃতি ও সদাচরণকে স্পর্শ পর্যন্ত করিবার অধিকার নাই, কেননা সে-সমস্ত সীমিত বস্তুর রাজত্বেই শুধু থাকিতে পারে

এবং শুধু বুদ্ধিগত যুক্তির উপর, কর্মক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এবং বাহ্য প্রকৃতির সত্য ও অভিব্যঞ্জনার উপরেই প্রকৃতভাবে স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক আকারে দেখিলে মনে হয় যে এ দুই মতবাদের মধ্যে ব্যবধানের যে পরিদৃশ্যমান সমুদ্র রহিয়াছে তাহার উপর সেতু-বন্ধন অসম্ভব। বরং একথা বলা চলে যে ভারতীয় মন প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য মনের এই সমস্ত ধারণাকে গ্রহণ না করিলেও বেশ বুঝিতে পারে কিন্তু পাশ্চাত্যের পক্ষে ভারতীয় মনোগতি নারকীয় না হইলেও অস্বাভাবিক এবং দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়।

জীবনের উপর ভারতের ধর্মবিভাবিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফল ও প্রভাব দেখিয়া পাশ্চাত্য সমালোচক আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার যে আবেগ তাহার কাছে যুক্তিবিরোধী মনে হইয়াছে তাহাই তাহাকে ইতিপূর্বে পীড়া দিয়াছে এইবার তাহার প্রকৃতির প্রবলতম সহজাত সংস্কারগুলি তাহাদের বিরোধী ও বিপরীত ভাবাবলীর দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত পাইতেছে। কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ না করিয়া একমাত্র যে জীবন ও প্রাণধর্মের মধ্যে সে বাস করিতে চায় এখানে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে। ভারতীয় কোন কোন চরমপন্থীর বাহ্য ও অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে নগণ্য এবং নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে, আর জীবনের জনাই জীবনকে গতানুগতিক ধারায় কোথাও গ্রহণ করা হয় নাই। এখানে তপশ্চর্যার গতি ছিল অপ্রতিহত, সকলের উপর তাহা স্থান লাভ করিয়াছে, প্রাণের সংস্কারগুলির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং মানুষকে, তাহার দেহকে এমন কি তাহার মনোময় জীবনের সংকল্প ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। পাশ্চাত্য মন ব্যক্তিত্বের শক্তির, ব্যক্তিগত ইচ্ছার, পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক মানুষের এবং তাহার প্রকৃতির নানা বাসনা ও দাবির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এখানে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার বিপরীত ভাবের এক নৈর্ব্যক্তিকতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণের দিকে, ব্যক্তিগত সংকল্পকে বিশ্বগত ইচ্ছার মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিবার দিকে, প্রাকৃত মানুষ ও তাহার সকল সীমাকে পরিবর্ধিত অথবা অতিক্রম করিয়া অসীমের পানে ছুটিয়া চলিবার দিকে। মন ও প্রাণগত অহমিকার পরিস্ফুরণ ও পরিপুষ্টি সাধন অথবা বড়জোর তাহাকে সমষ্টিগত সাম্প্রদায়িক অহং-এর সেবায় নিযুক্ত করা ইউরোপের সংস্কৃতিগত আদর্শ। কিন্তু এখানে আত্মার পূর্ণতার পক্ষে এই অহমিকাই প্রধান বাধা বলিয়া বিবেচিত হয়,—সমষ্টিগত সাম্প্রদায়িক বাস্তব কোন অহমিকাকে তাহার স্থানে স্থাপিত করাকে কাম্য মনে করা হয় না, নির্বিশেষ বিশ্বাতীত অন্তরস্থিত কোন কিছুকে, অতিমানস অতিপ্রাকৃত জড়াতীত অন্যনিরপেক্ষ কোন সত্য বস্তুকে সেই আসন দিতে বলা হয়।

পাশ্চাত্যের অধিবাসী নিজে রাজসিক স্বভাবের লোক, সর্বদা সক্রিয় ও ব্যবহারিক, কর্মপ্রবণ তাহার প্রকৃতি, চিন্তাধারাকে সে সর্বদা কার্যে পরিণত করিতে চায়; কর্মের জন্য অথবা মনের খেলা ও শক্তিপ্রকাশের সূক্ষ্ম তৃপ্তি ভিন্ন ভাবনার নিজস্ব মূল্য সে বড় একটা স্বীকার করে না। কিন্তু এখানে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষই শ্রদ্ধার পাত্র যাহার পক্ষে ধীর ভাবে চিন্তা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অন্তর্জীবনের মূল্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। কর্মের মূল্য কর্মের কিম্বা তাহার ফল বা পুরস্কারের জন্য নহে, কিন্তু আন্তর প্রকৃতির পরিণতি সাধনই তাহার কর্মের প্রধান উপযোগিতা। তাহা ছাড়া এখানে এক হতবুদ্ধিকর নীরবতার দিকে প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সকল কর্মকে এক শাশ্বত আলোক ও শান্তির মধ্যে বিলয় বা নির্বাণ করিতে চায়। অবিমুক্তমনা পাশ্চাত্য সমালোচক এই বৈসাদৃশ্য দেখিয়া বিরক্তি, বিদ্বেষ ও প্রচণ্ড ঘৃণায় যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইউরোপীয় বুদ্ধির পক্ষে যতই দুরধিগম্য হউক না কেন এ সমস্ত বিষয়ে অন্ততঃপক্ষে কিছু মহত্ত্ব ও সমুচ্চতা আছে। মিঃ আর্চার এ সমস্ত বিষয়কে মিথ্যা, যুক্তিবিরোধী এবং অবসাদকর বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু ঘৃণ্য ও অনর্থকর বলিয়া অভিযুক্ত করিতে পারেন না। অথবা কোন কোন স্থানে তিনি যেরূপ মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তিরস্কার করিয়াছেন শুধু তাহারই বলে ইহাদিগকে নিন্দা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ সমস্তই অদ্ভুত বা প্রাচীন মননের চিহ্ন হইতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই কোন বর্বর সংস্কৃতি হইতে প্রসূত নহে। কিন্তু এই ধারাগুলি যখন কোন ধর্মপদ্ধতিকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাহা দেখিয়া তাহার মনে হয় যেন খাঁটি বর্বরতার সম্মুখীন হইয়াছেন, অসভ্যোচিত অজ্ঞ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কারণ এখানে সেই সমস্ত পদার্থ অতি প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে যাহা তাঁহারা এতদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্ম হইতে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই শূন্যতাকে সংস্কার, জ্ঞানালোক ও যুক্তিযুক্ত সত্য নামে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে যাহা বহু ঈশ্বরবাদের বিরাট মূর্তি মনে হয় অথবা ঘোর কুসংস্কার বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিতে যাহা অনুভূত হয় তাহার অতিপ্রাচুর্য এখানে দৃষ্ট হয়, তাহার কাছে যাহার কোন অর্থ নাই অথবা যাহা অবিশ্বাস্য তেমন পদার্থকে ইহারা অপরিমিত ভাবে বিশ্বাস করিতে সদা প্রস্তুত ইহাই তিনি দেখিতে পান। ভারতীয় সাধারণ হিন্দু ত্রিশ কোটি বা ততোধিক দেবতায় বিশ্বাস করে, পৃথিবীর এই ভারত নামক উপদ্বীপে যত লোক বাস করে বিভিন্ন প্রকার স্বর্গে তত অধিবাসীর বাস, ইহা ত মনে করেই বরং প্রয়োজন হইলে এই অতি বৃহৎ সংখ্যা আরও বর্ধিত করিতে আপত্তি করে না। এখানে বহু মন্দির, অগণিত মূর্তি, পৌরোহিত্য,

দুর্বোধ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য, যাহাদের কতকাংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগে রচিত এমন সব সংস্কৃত মন্ত্র ও প্রার্থনার দৈনন্দিন আবৃত্তি, নানাপ্রকার জড়াতীত সত্তা ও শক্তি, সাধু গুরু শুভদিন শুভসংকল্প, নানাপ্রকার উৎসর্গ ও বলিদান, যজ্ঞ প্রভৃতিতে বিশ্বাস—এরূপ কতকিছু দেখা যায়; যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন যে সমস্ত ভৌতিক নিয়মানুসারে জাগতিক মরণশীল প্রাণীগণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মনে করে, তাহার একচ্ছত্র রাজত্বে বিশ্বাস না করিয়া যাহার বাহ্য প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না এমন সমস্ত শক্তি ও প্রভাব জীবনের উপর কার্য করে বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং সকল কার্যে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিবার প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের সমালোচকের নিকট এ সমস্তই দুর্বোধ্য বিশৃঙ্খলা, জড়ে চৈতন্যের আরোপ, বিকৃত অন্ধ লোক-বিশ্বাস। ভারতীয় চিন্তাধারা এই সকল বস্তুকে যে অর্থ দেয়, যে আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাখ্যা করে তাহা মিঃ আর্চারের মত লোকের মন একেবারেই বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে না এবং এ সমস্ত নিরর্থক, অতিসূক্ষ্ম, নিষ্প্রয়োজন বিকৃত-মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতীক-সমারোহ বলিয়া বোধ করে। কেবল বিশ্বাসে ও আচরণেই যে ইহা প্রাচীন ও মধ্যযুগোপযোগী তাহা নহে, জীবনের ক্ষেত্রে ইহাকে ইহার যথাযোগ্য স্থানেও রাখা হয় না। এখানে ধর্মজীবনকে কার্যকরী শক্তিহীন করিয়া নিভৃত এক কোণে ফেলিয়া রাখিবার পরিবর্তে ভারতীয় মন দাবি জানায়, যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভব দাবি জানায় যে ধর্ম মানুষের সমস্ত জীবন পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিবে; কিন্তু পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মন এ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

একান্ত ইহসর্বস্ববাদী সাধারণ ইউরোপীয় মন ধর্মভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করে এবং তাহার পক্ষে যুক্তিসমর্থিত জড়বাদ এখনও পূর্ণমাত্রায় দেউলিয়া হইয়া যায় নাই অথবা তাহা জড়বাদের উপরের ধর্মকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা মাত্র করিতেছে—এরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ভারতীয় ধর্ম ও তাহার বিভিন্ন পদ্ধতির যে সুগভীর সত্য ও অর্থ আছে একথা বুঝাইয়া বিশ্বাস করানো অতীব কষ্টকর। অতি সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে যে এই সমস্ত অধ্যাত্মভাবের বিভিন্ন ছন্দ; কিন্তু যে আত্মাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে আত্মা ও তাহার ছন্দের মধ্যস্থিত সম্বন্ধও হারাইয়া বসিয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসী জানে যে, যে সমস্ত দেবতার আরাধনা করা হয় তাহারা একই অনন্তের বিভিন্ন শক্তিশালী নাম, দিব্যমূর্তি, বিভিন্ন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব বা নানাভাবের জীবন্ত অভিব্যক্তি। প্রত্যেক দেবতা ঈশ্বরের পরম ত্রিমূর্তির কোন এক রূপ, তাহা হইতে উদ্ভূত বা তাহার অধীন এক শক্তি, প্রতিটি দেবী সার্বভৌম শক্তির, তাহার চিদ্‌বীর্যের এক বিগ্রহ। কিন্তু যুক্তিবাদী ইউরোপীয় মনের পক্ষে একেশ্বরবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ

(monotheism, polytheism and pantheism) পরস্পর মিলনবিরোধী সংগ্রামশীল মতবাদ; ইহাদের একের সহিত অপরের মিলন অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একত্ব বহুত্ব ও সর্বত্ব পরস্পর হইতে পৃথক বস্তু নহে, পৃথক হইতে পারে না, এ সমস্তই যে শাশ্বত অনন্ত পুরুষের পরস্পরের সহিত সুসংগত নানা বিভাব। জগদতীত এক ভাগবত সত্তাই জগতে সর্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন এবং নানা দেবতার মূর্তিতে বাস করিতেছেন এই বিশ্বাস তাহার মতে জগাখিচুড়ী, বিষম বিরোধী পদার্থের অদ্ভুত মিশ্রণ, অপরিচ্ছন্ন ভাবনাবিলাস এবং ভাবধারার বৃহৎ বিপর্যয়, কেননা সমন্বয়, বোধিদৃষ্টি ও আন্তর অনুভূতি এই প্রবল বহির্মুখী বিশ্লেষণপরায়ণ যুক্তিবাদী মনের প্রধান ধর্ম নয়। হিন্দুর পক্ষে প্রতিমা অপার্থিবের পার্থিব প্রতীক এবং ভৌতিক আলম্বন মাত্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়া জড়াতীতের প্রকাশ হয়, মূর্তিই একদিকে দেহগত মন ও মানবেন্দ্রিয় আর অন্যদিকে যে অশরীরী শক্তি বা সত্তাকে সে উপাসনা করে এবং যাহার সহিত সে যোগাযোগ স্থাপন করিতে চায়, এতদুভয়ের মিলনের ভিত্তি। কিন্তু সাধারণ ইউরোপীয় মন এরূপ অশরীরী সত্তাকে অল্পই বিশ্বাস করে, যদি সেরূপ সত্তা থাকে তবে তাহাকে একটা পৃথক শ্রেণীতে, পৃথক জগতে, পৃথকভাবেই সে রাখিতে চায়। জড় ও জড়াতীতের মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ বা সংযোগ তাহার মতে অর্থহীন সূক্ষ্ম ভাবনা মাত্র, কেবল কাল্পনিক কবিতা ও বাস্তব জীবনের সহিত সম্বন্ধবর্জিত উপন্যাসেই তাহা স্বীকৃত হইতে পারে।

হিন্দুর আচার ব্যবহার ক্রিয়া কর্ম, নানা মত ও পূজাপদ্ধতি কেবল তখনই বুঝিতে পারা যায় যখন হিন্দু চরিত্রের মূলগত ভাব কি তাহা স্মরণে আসে। প্রথমেই দেখিতে পাই যে সে এরূপ গোঁড়ামিবর্জিত যে সকল ধর্মকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে; খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্মকেও সে নিজের ভিতরে টানিয়া লইত যদি তত্তদ্ধর্মাবলম্বীগণ তাহাতে বাধা না দিত। তাহার চলার পথে যাহা কিছুর সে সাক্ষাৎ পাইয়াছে তাহা সে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে, জড়াতীত জগতের ও অনন্তের সত্যের সঙ্গে তাহার কোন প্রকার খাঁটি সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। আবার ভারত চিরদিনই তাহার অন্তরে বুঝিয়াছে যে ধর্মকে কেবল কতিপয় সাধু ও মনীষীর মধ্যে নিবদ্ধ না করিয়া যদি জনসাধারণের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হয় তবে ধর্মের আবেদন সমগ্র সত্তাতে পৌঁছা চাই, শুধু আমাদের যুক্তিবুদ্ধির অংশে বা যুক্তির অতীত ক্ষেত্রে তাহাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না। কিন্তু কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতি, রস ও সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সত্তার অন্যান্য অংশে তাহাকে স্থান দিতে হইবে, এমন কি অর্ধ অবচেতনার মধ্যে যে সমস্ত সহজাত সংস্কার রহিয়াছে সেখানেও ধর্মপ্রভাবকে পৌঁছিতে হইবে। ধর্ম মানুষকে মনের অতীত ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম সত্যে

লইয়া যাইবে, তাহাকে চলিবার পথে অবশ্যই আলোকোজ্জ্বল যুক্তিবুদ্ধির সাহায্য লইতে হইবে কিন্তু আমাদের জটিল প্রকৃতির অন্যান্য অংশকেও ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরিবার প্রেরণা সে কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রত্যেক লোক যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে ধর্মকে সেখান হইতেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে. সে যাহা অনুভব করিতে পারে তাহার মধ্য দিয়াই তাহার আধ্যাত্মিকতা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; সে যাহা এখনও সত্য ও প্রাণবন্ত বলিয়া বুঝিতে পারে নাই তেমন কোন বিষয় জোর করিয়া তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া চলিবে না। বস্তুবাদী বিচারবুদ্ধি হিন্দুধর্মের যে অঙ্গসকলকে অযৌক্তিক বা যুক্তিবিরোধী বলিয়া কলঙ্কারোপ করে এইখানে তাহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাক্ষাৎ মিলিবে। কিন্তু এই স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে ইউরোপীয় মন অশক্ত হইয়াছে অথবা তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। ইহারা ধর্মের "শুদ্ধি" চায় আত্মার দ্বারা নহে, যুক্তি ও বিচারের দ্বারা, "সংস্কার" চায় যুক্তিবিচারের সহায়তায়, আত্মার সহায়ে নয়। ইউরোপে এইরূপ শুদ্ধি ও সংস্কারের ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা জানি; এইরূপ অজ্ঞ চিকিৎসার অপরিহার্য ফল এই হইয়াছে যে তাহা ধর্মকে ক্রমে ক্ষীণতর করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে হত্যা করিয়াছে; রোগী হয়ত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বাঁচিতে পারিত কিন্তু চিকিৎসার ফলেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

নৈতিক চরিত্রের অভাব বলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর মিথ্যা অভিযোগ আনা হইয়াছে, বস্তুতঃ ঠিক তাহার বিপরীত কথাই সত্য, কিন্তু আমাদিগকে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে ইউরোপীয় প্রকৃতির কোন্ বৈশিষ্ট্য হইতে এ ভুল আসিয়াছে, কেননা এ অভিযোগ নূতন নহে। সাধারণভাবে হিন্দুর চিন্তাধারা ও তাহার সমগ্র সাহিত্যের উপর বরং এই উল্টা অভিযোগ আনা যায় যে তাহারা নৈতিকতা দ্বারা প্রায় পূর্ণরূপে আবিষ্ট ও ভারগ্রস্ত, দেখা যায় সর্বত্রই নীতিবোধের সুর বাজিতেছে। অনন্তের ধারণার পরেই ধর্মের ধারণা ইহার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, চিৎপুরুষের পর ধর্মই তাহার জীবনের ভিত্তি। এমন কোন নৈতিক ধারণা নাই যাহা সে গ্রহণ করে নাই, যাহার অনুশীলনের উপর জোর দেয় নাই, যাহা জীবনের আদর্শরূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং অবশ্যকরণীয় বলিয়া উপস্থাপিত করে নাই অথবা শিক্ষা, বিধি, রূপক, কাব্যকলা ও গঠনক্ষম উদাহরণ দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দেয় নাই। সত্য, আত্মসম্মান, নিষ্ঠা, আনুগত্য, সাহস, সতীত্ব, প্রেম, তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গ, অহিংসা, ক্ষমা, করুণা, মৈত্রী, জনহিতৈষণা প্রভৃতি বৃত্তির বিষয় ইহাতে সর্বত্র দেখা যায়—ইহার মতে এ সমস্তই মানবজীবনের খাঁটি উপাদান, মানবধর্মের সারভাগ। বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ ও মহান নীতি, জৈন ধর্মের কঠোর আত্মসংযমের আদর্শ, হিন্দুধর্মের আচরণের সকল দিকের মহৎ ও উজ্জ্বল

দৃষ্টান্তরাজি, নৈতিক শিক্ষা ও অনুশীলন বিষয়ে অন্য কোন ধর্ম বা নৈতিক ভাবধারার অপেক্ষায় একটুও হীনতর নয়, বরং সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কার্যকরী শক্তিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী। পুরাকালে এ সমস্তের যে প্রকৃষ্ট অনুশীলন ছিল তদ্বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সাক্ষ্য আছে। দেশের অনেক অবনতি সত্ত্বেও এ সমস্ত আদর্শের বহুল ছাপ এখনও ভারতীয় চরিত্রে দেখা যায়, যদিও যে সমস্ত গুণ কেবল স্বাধীন দেশের ভূমিতে পুষ্ট ও বর্ধিত হইতে পারে সেইরূপ পুরুষোচিত কোন কোন গুণের কতকটা মলিনতা দেখা দিয়াছে। ভারতীয় দর্শন মুক্তির জন্য কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের যে প্রাধান্য দিয়াছে তাহা ভুল বুঝিয়া খৃষ্টধর্মের উপর পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজ পণ্ডিতগণের মন হইতেই এ সমস্ত বিপরীত উপকথা সৃষ্ট হইয়াছে। কেননা দিব্য জ্ঞানলাভের পূর্ববর্তী সোপান রূপে শুদ্ধ সাত্ত্বিক মন ও জীবন যে গঠিত করিয়া লইতে হয়, গীতায় বলিয়াছে যে দুষ্কৃতকারীগণ ভগবানকে পায় না—ভারতের অধ্যাত্ম তত্ত্বান্বেষুর নিকট সুবিদিত এই বিধান তাহারা লক্ষ্য করে নাই অথবা তাহার অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। আর তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে নাই যে ভারতীয় চিন্তাধারায় সত্যের জ্ঞান অর্থ শুধু মন ও বুদ্ধি দ্বারা সত্য স্বীকার করা নহে, কিন্তু চিৎবস্তুর সত্য অনুসারে এক নূতন চেতনা ও জীবন গড়িয়া তোলা। পাশ্চাত্য মনের পক্ষে নৈতিক জীবন বলিতে প্রধানতঃ বাহ্যিক আচরণ বুঝায়, কিন্তু ভারতীয় মনের পক্ষে আচরণ আত্মার কোন ভাবের চিহ্ন, তাহার প্রকাশের এক উপায়মাত্র। আচরণের জন্য কতকগুলি নৈতিক নিয়ম প্রণয়ন বা কতকগুলি আদেশ সংকলন হিন্দু শুধু প্রসংগক্রমে ও গৌণভাবে করে, কিন্তু মনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতাসাধনকে মুখ্য স্থান দেয়, স্থূল কার্যকে তাহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র মনে করে। "কাহাকেও হত্যা করিও না" ইহা খুব জোরের সহিতই বলে কিন্তু "কাহাকেও ঘৃণা করিও না, ক্রোধ ঈর্ষা বা লোভের অধীন হইও না" এই নির্দেশ অধিকতর সনির্বন্ধতার সহিত পালন করিতে বলে, কেননা এই সমস্তই জীবহত্যার কারণ। ইহা ছাড়া হিন্দু অধিকারভেদে আদর্শের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে আর সে স্বীকারের মধ্যে যে জ্ঞান আছে তাহা ইউরোপীয় বুদ্ধির পক্ষে প্রায় অবোধ্য। সে 'অহিংসাকে পরম ধর্ম" বলে কিন্তু সৈনিক ও ক্ষত্রিয়কে এই নিয়ম কঠোরভাবে মানিতে বলে না কিন্তু তাহার নিকটও চায় ক্ষমা ও বীরোচিত আচরণ; দুর্বল নিরস্ত্র পরাজিত বন্দী আহত বা শরণাগতকে আঘাত করিতে তাহাকে প্রবলভাবে নিষেধ করে; নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একই বিধান অনুসারে চলিতে বলিলে সকলে তাহা পালন করিতে সমর্থ হইবে না ইহা বুঝিয়া এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা দেয়। ভিতরের কথা বুঝিয়া বিভিন্ন অবস্থায় এই যে বিজ্ঞজনোচিতভাবে অধিকার-ভেদে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ইহার মর্মাবধারণ করিতে না পারিবার

জন্য হয়ত হিন্দুর বিরুদ্ধে অনেক নিন্দাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য নীতি নৈতিকতার খুব উচ্চ একটা মান বা আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করে, সে মানে পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালন করা অপেক্ষা ভঙ্গ করিয়াই যে তাহার মর্যাদা দেওয়া হয় ইহা দেখিয়া সে তত বিচলিত হয় না; ভারতীয় নীতিশাস্ত্র তদ্রূপ অথবা প্রায়শঃ তদপেক্ষা উচ্চস্তরের নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু মুখে স্বীকার করা অপেক্ষা জীবনে তাহা সত্য করিয়া তুলিবার দিকে বেশী জোর দেয়; পরিণতির ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর বা সোপান আছে ইহা স্বীকার করে, যাহারা নিম্নতর ক্ষেত্রে রহিয়াছে যাহারা ধর্মের ধারণা ও আচরণের উচ্চতম সুরে নিজেদের জীবনতন্ত্রী বাঁধিতে পারে নাই তাহাদের জন্য নিম্নতর সুরের ব্যবস্থা দিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব নৈতিকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিলেই সে তৃপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই সমস্ত সমালোচনা হয় বস্তুতঃ মিথ্যা অথবা তাহাদের প্রকৃতিতে অপ্রামাণিক। সে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অন্য যে সমস্ত সাধারণ অথচ গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে—যথা, তাহা জীবন ও ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়, জীবনে প্রবল কোন শক্তির খেলা হইতে দেয় না, কোন উচ্চ আশা বা কোন মহান গতি ও শক্তির দ্বারা মন প্রাণ উদ্বোধিত করে না, মানুষের জীবনে মহত্ত্ব এবং সাধনক্ষম ও শক্তিপ্রদ কোন প্রেরণা দান করে না,—তাহা পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সমর্থনযোগ্য কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

পঞ্চম অধ্যায়

এখন আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন এই : মানুষের স্বাভাবিক সত্তাকে সুদৃঢ় ও মহান করিবার উপযুক্ত শক্তি ভারতীয় সভ্যতায় যথার্থ পরিমাণে আছে কিনা? সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রেরণা ছাড়া, তাহাকে কঠোর বৈরাগ্যের এবং তপশ্চর্যার দিকে না লইয়া ব্যবহারিকভাবে জীবনকে সক্রিয় করিবার, প্রসারতা দান করিবার এবং যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি তাহার মধ্যে দেখা যায় কিনা? ইহাই হইল মুখ্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কারণ, যদি এ ভাবের কিছু দান তাহার না থাকে তবে তাহার সংস্কৃতির অন্য যে কোন মূল্যই থাকুক না কেন তাহা বাঁচিতে পারে না। তাহা হইলে শীতপ্রধান দেশের কাঁচের ঘরের তাপে রক্ষিত তরুগুল্মাদির অস্বাভাবিক শোভা-সম্পদের মত এ সভ্যতা হিমালয়ের এপারে ভারত উপদ্বীপের অন্য সভ্যতাসংস্পর্শবর্জিত প্রদেশে অস্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইলেও বর্তমান জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রের তীক্ষ্ম ও প্রখর আবহাওয়ায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রাণধর্মবিরোধী কোন সংস্কৃতির উদ্বর্তন সম্ভব নহে। প্রাণশক্তির প্রবল অনুপ্রেরণা এবং চালনার অভাব হইলে একান্ত মানসিক শক্তিসম্পন্ন বা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দর্শনশীল সভ্যতাকে রসরক্তের অভাবগ্রস্ত উদ্ভিদ দেহের মত প্রপীড়িত অবসন্ন এবং দুর্বল হইয়া পড়িতেই হইবে। কোন সংস্কৃতিকে স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণরূপে মানুষের সেবায় লাগিতে গেলে জীবনের যাবতীয় মূল্য ও উপযোগিতা অতিক্রম করিয়া এক প্রকার দুর্লভ ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি দেওয়া ছাড়াও আর কিছু তাহাকে দিতেই হইবে। এমন কি কোন সংস্কৃতি যদি জ্ঞানের প্রবল ঔৎসুক্য, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, কারুশিল্পের স্থাপত্যের কাব্যের সমৃদ্ধ আলোক ও দীপ্তি দ্বারা সমাজকে সুসজ্জিত করে, যদি একটা প্রাচীন সুপরিণত জনকল্যাণপরায়ণ সমাজের দীর্ঘ জীবনের সুব্যবস্থা ও তাহার সুসঙ্গত মঙ্গল বিধান করে তাহাতেও শুধু চলিবে না, তাহাকে আরও কিছু করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাহার প্রাচীন জীবনে এ সমস্তই করিয়াছে; কিন্তু তাহাকে প্রগতিশীল জীবনী-

শক্তির পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে হইবে। মানুষের জাগতিক কর্মপ্রচেষ্টার একটা প্রেরণা, তাহার জীবনের একটা উদ্দেশ্য একটা উদ্দীপনা, পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবার একটা শক্তি, বাঁচিয়া থাকিবার একটা সংকল্প তাহার একান্ত প্রয়োজন। নীরবতা এবং নির্বাণ, আধ্যাত্মিক লয় অথবা ভৌতিক মৃত্যু আমাদের জীবনের শেষ পরিণাম যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে এই জগৎটা এক বৃহৎ প্রাণাত্মার (life-spirit) অতি প্রবল প্রচেষ্টার ক্ষেত্র, এবং সন্দেহের কারণ সত্ত্বেও মানুষ বর্তমানে জগতের শিরোভূষণ আর সতত সংগ্রামে প্রবৃত্ত এবং আজিও অলব্ধকাম মানবই সকল কর্মের প্রধান কর্মী অথবা জগৎ নাটকের প্রধান নায়ক ও অভিনেতা। একটা মহান সংস্কৃতিকে অনেকখানি পূর্ণভাবেই এ সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ঊর্ধ্বমুখী এই প্রাণপ্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয় সেজন্য যথার্থ আদর্শ শক্তি সমাজদেহে সচেতনভাবে সঞ্চারিত করিতে হইবে। জীবনের একটা দৃঢ় ভিত্তি গঠন এবং তাহাকে নানা ভূষণে বিভূষিত করাই যথেষ্ট নহে, অতি দ্রুত গতিতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া জীবনের অতীত ক্ষেত্রে বহু উচ্চ ও মহান স্তরে পৌঁছানও যথেষ্ট নহে। এই পার্থিব জগতে মানবজাতিকে উন্নীত এবং মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সমানভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। মধ্যবর্তী এই বৃহৎ সত্যকে হারাইয়া ফেলাই সংস্কৃতির একটা অতি বড় অপূর্ণতা এবং বিফলতার একটা চিহ্ন।

আমাদের সমালোচকগণ বলিতে চাহেন যে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গেই ঠিক এইরূপ বিফলতার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য ধারণাই এই যে হিন্দু সংস্কৃতি এক অধ্যাত্মদর্শন এবং পারলৌকিক ভাবের দ্বারা পরিচালিত, এক জগদতীত ভাবের স্বপ্নে বিভোর, ইহকালের এবং বর্তমানের দিকে একেবারেই নজর দেয় নাই, জীবনকে সে অসার ও অসত্য বলিয়া বোধ করিয়াছে অথবা এক অনন্তের চিন্তায় মত্ত রহিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষের পার্থিব চেষ্টা এবং আস্পৃহার মহত্ত্ব, সজীবতা এবং উচ্চতা হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া তাহাকে কর্মবিমুখ করিয়াছে। ইহার দর্শন খুব উচ্চস্তরের হইতে পারে, ধর্মানুরাগে ইহার নিষ্কপটতা এবং গাঢ়তা থাকিতে পারে, ইহার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা দৃঢ় সুসমঞ্জস ও স্থায়ী হইতে পারে, ইহার সাহিত্য ও শিল্প অন্তত ইহাদের নিজস্বভাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু এই খাদ্যের মধ্যে স্বাদুতার প্রাণস্বরূপ লবণের, ইচ্ছাশক্তির স্পন্দনের সজীব প্রচেষ্টার সামর্থ্যের অভাব রহিয়াছে। এপোলোর দ্বারা (Apollo, the Sun God) মহাকায় অজগরকে বাণবিদ্ধ করিয়া সংহারের মত আমাদের এই যে নূতন সাংবাদিক ধনুর্ধরটি (আর্চার অর্থ তীরন্দাজ) ভারতীয় বর্বরতার সর্পকুণ্ডলী ভেদ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার নিন্দাবাদের মধ্যে সর্বত্র এই প্রকারের অভিযোগ প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়

তবে ভারতবর্ষ স্পষ্টতই কোন মহৎ কিছু সাধন করিতে পারে নাই, মানুষের জীবনে কোন বীর্যপ্রদ শক্তির সঞ্চার করে নাই, তাহার মধ্যে সবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন কোন পুরুষ, শক্তিশালী কোন ব্যক্তিত্ব, সমুচ্চ সার্থক কোন মানবজীবন গড়িয়া তোলে নাই, কাব্যে ও শিল্পে কোন জীবন্ত মানুষের মূর্তি সৃষ্টি করিতে বা কোন সার্থক ভাস্কর্য বা স্থাপত্য রূপায়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুরঞ্জিত ভাষায় শয়তানের এই উকিল আমাদিগকে এই সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, বলিয়াছেন যে এইরূপভাবে এখানে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে জীবন ও চেষ্টার সাধারণ মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; মধ্যসমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় সীমা-শূন্য জীবন-অর্ণবের মধ্যে অসহায় ও উদ্দেশ্যহীন এক মানবজাতি পুরুষ পরম্পরায় জন্মিতেছে ও মরিতেছে এই চিত্র এখানে দেখা গিয়াছে; বলা হইয়াছে যে এখানে ব্যষ্টি ব্যক্তি সর্বত্র অবজ্ঞাত এবং খর্বিত হইয়াছে; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে একমাত্র গৌতম বুদ্ধকে ভারত দান করিয়াছে। কিন্তু "সম্ভবত তিনিও কাল্পনিক",—গৌতম বুদ্ধ বলিয়া কেহ হয়ত জন্মগ্রহণ করেন নাই—; এক্ষেত্রে কেবল হয়ত একজনের নাম করা যাইতে পারে—তিনি অশোক; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও নিষ্প্রাণ এবং বৈশিষ্ট্যহীন। নাটক ও কাব্যে যে সমস্ত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহারা কোথাও সজীব হয় নাই, তাহাদিগকে অতিরঞ্জিত অথবা অনৈসর্গিক শক্তির হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র করা হইয়াছে, শিল্প ও কারুকলা অন্তঃসারশূন্য, সত্যের স্থান তাহাতে নাই; সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার এই মলিন জীর্ণ এবং বিষণ্ণ চিত্রই অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই ধর্ম বা এই দর্শনেও কোন প্রাণশক্তি নাই, ইহার ইতিহাসে প্রাণের নিঃশ্বাসধারা বহে নাই, এই শিল্প ও কাব্যে জীবনের কোন বর্ণবিকাশ দেখা দেয় নাই, সর্বত্র সমান শূন্যতা, ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ফল। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা সত্য ও সাক্ষাৎভাবে কিছু জানিয়াছেন, এই সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, যাঁহারা এ জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা খাঁটিভাবে অনুসরণ ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে এ মত ভ্রান্তিকর এক তিক্ত উক্তি, অসম্ভবরূপে মিথ্যা, উহাতে সত্যকে অতিবিকৃত করিয়া বিপরীত ভাবে দেখান হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় মনে অনেক সময় যে ধারণা হয়, এখানে তাহার এক চরম অভিব্যক্তি অন্যায় ও নিঃসন্দিগ্ধ তীব্র ভাষায় দেখিতে পাইতেছি। একই বস্তু বিভিন্ন চক্ষুতে কেন এরূপ বিভিন্ন রং-এ প্রতিভাত হয় তাহা বুঝিবার জন্য পূর্ববৎ আমরা চেষ্টা করিব। এখানেও আমরা এই ভ্রান্ত ধারণার সেই একই আদি কারণ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে, অতি জীবন্তভাবে অতি সমৃদ্ধভাবে অতি মহৎভাবেই বাঁচিয়া আছে, কিন্তু ইউরোপ জীবনে যাহা হইতে চাহিয়াছে ভারত তাহা না চাহিয়া অন্য কিছু চাহিয়াছে। তাহার ধারণা, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা

এবং তাহার সাধনোপায় তাহার স্বভাবানুযায়ী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাহার নিজস্ব, কাহারো নিকট হইতে ধার করা নহে, অন্য কোথাও তাহা দেখা যায় না। সে কোন্ জিনিসের কি মূল্য দেয় বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা বুঝা শক্ত, শত্রু-ভাবাপন্ন অজ্ঞানী সহজেই তাহার উচ্চতম বস্তুসকলকে ভুল ও বিকৃত করিয়া দেখাইতে পারে, তাহার একমাত্র কারণ এই অশিক্ষিত সাধারণ মনের পক্ষে তাহারা এত উচ্চ যে তাহাদের বুদ্ধি ততদূর পেঁাছে না, সে সমস্ত তাহাদের বুদ্ধির সীমার বাহিরে অবস্থিত।

কোন সংস্কৃতির জীবন-মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে তাহার তিন প্রকার শক্তির কথা ভাবিতে হয়; প্রথমে জীবন সম্বন্ধে তাহার মৌলিক ধারণা বা আদর্শের শক্তি, দ্বিতীয়, জীবনে যে রূপ দেখা দিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যসূচক যে মূল ধারা এবং ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার শক্তি এবং অবশেষে সে সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বাস্তব জীবনে যে অনুপ্রেরণা যে বীর্য যে প্রাণবন্ত কর্মদক্ষতা আবির্ভূত হইয়াছে তাহার শক্তি। জীবন সম্বন্ধে ইউরোপীয় যে ধারণা, তাহার সঙ্গে ভারতবাসী আমরা বর্তমানে খুবই পরিচিত হইয়াছি, কারণ আমাদের বর্তমান চিন্তাধারা ও চেষ্টা সে ধারণা দ্বারা পূর্ণরূপে অধিকৃত না হইলেও তাহার ছায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে; কারণ আমরা এই ধারণার কতকাংশকে পরিপাক করিতে চাহিতেছি। এমন কি ইহার রূপ ও ছন্দের কতকটা অনুকরণে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি, বিশেষতঃ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক আচরণ ইহার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছি। ইউরোপের ধারণা বাহ্য ভৌতিক জগতের মধ্যে একটা শক্তির বিকাশ হইতেছে এবং তাহার মধ্যে একটা প্রাণ আছে, যে প্রাণের অর্থ কেবল মানুষের মধ্যে কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। অধুনা জড় বিজ্ঞান অচেতন যান্ত্রিক প্রকৃতির বিরাট শূন্যতার উপর বিশেষ জোর দিলেও মানুষকে কেন্দ্র করিয়া তাহার এই যে ধারণা ও মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে পরিবর্তিত করে নাই। জড় প্রকৃতির অচেতন প্রবাহের মধ্যে অসাধারণ বস্তু এই যে মানুষ, তাহার জীবনের সকল সাধনা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি এবং জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের কার্যকরী বুদ্ধির শক্তি, সুশোভন সৌন্দর্য, সুদৃঢ় উপযোগিতা, প্রাণের ভোগ ও তৃপ্তি এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের দিকেই চলিয়াছে। এই জন্য ব্যক্তিগত অহং-এর স্বাধীন শক্তি এবং সংঘগত অহং-এর সুগঠিত ইচ্ছা এই দুইটি শক্তিই প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু; এইজনাই ইউরোপীয় আদর্শ ব্যক্তিগত অহংকে পুষ্ট ও দৃঢ় করিয়া তুলিতে এবং জাতিগত অহংকে সুনিয়ন্ত্রিত ও কার্যকরী করিতে চাহিয়াছে। ইউরোপে এই দুই শক্তি পুষ্ট হইয়াছে, সাধনা ও সংগ্রাম করিয়াছে, সময় সময় সংযমের বাধা মানে নাই, উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে: ইউরোপের

ইতিহাসে যে চাঞ্চল্য এবং যুদ্ধসঙ্কুল বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে অনেক সময় ইহাই তাহার কারণ এবং ইহারই উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্যে তাহার কাব্য ও শিল্পের ভাব-সম্ভার সমৃদ্ধ হইয়াছে। জীবন ও শক্তির সম্ভোগের এবং ব্যক্তিগত আবেগ ও প্রাণের কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির দিকবর্তী তাহার সতত উদ্দামতার দ্বারা তাহার জীবন সর্বদা পরিচালিত হইয়াছে, এই ভোগ ও পরিতৃপ্তি পুনঃ পুনঃই ইউরোপের জীবনে উচ্চ প্রধান সুর রূপে দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবল কর্ম-প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতমুখী অন্য একটি ধারাও সেখানে দেখা যায়। বিচার, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, কাব্য ও কারুশিল্প দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও তথায় রহিয়াছে,—সংযত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে জীবনকে লইয়া যাওয়াই সেখানে প্রধান প্রেরণা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তিধারা তাহার জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে; খৃষ্টীয় ধার্মিকতা আসিয়া আবার তাহাতে নূতন সুর সংযোগ করিয়াছে, পুরাতন কোন কোন প্রবণতাকে খর্বিত বা পরিবর্তিত এবং কোন কোন প্রবণতাকে গভীরতা দান করিয়াছে। প্রত্যেক যুগে এই রকমে জীবন গঠনকারী ধারা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে, ক্রমে তাহার জীবনের সমগ্র ধারণার মধ্যে অধিকতর জটিলতা ও মহত্ত্ব আনিবার সহায়তা করিয়াছে। বর্তমান সময়ে তাহাতে সমষ্টিগত সত্তার ধারণা প্রধান স্থানীয়, বুদ্ধির ও বাহ্য সম্পদের প্রভূত উন্নতিসাধন এবং জড় বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রের পরিপুষ্টিই তাহার লক্ষ্য। তাহার আদর্শ হয় বুদ্ধি পরিচালিত উপযোগিতা, স্বাধীনতা এবং সমতাস্থাপন অথবা অন্যপক্ষে জনকল্যাণসাধনের অবিচ্ছিন্ন আবেগ লইয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ পূর্ণভাবে কার্যকরী সদাপ্রস্তুত সংঘজীবন গঠন এবং বিচক্ষণতার সহিত সকল শক্তিকে একমুখী করিয়া তাহাদের সুবিন্যাস। ইউরোপের এই চেষ্টা একান্ত বহির্মুখী যান্ত্রিকতার আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু একটা অধিকতর সজীব মানুষী ভাবধারা নবতর শক্তি লইয়া তাহার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে চাহিতেছে, যাহার ফলে অচিরে হয়ত আর সে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বারা নিজে অভিভূত হইতে চাহিবে না বা তাহার আপনার বিজয়ী যন্ত্রচক্রে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে না। যাহা হউক এই ভাবধারা শীঘ্র চলিয়া যাইতেও পারে, তাই ইহার উপর আমরা অধিক জোর দিতে চাই না। জীবন সম্বন্ধে ইউরোপের যে বৃহত্তর স্থায়ী ধারণা তাহা থাকিয়াই গিয়াছে এবং আপন সীমার মধ্যে সে ধারণা মহৎ এবং শক্তিপ্রদ, যদিও তাহা অপূর্ণ, উপরের দিকে সংকীর্ণ, একটা গুরুভার আবরণে আবৃত, তাহার দিঙ্মণ্ডলের প্রসারতা অতি কম, তাহার মধ্যে নিম্নস্থ মৃত্তিকার ভাগই বেশী, তবুও তাহার মধ্যে এমন একটি তাৎপর্য আছে যাহা তাহাকে শক্তিশালী ও মহৎ করিয়া তুলিয়াছে।

জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণা গভীরতর মূল হইতে জাত, তাহার গতি ততখানি বাহ্য ধারার মধ্য দিয়া নয়, তাহার লক্ষ্যও ভিন্নতর। ভারতীয় চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার দৃষ্টি বাহ্য রূপের এমন কি শক্তিরও মধ্য দিয়া সর্বত্রই আত্মাকে খুঁজে; তাহার জীবনসংকল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে সে মনে করে জীবনের মধ্যে সে যাহা চায় তাহা আজিও পায় নাই, সে পূর্ণতার সংস্পর্শে আসে নাই, যতক্ষণ সে আত্মার সন্ধান না পাইতেছে, তাহার মধ্যে বাস করিতে না পারিতেছে ততক্ষণ ইতিমধ্যে যে সমস্ত ভোগের উপাদান তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছে তাহাতে স্থায়ীভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিবার অধিকার তাহার নাই। জগৎপ্রকৃতি বা অস্তিত্বের যে ধারণা সে পোষণ করে তাহা স্থূল বা ভৌতিক নহে, পরন্তু তাহা চেতনাত্মক এবং আধ্যাত্মিক। অচেতন জড় বা নিশ্চেতন শক্তি হইতে চিদ্বস্তু আত্মা বা চৈতন্য শুধু যে মহত্তর তাহা নহে পরন্তু তাহা এই সমস্ত ক্ষুদ্রতর বস্তুর পূর্ববর্তী ও তাহাদের উৎপত্তিস্থল, আত্মা ও চৈতন্যবর্জিত জড় বা জড়শক্তি থাকিতেই পারে না, সকল শক্তিই অন্তর্গূঢ় চিদাত্মার শক্তি বা কার্যসাধনোপায়; যে শক্তি বিশ্ব সৃষ্টি বা রক্ষা করিতেছে তাহা চৈতন্যময় ইচ্ছাশক্তি এবং প্রকৃতি তাহার কার্যকরী শক্তির যন্ত্র; জড় তন্মধ্যস্থ গোপন চেতনার দেহ বা ক্ষেত্র, জড় জগৎ আত্মারই একটা রূপ ও গতিধারা। মানুষও জড় হইতে জাত মন ও প্রাণ নহে, সে চিরদিন প্রকৃতির অধীনে থাকিবেও না; মানুষ স্বরূপতঃ আত্মা, সে প্রাণ ও দেহ ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ব্যবহার করিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম অর্থ ও তাৎপর্য জীবন ও অস্তিত্বের এই ধারণায় জ্ঞানত বিশ্বাস করা, তদনুসারে জীবনযাপন করা, জ্ঞানে ও আচরণে এই উচ্চ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অবশেষে জীবন ও জড়ে আবদ্ধ মননের এই আবরণ ভাঙিয়া এক বৃহত্তর অধ্যাত্ম চেতনায় প্রবিষ্ট হওয়ার আস্পৃহা পোষণ করা; বহু আলোচিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ইহা ছাড়া আর কিছু নহে। স্পষ্টত ইহা পাশ্চাত্যের প্রধান ধারণা হইতে বহু দূরে অবস্থিত; ইউরোপ খৃষ্টীয় জীবনতত্ত্বকে যে আকার দান করিয়াছে তাহা হইতেও বিভিন্ন। কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, প্রাণের ক্ষেত্রে বা জড় জগতে জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পায় না, অথবা কোন প্রকার ভোগ বা পরিতৃপ্তির পথে চলে না কিম্বা বাস্তব ক্ষেত্রে মানব জীবনের জন্য কিছু করে না; ইহাও বলা চলে না যে এ ধরনের জীবনবেদ মানুষের মানুষী প্রয়াসে কোন শক্তিশালী অনুপ্রেরণা দেয় না। এই মত অনুসারে জড়-প্রাণ-মন যুক্তি বা রূপ নিশ্চয়ই আত্মার শক্তি মাত্র, তাহাদের নিজস্ব কোন মূল্য নাই, মূল্য রহিয়াছে শুধু তাহাদের মধ্যে চিদ্বস্তুর অস্তিত্বের জন্য। উপনিষদ বলিয়াছে এ সমস্তই "আত্মার্থম্" আত্মার্থে, ইহাই এ সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে

ভারতীয় মনোভাব। একথা বলাতে ইহাদের মূল্য কমে না বা উপযোগিতা হ্রাস হয় না; পক্ষান্তরে এ' ধারণায় ইহাদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। দেহ এবং রূপ আত্মার জীবন দ্বারা অভিসিঞ্চিত এবং আত্মার কর্মের ছন্দের বাহন, এ বোধ আসিলে ইহাদের উপযোগিতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা মানুষের জীবনকে নীচ এবং ঘৃণ্য মনে করে নাই, জীবনধারণ অযোগ্য ভাবে নাই, পরন্তু আমাদের পরিজ্ঞাত বস্তুরাজির মধ্যে ইহাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়াছে; এমন কি পুরাণে সাহসের সহিত বলা হইয়াছে যে স্বর্গের দেবতারাও এ জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন। মানুষ তাহার মন, হৃদয়, প্রাণশক্তি এবং দেহের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ অথবা মুখ্যতম শক্তির গভীরতা ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদের সাহায্যে তাহার নিজের আত্মস্বরূপ অবগত হইবার, তাহার নিজের অনন্ত স্বাধীনতা ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার পথে চলিতে সমর্থ হয়। কেননা যখন মন বুদ্ধি ও হৃদয় উচ্চতম আলোক ও শক্তি লাভ করে তখনই দেহগত জীবন এমন এক উচ্চস্থানে পেঁাছে যেখানে এ সমস্তের অতীত আরো বৃহত্তর আলোক ও শক্তির কাছে তাহা নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে, তখন ব্যক্তিগত মন প্রসারিত হইয়া এক বিরাট বিশ্বচেতনায় উদ্বোধিত হয় এবং আধ্যাত্মিকতার এক উচ্চ সর্বাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে। এ সমস্ত ধারণা মানুষকে ভগ্নোদ্যমও করে না বা বিফলতার পথেও লইয়া যায় না; পরন্তু তাহারা মানুষের জীবনকে বহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেয় এবং তাহার যুক্তিযুক্ত পরিণামে তাহাকে দিব্য পুরুষের কোন রূপে গড়িয়া তোলে।

বেদান্তের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ (classical) যুগের চিন্তাধারা মানুষের জীবনকে যে গৌরব দান করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য জগতের মানবত্বের যে কোন মহত্তম ধারণাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মানুষের সম্বন্ধে যে ধারণা পাশ্চাত্য মনে সর্বদা রহিয়াছে তাহা এই যে, সে প্রকৃতির এক ক্ষণস্থায়ী জীব মাত্র, অথবা তাহার জন্মের সময় এক খামখেয়ালী স্রষ্টার খেয়ালখুসীতে সৃষ্ট এক আত্মা, যাহাকে মুক্তি পাইবার জন্য এমন এক অত্যন্ত বিরোধী অবস্থায় রাখা হইয়াছে যে তাহার পক্ষে মুক্তি পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; আরও ভয়ের কথা এই যে অকৃতকার্য ও আশাহীন বলিয়া প্রজ্জ্বলিত নরককুণ্ডের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনাই তাহার পক্ষে বেশী। বড় জোর তাহার বিচারশীল মন ও সঙ্কল্পশক্তির সহায়তায় সে কতকটা উন্নত হইতে এবং ঈশ্বর বা প্রকৃতি তাহাকে যাহা করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে কতকটা উন্নত হইতে চেষ্টা করিতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি মানবত্বের যে ধারণা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে তাহা অনেক অধিক অনুপ্রেরণা দেয়, আমাদিগকে অনেক বেশী মহৎ ও উন্নত করিয়া তোলে,

উচ্চতম এক ভাবের প্রেরণাশক্তি তাহার মধ্যে আছে। ভারতের ধারণায় মানুষ, শক্তির কর্মধারায় আবৃত আত্মা, আত্মস্বরূপ বোধের দিকে সে চলিয়াছে, ভগবানের সহিত এক হওয়ার শক্তি তাহার আছে। সে স্বরূপতঃ আত্মা, প্রকৃতির মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া সচেতনভাবে আপন স্বরূপ উপলব্ধির পথে চলিয়াছে; সে নিজে এক দিব্য বস্তু এক শাশ্বত সত্তা; সে ভগবদ্-সমুদ্রের সদা প্রবহমান একটি ঢেউ, সেই পরম অগ্নির (বা বিভুচৈতন্যের) অনির্বাণ একটা স্ফুলিঙ্গ (অনুচৈতন্য); এমন কি যে অনির্বচনীয় জগদতীত সত্তা হইতে সে আসিয়াছে নিজের অন্তরতম সত্তায় তাহার সহিত সে এক; যে সমস্ত দেবতার সে আরাধনা করে তাহাদের অপেক্ষাও সে শ্রেষ্ঠ। স্বল্পকাল-স্থায়ী যে প্রাকৃত অর্ধপশু বলিয়া তাহাকে মনে হয় তাহা তাহার পূর্ণ জীবন নহে, প্রকৃত জীবন বা সত্তা কোন প্রকারেই নহে। তাহার অন্তরতম সত্তায় সে দিব্য পুরুষের সহিত এক অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহার এক নিত্য সক্রিয় অংশ; পার্থিব সমস্ত জীবের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষই তাহার বাহ্য আপাতস্বাভাবিক জীবন অতিক্রম করিয়া ভাবগত সত্তায় পৌঁছিবার মহত্ত্ব লাভ করিবার সামর্থ্য রাখে। অসাধারণ মনুষ্যত্বের এক অতি উচ্চ শিখরে, এক পরম পদে আরূঢ় হইবার আধ্যাত্মিক শক্তি তাহার আছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ইহাকেই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে। অধিকাংশ মানুষ আজিও যেখানে রহিয়াছে সেই আদিম অবস্থায় বাস না করিয়া—"ন যথা প্রাকৃত জনঃ"—সে মুক্ত সিদ্ধ স্বাধীন ভগবদ্ ভাবে বিভাবিত পূর্ণ মানুষ হইতে পারে। কিন্তু আরও বেশী কিছু সে করিতে পারে; বিশ্বচেতনার মধ্যে মুক্ত হইয়া তাহার আত্মা ঈশ্বরের বা বিশ্বাত্মার সহিত এক হইতে পারে, অথবা যাহা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এমন এক আলোক ও বিশালতার মধ্যে উঠিয়া যাইতে পারে; তাহার প্রকৃতি সক্রিয় বিশ্বপ্রকৃতির অথবা বিশ্বাতীত বিজ্ঞানময় পুরুষের দিব্য জ্যোতির সহিত এক হইতে পারে। অহন্তার মধ্যে চিরকাল বন্ধ থাকিবার জন্য সে আসে নাই, পরিণামে তাহাকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, সে বিশ্বাত্মার সহিত, যিনি পরম এক তাঁহার সহিত, অপর সকলের সহিত, সর্বভূতের সহিত, এক হইতে পারে। মানুষের মধ্যে এই অতি উচ্চ তাৎপর্য ও শক্তি গোপনে রহিয়াছে যে, সে এই পূর্ণতা এই সর্বাতীত অবস্থা লাভ করিবার আকূতি বা আশা ও ভরসা পোষণ করিতে পারে। তাহার মন, বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও তজ্জাত জ্ঞান, তাহার হৃদয় এবং সে হৃদয়ের ভালবাসা ও সহানুভূতির অপরিমেয় শক্তি, তাহার ইচ্ছাশক্তি এবং প্রভুত্ব লাভ ও যথার্থ কর্মের দিকে সে শক্তির আবেগ, নৈতিক প্রকৃতি এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে তাহার প্রবল অনুরাগ, তাহার রসবোধবৃত্তি এবং আনন্দ ও সৌন্দর্যের দিকে তাহার আকূতি, তাহার অন্তরাত্মা ও তাহার আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও নীরবতা, এবং উদারতা ও

দিব্য উল্লাসের শক্তি—তাহার এই সমস্ত স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তির যে কোনটি অথবা একত্রযোগে সকলগুলিকে লইয়া যদি সে মুক্তিকামী হয় তবে তাহার বা তাহাদের মধ্য দিয়া সে সেই পূর্ণ এবং সর্বাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারে।

প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় চিন্তাধারা ও আন্তর সাধনা এই আধ্যাত্মিক মুক্তি ও পূর্ণতার ধারণায় একান্তভাবে ভরপুর; তাহার দৃষ্টিতে এ অবস্থা যতই উচ্চ ও কঠোর হউক না কেন তথাপি তাহার নিকট সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্ভব মনে হইয়াছে; এমন কি একবার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথ পাইলে এক হিসাবে তাহা অতি নিকট এবং স্বাভাবিক বোধ করিয়াছে। কিন্তু এই ধারণাকে জীবন্ত বা যুক্তিসম্মত মনে করা ইহসর্বস্ববাদী পাশ্চাত্য মনের পক্ষে অতি দুরূহ; তাহার কাছে সিদ্ধ ভাগবত অথবা মুক্ত পুরুষের অবস্থা ভিত্তিশূন্য এক অদ্ভুত কল্পনামাত্র মনে হয়। ইউরোপের খৃষ্টধর্মজাত সংস্কার ইহাতে ঈশ্বরের অনন্যসাধারণ মহত্ত্বের নিন্দা ও অপবাদ দেখিতে পায়, কেননা মানুষ তাঁহার কাছে একটা অতি হীন কীট বা পতঙ্গতুল্য বস্তু মাত্র; প্রাকৃত অহং-এর প্রতি পাশ্চাত্যমনের যে অত্যাসক্তি আছে তাহার কাছে এ সমস্ত তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতিষেধক ভয়ের বস্তু মনে হয়। ইহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; পৃথিবীর সঙ্গে আবদ্ধ তাহার যুক্তিবাদের কাছে ইহা একটা স্বপ্ন, আত্মসম্মোহনকারী একটা ভ্রান্তি অথবা মোহগ্রস্ত একটা খেয়াল মাত্র। তথাপি প্রাচীন ইউরোপে ষ্টোয়িক (stoic) নামক দার্শনিকগণ, প্লেটো এবং পাইথাগোরাসের অনুবর্তীগণ এই আস্পৃহার বা এই ভাবধারার দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, এমন কি পরবর্তীকালে কোন কোন অসাধারণ সাধক এ অবস্থার স্বরূপ কিছু বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহারা গোপন অলৌকিক রহস্য বিদ্যার পথে এদিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়া-ছিলেন। আবার বর্তমানে এ ভাবধারা পাশ্চাত্যের কল্পনার আকাশে কিছু কিছু উদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু তাহা জীবনে ততটা সক্রিয় প্রেরণা দিতে পারে নাই, কাব্য বা সাধারণ চিন্তাধারার কোন কোন অংশে অথবা থিওসফিক্যাল সোসাইটির মত যে সমস্ত আন্দোলন প্রাচীন এবং প্রাচ্য উৎস হইতে তাহাদের ভাবধারা সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শুধু দেখা দিয়াছে। তাহাদের জড় বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম এখনও এ সমস্তকে ভ্রান্তি বলিয়া ঘৃণা করে, অলীক স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষা করে অথবা পৌত্তলিকের ঔদ্ধত্য বলিয়া গালি দেয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বৃহৎ সক্রিয় আশা সে পোষণ করিয়াছে, তাহাকে জীবন্ত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়াছে, পূর্ণ সত্তায় পৌঁছিবার যত প্রকার সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক পন্থা আছে তাহা সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ

আদর্শ বা উদ্দেশ্য যে এই আধ্যাত্মিক পরিণতি ইহা সর্বজনীনভাবে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে।

আমাদের সাধারণ ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত এই দুরূহ এবং সুদূর পূর্ণতার কি সম্বন্ধ এবং কি কি সোপানপরম্পরা অবলম্বনে ইহাতে পেঁাছান যায় তাহার উপর জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার মূল্য নির্ভর করে। এই পূর্ণতার সহিত আমাদের সাধারণ জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই ইহা যদি বলা হয় অথবা এই পূর্ণতায় পেঁাছিবার ক্রমপরম্পরা যদি না থাকে তবে ইহা পূর্ণতার এক উচ্চ আদর্শমাত্র থাকিবে তাহাতে কেহ কখনও পেঁাছিতে পারিবে না, অথবা অতি অল্প কয়েকজন অসাধারণ অনাসক্ত সাধকের সুদূর আবেগ রূপে ইহা বর্তমান থাকিবে; অথবা এমন কি আমাদের অধ্যাত্ম এবং প্রাকৃত অপূর্ণ সত্তার মধ্যে এত বড় একটা ব্যবধান ঘটাইবে যাহাতে সাধারণ জীবনের মূল উৎস শুকাইয়া উঠিবে। অতীত ভারতের শেষ যুগে কতকটা এরূপ ঘটিয়াছে, পরবর্তী কালের এই চিন্তাধারায় মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা এবং তাহার পার্থিব জীবনের মধ্যে যে ক্রমশ বৃহৎ ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের যে কেবলমাত্র তপশ্চর্যা এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রহিয়াছে এই ধারণা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অবনতির বিশেষ যুগে যে প্রবল ঝোঁক আসিয়াছিল অথবা কোন বিশেষ ভাবধারার উপর যে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে আমরা যেন ভুল পথে না চলি। ভারতীয় জীবনধারার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গেলে আমাদিগকে সেই জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগে যাইতে হইবে। আমাদিগকে প্রাচীন দার্শনিক চিন্তা, ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, শিল্প ও সমাজের দিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, কোন বিশেষ যুগের কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের বা তাহার একাঙ্গের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই ভারতের সমগ্র চিন্তাধারা মনে করিলে চলিবে না। ভারতীয় ধারণা তাহার প্রাচীন যুগের সুস্থ অবস্থায় এ ভুল করে নাই, সে কল্পনাও করে নাই যে সত্তার এক প্রান্ত হইতে তাহার বিপরীত প্রান্তে অসহিষ্ণুভাবে উদ্দাম উল্লম্ফন দ্বারা পেঁাছান যাইবে অথবা এমন কি পেঁাছিবার চেষ্টা করা উচিত; এমন কি চরমপন্থী কোন দার্শনিক মতবাদও এমন কথা বলে নাই। ভারতীয় মনের এক অংশে জগতে বিশ্বাত্মার ক্রিয়াবলী সত্য, অন্য অংশে তাহা অর্ধ-সত্য আত্মবিস্তারশীল লীলা বা মিথ্যা মায়া, এক অংশে জগৎ অনন্ত শক্তির ক্রিয়া অন্য অংশে শাশ্বত ব্রহ্মের মধ্যস্থিত গৌণ এবং প্রহেলিকাময় চেতনার (বা মায়ার) মিথ্যা কল্পনা মনে হইয়াছে; কিন্তু মানবজীবন যে একটা মধ্যবর্তী সত্য ইহা কোন ভারতীয় দর্শনই অস্বীকার করে নাই। ভারতীয় চিন্তাধারা স্বীকার করিয়াছে যে সচেতনভাবে সাধনার দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের

জন্যই স্বাভাবিক জীবনযাপন, জ্ঞানের দ্বারা তাহার শক্তি পুষ্ট করিতে হইবে, ইহার বাহ্য রূপের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে, ইহার অর্থবোধ, গভীরভাবে ইহার মূলানুসন্ধান করিয়া দেখিতে, ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহার বিধান মানিয়া চলিয়া এবং ইহার স্বক্ষেত্রে থাকিয়া ইহাকে ভোগ করিতে হইবে। কেবল এইগুলির পরে আমরা আত্মসত্তা বা জগদতীত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা মানব জীবনের চরম ও পরম ফল—তাহার জন্য প্রয়োজন জীবনে ও প্রকৃতির মধ্যে ধীর ও সহিষ্ণুভাবে বহু সহস্র বর্ষব্যাপী অতি দীর্ঘ সাধনার ভিতর দিয়া আত্মার ক্রমশ অভিব্যক্তি। আধ্যাত্মিক উন্নতির এখানেই এই যে ক্রমবিকাশ আছে এই বিশ্বাসের জন্য ভারতে প্রায় সর্বজনীনভাবে পুনর্জন্মবাদ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নযোনিতে লক্ষ লক্ষ জন্মের পরে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আত্মা মানুষে আসিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে; যাহাকে অচেতন জড় বলি তাহার মধ্যেও এই আত্মা সচেতন ছিল—"চেতনঃ অচেতনেষু": শত সহস্র এমন কি হয়ত বহু লক্ষ জন্ম ধরিয়া মানুষ উন্নতিলাভ করিতে করিতে অবশেষে তাহার স্বরূপগত ভাবগত সত্তায় গিয়া পৌঁছিবে। প্রত্যেক জীবনই একটি সোপান—তাহাকে ধরিয়া মানুষ হয় আরোহণ বা অবরোহণ করিতে পারে; জীবনে তাহার কর্ম তাহার ইচ্ছা ও আস্পৃহা তাহার চিন্তা ও জ্ঞান তাহার জীবন শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ সমস্তের দ্বারা মানুষ তাহার আদিম হইতে চরম অবস্থায় কি হইয়া উঠিবে তাহা নির্ণীত হয়—'যথা কর্ম যথা শ্রুতম্'।

এক চরম পূর্ণতায় বা দিব্য ভাবে সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সঙ্গে আত্মার ক্রমপরিণতিতে এই বিশ্বাস এবং মানব জীবনই তৎসাধনের প্রথম সাক্ষাৎ উপায় এবং পুনঃ পুনঃ আগত সুযোগ—ইহাই মূল কেন্দ্রগত ভারতীয় ধারণা। ইহাই আমাদের জীবনকে এক শঙ্খাবর্তগতিতে বা বৃত্তাকারে ঊর্ধ্বা-রোহণের আকৃতি দান করে; আর এই আরোহণের সুদীর্ঘ সময়কে মানুষী জ্ঞান কর্ম এবং অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার মধ্যে জাগতিক সকল উদ্দেশ্য ক্রিয়াধারা ও আস্পৃহা অন্তর্ভুক্ত আছে, সকল প্রকার মানব চরিত্র ও প্রকৃতির স্থান রহিয়াছে। কারণ অধ্যাত্ম সত্তা জগতে শত শত রূপ পরিগ্রহ করেন, নানা প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলেন, তাঁহার খেলা বা লীলাকে বহু বিচিত্র আকার দান করেন। সব কিছুই আমাদের সামগ্রিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাহার অংশ: প্রত্যেকের সার্থকতা আছে, প্রত্যেক সত্তার স্বাভাবিক বা প্রকৃত বিধান ও কারণ আছে, লীলায় এবং তাহার পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেকের উপযোগিতা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দাবি উপেক্ষিত হয় নাই, ইহার যথার্থ

মূল্য স্বীকার করা হইয়াছে। আত্মার শ্রমসাধ্য ও বীরোচিত কর্মের উৎস শুকাইয়া ফেলা হয় নাই, পূর্ণতম রূপে কর্ম করিবার প্রচুরতম অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। শত রূপে জ্ঞানের গতিবৃত্তি অনুসরণের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল, পরিশুদ্ধ ও শিক্ষিত ভাবাবেগের খেলা এমনভাবে পূর্ণরূপে চলিতে দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহা দিব্য স্তরের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে, সৌন্দর্য ও রসানুভবের বৃত্তিগুলির দাবিকে উৎসাহিত এবং তাহাদিগকে অসাধারণভাবে তাহাদের উচ্চতম রূপে জীবনের সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিতে দেওয়া হইত। এ সংস্কৃতি মানবজীবনের বিরাট খেলার সমৃদ্ধিকে মুছিয়া ফেলিতে অথবা ক্ষীণ করিতে, আমাদের প্রকৃতির ক্রিয়াধারাবলিকে কখনও মন্দীভূত বা বিকলাঙ্গ করিতে কখনই চাহে নাই। পক্ষান্তরে সুপরিচালিত ঐক্যতানের সুরে বাঁধিয়া সে লীলাকে পূর্ণভাবে এবং অনেক সময় তাহার চরম রূপে অভিব্যক্ত হইতে দিয়াছে। তাহার চলিবার পথে সকল অনুভূতির অন্তরে ডুবিয়া বুঝিতে, ও বীরোচিতভাবে তাহার চরিত্র ও ক্রিয়ার বহুবিস্তার সাধন করিতে এবং বর্ণ সৌন্দর্য ও সম্ভোগের সমৃদ্ধিতে জীবন পূর্ণ করিতে মানুষকে অধিকার দিয়াছে। তাহার মহাকাব্যে এবং তাহার গৌরবময় যুগের (classical) সাহিত্যে জীবনের এই দিক ভারতীয় ধারণায় অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত এবং তাহার পরবর্তী ভাষাসকলে রামায়ণ, মহাভারত, নাটকাবলি, মহাকাব্যসমূহ, রোমান্স বা ভাবাবেগ-ও-রসময় উপাখ্যানরাজি এবং নীতিগর্ভ সুভাষিত বাক্যাবলি ও রসভাবিত গীতিকবিতার যে অতিবিস্তৃত সাহিত্যসম্ভার রহিয়াছে—সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে অতিবিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থরাজির বিপুল সমাহার আছে তাহার কথা নাই বা তুলিলাম—সে সমস্ত যাহার দৃষ্টি-শক্তি বা বুদ্ধি আছে এরূপ লোকে যদি পড়ে আর যদি দেখি যে তাহাদের বৃহৎ বিস্তার বিশাল ঐশ্বর্য ও বিরাট মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারে তাহা হইলে বস্তুতঃ অতিমাত্রায় বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে সে ব্যক্তি দেখিবার মত চক্ষু অথবা বুঝিবার মত মন না লইয়াই পড়িয়াছে; অধিকাংশ বিরোধী সমালোচক আদৌ কিছু পড়েন নাই বা আলোচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের পূর্বগঠিত ধারণাগুলি উগ্রভাবে উঁচু গলায় নির্বোধের মত নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় শুধু চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সংস্কৃতির মহৎ কার্য যেমন মানবজীবনকে সমৃদ্ধ, উদার ও উৎসাহিত করা তেমনি প্রাণশক্তিরাজিকে এক পরিচালনার বিধি দেওয়া, তাহাদিগকে নীতি ও যুক্তির শাসনাধীন করা এবং তাহাদের প্রাথমিক স্বাভাবিক রূপায়ণসমূহের অতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া এবং এইভাবে অবশেষে

জীবনের জন্য আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, পূর্ণতা ও মহত্ত্বের সূত্র বাহির করা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে শক্তির দ্বারা এই কার্য সাধিত করিয়াছে যে গভীর জ্ঞান এবং উচ্চ ও সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত তাহা এইভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত জীবনে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিচালিত ও উৎসাহিত করিয়াছে এবং অবশেষে সবকিছুকে তাহার প্রধানতম ভাবধারার উপলব্ধির দিকে ফিরাইয়া ধরিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট মূল্য রহিয়াছে। যে মনকে ইহা শিক্ষিত করিতেছিল তাহাকে তাহার অব্যবহিত লক্ষ্য হইতে দূরে না লইয়া গিয়াও, জীবনকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং অনন্তে পৌঁছিবার পথ রূপে ব্যবহার করিবার দিকে দৃষ্টি সে কখনও হারায় নাই।

জীবন পরিচালনায় অথবা আধ্যাত্মিক সাধনায় ভারতীয় মন আমাদের সত্তার দুইটি প্রধান সত্যকে সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। প্রথমটি এই :—আমাদের সত্তাকে তাহার প্রগতির পথে অনেকগুলি সোপান বা স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়; তাহার মধ্যে যদিও কখন কখন লম্ফ দিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করা যায় তথাপি তাহার অধিকাংশ পথই ধীরে ধীরে সুনিশ্চিত পদক্ষেপের মধ্য দিয়া চলিতে হয়, মানুষের পুষ্টি ও পরিণতি সাধারণতঃ ধীরে ক্রমবর্ধনশীল ভাবেই হয়, এমন কি দ্রুততম ভাবে দৌড়ের প্রতিযোগিতারও বিভিন্ন ক্ষেত্র রহিয়াছে। তাহার পর মানুষের জীবন ও প্রকৃতি অতি জটিল বস্তু; প্রত্যেক জীবনে তাহার জটিলতার কতক পরিমাণকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে এবং তাহার মধ্যে একপ্রকার এক সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু জীবনের প্রাথমিক গতিবৃত্তিগুলিতে আমরা সেই রূপের সাক্ষাৎ পাই যাহা মানুষের স্বাভাবিক অহমিকার শক্তিকে পুষ্ট করিয়া তোলে; কাম ও অর্থ, স্বার্থ ও সুখজনক বাসনাই মানুষের কর্মের আদি প্রযোজক। ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের প্রকৃতির এই প্রাথমিক দিকটাকে বৃহৎ ভাবেই স্বীকার করিয়াছে। এই সমস্ত শক্তিকে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিতে হইবে; কেননা স্বাভাবিক অহমিকার জীবনযাপন করিতে হইবে এবং মানুষের সত্তায় তাহা যে শক্তিরাজি উন্মিষিত করিয়া তোলে তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে কেহ যাহাতে অসঙ্গত দাবি না করে অথবা উন্মত্তভাবে উপভোগের দিকে ছুটিয়া না চলে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা হইত; কেবল তাহা হইলেই কোন দারুণ বিপৎপাতের মধ্যে না গিয়া অহমিকার জীবনের পূর্ণ ফল পাওয়া যাইতে পারে, কেবল তখনই সে জীবনকে অনুপ্রেরণা দিয়া পরিণামে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইতে এবং অবশেষে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও মহত্তর আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে প্রণোদিত করা যাইতে পারে। বহির্জীবন বা অন্তর্জীবনে অরাজকতা বা

বিশৃঙ্খলা জীবনের বিধান হইতে পারে না; একগুঁয়েমি, রিপুর উত্তেজনা, স্বার্থপরতা বা কামনা বাসনা দ্বারা পরিপূর্ণরূপে বা মাত্রাতিরিক্তভাবে শাসিত জীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানব জীবন বা লোকহিতকর জীবন হইতে পারে না। অথচ তাহা হইতে পারে এবং তাহাই সত্যকার বিধান, প্রলোভনকর এই কল্পনার বশে পাশ্চাত্য মন তাহার বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবে সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বা তাহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই মনোভাব যাহাকে অন্যায়পূর্বক পৌত্তলিক (pagan) বলা হইয়াছে—কেননা গ্রীক বা পৌত্তলিক বুদ্ধির মধ্যে বিধিব্যবস্থা সামঞ্জস্য এবং আত্মশাসনের মহৎ ভাবনার সমাবেশ ছিল—তাহা ভারতীয় প্রকৃতির পক্ষে বৈদেশিক বস্তু। ভারত ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ গ্রীস রোম বা বর্তমান ইউরোপের অপেক্ষা ন্যূনতরভাবে অনুভব করে নাই; জড় জীবনের সম্ভাবনা সে বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে এবং কোন কোন মনের উপর তাহার আকর্ষণ ক্রিয়া করিয়াছে; এইভাবে চার্বাক দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই মনোভাব কখনো ভারতীয় মনকে পূর্ণরূপে অধিকার করিতে এমন কি সাময়িকভাবেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। যদিও যখন বিপুলভাবে এজীবন যাপন করা যায় তখন তাহার মধ্যে একপ্রকার এক বিকৃত মহত্ত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই তথাপি এক বিশাল অহমিকা যখন মন এবং ইন্দ্রিয়গত প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে এরূপ ভোগে ডুবাইয়াছে ভারত তখন তাহাকে আসুর ও রাক্ষস প্রকৃতি বলিয়া মনে করিয়াছে। এরূপ সত্তাকে এরূপ আসুরিক বিরাট, অথবা দানবীয় প্রকৃতিকে তাহার নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বীকার করিলেও তাহা মানব জীবনের পক্ষে উপযুক্ত বিধান বলিয়া কখনই সে মনে করে নাই। মানুষের উপর অন্য এক শক্তির দাবী স্বীকৃত হইয়াছে যে শক্তি বাসনা, স্বার্থপরতা এবং আত্মম্ভরিতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাহা হইল ধর্মের শক্তি।

ধর্মের মধ্যে একাধারে ক্রিয়ার ধর্মগত বিধি এবং আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম বিধান উভয়ই আছে; পাশ্চাত্য ধারণার মত ইহা একটা অনুষ্ঠান, একটা মতবাদ অথবা মানুষের নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার একটা আদর্শ মাত্র নহে; ধর্ম আমাদের জীবনের সকল অঙ্গের—সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের যথার্থ বিধান। জীবনের একটা সঠিক ও পূর্ণ বিধান খুঁজিবার জন্য মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে এবং ধর্মের মধ্যে সে প্রবৃত্তি তাহার সত্য এবং সার্থকতা দেখিতে পায়। প্রত্যেকের অবশ্য একটা স্বকীয় ধর্ম আছে, তাহা প্রকৃতিদ্বারা তাহার উপর আরোপিত বিধান; কিন্তু মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ এক আদর্শ জীবন যাপনের জন্য সচেতনভাবে আরোপিত এক বিধি বা ব্যবস্থা তাহার ধর্ম। ধর্মের মূল স্বরূপ নিত্য, পরিবর্তনরহিত তথাপি আমাদের চেতনাতে তাহার পুষ্টি ও ক্রমোন্নতি আছে, ইহাতে আমাদের প্রকৃতির উচ্চতম

বিধান আবিষ্কারের জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথে নানা স্তর বা সোপান রহিয়াছে। সর্ববিষয়ে সকল মানুষ এক সাধারণ এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না। জীবন এত জটিল যে নৈতিক মতবাদী যেরূপ সরল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আদর্শ জীবন যাপন পছন্দ বা কল্পনা করেন তাহা সম্ভব হইতে পারে না। মানুষে মানুষে প্রকৃতির ভেদ আছে, যে অবস্থায় আমরা রহিয়াছি বা যে কর্ম আমাদিগকে করিতে হইবে তাহাদের নিজস্ব দাবি ও আদর্শ আছে। মানুষের উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি, জীবনের অন্তরস্থিত আত্মার আহ্বান সকলের পক্ষে এক নহে; উন্নতির গতি, প্রকৃতি ও সামর্থ্য অথবা অধিকার বা যোগ্যতা সকলের সমান নহে। মানুষ সমাজে বাস করে এবং সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব একটা সাধারণ ধর্ম আছে এবং তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক মানুষকে সমাজের এই বৃহত্তর গতিধারার অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু তথায়ও সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কাজ করিতে হয়; তাহাদের প্রকৃতি সামর্থ্য এবং মেজাজে বহু প্রকার ও পরিমাণ ভেদ আছে; ইহা বুঝিয়া সমাজের বিধিব্যবস্থার মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের স্থান দিতে হইবে। সকলের জন্য এক একান্ত ব্যবস্থা করিলে তাহারই ক্ষতি হইবে। জ্ঞানী শক্তিশালী উৎপাদনকারী ও ধনোপার্জনদক্ষ মানুষ, পুরোহিত, বিদ্বান, কবি, শিল্পী, শাসক, যোদ্ধা, বণিক, কৃষক, কারিকর, শ্রমজীবী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলকে একপ্রকার শিক্ষা দিলে চলে না। সকলকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়া যায় না, সকলে একভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না। সকলের জন্য একভাবের সামাজিক বিধান চলিতে পারে না, কেননা সেরূপ কঠোর অনড় অর্থহীন ব্যবস্থার ফলে জীবনের সাবলীল সত্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের নিজ প্রকৃতিতে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা সাধনের একটা ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ধারা (function) পৃথক, তাহার শক্তির স্ফুরণ ভিন্নভাবে হয়—তাহারও একটা আদর্শ ও বিধান থাকা চাই। প্রত্যেক বিষয়ের যে আদর্শ ও বিধান তাহা জ্ঞানের দ্বারা স্থির করিতে হয় এবং বুদ্ধির সঙ্গে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হয়—এই ব্যবস্থা ধর্মের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। মানুষের আচরণে নিয়ম-সংযমের বাধাবিহীন বাসনা, স্বার্থ বা প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, এমন কি ঐ বাসনা স্বার্থ বা প্রবৃত্তির পরিপূরণই যখন মুখ্য ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্য তখনও শাসন, বিধান ও পরিচালনা মানিয়া চলিতে হয়। অভীপ্সিত বস্তুর সত্য হইতে জাত নীতি ও বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পূর্ণতার একটা মান ধরিয়া সংযতভাবে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হয়। তথাপি মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন কর্ম অনুযায়ী এই সমস্ত বিশেষ ধর্মের উপরে উঠিয়া এক বৃহত্তর বিধান ও সত্যে পৌঁছিতে হয় যাহা অন্য সকল কর্মের উপরে অবস্থিত

থাকিয়াও সকলকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় এবং সর্বজনীনভাবে কার্যকরী হয়। সুতরাং ইহাই ছিল ধর্ম, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত পরিণতির স্তর, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা এবং বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রের পক্ষে উপযোগী আবার যাহার সাধারণ ধারাগুলি সার্বজনীন এবং সকলেরই অনুসরণ করা উচিত।

ভারতীয় ধারণা এই যে সর্বানুস্যূত এই সার্বভৌম ধর্মেই মানুষের ক্রম-বর্ধনশীল মন ও আত্মার আদর্শ পরিপূর্ণতার বিধান রহিয়াছে; ইহা কতকগুলি উচ্চ বা মহৎ গুণের ও শক্তির মধ্যে থাকিয়া মানুষকে পুষ্ট ও বর্ধিত হইতে বাধ্য করে, সেই সমস্ত গুণ তাহাতে সুসংগত ও সুসমঞ্জস হইয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতীয় ভাবনা ও জীবনে মানুষের মধ্যে যাঁহারা সর্বোচ্চ ইহা তাঁহাদের আদর্শ—যাঁহারা সৎ বা মহৎ তাঁহাদের জীবনের বিধান, যাঁহারা নিজেকে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন সেই সমস্ত আর্য, শ্রেষ্ঠ, সজ্জন ও সাধুর সাধনার ধারা। এ আদর্শে নৈতিক উপাদানের প্রাধান্য থাকিলেও ইহা যে শুধু নৈতিক প্রচেষ্টা একথা বলা চলে না, পরন্তু ইহাতে বুদ্ধিবিচারের, ধর্মের, সামাজিকতার, রসবোধের স্থান আছে; এক কথায় ইহাকে মানব প্রকৃতির সকল দিককার পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণের আদর্শ বলা যাইতে পারে। ভারতের মতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সৎ ও মহৎ বা আর্য তাঁহাদের জীবনে অশেষ প্রকার সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহাদের হৃদয়ে থাকিবে দানশীলতা, জনহিতৈষিতা, প্রেম, করুণা, নিঃস্বার্থ পরোপকার, দীর্ঘ তপশ্চর্যা, উদারতা, ধৈর্য, দয়া; তাঁহাদের চরিত্রে থাকিবে সাহস, বীরত্ব, উৎসাহ, গুরুজনের প্রতি আনুগত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যপরতা, আত্ম-সম্মানবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাস, যথাযোগ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতা ও ভক্তি, তৎসঙ্গে থাকিবে শাসন ও পরিচালনার ক্ষমতা, মধুর বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ় স্বাধীনচিত্ততা এবং মহৎ গৌরববোধ; মনে থাকিবে জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, যাবতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে পরিচয়, কাব্য শিল্প ও সৌন্দর্যের দিকে উন্মুখতা, কর্মে সুনিশ্চিত সামর্থ্য ও সুনিপুণতা; অন্তরসত্তায় থাকিবে প্রবল ধর্মবুদ্ধি, ভক্তি, ভগবৎপ্রেম, উচ্চতম অবস্থার দিকে আবেগ ও অন্বেষণ, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের আস্পৃহা; সামাজিক সকল প্রকার সম্বন্ধ ও আচরণের ক্ষেত্রে পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, আত্মীয়-বন্ধু, শাসক বা প্রজা, প্রভু বা ভৃত্য, পুরোহিত অথবা যোদ্ধা অথবা কর্মী, রাজা বা সাধক, কোন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সভ্যরূপে সকলের সহিত ঠিকভাবে সমাজধর্মের পরিপালন—ইহাই ছিল আর্যের, মহৎ প্রকৃতির বা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিতের পূর্ণ জীবনের আদর্শ। প্রাচীন ভারতের দুই সহস্র বৎসরব্যাপী লিখিত বিবরণে স্পষ্টভাবে এ আদর্শ বর্ণিত আছে—ইহাই হিন্দুর নীতি-ধর্মের প্রাণস্বরূপ। যাঁহারা ইহা সৃষ্টি

করিয়াছিলেন তাঁহারা একাধারে ছিলেন বুদ্ধিমান, আদর্শে অনুপ্রাণিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ের মত জাগতিক বিষয়েও সমদৃষ্টিসম্পন্ন, গভীরভাবে ধার্মিক, মহৎভাবে নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ়ভাবে বুদ্ধি ও বিচারে অভ্যস্ত অথচ নূতন বিষয়ে গ্রহণসক্ষম, বৈজ্ঞানিক অথচ সুন্দরকে দেখিতে অভ্যস্ত, ধৈর্যশীল, পরমতসহিষ্ণু, মানুষের নানা বিপদে এবং দুর্বলতায় সহানুভূতিসম্পন্ন কিন্তু নিজে কঠোর সাধনায় সংযত; ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি এইরূপ মননই গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মহৎ যে বস্তু লাভ হইলে মানবজীবন উন্নত ও মহান হইয়া মানবতাকে অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক ও ভাগবত সত্তায় পরিণত হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হইয়া উঠিবার পক্ষে ইহাও ভিত্তিভূমি মাত্র। প্রাণের পাশব বাসনা, স্বার্থ প্রবৃত্তি প্রভৃতি স্থূল বিষয়াসক্তিসমূহ স্বভাবতঃ মানুষকে প্রথমে চালাইতে চায়; ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্মের উচ্চ ও মহান আদর্শ ও সাধনার দ্বারা ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে মহত্তর পূর্ণতার ক্ষেত্র আছে তথায় তাহাদিগকে উন্নীত করিয়াছে, তাহাদের সুন্দর রূপ দিয়াছে। কিন্তু তাহার আরও গভীর এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্য সাধনই তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং এখানে সে অনন্যসাধারণ, সে উদ্দেশ্য হইল মানুষের আত্মপরিণতি ও পূর্ণতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই মহত্তর জীবনকেও এতদপেক্ষা উচ্চতর স্বাধীনতা ও আত্মাতিক্রমের যে ক্ষেত্র আছে তথায় তুলিয়া লওয়া; এ সভ্যতা এইভাবে জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মুক্তি, পূর্ণতা এবং মোক্ষের মহান আদর্শ সঞ্চারিত করিতে বিপুল প্রয়াস পাইয়াছে। বিধান ও তাহার আচরণ মানুষের জীবনের প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য নয়, কেননা এই বিধানের ঊর্ধ্বে চেতনার বৃহত্তর যে রাজ্য আছে মানুষকে তথায় উন্নীত হইয়া আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। মহৎ হইলেও মৃত্যুদ্বারা চির-প্রপীড়িত মনুষ্যত্ব মাত্র তাহার চরম পূর্ণতা নহে, পরন্তু অমরত্ব, স্বাতন্ত্র্য, ভাগবত স্বারূপ্য লাভেও তাহার অধিকার আছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার আন্তর দৃষ্টির সম্মুখে এই সর্বোচ্চ আদর্শ সর্বদা রক্ষা করিয়াছে এবং তাহার সত্তার সর্বাঙ্গ এই সম্ভাবনা এবং ইহার আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছে। এই আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনের সর্বাঙ্গকে মহান করিয়াছে এবং সমগ্র সমাজ গঠনের বিধানে এই উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছিবার জন্য সোপানপরম্পরা স্থাপিত করিয়াছে।

ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত কোন সমাজ ব্যবস্থায়, ভারতীয় চিন্তাধারা যে তিনটি প্রাথমিক শক্তির (কাম, অর্থ ও ধর্মের) কথা স্বীকার করিয়াছে প্রথমতঃ তাহাদিগকে সুব্যবস্থিত করিতে হইবে। মানুষের

স্বাভাবিক বৃত্তির দাবি পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে হইবে; ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থের অনুসরণ, মানুষের প্রয়োজন ও বাসনার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থার দিকে প্রচুর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এ সমস্ত লাভের উপযোগী জ্ঞান এবং কার্যপদ্ধতির একত্র মিলন করাইতে হইবে। কিন্তু ধর্মের আদর্শের দ্বারা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত, উন্নীত এবং বৃহত্তর আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। তদুপরি যাহাতে মানুষ উন্নীত হইতে পারে এমন কোন উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনা যদি থাকে—ভারত বিশ্বাস করে যে তেমন চেতনা আছে—তবে সেই চেতনায় উন্নীত হওয়া যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ বোধ সর্বদা সর্ব অবস্থার ভিতরেই দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া দিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা মানুষের প্রকৃতিকে যুগপৎ প্রশ্রয় দিয়াছে এবং শাসন করিয়াছে; এ সংস্কৃতি মানুষকে সমাজ জীবনে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছে; যাহার প্রতি অঙ্গ মহান, যাহার সকল সামর্থ্য ও কর্মশক্তি সুসঙ্গত ও সুব্যবস্থিত, যাহা উন্নত এবং সুরুচিসম্পন্ন সিদ্ধ মানবতার তেমন এক উদার আদর্শ ইহা মানুষের মনে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে; তাহা ছাড়া ইহা এক মহত্তম পরিণতির মতবাদ ও সাধনার ধারা তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, অধ্যাত্ম জীবনের ধারণার সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়াছে এবং ঈশ্বর ও অনন্তের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও আকূতির বীজ তাহার মধ্যে বপণ করিয়াছে। ইহা ধর্মের এমন সব প্রতীকের ব্যবস্থা করিয়াছে যাহা এই উচ্চতম জীবনে পৌঁছিবার পথের ইঙ্গিতে পূর্ণ; প্রতি পদে মানুষকে মনে করাইয়া দিয়াছে যে এই জীবনের পশ্চাতে ও সম্মুখে অন্য জীবনধারাসমূহ আছে, এই পার্থিব জগতের পিছনে অন্য বহু জগৎ রহিয়াছে; যিনি প্রাণকে অনুপ্রাণিত করেন অথচ প্রাণ হইতে যিনি বৃহত্তর সেই অধ্যাত্মসত্তা যে আমাদের অতি নিকটে আছেন, এমন কি তিনি যে মানুষকে ডাক দেন এবং মানুষের কাছে আবির্ভূত হন, এ সংস্কৃতি সেই ধারণা মানুষের প্রাণে সঞ্চার করিয়াছে; মানুষ যে চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে অমরত্ব, স্বাধীনতা, ভাগবত চেতনার দিব্য প্রকৃতির উচ্চ পদবী লাভ যে সম্ভব এ বিশ্বাস তাহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহং-এর উপরে যে এক উচ্চতম আত্মা আছে আর সে এবং সর্ববস্তু সর্বদা ঈশ্বরে বা শাশ্বত আত্মাতে বাস করিতেছে, তাঁহারই মধ্যে বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার মধ্যেই তাহাদের সত্তা রহিয়াছে এ কথা তাহাকে কখনও ভুলিতে দেওয়া হয় নাই। সে জানিত এমন বহু পথ ও সাধনা আছে যাহা অবলম্বন করিলে সে এই মুক্তিপ্রদ সত্যের অনুভূতি লাভ করিতে পারে অথবা অন্ততঃপক্ষে দূর হইতে তাহার সামর্থ্য ও প্রকৃতি বা অধিকার অনুসারে এই উচ্চতম লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। এই সাধন পথে যে সমস্ত ভক্তিভাজন সাধু-সজ্জন চলিতেছেন বা এই পথে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন

মহাশক্তিশালী সেই সমস্ত মহাপুরুষকে তাহারা চারিদিকে দেখিতে পাইত। সমাজ-জীবনে শীর্ষস্থানে অবস্থিত ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকস্তম্ভ এই সমস্ত মহামানব শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎস স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা মহান ভাবধারা দ্বারা মানবকে অনুপ্রাণিত করিতেন; ইঁহাদেরই উপরে প্রাচীনকালে বালকগণেরও শিক্ষাভার ন্যস্ত ছিল। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও পূর্ণতা যাহা ধরা ছোঁয়া যায় না সুদূরে অবস্থিত তেমন কোন চরম আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হইত না, কিন্তু তাহা মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া দেখান হইয়াছে, বলা হইত এই আধ্যাত্মিকতায় সকলকে অবশেষে উন্নীত হইয়া উঠিতে হইবে এবং জীবন এবং ধর্মের প্রাথমিক ব্যবহারিক ভিত্তি হইতে সাধনার দ্বারা সে আদর্শ নিকট এবং তাহাতে পেঁৗছা সম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক ভাবধারাই এই মহান সংস্কৃতির মধ্যস্থিত সকল লোকের জীবনের অন্য সকল প্রকার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা পরিচালিত ও আলোকিত করিত এবং সে-সকলকে সংগ্রহ করিয়া নিজের কাছে আনিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রধানতঃ এই সমস্ত ভাবধারাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছিল; জীবন সম্বন্ধে তাহার শক্তিশালী ধারণাবলি ইহাদের মধ্যেই রহিয়াছে। ইতিহাসের সুরু হইতে যে কোন সংস্কৃতি অথবা জীবন সম্বন্ধে যে কোন ধারণা মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহাদের কোনটি হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহাতে এমন কিছু নাই যাহার জন্য বলা যাইতে পারে যে ইহা জীবনকে এবং জীবন-বিকাশধারাকে নিরুৎসাহিত করে অথবা যে শক্তি মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে, তাহার জীবনে বেগ সঞ্চার করিতে বা গভীর প্রেরণা দিতে পারে তাহাকে নষ্ট করে। পক্ষান্তরে এ সংস্কৃতি মানব সত্তার সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈচিত্র্য এবং প্রকাশের ধারা ও তাহার শক্তি অকপটভাবে ও পূর্ণরূপে স্বীকার ও পরীক্ষা করিয়াছে; যথার্থভাবে জীবন পরিচালনার জ্ঞানগর্ভ মহৎ ধারণা এবং ঊর্ধ্বমুখী এক আদর্শ আকৃতি ও চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে পোষণ করিয়াছে এবং যথাসম্ভব বৃহৎ ও পূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্য প্রবলভাবে মানুষকে আহ্বান করিয়াছে। এই সমস্তই তো সংস্কৃতির প্রধান কাজ, এই সমস্তই মানব জীবনকে স্থূল আদিম বর্বরতা হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে। যদি ভাবের ও ধারণার মহত্ত্ব এবং তাহাদিগকে প্রবলভাবে প্রয়োগ করিবার শক্তির দ্বারা বিচার করিতে হয় তবে ভারতীয় সভ্যতা কোন সভ্যতা হইতে হীনতর নহে। ইহা যে পূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল একথা বলিব না, অতীত বা বর্তমান কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাহার অন্তরতম সত্তায় মানুষ অনন্ত, মনের ও প্রাণের ক্ষেত্রে সে ক্রমোন্নতির পথেও অগ্রসর হইতেছে এবং সে যতই টলিতে টলিতে চলুক না কেন বা যত দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাভাবের পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হউক না কেন, তাহাকে কোন এক বিধানে বা ভাবে অথবা জীবনের কোন এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে বাঁধিয়া রাখা যায় না। যে কাঠামোই সে গ্রহণ করুক না কেন তাহা সাময়িক এবং অপূর্ণ; যাহা খুব ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীণভাবে জীবনকে গ্রহণ

করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় কালক্রমে তাহাও অপ্রচুর হইয়া পড়ে, তাহার উপযোগিতা নষ্ট হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তিত করিতে অথবা তাহার স্থানে অন্যকে বসাইতে হয়। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একথা বলা যাইতে পারে যে মানুষের সমগ্র সত্তায় সকল ভূমিতে মানুষের দেহ মন প্রাণের, তাহার প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভবের, তাহার নৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবনের সকল অঙ্গে ও অংশে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সকল ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রধান প্রধান সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বা যে সমস্তের প্রবল প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়, ভারতীয় ধারণা তাহাদের সকল গুলিই অসাধারণ গভীরতা ও ব্যাপকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, এবং এই সকল ভাবের গতিমুখ উদার ও সূক্ষ্মভাবে অতি মহান ও জ্ঞানগর্ভ উচ্চতার পথে সজ্ঞানে সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপক ও ঐকান্তিকভাবে ফিরাইয়া দিয়াছে। অতীত বা বর্তমান কোন সংস্কৃতি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা অধিক কিছু বলা চলে না।

পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক সংস্কৃতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সকল মহান ও বৃহৎ ভাবধারারাজি তাহাকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু ইহা ছাড়া আরো কিছু চাই, তাহাকে তাহার রূপ ও ছন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে হইবে, এমন একটা কাঠামো বা ছাঁচ গঠিত করিতে হইবে যাহার মধ্যে তাহার ভাব ও জীবন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে এবং স্থায়ী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে তেমন বৃহৎ পূর্ণতা আমরা লাভ করিতে পারি নাই; অনেকটা অপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহার কারণ ভাব হইতে আত্মা যেরূপ বৃহত্তর তেমনি রূপ ছাঁচ বা ছন্দ হইতে ভাব বৃহত্তর। রূপের কতগুলি সীমারেখা আছে যাহাতে ভাবপ্রকাশ বাধা পায়, যে ভাব হইতে তাহার জন্ম হয় রূপ সেই ভাবের অন্তর্স্থিত সমস্ত সম্ভাবনা ও শক্তিকে নিঃশেষে বা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। যতই বৃহৎ হউক না কেন কোন ভাব অথবা শক্তি বা রূপের কোন সীমিত খেলা অনন্ত চিৎপুরুষকে বাঁধিতে পারে না; পৃথিবীর পক্ষে পরিবর্তন স্বীকার করিবার এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার যে প্রয়োজন রহিয়াছে ইহাই তাহার গোপন রহস্য। আবার ভাব আত্মার আংশিক প্রকাশমাত্র। এমন কি নিজের সীমার বা আপন বিশিষ্ট ধারার মধ্যেও ইহাকে সর্বদা অধিকতর সাবলীল বা নমনীয় হইতে এবং অন্যমত বা ভাব গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে হয়; প্রয়োগের নূতন ক্ষেত্রে তাহাকে উন্নীত এবং বিস্তারলাভ করিতে হয় আর প্রায়ই তাহার নিজের অর্থ ও বৃহত্তর তাৎপর্যের মধ্যে উন্নীত ও রূপান্তরিত করিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে হয়; অথবা নবতর এবং সমৃদ্ধতর সমন্বয়ের মধ্যে গিয়া মিশিতে হয়। তাই দেখিতে পাই সকল বৃহৎ সংস্কৃতির ইতিহাসে সভ্যতাকে তিনটি যুগ বা কালের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, কেননা এই গতি ঐ বস্তুসত্যের

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। প্রথম যুগে বৃহৎ একটা কিছু গড়িয়া উঠিতে থাকে কিন্তু তাহার রূপ তখন দানা বাঁধিয়া উঠে না; দ্বিতীয় যুগে ইহা নির্দিষ্ট রূপ, ছাঁচ ও ছন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে; অবশেষে তৃতীয় যুগে ইহাকে বার্ধক্যে ধরে, শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, নিজে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। কোন সভ্যতার জীবনে এই শেষ যুগ গুরুতর সংকটের সময়, তখন যদি তাহা নিজের রূপান্তর সাধন করিতে না পারে তাহা হইলে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে অগ্রসর হয় অথবা ইহার নিকটস্থিত শক্তিশালীভাবে জীবিত কোন সভ্যতার দ্রুত অভিঘাতে মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া অবসান লাভ করে—এই নূতন সভ্যতার প্রকৃতপক্ষে মহত্তর কোন শক্তি বা রূপ না থাকিলেও ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু যদি ঐ সভ্যতা তাহার যে রূপে তাহাকে সীমিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, যদি তাহার ভাবধারা নূতন পথে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে এবং আন্তর সত্তাকে নূতন কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে তদুপরি নূতন অভ্যুদয় ও প্রয়োজন ভালভাবে বুঝিয়া তাহাদিগকে আয়ত্ত ও পরিপাক করিয়া লইতে দৃঢ়সংকল্প থাকে তাহা হইলে সে-সভ্যতার যেন পুনর্জন্ম, প্রকৃত পুনরভ্যুদয় ও বিস্তারলাভ হয়, তাহার জীবনের আয়ু বাড়িয়া যায়।

ভারতীয় সভ্যতা নিজস্ব বৃহৎভাবে অতি মন্থর গতিতে এই সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম যুগে যখন প্রবলভাবে আধ্যাত্মিকতার পরিস্ফুরণ হইয়াছিল তখন ইহার বাহ্য রূপ নবভাব গ্রহণে সমর্থ ও নমনীয় ছিল, এবং নিজের মূল প্রকৃতির আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারিত। প্রথম যুগের এই সুনম্য গতিশীলতার পরে, দৃঢ়বুদ্ধির বৃহৎ একটা কাল আসিয়াছিল তখন সবকিছু নির্দিষ্ট বিশিষ্ট ভাবে বেশ জটিলতার সহিত নানা রূপ ও ছন্দে সুগঠিত ও বৃহৎভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন সে রূপ ও ছন্দের সাবলীলতা বর্তমান ছিল। ইহার পরিণামস্বরূপে একটা যুগ আসিল যখন খুব সমৃদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় পদ্ধতিতে সমাজ রূপ গ্রহণ করিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইল তাহাতে সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল, কিন্তু ভাব ও রূপের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা অংশতঃ সে অবস্থা প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে দৃঢ় বাহ্যরূপের বন্ধন-শক্তি জয়লাভ করিতে থাকে এবং অন্তরের অনুপ্রেরণাদায়ী ভাবধারা শুকাইয়া আসিতে, জীবনের গতিবেগ মন্দীভূত হইতে এবং বাহ্য রূপের কাঠামো ক্রমশ অবনতি ও ক্ষয়ের পথে চলিতে থাকে। ক্ষয় আরম্ভের সঙ্গে অন্য নানা সংস্কৃতির কঠোর সংঘাত আসিয়া পড়ে কিন্তু গোড়ার দিকে কিছুকালের জন্য ক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব হইলেও পরিশেষে ঐ সংঘাতের ফলে অবনতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার পরে পাশ্চাত্য জগৎ

ও তাহার বিশিষ্ট ভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া পড়াতে আজ আমরা এক ভীষণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার ফলে যে প্রবল উৎক্ষেপ ও বিস্ফোরণ দেখা দিয়াছিল তাহাতে প্রথমে ভয় হইয়াছিল যে এ সংস্কৃতির নবজাগরণের আশা বুঝি আর নাই, ইহা একান্তভাবে বুঝি ধ্বংস হইয়া যাইবে; কিন্তু অন্য দিকে ইহার গতিধারা আবার ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে এবং বৃহৎভাবে পুনরুজ্জীবিত ও রূপান্তরিত হইয়া এ সংস্কৃতি নব বলে যে বলীয়ান হইয়া উঠিবে তাহার প্রবল সম্ভাবনা ও আশা দেখা দিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট ভারতীয় সংস্কৃতির এই তিন অবস্থারই বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল ভাবধারা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে ইহার গৌরবময় আদিকালে, বেদ ও উপনিষদের প্রাচীনতম যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে, সেখানেই ইহার সৃষ্টিশীল বলিষ্ঠ মূল রহিয়াছে। এ ভাবধারা যে নির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, যে বস্তু ইহার জীবনে মৌলিকভাবে ছন্দের দোলা আনিয়া দিয়াছিল তাহা দেখিতে এবং ভালভাবে যদি বুঝিতে চাই তবে মধ্যযুগের শেষাংশে প্রচারিত শাস্ত্র এবং ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের যুগের, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মতবাদ ও বিধিব্যবস্থা, নানামুখী বিচারশীল চিন্তাধারা, ধর্মের স্থিরীকৃত বিধান, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যার দিকে আমাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ইহার গতিপথে কি ইহাকে সীমিত করিয়াছে, কোন্ কোন্ স্থানে ইহার গতি রুদ্ধ হইয়াছে, কোথায় ইহা ইহার অন্তরের ভাবকে পূর্ণ বা প্রকৃত রূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, তাহা জানিতে চাহিলে তাহার অবনতির যুগের পীড়াদায়ক অবস্থা মনোযোগসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অবশেষে রূপান্তরপ্রাপ্তির জন্য এ সভ্যতার ভবিষ্যতে কোন্ পথে চলিবার সম্ভাবনা আছে তাহা যদি আবিষ্কার করিতে চাই তাহা হইলে তাহার পুনরুজ্জীবনের সঙ্কটময় কালের যে গতিবৃত্তি বর্তমানে বিশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে তাহার পশ্চাতে গভীরভাবে ডুবিয়া সে সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ এই যুগসকলের একটিকে আর একটি হইতে একেবারে পৃথক করিয়া দেখান যায় না; কারণ পূর্ববর্তী যুগে যাহা পূর্বদৃষ্ট ও আরম্ভ হইয়াছে বা যাহার বীজ বপন করা হইয়াছে পরবর্তীযুগে তাহারই বিকাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও হয়ত কতকটা বৃহৎ কিন্তু অস্পষ্টভাবে আমরা এই যুগগুলি ভাগ করিতে পারি; বিশ্লেষণ করিয়া জানিবার এবং বুঝিবার জন্য তাহা প্রয়োজনও বটে। কিন্তু যে সমস্ত প্রধান রূপ ও ছন্দ সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার মহত্তর যুগের মধ্যে বাঁচিয়া ছিল বর্তমানে আমরা কেবল তাহাই আলোচনা করিব।

জীবন সম্বন্ধে ইহার যে বিশিষ্ট ভাব ও আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা

যাহার উপর ফুটাইয়া তোলা যাইবে এমন দৃঢ় ব্যবহারিক ভিত্তি নির্ণয় করাই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্যা। তাহার সমস্যা ছিল কি করিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতঃ একদিকে তাহাকে স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের যথেষ্ট বিস্তৃত ক্ষেত্র দিতে হইবে তথাপি অন্যদিকে সেই জীবনকে কি করিয়া তাহার নিয়ম, কার্য ও আচরণের বিধিব্যবস্থার, তাহার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের ধারার, তাহার প্রতি বাস্তব সাধারণ প্রবৃত্তির বিধানের এবং তৎসঙ্গে তাহার আদর্শ উদ্দেশ্যের উচ্চতম বিধানের অধীন করিতে হইবে। আরও সমস্যা ছিল তাহার অধ্যাত্ম জীবনের নিরাপদ স্বাধীনতায় পৌঁছিবার জন্য সে-ধর্ম যাহাতে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যেখানে পৌঁছিলে তাহার সাধনপদ্ধতি ও অনুশাসনের পূর্ণ সার্থকতা ও অবসান ঘটিবে সেই পরম অবস্থার দিকে কি করিয়া নিজেকে ফিরাইয়া ধরিতে পারিবে। নিজেকে পরিচালনা করিবার জন্য এ সংস্কৃতি প্রাচীন কাল হইতে দুইটি ভাবধারা গ্রহণ এবং সমাজের কাঠামোর মধ্যে জীবনের ভিত্তিভূমি রূপে প্রয়োগ করিয়াছে। ইহার একটি চারিভাগে বিভক্ত জাতিবিভাগ পদ্ধতি—চাতুর্বর্ণ্য; অপরটি ক্রমবিকাশশীল জীবনের চারিটি স্তর অনুসারে পরিকল্পিত চতুরাশ্রম।

পরবর্তী যুগে চাতুর্বর্ণ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে তখনকার অবস্থা দেখিয়া অথবা যাহা তাহার স্থূল অর্থশূন্য হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ সেই জাতিভেদ দ্বারা প্রাচীন যুগের চাতুর্বর্ণ্য বিধানের বিচার করিলে ভুল করা হইবে। অন্যান্য সভ্যতায় পুরোহিত, রাজ্যপরিচালক, বণিক ও ভৃত্য বা শ্রমজীবী রূপে যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় এ চাতুর্বর্ণ্য বিধান প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। উভয়ত্র শ্রেণীবিভাগ হয়ত বাহ্য দৃশ্যে একই রূপে আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু ভারতে ইহাকে নিজের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক এক বিশেষ অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় ধারণা এই ছিল যে স্বভাব অনুসারেই মানবজাতি চারিটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই চারিবর্ণের মধ্যে প্রথম ও সর্বোপরি ছিল ব্রাহ্মণ যাঁহারা উচ্চ চিন্তাশীল শিক্ষিত ও জ্ঞানী; তাহার পর ক্ষত্রিয় যাঁহারা শৌর্য-বীর্যশালী সর্বদা কর্মরত শাসক যোদ্ধা নেতা এবং রাষ্ট্রপরিচালক; তৃতীয় শ্রেণী বৈশ্য যাঁহাকে অর্থনৈতিক মানুষ বলা যাইতে পারে, যাঁহারা উৎপাদক এবং উপার্জনশীল বণিক কারুশিল্পী ও কৃষক; এই তিন শ্রেণী ছিল দ্বিজ; ইঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিত। অবশেষে যে সমস্ত মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত অথবা দ্বি-জাতির উপযোগী কার্যগ্রহণের জন্য এখনও প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই, যাহারা বুদ্ধি ও শক্তিহীন যাহাদের স্মৃতিশক্তি নাই, যাহারা বুদ্ধিপূর্বক উৎপাদনে অসমর্থ এমন কি কর্মে কোন বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতেও পারে নাই শুধু কায়িক শ্রমে সমর্থ তাহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

এইভাবে এই চারিশ্রেণীর বা চারিপ্রকার স্তরবিভাগ দ্বারা ঠিক করা হইয়াছিল। সমাজ ব্রাহ্মণের নিকট দাবী করিত সমস্ত সমাজের জন্য সে পুরোহিত মনীষী, পণ্ডিত, ব্যবস্থাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ধর্মজগতের নেতা ও পরিচালক এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইয়া উঠুক, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে রাজা, যোদ্ধা, শাসক ও রাজকার্য পরিচালক ব্যক্তিবর্গকে চাহিত, বৈশ্যের নিকট হইতে উৎপাদক, কৃষক ও শ্রম-শিল্পী এবং ব্যবসায়ীগণকে পাইবার আশা করিত, শূদ্রের নিকট হইতে ভৃত্য ও পরিচারক পাইত। এ পর্যন্ত ইহাতে অসাধারণভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া এবং হয়ত ধর্ম মনীষা ও শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া ছাড়া ইহার মধ্যে অন্য কোন প্রবল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, কিন্তু জ্ঞান ও ধর্মের যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা শুধু উচ্চ স্তরে নিবদ্ধ ছিল না, তাহাদিগকে সমাজের প্রধান নিয়ামক শক্তি করিয়া তোলা হইয়াছিল—অন্য একটি বা দুইটি সভ্যতায় মাত্র ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা গিয়াছিল। সমাজব্যবস্থায় মানুষের স্থান জন্মদ্বারা স্থির না করিয়া এইভাবে তাহার আন্তর প্রকৃতি ও সামর্থ্যানুসারে শ্রেণীবিভাগ করা উচিত ইহাই ছিল তাহার বিশুদ্ধ অবস্থায় মূলত ভারতীয় ধারণা আর এই ব্যবস্থা যদি পূর্ণভাবে রক্ষিত হইত তবে তাহা অন্য সমাজ হইতে ভারতের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতার স্পষ্ট পরিচায়ক হইত। কিন্তু কতকটা যন্ত্রের মত বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট সমাজও বাহ্য ভৌতিক চিহ্ন ও মানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে আর সেই পুরাকালে এই ভাবের সূক্ষ্ম ও মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা শ্রেণীবিভাগ স্থির রাখা দুরূহ ছিল এবং সেইরূপ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। আমরা দেখিতে পাই যে কার্যতঃ ভারতেও জন্মই বর্ণনির্ণয়ের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে প্রবল চিহ্ন অন্য সকল সংস্কৃতি হইতে ইহাকে পৃথক রাখিয়াছে, যাহা ইহার সমাজ ব্যবস্থাকে অন্য সকল হইতে বিভিন্ন এবং অসাধারণ করিয়াছে তাহা আমাদিগকে অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

বস্তুতঃ এই ভাবের অর্থনৈতিক বিধানের পরিপূর্ণ অনুগত ভাবে সমাজ কখনও চলিতে পারে নাই। প্রথম যুগাবলিতে সমাজের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সাবলীলতা দেখা গিয়াছিল, যখন সমাজের জটিল পদ্ধতি ক্রমশঃ দৃঢ় আকার গ্রহণ করিতে লাগিল তখনও সে সাবলীলতা পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। এমন কি পরবর্তী যুগে যখন জাতিভেদ আরো দৃঢ় আকার ধারণ করিল কেবল তখনই কার্যতঃ অর্থনৈতিক ব্যাপারে বা বৃত্তি গ্রহণে গোলযোগ দেখা দিল। কোন সতেজ সমাজের প্রাণশক্তি প্রতি পদে যান্ত্রিক মন দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট একটি ছাঁচে গঠিত হইতে বা একটি বিশিষ্ট ধারা ধরিয়া চলিতে দেয় না। তাহা ছাড়া কোন ব্যবস্থার আদর্শগত মতবাদের সহিত সাধারণ আচরণের ক্ষেত্রের—যেখানে মানুষ প্রায়শ আদর্শ অনুসারে চলে না—একটা ভেদ সর্বদা থাকিয়া যায়, কারণ সকল আদর্শ বা ব্যবস্থার মধ্যে সর্বদাই এমন কি তাহাদের

চরমোৎকর্ষের সময়ও তাহার বাহ্য জড়গত দিকে দুর্বলতা থাকে এবং সকল ব্যবস্থারই শেষ দোষ এই যে কালক্রমে কঠোর বিধিবিধান আসিয়া দেখা দেয়, নমনীয়তা হারাইয়া যায়, সমাজ এক অনড় শ্রেণীভেদে পরিণত হয় এবং তাহা নিজ পদ্ধতির মূলগত উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা স্থায়ীভাবে সঠিকরূপে রক্ষা করিতে পারে না। তখন ইহা প্রাণহীন রূপমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ ব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আর যখন ইহা পূরণ করিতে পারিতেছে না তখনও ইহাকে পচনশীল অধোগামী বা অত্যাচারী বাহ্যানুষ্ঠান রূপে বাঁচাইয়া রাখা হয়; এমন কি যখন কোন সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষে মানব প্রগতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন সাধনের উপযোগী হওয়ার সামর্থ্য আর না থাকে তখনও তাহার যান্ত্রিক ধারা রহিয়া যায় এবং তাহা জীবনের সত্যকে কলুষিত ও উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। ভারতবর্ষীয় সমাজ এই সাধারণ বিধান হইতে মুক্ত হয় নাই; এই সমস্ত দোষ ও ত্রুটি ইহাকে অভিভূত করিয়াছে, যে আদর্শ লইয়া সে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, জাতিভেদের অরাজকতায় পড়িয়া অবনত হইয়াছে এবং এমন সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা দূর করিতে আমাদিগকে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হইতেছে। কিন্তু এ পদ্ধতি যখন প্রথম গঠিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং অতি উত্তমরূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিল; কৃষ্টিগত অভ্যুদয়ের নিরাপদে অগ্রসর হওয়ার পথে যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন তাহা বেশ দৃঢ় ও মহৎ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল—এমন ভাবে সে গঠন হইয়াছিল যে জগতে কোন সংস্কৃতিতে তাহার তুলনা মিলে না। আর ভারতীয় প্রতিভা ইহাকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিল যে তাহার ফলে ইহা সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার জন্য পরিকল্পিত কেবল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার যন্ত্র হইতেও মহত্তর ও বৃহত্তর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল।

কারণ সমাজ ব্যবস্থায় সুসমঞ্জস ভাবে কার্য বিভাগের জন্য ভারতীয় চাতুর্বর্ণ্যকে যে খাঁটি মহত্ত্ব দেওয়া হয় তাহা নহে; সমাজের পরিচালক মনীষীগণ ইহার কাঠামোর ভিতরে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রভাব আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই ইহাকে প্রকৃত মৌলিকতা এবং একটা স্থায়ী মূল্য দান করিয়াছে। বুদ্ধি নীতি ও আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিসত্তা হিসাবে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে ইহাই যে মানব জাতির মূল প্রয়োজন, এই আন্তর ধারণা লইয়া তাঁহারা কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমাজ মানুষের এই ব্যক্তিগত পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো মাত্র; সমাজের মধ্যে রহিয়াছে নানা সম্বন্ধের ধারা, যাহা সরবরাহ করে ব্যক্তির পুষ্টির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র, বাহন ও নিমিত্ত এবং আমাদের সহায়ক নানা প্রভাবের

সুশৃঙ্খল সম্বন্ধ। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিকে এমন নিরাপদ স্থান দেওয়া প্রয়োজন, যথা হইতে ব্যক্তিগত হিসাবে মানুষ একই সঙ্গে তাহার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে তাহাদের সকলের সেবা ও সমাজ রক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে ও নিজ কর্তব্য পালন এবং অন্যের সহায়তা করিয়া সমাজের নিকট তাহার যে ঋণ আছে তাহা পরিশোধ করিতে এবং সমাজের নিকট হইতে যতটা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা লইয়া নিজের আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে। কার্যতঃ জন্মকেই স্থূলভাবে প্রথম ও স্বাভাবিক রূপে সমাজের মধ্যে তাহার স্থানের নির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা হইত; কেননা ভারতীয় মন বংশধারা ও উত্তরাধিকার সূত্রকে সর্বদা খুব উচ্চ স্থান দিয়াছে, এমন কি পরবর্তী কালের চিন্তাধারাতে এ মতও গৃহীত হইয়াছিল যে মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্মে আত্মোন্নতি দ্বারা নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ যে পরিবেশ প্রস্তুত করিয়াছে জন্মই তাহার নির্দেশক ও প্রকৃতিদত্ত চিহ্ন। কিন্তু জন্মই বর্ণনির্ণয়ের একমাত্র উপায় নয়; হইতে পারে না। বুদ্ধি ও বিচার-সামর্থ্য, প্রকৃতির গতি ও প্রবণতা, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা—এ সমস্তই বর্ণ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। তাই এই মূল বিষয়গুলি যাহাতে বিকশিত ও রূপায়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পারিবারিক জীবনের এক বিধান রচিত, আত্মশিক্ষা ও আচরণের এক পদ্ধতি নির্ণীত এবং শিক্ষা ও অনুশীলন হইতে শক্তিলাভের এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জীবনের কর্তব্য সুচারুরূপে পরিপালনের জন্য মানুষের কর্ম-শক্তি, অভ্যাস, আত্মসম্মানবোধ কর্তব্যানুরাগ প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ যাহাতে জাগিয়া উঠে ও বর্ধিত হয় তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। যে কাজ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধেও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শিক্ষা দেওয়া এবং সেই বিষয়ে কার্যসিদ্ধির সুষ্ঠু উপায় তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইত, অর্থনীতি রাজনীতি অথবা ধর্মের ক্ষেত্রে সাহিত্য ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে অথবা যে কোন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানুষ চলুক না কেন সেখানে তাহার শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে যাহাতে স্পষ্টতর পূর্ণতার পথে চলিতে পারে এইরূপ উচ্চতম বিধি বিধানের দ্বারা তাহাকে উপযুক্ত করিয়া লওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এমন কি অতি উপেক্ষিত কাজ বলিয়া যাহা পরিচিত ছিল তাহার মধ্যেও শিক্ষা এবং বিধি বিধান, সফলতা লাভের উচ্চাভিলাষ, কর্তব্য সম্পাদনে গৌরব বোধ, সুসম্পন্ন করিবার আগ্রহ ও গৌরবময় নির্দিষ্ট মান ছিল; এবং এই সমস্ত ছিল বলিয়া যে কাজ নীচতম বলিয়া বিবেচিত হইত বা যে কাজের প্রতি লোকের সর্বাপেক্ষা কম আকর্ষণ ছিল তাহাও কতক পরিমাণে আত্মলাভের এবং সুব্যবস্থিত আত্মতৃপ্তির উপায় হইয়া উঠিতে পারিত। এই ভাবের বিশেষ কর্মের শিক্ষা ছাড়া যাহা যাহা সাধারণ ভাবে নানা গুণ নানা বিজ্ঞান, বহুবিধ

শিল্প জীবনের নানা সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং যাহা মানব প্রকৃতির বিচার-বুদ্ধির রসবোধের ও সুখ লাভের শক্তি বিকশিত করে সে সমস্তর দিকে দৃষ্টি ছিল। প্রাচীন ভারতে এইরূপ বহু বিচিত্র নানা ধারা ছিল এবং সব কিছু গভীর রূপে তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্মভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং সংস্কৃতির মধ্যস্থ সকল উপযুক্ত ব্যক্তিরই সে শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল।

কিন্তু প্রাণধর্মের সুস্পষ্ট প্রাচুর্য এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মহৎ তাৎপর্য লইয়া এই সমস্ত বস্তু লাভের জন্য যখন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তখন অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মত ভারতীয় সংস্কৃতির গতি যে থামিয়া গিয়াছিল তাহা নহে। ইহা ব্যষ্টি ব্যক্তিকে বলিয়াছিল "তুমি এই সমস্ত যাহা দেখিতেছ বস্তুতঃ তাহা এক বিশাল মন্দিরের নিম্নভাগ মাত্র, এ ভাগকেও গঠিত করিয়া তোলার খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে তথাপি ইহা চূড়ান্ত বা মহত্তম বিষয় নহে। যখন তুমি তোমার সমাজের ঋণ শোধ করিয়াছ, সমাজ জীবনে নিজের স্থান সুন্দর ভাবে প্রশংসার সহিত পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, সমাজকে বিধি পালন ও তাহার ধারা রক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছ, তোমার প্রাপ্য অভীপ্সিত তৃপ্তি তথা হইতে আহরণ করিয়াছ, তখনও যাহা সবচেয়ে মহত্তম বস্তু তাহা তোমার লাভ হয় নাই। তাহার পরেও আছে তোমার নিজের আত্মা, তোমার অন্তরতম সত্তা, তোমার অন্তরাত্মা যাহা অনন্ত পুরুষের অংশ, শাশ্বত সত্তার সহিত মূলতঃ এক, তাহাকে তুমি জান নাই বা পাও নাই। এই আত্মাকে, তোমার এই অন্তরতম সত্তাকে তোমার পাইতে হইবে, সেই জন্যই তুমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছ, সমাজ ব্যবস্থায় আমি তোমাকে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যে শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছি তাহাতে তুমি এই নিজেকে জানিবার পথে অগ্রসর হইতে পার; কারণ প্রত্যেক বর্ণকে মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত করিয়াছি, তোমার প্রকৃতি যে অত্যুচ্চ আদর্শধারা গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা দেখাইয়া দিয়াছি। তোমার জীবন ও প্রকৃতিকে নিজের বিশিষ্ট ভাবে নিজের স্বধর্ম দ্বারা পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করিয়া তুমি যে কেবল সে-আদর্শজীবনের দিকে পুষ্ট ও বর্ধিত এবং সার্বভৌম প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস হইয়া উঠিতে পার শুধু তাহা নহে, পরন্তু তুমি এক বৃহত্তর দিব্য প্রকৃতির সন্নিকটে ও সংস্পর্শে আসিতে এবং বিশ্বাতীত পরম বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে পার। ইহাই তোমার সম্মুখে উপস্থাপিত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবনের যে ভিত্তি আমি তোমাকে দিয়াছি তাহার উপর দাঁড়াইয়া যে জ্ঞান পরিণামে তোমাকে আধ্যাত্মিক মুক্তিতে বা মোক্ষে লইয়া যাইবে সেই জ্ঞানে উন্নীত হইতে পার। এই যে সমস্ত বাধা এবং সীমার মধ্যে তুমি বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ তাহা পার হইয়া যাইবার শক্তি লাভ করিতে পার,

পূর্ণভাবে ধর্মপালন দ্বারা সেই ধর্মের অতীত তোমার শাশ্বত আত্মার ক্ষেত্রে অমৃতময় পুরুষের পূর্ণতা, স্বাধীনতা, মহত্ত্ব ও আনন্দে পৌঁছিতে পার; কেননা প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজ প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে সেই পরম সত্তার সহিত এক। যখন তুমি ইহা করিতে পারিবে তখনই মুক্ত ও স্বাধীন হইবে। তখন তুমি সকল ধর্ম অতিক্রম করিয়া বিশ্বগত আত্মার সহিত বিশ্বের সকল সত্তার সহিত এক হইয়া যাইবে আর তখন তুমি হয় সেই দিব্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র হইতে সর্বভূতের কল্যাণের জন্য কর্ম করিতে পারিবে অথবা নির্জনে নীরবতার মধ্যে শাশ্বতের এবং সর্বাতীত পরম বস্তুর দিব্য আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।" ভারতীয় সভ্যতায় চারি বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে এইভাবে প্রাণ মন ও আত্মার উন্নতি ও অগ্রগতি এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভের সুসংগত উপায় করা হইয়াছিল; এইভাবে তাহার সাধারণ অভীপ্সিত পদার্থ ও বাসনার ক্ষেত্র হইতে প্রথমতঃ ধর্মের ভূমিতে লইয়া গিয়া তাহার প্রকৃতির পূর্ণতা বিধান করিবার এবং আবার তথা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, কেননা সর্বদাই মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে—নিজের এই অমৃতময় আত্মার উপলব্ধি, এই অনন্ত শাশ্বত সত্তার গোপন রহস্যের মধ্যে প্রবেশ।

কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা ব্যষ্টিগত জীবনের এই দুরূহ উন্নতি ও পরিণতি বাহিরের বিনা সাহায্যে শুধু অন্তরের প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া একেবারে রাখিয়া দেয় নাই। অবলম্বন করিবার জন্য ইহা মানুষকে তাহার জীবনের একটি কাঠামো দিয়াছে; বিভিন্ন অধিকারের উপযোগী করিয়া তাহাতে নানা সোপান ও স্তর বিন্যাস করিয়াছে মইএর মত যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ উপরে উঠিতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চারি আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জীবনকে চারিটি পর্যায় বা কালে ভাগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটি সংস্কৃতিগত জীবনাদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার একটি স্তর রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সে চারিটি আশ্রম যথাক্রমে ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গৃহীর জীবন বা গার্হস্থাশ্রম, নির্জনে বাস করিয়া সাধনার জীবন বা বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সমাজবন্ধন হইতে মুক্ত পরিব্রাজকের জীবন বা সন্ন্যাসাশ্রম। মানুষকে যাহা জানিতে করিতে এবং হইতে হইবে তাহার ভিত্তি পত্তন করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন পরিকল্পিত হইয়াছিল। এ জীবনে প্রয়োজনীয় শিল্প বিজ্ঞান ও জ্ঞানের নানা শাখার শিক্ষা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হইত; কিন্তু ধর্ম ও নৈতিক প্রকৃতি গড়িয়া তুলিবার জন্য নিয়মানুগ অভ্যাস গঠনের দিকে অধিকতর ঝোঁক দেওয়া হইত এবং প্রাচীনতর যুগে বৈদিক অধ্যাত্ম জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সেই পুরাকালে নাগরিক জীবন হইতে দূরে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে যিনি

নিজে জীবনে এই সমস্ত আশ্রমের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন এবং প্রায়শই যিনি অধ্যাত্ম জ্ঞানের বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এরূপ গুরুর অধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ছাত্রগণ এ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরবর্তী কালে শিক্ষা যখন আরো বেশী পার্থিব বিষয় লইয়া ব্যস্ত এবং আরো বুদ্ধি বিচারে প্রবৃত্ত হইল, তখন নগর এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার স্থান রূপে নির্দিষ্ট হইল, এবং চরিত্র ও জ্ঞানের আন্তর প্রস্তুতি অপেক্ষা শিক্ষা এবং বুদ্ধির অনুশীলন বড় হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রথম অবস্থায় আর্যপুরুষ অর্থ, কাম, ধর্ম, মোক্ষ জীবনের এই চারিটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কতকটা সত্যভাবেই প্রস্তুত হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অর্জিত জ্ঞানের জীবন যাপন করিবার জন্য সে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত, সেখানে তাহার জীবনের প্রথম তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে পারিত; তাহার প্রাকৃত সত্তার প্রয়োজন ও কামনা বাসনার তৃপ্তি সাধন এবং জীবনের আনন্দ ভোগ করিত, সমাজের নিকট তাহার যে ঋণ আছে তাহা শোধ করিত, তাহার দাবী মিটাইত, আর এ সমস্ত এমন ভাবে করিত যাহাতে তাহার জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে। তৃতীয় আশ্রমে সে বনে গমন করিত এবং কতকটা নির্জনতার মধ্যে আত্মার সত্য লাভের চেষ্টা করিত। তখন সে সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিশালতর ভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করিত. কিন্তু সে যদি ইচ্ছা করিত তবে তাহার চারিদিকে তরুণগণকে একত্র করিয়া তাহাদিগের অথবা অনুসন্ধিৎসু অথবা জ্ঞানাভিলাষীর মধ্য দিয়া শিক্ষক বা অধ্যাত্ম গুরু রূপে তাহার জ্ঞান নবাগত ভবিষ্যত বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইত। জীবনের শেষ সোপানে অবশিষ্ট বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ধারা এবং সকল পদার্থের প্রতি ঐকান্তিক ভাবে আসক্তিশূন্য ও আধ্যাত্মিকতায় বিভাবিত হইয়া জগতে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার লাভ হইত; তখন কেবলমাত্র জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা না হইলে চলে না এমন দ্রব্য শুধু গ্রহণ করিয়া বিশ্বাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ সাধন এবং শাশ্বতের জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ থাকিত না। সকলকেই যে বাধ্যতামূলকভাবে এই চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে এমন কথা ছিল না। অধিকাংশ লোকই প্রায় দুটি আশ্রমের বাহিরে যাইত না; বাণপ্রস্থ আশ্রমে বনে থাকিয়া অনেকে দেহ রক্ষা করিত; কেবলমাত্র অতি অল্প সংখ্যক লোক বিপদসঙ্কুল চরম অবস্থায় প্রবেশ এবং পরিব্রাজক সন্ন্যাসী-জীবন গ্রহণ করিত। মানুষের ক্রমোন্নতির পথে সকল আশ্রম লইয়া গভীর ভাবে পরিকল্পিত এই সমগ্র নক্সা সকলের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইত এবং সকলেই তাহাদের বাস্তব পরিণতি এবং অধিকার অনুসারে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিত এবং যাহারা উপযুক্ত রূপে উন্নতি ও

পরিণতি লাভ করিত তাহারা বর্তমান জন্মেই পরিপূর্ণ জীবন চক্রের সুযোগ ও সাহায্যে পূর্ণরূপে সুগঠিত হইয়া উঠিত।

প্রথমে এইরূপ দৃঢ় ও মহৎ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতা পুষ্ট ও পরিণত এবং এক সমৃদ্ধ গৌরবময় অদ্বিতীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। চরম আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াও সমতলের জীবনকে সে উপেক্ষা করে নাই। নগর ও গ্রামের কর্মচঞ্চল এবং বনানীর স্বাধীন ও নির্জন জীবনের মধ্যে এবং অবশেষে উন্মুক্ত অসীম আকাশতলে সে সমান ভাবেই বাস করিয়াছে। দৃঢ় ও নির্ভীক ভাবে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সে বিচরণ করিয়া এই দুইকে অতিক্রম করিয়া যে অমরত্ব আছে তাহাকে সে দেখিতে পাইয়াছে এবং তথায় পেঁাছিবার শত পথ সে কাটিয়া বাহির করিয়াছে। বাহ্য প্রকৃতিকে সে পুষ্ট ও পরিণত করিয়াছে এবং তাহাকে অন্তরাত্মার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে; জীবনকে সে এমন ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে যে তাহাও আত্মস্বরূপে উন্নীত হইয়াছে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ভাবের শিক্ষা পাইয়া ভারতের এই প্রাচীন জাতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার এত উচ্চস্তরে পেঁাছিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না; দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত মহৎ বিচিত্র ও সমৃদ্ধ এক উদার সামঞ্জস্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সে বাস করিত; বিশাল সাহিত্য নানা বিজ্ঞান শ্রমশিল্প ব্যবসায় ও কারুকলা সে গড়িয়া তুলিয়াছিল; যেমন সে উচ্চতম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তেমনি জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত আচরণের ক্ষেত্রেও তাহার কৃতিত্ব কিছু কম ছিল না; সে দুঃসাধ্য মহত্ত্ব ও বীরত্ব, দান ও পরোপকার, সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি ও একত্ববোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল; সে অনুপ্রেরণালব্ধ অধ্যাত্ম দর্শনের এক অত্যাশ্চর্য ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; একদিকে বাহ্য প্রকৃতির গূঢ় রহস্যসকল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল অন্যদিকে আন্তর সত্তার অসীম ও পরমাশ্চর্য সত্যসকলও আবিষ্কার করিয়াছিল এবং সেই সমস্ত সত্য জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল; যেমন গভীরে ডুবিয়া আত্মাকে দেখিয়াছিল তেমনি জগৎকে বুঝিয়াছিল এবং অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এ সভ্যতা যখন সমৃদ্ধ ও জটিল হইয়া উঠিল তখন আদিম-কালের প্রাথমিক বিশাল সরলতা সে বস্তুতঃ হারাইয়া ফেলিল। তখন বুদ্ধি বিস্তৃত হইল উচ্চ শিখরে পেঁাছিল বটে কিন্তু বোধি ও অনুপ্রেরণা কমিয়া আসিতে লাগিল অথবা সাধু সন্ত ভাবক বা রহস্যবিদ্যাবিদের অন্তরে গিয়া লুকাইল। জীবন ও মননের সকল ক্ষেত্রে এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও বৈজ্ঞানিক বিধি ব্যবস্থা সূক্ষ্ম ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার উপর অধিকতর ঝোঁক দেওয়া হইতে লাগিল; সম্বোধিজাত যে জ্ঞানপ্রবাহ স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হইত তাহাকে বলপূর্বক নির্দিষ্ট মনুষ্যনির্মিত খাতে পরিচালিত করা হইল। সমাজের স্বাধীনতা পূর্বাপেক্ষা

হ্রাস পাইতে এবং মহত্ত্ব কমিতে লাগিল, তাহাতে কৃত্রিমতা দেখা দিল জটিলতা বৃদ্ধি পাইল, সমাজ আধ্যাত্মিক বৃত্তিরাজির পরিণতির ক্ষেত্র হওয়া অপেক্ষা ব্যষ্টি ব্যক্তির পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বে সমাজে পূর্ণতার যে রমণীয় সামঞ্জস্য ছিল তাহার স্থলে ক্রমশঃ জীবনের এক একটি মৌলিক ভাবের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হইতে লাগিল। অর্থ ও কাম ভোগ ও বাসনা কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের বিনিময়েও বর্ধিত হইতে লাগিল। ধর্মের ধারাসমূহ অতি দৃঢ় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বন্ধ হইতে লাগিল তাহাতে এরূপ ভাবের ছাপ পড়িতে লাগিল যাহা আত্মার স্বাধীনতার পথেও বাধা হইয়া দাঁড়াইল; জীবনের চরম ও পূর্ণ পরিণতি এবং মুকুটমণি না হইয়া জীবনের সহিত শত্রুতা করিয়া মোক্ষ বা মুক্তির পথ নির্ধারিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি যাহা জীবনকে অনুপ্রেরণা দিতে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে এবং ভারতের আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে পুরাতন জ্ঞানের তেমন দৃঢ় ভিত্তি কিছু অবশিষ্ট রহিল। এমন কি যখন ক্ষয় দেখা দিল, ধীরে ধীরে অবসন্নতা আসিয়া পড়িল, সমাজজীবন অপ্রীতিকর ও প্রস্তরীভূত একরূপ অসামঞ্জস্য ও অজ্ঞানের মধ্যে অবনত হইয়া পড়িল তখনও প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ঐতিহ্য ভারতবাসীর জীবনকে মধুর করিতে তাহার মানবতা বজায় রাখিতে এবং অতি দুর্দিনে রক্ষা করিতে বর্তমান ছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই সেই আদর্শই সঞ্জীবনী শক্তির নূতন তরঙ্গ ও প্রবল প্রবাহ রূপে আসিয়া, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বিভাবিত মন বা হৃদয়কে গভীর ভাবে সর্বদাই উদ্দীপিত করিয়াছে এবং বর্তমানে আবার তাহার অতি বিশাল এক জোয়ার তাহার সকল শক্তি লইয়া নবজাগরণের সমৃদ্ধ আবেগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

প্রথম অধ্যায়

আমি বিচারশীল সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভারতীয় ভাব ও ধারণার বিবরণ দিয়া আসিয়াছি, কারণ যে সমস্ত সমালোচক তাচ্ছিল্য সহকারে এই সভ্যতার মূল্য ও খ্যাতি নষ্ট করিতে চাহিয়াছেন ইহা তাঁহাদেরই দৃষ্টিভঙ্গী। দেখাইয়াছি যে এইরূপ প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে বিচার করিলেও ভারতীয় সংস্কৃতি এক উদার ও মহৎ ভাবধারা হইতে জাত হইয়াছে, বিচারের ফল ইহাই দাঁড়ায়। সুউচ্চ এক তত্ত্বদ্বারা ইহার হৃদয় উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে মনুষ্যত্বের, তাহার শক্তির এবং সম্ভবপর পূর্ণতার এক বিস্ময়কর ঊর্ধ্বমুখী ভাব ও ধারণার দ্বারা ইহা আলোকিত হইয়াছে, সুবিস্তৃতভাবে সমাজ সৌধ গঠনের পরিকল্পনা সুন্দর রেখাচিত্রে অংকিত হইয়াছে; এই সংস্কৃতি শুধু শক্তিশালী দর্শন মনন এবং কারুশিল্পের মহৎ সৃষ্টির দ্বারা নহে পরন্তু তৎসঙ্গে এক বৃহৎ কার্যকরী সঞ্জীবনী প্রাণশক্তিবলে সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুধু এই সকলই তাহার বৈশিষ্ট্য অথবা মহত্ত্বের যথোচিত পরিচয় প্রদান করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যদি কেহ গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার বিবরণ প্রদান করে তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে যাহার কিছু মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা আছে এমন সকল বিষয়ই তাহাতে আছে দেখিতে পাইবে; পরন্তু ভারতীয় সভ্যতা শুধু একটি মহান সংস্কৃতির ধারা মাত্র ছিল তাহা নহে, ইহাতে ধর্মের ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির একটা অতি প্রবল সাধনা দেখা দিয়াছিল।

ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সমগ্র মূল পার্থক্যের সাক্ষাৎ আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যে দেখিতে পাই। এই উদ্দেশ্য এ সংস্কৃতির বহু বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ রূপ ও ছন্দের গতির মুখ যেদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তাহার মধ্যে জাগাইয়াছে তাহাই তাহাকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক প্রকৃতি দিয়াছে। কেননা যে সমস্ত বিষয় অন্য সকল সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ ভাবে ইহাতে বর্তমান আছে তাহাতেও তাহার এই বিশেষ গতি ও প্রবণতা এক বিস্ময়কর মৌলিকতা এবং অনন্যসুলভ মহত্ত্বের ছাপ দিয়াছে। এক আধ্যাত্মিক আস্পৃহাই এ সভ্যতার নিয়ামক শক্তি,

চিন্তার সারাংশ, ইহার ভাবাবেগের পরিচালক ছিল। আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য মাত্র করিয়াই ইহা ক্ষান্ত হয় নাই, সেই অতীত যুগে মানব জাতির যে অবস্থা ছিল তাহার পক্ষে যতটা সম্ভব সেইভাবে সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাইতে চেষ্টাও করিয়াছিল। অপূর্ণ হইলেও মানব মনে ধর্ম আধ্যাত্মিক আবেগের প্রাথমিক প্রকৃতিগত রূপ বলিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপন এবং তদ্বারা জীবনকে অধিকার করিবার চেষ্টার প্রাবল্য উপস্থিত হইলে জীবনের প্রত্যেক ঘটনা ধর্মভাব দ্বারা পূর্ণ করিবার, ভাবনা ও কার্য ধর্মের ছাঁচে ঢালাই করিবার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা আসিয়া পড়ে; তখন ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপক মিলন জাত এক সংস্কৃতি স্থাপনের প্রয়োজন হয়। সাধনার নিম্নস্তরে ধর্মের যে বিশিষ্ট রূপ এবং মতবাদসমূহ থাকে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা তাহার অনেক উপরে স্বাধীন ও উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সহজে তাহাদের সীমার বন্ধন স্বীকার বা সহ্য করিতে পারে না। যখন তাহাদিগকে স্বীকার করে তখনও তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়, আধ্যাত্মিকতা এমন এক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির মধ্যে বাস করে যাহা বাহ্যাচারমূলক ধার্মিক মনের বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু মানুষ প্রথমেই অন্তরের সেই উচ্চতম স্তরে পেঁাছিতে পারে না, আদিতেই যদি তাহার নিকট সে দাবী করা হয় তবে কখনই সে-স্তরে সে পেঁাছিতে পারিবে না। মানুষের পক্ষে প্রথমে নিম্নতর আশ্রয়ের এবং আরোহণের জন্য সোপান বা স্তরের প্রয়োজন আছে; অট্টালিকা প্রস্তুতের জন্য যেমন ভারা বাঁধা প্রয়োজন হয় তেমনি মতবাদ পূজা মূর্তি চিহ্ন রূপ প্রতীক অর্ধ-স্বাভাবিক ভাবে মিশ্রিত উদ্দেশ্যের কিছুটা প্রশ্রয় ও প্রেরণা পোষণের অনুমতি মানুষকে প্রথমে দিতে হয়, এইসমস্তর উপর দাঁড়াইয়া সে তাহার অধ্যাত্ম-মন্দির গড়িয়া তুলিতে পারে। যখন গঠন সম্পূর্ণ হয় আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়, কেবল তখনই ভারাকে, এই সমস্ত অবলম্বনকে অপসারণ করা চলে। ধর্মভাব দ্বারা গঠিত যে সংস্কৃতি বর্তমানে হিন্দুত্ব নামে পরিচিত তাহা কেবল যে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়াছে তাহা নহে এসমস্তের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারিয়াছে, অচলপ্রতিষ্ঠ মতবাদনিষ্ঠ অনেক ধর্ম যাহা পারে নাই। ইহা নিজের কোন নামকরণ করে নাই কেননা সে নিজেকে কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহে নাই, যাহা সকলকেই মানিতে হইবে এমন কিছু দাবী তাহার নাই, কোন বিশেষ অভ্রান্ত একমাত্র গ্রহণীয় মত খাড়া করে নাই, কোন এক বিশেষ সংকীর্ণ পথ বা দ্বারের মধ্য দিয়া না গেলে মুক্তি অসম্ভব এ কথা বলে নাই; ইহাকে বিশেষ কোন এক মত বা ধর্মপ্রাণালী না বলিয়া বরং বলা চলে যে ইহা মানবাত্মার ভগবদ্-অভিমুখী গতি ও প্রচেষ্টার অবিচ্ছিন্ন এক ক্রমবর্ধমান ঐতিহ্য। যাহা নিজের মধ্যে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আত্মগঠন ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বহুমুখী নানা সাধনার স্থান রাখিয়াছে, বিভিন্ন অধিকারীর জন্য

নানা সোপান ও স্তরের ব্যবস্থা করিয়াছে ইহা তেমন এক বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে শাশ্বত ও 'সনাতন ধর্ম' বলিয়া ধর্মের যে একটিমাত্র নাম তাহার জানা ছিল সেই নামে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই অভিহিত করিয়াছে। ভারতীয় ধর্মের তাৎপর্য এবং প্রকৃতি যদি আমরা যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্যক রূপে অবধারণ করিতে পারি কেবল তাহা হইলেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ হইব।

ঠিক এইখানেই প্রতিহতকারী প্রথম ও প্রধান বাধা রহিয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য মনকে ভ্রমে ফেলিয়াছে, কেননা হিন্দু ধর্ম যে কি তাহা সে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। সে জিজ্ঞাসা করে এ ধর্মের আত্মা, স্বরূপ ও সারমর্ম কি? ধর্মের সম্বন্ধে ইহার মন ও চিন্তার নির্দিষ্ট ধারা কি? ইহার রূপের আকার কি? অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া যাহাতে বিশ্বাস দাবী করিতে হয় এমন কোন নির্দিষ্ট মতবাদ যাহার নাই, ধর্মশাস্ত্রসম্মত কোন মূল স্বীকার্য নাই, এমন কি কোন বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্র মানিতে হইবে এমন বিধান নাই, যাহার এমন কোন বিশেষ ধর্মসূত্র নাই যদ্দ্বারা বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ধর্ম হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া দেখান যাইবে, তেমন ধর্ম কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এমন ধর্ম কি রূপে থাকিতে পারে পোপের মত যাহার একনায়ক গুরু নাই, শাসন ও পরিচালনার জন্য কোন ধর্মযাজক সমাজ বা সমিতি নাই, কোন নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ভজনালয় অথবা সকলে মিলিত ভাবে উপাসনার কোন বিশেষ পদ্ধতি নাই, ধর্মের মধ্যস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা মানিতে বাধ্য তেমন বাধ্যতামূলক কোন রূপ বা আচরণ নাই, ধর্মের বিশিষ্ট ভাবে কোন পরিচালনা অথবা বিশেষ নির্দিষ্ট সাধনপন্থা নাই? কেননা হিন্দু পুরোহিতগণ কেবল বাহ্য ক্রিয়া পূজার্চনার জন্যই আহূত হ'ন; প্রকৃত ধর্ম-সাধন বিষয়ে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব অথবা শিক্ষা ও শাসন বিষয়ক কোন শক্তি নাই, আর পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, ধর্মের বিধিবিধানের প্রবর্তক বা শাসক নহেন। আবার যখন সে সকল প্রকার বিশ্বাসকে স্বীকার করে, এমন কি বহু উচ্চে পৌঁছে এমন একপ্রকার নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়বাদকে স্থান দেয়, সকল প্রকার সম্ভাবনার আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে, ধর্ম সম্বন্ধে সকল প্রকার সাহস-সঙ্কুল কার্যে অনুমতি দেয় বা অনুমোদন করে তখন হিন্দুত্বকে কি করিয়া ধর্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? তাহার মধ্যে কেবল সামাজিক বিধানই একমাত্র বস্তু যাহা দৃঢ় নিশ্চিত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং স্পষ্ট কিন্তু তাহাতেও জাতি প্রদেশ এবং সম্প্রদায় অনুসারে পার্থক্য দেখা যায়। জাতি বা শ্রেণী (caste) এখানে শাসন করে, কোন যাজক সম্প্রদায় নহে, কিন্তু এরূপ শ্রেণীও কোন বিশ্বাসের জন্য কাহাকেও সাজা অথবা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মত পোষণ করিলে তাহাকে অভিশাপ দিতে অথবা বিপ্লবাত্মক অথবা কোন নূতন মত বা

নূতন আধ্যাত্মিক নেতার অনুসরণ করিতে বাধা দিতে পারে না। খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণকে যদি ইহারা সমাজে গ্রহণ না করিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ তাহাদের ধর্মবিশ্বাস বা আচরণ নহে, তাহার হেতু তাহাতে তাহার সামাজিক বিধান ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। এই সমস্তের ফলে ইহা বলা হইয়াছে যে হিন্দু-ধর্ম বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল এক হিন্দু সমাজব্যবস্থা আর তাহার সহিত আছে কতকগুলি অতি বিসদৃশ ধর্মবিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানের এক সমষ্টি। এ বিষয়ে বহিস্তরে অবস্থিত পাশ্চাত্য মনের চরম মূল্যবান রায় এই যে হিন্দুত্ব কতকগুলি প্রাচীন জনশ্রুতির একটা স্তূপমাত্র, তাহার উপর আনাড়ীর মত অধ্যাত্ম দর্শনের এক নিরর্থক ও শ্রীহীন প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ধর্ম সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর যে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা ভারতীয় মন এবং সাধারণ ইয়োরোপীয় বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতেই এ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। এই বিভিন্নতা এত অধিক যে উদার ভাবে অধ্যাত্ম বিষয়ের অনুশীলন এবং নমনীয় ভাবে দার্শনিক ভাব শিক্ষা ভিন্ন এই দুই জাতীয় মনোভাবের উপর সংযোগ সেতু স্থাপিত হইতে পারে না; কিন্তু পাশ্চাত্যে প্রচলিত ধর্মে এবং দার্শনিক চিন্তার কঠোর পদ্ধতিতে এরূপ অনুশীলন বা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি তাহার কোন সুযোগও দেওয়া হয় না। ভারতীয় মনের পক্ষে মতবাদ ধর্মের সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে অবশ্য পালনীয় অংশ, ধর্মভাব বা ধর্মানুগত প্রকৃতি ধর্মের প্রধান বস্তু, ধর্ম-বিজ্ঞানসম্মত কোন মতবাদ নহে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মনের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট মানসিক বিশ্বাস ধর্ম-প্রণালীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ, ইহার অর্থের মর্মস্থল, এই মানসিক বিশ্বাস ইহাদের ধর্মকে অপর ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে। পাশ্চাত্যে সূত্রাকারে নিবদ্ধ ধর্মবিশ্বাস বা মতামত দ্বারাই ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণীত হয়, ধর্মের সমালোচক তাহার নিজ ধর্মমতের সহিত যাহা মিলে তাহা সত্য, যাহা মিলে না তাহা অসত্য বলেন। এই ধারণা যতই মূর্খতাপূর্ণ এবং অগভীর হউক না কেন ইহা পাশ্চাত্য মনের সেই প্রতীতির অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা মানসিক সত্যকেই উচ্চতম সত্য বস্তু, এমন কি মানসিক সত্য ছাড়া সত্যের অন্য কোন রূপ নাই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। ভারতের চিন্তাশীল ধর্মবেত্তাগণ জানেন সকল সর্বোচ্চ শাশ্বত সত্য আত্মারই সত্য। চরম সত্য-রাজি যুক্তিবিচারজাত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নহে অথবা ধর্মবিশ্বাস বা মতামতের বিবৃতি নহে, তাহা আত্মার আন্তর অনুভূতির ফল। মনোময় সত্য মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশের বহু দ্বারের মধ্যস্থিত একটি দ্বার মাত্র। আর মানস সত্য অনন্তের অভিমুখী হইলে এক নির্দিষ্ট ভাবে নয় পরন্তু স্বভাবতই বহু রূপে বা বহু ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন মানসিক বিশ্বাসসমূহও সমান ভাবে সত্য হইতে পারে, কারণ তাহারা প্রত্যেকে অনন্ত সত্যের এক

একটি পৃথক দিক হইতে প্রতিফলিত রশ্মিমালা হইতে পারে। মানসিক ক্ষেত্রে পরস্পরের পার্থক্যের দূরত্ব যতই হউক না কেন প্রত্যেক বিশ্বাসই পার্শ্ববর্তী দ্বারের কার্য করিতে পারে, যাহার মধ্য দিয়া পরম আলোকের কোন অস্পষ্ট রশ্মি মানব মনের কাছে পেঁৗছিতে পারে। এ ধর্ম সত্য ও ধর্ম মিথ্যা ইহা ঠিক নহে বরং বলা উচিত প্রত্যেক ধর্ম নিজের ভাব ও পরিমাণে সত্য। একই শাশ্বত সত্যে পেঁৗছিবার সহস্র পথের মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম একটি পথ।

ভারতীয় ধর্ম মানবজীবনের সম্মুখে চারিটি প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছিল। প্রথমত ইহা মনের উপর এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল যে উচ্চতম এক চেতনা বা সত্তার এক সার্বভৌম জগদতীত অবস্থা আছে, যাহা হইতে সব কিছু জাত হইয়াছে, না জানিয়াও যাহার মধ্যে সকলে বাস ও বিচরণ করিতেছে, আর সকলেই একদিন সেই পরিপূর্ণ শাশ্বত অনন্তের দিকে ফিরিবে এবং তাহাকে জানিবে। দ্বিতীয়ত যতদিন ব্যষ্টিমানব এই বৃহত্তর সত্তার সত্যে সচেতন ভাবে গড়িয়া উঠিবার জন্য সাধনার পক্ষে উপযুক্ত হইতে না পারিবে ততদিন ভারতীয় ধর্ম প্রগতির পথে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহার যে আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে এই বোধ তাহার জীবনের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়াছিল। তৃতীয়ত এই জন্য ইহা সুগঠিত পরীক্ষা দ্বারা সুনিশ্চিত নানা শাখায় বিভক্ত চিরবর্ধমান জ্ঞানের পন্থার এবং আধ্যাত্মিকতার বা ধর্মসাধনার নানা ধারার সন্ধান দিয়াছিল। অবশেষে যাহারা এই সকল উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে তখনও সক্ষম বা প্রস্তুত হয় নাই তাহাদের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে ব্যক্তিগত ও সংঘগত সাধনা ও আচরণের এবং মানসিক নৈতিক ও প্রাণিক পরিপুষ্টির জন্য একটা কাঠামো একটা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে তাহার সীমার মধ্যে তাহার প্রকৃতি অনুসারে এমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারিত যাহাতে অবশেষে বৃহত্তর জীবনের জন্য সে প্রস্তুত হইয়া উঠিত। এই চারিটির প্রথম তিনটি প্রত্যেক ধর্মের প্রধান মূল, কিন্তু হিন্দুধর্ম শেষোক্ত বিষয়টিও সর্বদাই অতি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছে; ইহা জীবনের কোন অংশকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নিকটে অপরিচিত বা সম্বন্ধশূন্য রাখে নাই। তথাপি ঐতিহ্য অনুসারে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের এক মিলিত রূপ মাত্র নহে, যদিও অজ্ঞ সমালোচক ভুল করিয়া সেরূপ মনে করিয়াছেন। কোন সামাজিক পরিবর্তনের সময় যতই বৃহৎ রূপে মনে হউক না কেন, রক্ষণশীল ধার্মিক মন প্রবলভাবে পরিবর্তনের যতই বিরোধিতা করুক না কেন, তথাপি হিন্দুত্ব অর্থে এক আধ্যাত্মিক সাধনা বুঝিতে হইবে কোন সামাজিক ব্যবস্থা নহে। বস্তুত আমরা দেখিতে পাই শিখ ধর্ম প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া এক নূতন রূপে সমাজ গঠন করিলেও বৈদিক ধর্মের শাখা বলিয়া তাহাকে গণনা করা হইয়াছে:

পক্ষান্তরে হিন্দুর আচার ও ব্যবহার মানিয়া চলিলেও এমন কি হিন্দুর সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান থাকিলেও ইহার ঐতিহ্যে দেখা যায় যে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মকে হিন্দুত্বের বহির্ভূত মনে করা হইয়াছে, কেননা এই ধর্মের পদ্ধতি ও শিক্ষা তাহাদের প্রারম্ভে বেদের সত্য অস্বীকার করিয়াছে এবং বৈদিক ধর্ম-মার্গের নিরবচ্ছিন্ন ধারা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুত্বের এই চারিটি উপাদানে নানা পন্থা মত সম্প্রদায় এবং জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে ছোট বড় অনেক ভেদ আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা সাধারণ ঐক্য, এমন সকল মৌলিক রূপ ও ধরন, এমন আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বা মেজাজ আছে যাহা এই বৃহৎ বৈচিত্র্যের নানা পরিবর্তনশীল ভাবের মধ্যেও একটা দৃঢ় সংসক্তি এবং ঐক্যের শক্তি দান করিয়াছে।

ভারতীয় সকল ধর্মের মৌলিক ধারণা সর্বস্থানের মানুষের উচ্চতম চিন্তার সহিত সাধারণত এক। যাহা কিছু আছে তাহার পরম সত্য এই যে এখানে যে সমস্ত মনোময় এবং জড়ময় পরিদৃশ্যমান রূপরাজির সংস্পর্শে আমরা আসি তাহার অতীত এক সৎ বা সত্তা আছে। মন প্রাণ ও দেহের ঊর্ধ্বে এক চিৎসত্তা ও আত্মা আছে যাহার মধ্যে যাহা কিছু সান্ত এবং যাহা কিছু অনন্ত তাহাদের সর্বকিছুই রহিয়াছে, সে বস্তু সকল আপেক্ষিকতাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান, তাহা এক পরম নির্বিশেষ বা এক অদ্বয়-শাশ্বত বস্তু, যাহা কিছু অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহার সকলই তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহাই সব কিছুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এক অদ্বয় বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত অনাদি শাশ্বত দিব্যসত্তা অথবা দিব্য এক সৎ, চিৎ, শক্তি ও আনন্দ সর্বভূতের উৎস ও তাহাদের আধার ও অন্তরবাসী সত্তা। মানুষের অন্তরাত্মা, প্রকৃতি ও জীবন এই আত্ম-সচেতন মহাকালের, এই চিৎস্বরূপ শাশ্বত বস্তুর শুধু এক প্রকাশ বা এক আংশিক প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু সত্তার এই সত্য শুধু দার্শনিক এক ধারণা, ধর্মতত্ত্বের একটা মতবাদ, বুদ্ধিপরিকল্পিত বস্তুনিরপেক্ষ এক ভাবনামাত্র রূপে ভারতীয় মনকে অধিকার করে নাই। তাহার কাছে ইহা এমন বস্তু ছিল না যাহা লইয়া মনীষী ভাবুক তাঁহার অধ্যয়নশালায় বসিয়া বাস্তব জীবনের সহিত সম্বন্ধশূন্য এক ধারণারূপে আলোচনার মধ্যে শুধু ব্যাপৃত থাকিতে পারে। ইহা রহস্যসমাচ্ছন্ন ঊর্ধ্বস্থিত এমন এক বস্তু ছিল না জগৎ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে যাহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। ইহা ছিল এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্য এক সত্তা এক শক্তি এক সান্নিধ্য যাহাকে সকলেই তাহাদের সামর্থ্যের পরিমাণ অনুসারে অন্বেষণ করিতে এবং জীবনের ও জীবনের পরপারে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া মানুষ সহস্র পন্থায় তাহাকে ধরিতে পারিত। এই সত্যে বাস করিতে হইত, এমন কি ইহাকেই ভাবনা প্রাণ ও ক্রিয়ার পরিচালক ধারণা করিয়া তোলা হইয়াছিল। যে পরম বস্তু বা সত্তা সকল রূপের পশ্চাতে

সদা বর্তমান তাহাকে এইভাবে স্বীকার করা এবং তাহারই অনুসরণ করা ভারতীয় ধর্মের একমাত্র সর্বজনীন সূত্র ও মতবাদ; এবং যদি তাহা শত রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে তবে তাহার যথার্থ কারণ এই যে এ ধর্ম এত প্রভূত পরিমাণে জীবন্ত ছিল। একমাত্র অনন্তই সান্তের অস্তিত্বের সমর্থন করে, সান্তের নিজস্ব সম্পূর্ণ পৃথক কোন মূল্য বা স্বাধীন কোন সত্তা নাই। প্রাণ যদি এক ভ্রান্তি না হয় তবে তাহা এক দিব্যলীলা, অনন্তের মহিমারই এক অভিব্যক্তি। অথবা প্রাণই হইল এক উপায় যাহা দ্বারা যে অন্তরাত্মা অগণিত রূপ ও বহু জন্ম ও জীবনের ভিতর দিয়া বর্ধিত ও পরিণত হইয়া আসিতেছে, সে প্রেম ও জ্ঞান বিশ্বাস ও ভক্তি এবং কর্মের মধ্যস্থ ভগবদভিমুখী সংকল্পের মধ্য দিয়া এই বিশ্বাতীত পুরুষ এবং অনন্ত সত্তার নিকটে পৌঁছিতে তাহাকে স্পর্শ ও অনুভব করিতে এবং নিজে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে। এই পরমাত্মা বা এই স্বয়ম্ভূ সত্তা একমাত্র পরম সত্য বস্তু এবং অপর সর্ববস্তু হয় শুধু পরিদৃশ্যমান রূপ মাত্র অথবা ইহাকেই অবলম্বন করিয়া শুধু সত্য। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে জীবন্ত ও ভাবনাশীল মানবসত্তার পক্ষে একমাত্র মহৎ ও বৃহৎ কার্য হইল সেই আত্মাকে, সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও পাওয়া। অবশেষে সকল জীবন সকল ভাবনা আত্মা ও ভগবানের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইবারই এক উপায়।

ভারতীয় ধর্ম পরম সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধি বা ধর্মবিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলিকে একমাত্র কেন্দ্রস্থানীয় প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া কখনও মনে করে নাই। তৎসম্বন্ধে যে কোন ধারণা লইয়া অথবা যে কোন রূপে হউক সেই সত্যকে অনুসরণ করা অন্তরের অনুভূতিতে তাহাতে পৌঁছানো, চেতনায় তাহাতে বাস করা—ইহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ইহা হইতে পারে যে, কোন ধর্মমত বা কোন সম্প্রদায় মনে করিয়াছে যে মানুষের প্রকৃত আত্মা বিশ্বাত্মা বা পরমপুরুষের সহিত অবিভাজ্য ভাবে এক; আর এক মতে পাওয়া যাইতে পারে যে মানুষ ভগবানের সহিত স্বরূপত এক কিন্তু প্রকৃতিতে তাঁহা হইতে পৃথক; আবার তৃতীয় মত বলিতে পারে যে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের ব্যষ্টি অন্তরাত্মা—ইহারা নিত্যকাল ব্যাপিয়া সত্তার তিন বিভিন্ন শক্তি। কিন্তু ইহাদের সকলেই আত্মার সত্য সমান ভাবেই স্বীকার করিয়াছে; কেননা ভারতীয় দ্বৈতবাদীর নিকটও ঈশ্বরই পরমাত্মা ও পরম সত্য যাহার দ্বারা এবং যাহার মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষ এই উভয়েই বাস ও বিচরণ করে এবং তাঁহারই মধ্যে এ উভয়েরই সত্তা রহিয়াছে আর তাহাদের সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে যদি ভগবানকে বাদ দিয়া ফেলা যায় তবে প্রকৃতি ও মানুষ এ উভয়ই তাঁহার নিকট সকল প্রকার অর্থশূন্য ও নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়া পড়ে। ভারতের মধ্যে যত বহু ধর্ম সম্প্রদায় এবং পরস্পরবিরোধী যত ধর্মানুগত দর্শন

আছে তাহারা সকলে চিৎপুরুষ, বিশ্বপ্রকৃতি—তাহাকে মায়া, প্রকৃতি বা শক্তি যাহাই বলুক না কেন—এবং জীবন্ত সত্তাসকলের মধ্যস্থিত অন্তরাত্মা বা জীব এই তিন সত্যকে সর্বজনীন ভাবে স্বীকার করে। আবার ইহাও সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বাস যে মানুষের অন্তরস্থ আধ্যাত্মিক সত্তা বা তন্মধ্যস্থ দিব্য আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং ভগবান বা পরমাত্মা বা শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে মানবাত্মার কোন প্রকার জীবন্ত ও মিলনাত্মক সংস্পর্শ অথবা পরম একত্ব লাভ করা-ই হইল আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সর্ত বা নিমিত্ত। আমরা ভগবানকে অদ্বয় নৈর্ব্যক্তিক অনন্ত ও নির্বিশেষ রূপে ধারণা বা অনুভব করিতে, অথবা তাঁহাকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত শাশ্বত পরমপুরুষ রূপে জানিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি: এই দুই রূপের যে কোন রূপের নিকট যে কোন উপায়েই আমরা পেঁাছি না কেন, আধ্যাত্মিক অনুভূতির একমাত্র প্রয়োজনীয় সত্য এই যে তিনিই সর্বসত্তার হৃদয়ে ও কেন্দ্রে রহিয়াছেন, সর্বসত্তা তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছে এবং তাঁহাকে পাওয়াই মহান আত্ম-আবিষ্কার। ভারতীয় মনের কাছে মতগত পার্থক্যগুলি, সকলের মধ্যস্থিত একই আত্মা ও ঈশ্বরকে দেখিবার বিভিন্ন উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মোপলব্ধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু; অন্তরস্থ চিৎপুরুষের দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরা, অনন্তের মধ্যে বাস করা, শাশ্বত বস্তুকে খোঁজা ও আবিষ্কার করা, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া—ইহাই হইল ধর্মের সাধারণ ধারণা ও লক্ষ্য, ইহাই আধ্যাত্মিক মুক্তির অর্থ, ইহাই সেই জীবন্ত সত্য যাহা জীবকে মুক্ত ও সার্থক করিয়া তোলে। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সক্রিয়ভাবে এই রূপে অনুসরণ করিবার মধ্যেই রহিয়াছে ভারতীয় ধর্মমতসমূহের মিলনের সূত্র এবং তাহার সহস্র রূপের পশ্চাৎস্থিত একমাত্র সাধারণ স্বরূপ তত্ত্ব।

ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও প্রতিভার পক্ষে অথবা ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দাবি করিবার অন্য কিছু যদি নাও থাকিত, তথাপি শুধু এই একমাত্র তথ্য দ্বারা সে দাবি যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইত যে, ভারত যে নির্ভীক ও বৃহৎ ভাবে বৃহত্তম ও উদারতম আধ্যাত্মিক সত্য দেখিতে পাইয়াছিল, অসাধারণ গভীরতার সহিত তাহা যে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছিল এবং সম্ভবপর সকল দিক ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সেদিকে যে অগ্রসর হইয়াছিল শুধু তাহা নহে, কিন্তু তাহাকেই সে সচেতন ভাবে প্রাণের বিশাল উন্নয়নকারী ধারণাতে সকল ভাবনার অন্তরতম সার অংশে, সকল ধর্মের ভিত্তিতে এবং মানবজীবনের গোপন অর্থ এবং বিঘোষিত চরম লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই যে সত্য বিঘোষিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় ভাবনার নিজস্ব বস্তু নহে; জগতের সর্বত্রই উচ্চতম মন ও আত্মা এ সত্যকে দেখিতে পাইয়াছে ও অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু অন্য

সর্বস্থানে এ সত্য কয়েকজন মনীষীর অথবা বিরল কোন রহস্যাবিদের অথবা অসাধারণ প্রতিভাবান, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন সাধকের নিকট শুধু জীবন্ত পরিচালক হইয়া উঠিয়াছিল। তথাকার জনসাধারণের এ বিষয়ে কোন বোধ, কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, এমন কি সর্বাতিক্রমী এই কিছুর কোন প্রতিফলিত আভাসও তাহারা পায় নাই; তাহারা শুধু ধর্মের অধস্তন সাম্প্রদায়িক দিক্‌বর্তী ভাবের, দেবতার নিম্নতর ধারণার অথবা প্রাণের বাহ্য মর্ত্য-বিভাবের মধ্যেই বাস করিয়াছে। যাহা সাধন করিতে অন্য কোন সংস্কৃতি সমর্থ হয় নাই, ভারত তাহার উদ্যমশীল দৃষ্টি, চেষ্টা ও অনুসন্ধানের গভীরতা লইয়া সার্বভৌম ভাবে অগ্রসর হইবার ফলে কিন্তু তাহাতে সফল হইয়াছিল। এ কৃষ্টি খাঁটি আধ্যাত্মিকতার স্বরূপগত আদর্শের ছাপ ধর্মের অঙ্গে মুদ্রিত করিয়া দিতে, এবং ধর্মের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঙ্গে উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের কিছু জীবন্ত প্রতিফলন আনিতে, তাহার প্রভাবের প্রাণশক্তি কিছুটা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের সাধারণ ধর্মগত মন ভারতীয় ধর্মের উচ্চতর আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক সত্য যে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, এরূপ অভিযোগ করা অপেক্ষা অধিকতর অসত্য কিছু হইতে পারে না। ভারতবাসীগণ সর্বদাই শুধু বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক মত ও বুলির মধ্যে বাস করিয়াছে ইহা বলিলে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলা অথবা ইচ্ছাপূর্বক তাহাদের কার্যের কদর্থ করা হইবে। পক্ষান্তরে ইহাই সত্য কথা যে ভারতের ধর্মগত দর্শনের প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক সত্যগুলির প্রশস্ত ধারণা, অথবা তাহাদের গভীরভাবে কবিত্বপূর্ণ ও সক্রিয় বর্ণনা, এ জাতির সাধারণ মনের উপরও বেশ ছাপ ফেলিয়াছে। মায়া, লীলা ও ভগবানের সর্বব্যাপীত্বের কথা যেমন সাংসারিক সাধারণ লোক ও মন্দিরের পূজক, তেমনি নির্জনতাপ্রিয় দার্শনিক, মঠের সন্ন্যাসী অথবা আশ্রমবাসী সাধুসন্তের নিকট সমানভাবে পরিচিত ছিল। যে আধ্যাত্মিক সত্যকে তাহারা প্রতিফলিত এবং যে গভীর অনুভূতির দিকে তাহারা নির্দেশ করে তাহা একটা সমগ্র জাতির ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলার এমন কি জনসাধারণে প্রচলিত ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

ইহা অবশ্য সত্য যে জনসাধারণ উদ্যমশীল ভাবনার প্রচেষ্টা অপেক্ষা ভক্তির আবেগের মধ্য দিয়া এই সমস্ত বিষয় অধিকতর সহজে উপলব্ধি করে; কিন্তু তাহাই তো হইবে, হওয়াও উচিত, কেননা বুদ্ধি অপেক্ষা মানুষের হৃদয়ই সত্যের নিকটতর বস্তু। ইহাও সত্য যে বাহ্যবিষয়ের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া ভারতেও রহিয়াছে এবং গভীরতর আধ্যাত্মিক প্রবর্তনা-শক্তিকে আচ্ছন্ন রাখিবার কার্য করিয়াছে; কিন্তু ইহা শুধু ভারতের বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা মানব-প্রকৃতির এক সাধারণ দুর্বলতা; এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপে এ দুর্বলতা স্বল্প নহে বরং অধিক পরিমাণেই লক্ষিত হয়। রূপ, আচরণ ও অনুষ্ঠানের

নির্জীবকর গুরুভার অপসারণ করিয়া সত্যকে সুস্পষ্ট রাখিবার জন্য সাধুসন্ত, ধার্মিক মনীষী ও জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীগণের প্রদত্ত উপদেশের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ইহাই আসল কথা যে ভারতে চিৎস্বরূপের এই সমস্ত বাণীবহের কখনও অভাব হয় নাই। আর তদপেক্ষাও অর্থপূর্ণ তথ্য এই যে সাধারণ মনের পক্ষে সে বাণী শুনিবার সাগ্রহ প্রবৃত্তির অভাব কখনও দেখা যায় নাই। অন্য দেশের মত ভারতেও জড়ভাবে বিভাবিত সাধারণ আত্মা ও বহির্মুখী মনের সংখ্যাই বেশী। উচ্চশ্রেণীর এই ইউরোপীয় সমালোচকের পক্ষে আমাদের মানবজাতির এই সাধারণ তথ্যকে বিস্মৃত হওয়া এবং ইহা ভারতীয় মননধারার এক বিশেষ চিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করা কতই না সহজ! কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ভারতবাসীগণের এমন কি তথাকার 'অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণের' মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, তাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষার ফলে অন্তরতর সত্যসকলের অধিকতর নিকটে পৌঁছিয়াছে, সর্বদেশব্যাপী অজ্ঞানের অন্ধকার তাহাদের পক্ষে তত নিবিড় নহে, এবং তাহারা ঈশ্বর ও চিৎপুরুষ, আত্মা ও শাশ্বত বস্তুর সজীব আভাস অন্য দেশের সাধারণ লোক এমন কি শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর সহজে পাইতে পারে। আর কোন্ দেশে বুদ্ধের মত উচ্চ কঠোর ও দুরূহ শিক্ষা এত দ্রুত জনগণমন অধিকার করিতে পারিত? আর কোন্ দেশ তুকারাম, রামপ্রসাদ ও কবিরের, শিখগুরু ও তামিল সাধুগণের মত সাগ্রহ ভক্তিপরিপ্লুত ভজন সঙ্গীত ও কীর্তনের এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রতিধ্বনি, সাধারণ লোকের মনে এত দ্রুত জাগাইয়া তুলিতে অথবা এরূপ জনসাধারণের উপযোগী ধর্মসাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিত? এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবধারার অতি নিকটে আসা এবং তাহা দ্বারা প্রবলভাবে অনুসিক্ত হওয়া, উচ্চতম সত্যসকলের প্রতি সমগ্র জাতীয় মনের এরূপ উন্মুখ হওয়া একটা বহুযুগব্যাপী, খাঁটি ও আজিও জীবন্ত, শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার চিহ্ন ও ফল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের অনন্ত বৈচিত্র্য ইউরোপীয় মনের নিকট অফুরন্ত, হতবুদ্ধিকর, বিরক্তিজনক ও নিরর্থক মনে হয়; সে মন উদ্ভিদ জীবনের অতি-প্রাচুর্য ও অতিবর্ধনশীলতার জন্য অরণ্যটাকেই দেখিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার অগণিত রূপের মধ্যে যে সাধারণ আধ্যাত্মিক জীবন রহিয়াছে তাহা সে ধরিতে পারে নাই। কিন্তু বিবেকানন্দ যুক্তিযুক্তভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন যে এই অনন্ত বৈচিত্র্যই এক মহত্তর ধর্মসংস্কৃতির চিহ্ন। ভারতীয় মন সর্বদা উপলব্ধি করিয়াছে যে পরম বস্তুই অনন্ত; বৈদিক যুগের আদি হইতেই ইহা অনুভব করিয়াছে যে প্রকৃতির মধ্যস্থিত অন্তরাত্মার নিকট অনন্তকে নানা বিভাবের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া নিজেকে উপস্থাপিত করিতে হয়। পাশ্চাত্য মন

সর্বদাই সংগ্রামশীল ও সম্পূর্ণ-যুক্তিবিরুদ্ধ এই ধারণা পোষণ করিয়াছে যে সকল মানবজাতির ধর্ম একই হইবে; একপ্রস্থ মতবাদ, একই পূজা প্রণালী, একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, একই প্রকার বিধি-নিষেধের সমাহার এবং পৌরোহিত্যের একই নিয়ম ও বিধানের সংকীর্ণ শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এক সর্বজনীন ধর্মই শুধু থাকিবে। একমাত্র সত্য ধর্ম আছে যাহা সকলকেই মানিতে হইবে, নহিলে ইহজগতে মানুষের নির্যাতন সহিতে এবং পরজগতে ঈশ্বর দ্বারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত অথবা তাঁহার দেওয়া ভীষণ শাস্তি চিরতরে ভোগ করিতে হইবে—এই সংকীর্ণ মূঢ় যুক্তিহীনতাই তথায় উদ্ধতভাবে সোল্লাসে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। এত প্রভূত পরিমাণে অসহিষ্ণুতা, নিষ্ঠুরতা, আলোকলাভের বিরোধিতা এবং আক্রমণশীল ধর্মোন্মত্ততার জনক মানুষের যুক্তিহীনতার বা কুযুক্তির হাস্যোদ্দীপক এই বিচিত্র সৃষ্টি, ভারতের মুক্ত ও নমনীয় মনের উপর দৃঢ় আধিপত্য কখনই স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। মানুষের প্রকৃতিতে সর্বত্রই সাধারণ ভাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে; অসহিষ্ণুতা এবং বিশেষভাবে আচরণের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ভারতেও ছিল এবং আছে। ভারতে অনেক সময় ধর্মতত্ত্ব লইয়া তীব্র বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে, যাঁহারা দাবী করে যে তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে রহিয়াছে এবং বৃহত্তর জ্ঞানসম্পদে বিভূষিত হইয়াছে এরূপ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ক্রোধের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি উপস্থিত হইয়াছে, আবার কখনও কখনও বিশেষতঃ এক সময় দক্ষিণ ভারতে ধর্মবিষয়ে তীব্র মতভেদের যুগে সাময়িকভাবে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ইউরোপে যে পরিমাণে ঘটিয়াছে ভারতে কখনও সেরূপ হয় নাই। অসহিষ্ণুতা ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্কযুদ্ধে আহ্বান বা সামাজিক বাধা সৃষ্টি অথবা সমাজচ্যুতি প্রভৃতি গৌণ রূপের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; তাহা কখনও সীমালঙ্ঘন করিয়া সেরূপ বর্বরোচিত নির্যাতনের ভীষণ রূপ ধারণ করে নাই, যেরূপ নির্যাতন দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ধর্মের ইতিহাসে রক্তরঞ্জিত জঘন্য কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে। ভারতে চিরকালই উচ্চতর ও পবিত্রতর এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞতার মুক্তিদায়ক অনুভূতির খেলা চলিয়াছে যাহা গণচেতনার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম সর্বদাই বোধ করিয়াছে যে মানুষের মন, স্বভাব ও মানসিক আকর্ষণের বস্তুর মধ্যে অসীম বৈচিত্র্য রহিয়াছে বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনন্তের দিকে যাত্রাপথে ভাবনা ও পূজা-অর্চনার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

ভারত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে

স্বীকার করিয়াছে। এমন কি তাহার অধঃপতনের দিনে যখন প্রামাণিকতার দাবি বহুক্ষেত্রে কঠোর ও অপরিমিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখনও নিস্তারকারী এই ধারণা সে রক্ষা করিয়াছে যে, এক মতই যে শুধু প্রামাণিক হইবে তাহা নহে বহু মতেরও প্রামাণিকতা থাকা অনিবার্য। ভারতীয় ধর্মগত মনের এই বৈশিষ্ট্য সর্বদা দেখা গিয়াছে যে পুরাতন ঐতিহ্যকে বর্ধিত করিতে সমর্থ নূতন আলোককে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য সে সতর্ক ভাবেই প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা তাহার আগেকার যুগে রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক স্বাধীনতাকে ন্যায়বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দেয় নাই—স্বাধীনতার সেই মহত্ত্ব বা পরীক্ষার সে-সাহস পাশ্চাত্য দেশই দেখাইয়াছে; কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের মত ধর্মসাধনার স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মভাবনার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহার ঐতিহ্যে সর্বদা বিদ্যমান আছে ইহা সত্য। ভারতে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়-বাদীকে অত্যাচার-প্রপীড়িত হইতে হয় নাই। প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী বলিয়া বৌদ্ধ ও জৈনকে তাচ্ছিল্য করা হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন পন্থাবলম্বীদের মতবাদ ও দর্শনের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে তাহাদের পাশাপাশি বাস করিতে কখনও কোন বাধা দেওয়া হয় নাই; সত্যের জন্য তাহার প্রবল পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য ভারত তাহাদিগকেও পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এবং তাহার ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সদাবর্ধমান সাধারণ ভাণ্ডারে তাহাদের সত্য হইতে যতটা পরিপাক করিয়া নেওয়া সম্ভব ততটা গ্রহণ করিয়াছে। সেই চিরতরুণ ধারাবাহিকতা যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু সর্বদিক হইতে আলোক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত সাধুসন্তের জীবনে হিন্দু ও ইসলামিক শিক্ষাধারা অনেকটা মিশ্রিত হইয়াছিল তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ও অবিলম্বে হিন্দুধর্মের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন—এমন কি এই সমস্ত সাধুদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানের ঘরে জন্ম এবং মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে যোগী যোগের কোন নূতন পথ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে ধর্মগুরু কোন নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যে মনীষী আধ্যাত্মিক সত্তার বহুমুখী সত্যের এক নূতন দিকের বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাঁহাদের সকলেই তাঁহাদের সাধনার বা তাহার প্রচারকার্যে কোন গুরুতর বাধার সম্মুখীন হন নাই। বড়জোর তাহাদিগকে পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছে যাঁহারা সহজাত সংস্কারবশে কোন পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু নূতন উপাদানকে জাতীয় ধর্ম ও তাহার সর্বদা সুনম্য ধর্ম-মণ্ডলীর স্বাধীন ও নমনীয় দেহের মধ্যে গৃহীত হইবার জন্য শুধু অপেক্ষা করিয়া নিজের আচরণ দ্বারা তাহাদের নিন্দা বা অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইত।

একটা দৃঢ় আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এবং তৎসঙ্গে তাহার অবারিত স্বাধীনতার প্রয়োজন সর্বদা অনুভূত হইয়াছিল, এবং নানাভাবে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু নিয়মনিষ্ঠ বাহ্য বা কৃত্রিম কোন এক ভাবে তাহা করা হয় নাই। প্রথমতঃ ইহা কতকগুলি প্রামাণিক ধর্মশাস্ত্রের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু সে শাস্ত্রের সংখ্যা ছিল চিরবর্ধনশীল। এই সমস্ত শাস্ত্রের কতকগুলির—যেমন গীতার—প্রামাণিকতা সাধারণ ও বহুবিস্তৃত ভাবেই গৃহীত হইত, অন্য অনেকগুলি, ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ছিল; আবার বেদের মত কতকগুলি অবশ্য পালনীয় এবং অপরগুলি আপেক্ষিক ভাবে পালনীয় মনে করা হইত। কিন্তু এই সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৃহত্তম স্বাধীনতা দেওয়া হইত তাহার ফলে এ সমস্তের কোন গ্রন্থই ধর্মযাজকগণের অত্যাচারে এবং মানুষের মন ও আত্মার স্বাধীনতার অস্বীকৃতিতে পরিণত হয় নাই। সুশৃঙ্খলা স্থাপনের আর একটি যন্ত্র ছিল কুলধর্ম বা পরিবার ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের শক্তি, যে শক্তি স্থায়ী হইত কিন্তু অপরিবর্তনীয় ছিল না। তৃতীয় আর একটি বস্তু ছিল ধর্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণের উপর অর্পিত শক্তি; পুরোহিত রূপে তাঁহারাই আচার-ব্যবহারের নিয়ন্তা বা রক্ষক ছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত রূপে শুদ্ধ পৌরোহিত্য কার্য অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ও সম্মানার্হ ভূমিকা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন—কেননা ভারতবর্ষে শুদ্ধ মাত্র পৌরোহিত্য কার্যকে প্রধান বস্তু মনে করা হয় নাই—তাঁহারা ছিলেন ধর্মগত ঐহিত্যের ব্যাখ্যাতা তাঁহাদের প্রভূত পরিমাণে রক্ষণশীলতার শক্তি ছিল। অবশেষে ইঁহাদের শিষ্টাচার পদ্ধতি এ জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবে ও অতি শক্তিশালী রূপে রক্ষিত হইত গুরুপরম্পরা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণের ধারার দ্বারা, যাঁহারা প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সাধনধারার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিতেন এবং শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমের মধ্য দিয়া সে ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকার ছিল স্বাধীনভাবে স্বীয় ধারার তাৎপর্যকে সমৃদ্ধ ও সাধনাকে পরিণত করিয়া তোলা, যে অধিকার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ কখনও পাইতেন না। শুধু এক অচলায়তনে পরিণত করিয়া তাহার নিরবচ্ছিন্নতাকে রক্ষা না করিয়া ধর্মকে জীবন্ত ও সচল রাখাই ছিল ভারতের ধর্মগত আন্তর মনের বৈশিষ্ট্যসূচক ধরন। যুগযুগান্তরব্যাপী ধারাবাহিকতা ও স্থায়ী ঐতিহ্যের সহিত শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত পরিবর্তন সাধনের স্বাধীনতার এই মিলনের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে—যে ধর্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার মধ্যে সাধুসন্ত শিক্ষক ও গুরুর এক দীর্ঘপরম্পরা দেখা গিয়াছে, রামানুজ, মধ্ব, চৈতন্য, বল্লভাচার্য দ্বারা পর্যায়ক্রমে যাহার বিস্ময়কর পরিণতি সাধিত হইয়াছে, এবং অবসাদগ্রস্ত ও কতকটা পরিমাণে প্রস্তরীভূত হইয়া পড়িবার একটা যুগের পর অধুনা যাহার মধ্যে

পুনরুজ্জীবনের প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আরও আশ্চর্যজনক এক উদাহরণ হইল শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা, তাহার দীর্ঘ গুরুপরম্পরা, এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ দ্বারা খালসাদের মধ্যে গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানের এক নবরূপায়ণ। বৌদ্ধদের সংঘ ও তাঁহাদের পরামর্শ-সভা, শঙ্করাচার্য দ্বারা সৃষ্ট এক প্রকার এক বিভক্ত ধর্মযাজকীয় প্রভুত্ব ও পরিচালনা,—যাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষ-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই—শিখ খালসা এবং বর্তমানকালের সংস্কারপরায়ণ সম্প্রদায় দ্বারা গৃহীত সমাজ নামধেয় উপাসনার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দৃঢ়সংবদ্ধ ও কঠোর বিধানের দিকে একটা চেষ্টা দেখা যায় বটে; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যেও, পাশ্চাত্য দেশে অতিবিকশিত ধর্মসঙ্ঘ এবং পদমর্যাদানুক্রমে শ্রেণীবদ্ধ যথেচ্ছাচারী যাজকসম্প্রদায়, যে ভাবে মানবজাতির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর তাঁহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাসন ও অত্যাচারের গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছে, ভারতের ধর্মগত মনের স্বাধীনতা, নমনীয়তা এবং জীবন্ত সরলতা ও ঐকান্তিকতা সে জাতীয় কিছু কখনও ঘটিতে দেয় নাই।

মানুষের কর্মের কোন ক্ষেত্রে, কোন জাতির মধ্যে যদি যুগপৎ সুশৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার সহজাত একটা প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহা তাহার স্বাভাবিক এক উচ্চ সামর্থ্যের চিহ্ন বলিয়া সর্বদা গৃহীত হয়; তাই যে জাতি ধর্মের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে সদা সুশৃঙ্খল পরিণতির এইরূপভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে, ধর্মজগতে তাহার প্রবল সামর্থ্য আছে একথা স্বীকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে এক বৃহৎ প্রাচীন এবং আজিও জীবন্ত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি যে সে জাতি লাভ করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ভাবনা ও অনুভূতির এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, আর যাহা সে স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় নমনীয় ও বিচিত্র, তৎসঙ্গে যাহা এক স্থায়ী ও শক্তিশালী পরিণতি লাভের উপায় রূপে প্রচুর পরিমাণে নিশ্চিত অথচ দৃঢ় হইতে সমর্থ, তেমন এক কাঠামো সৃষ্টির ব্যবস্থা, এই উভয় বস্তু ভারতীয় সভ্যতাকে এই বিস্ময়কর এবং আপাত-প্রতীয়মান শাশ্বত ধর্ম দিয়াছে, তৎসঙ্গে দিয়াছে নানামুখী দর্শনসমূহ, মহান শাস্ত্রাবলী, গভীর ধর্মগ্রন্থরাজি, যাহা অনন্ত সত্যের প্রত্যেক দিক হইতে শাশ্বতের অভিমুখে অগ্রসর হয় এরূপ নানা প্রকার ধর্মের চৈত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা, আত্মাকে আবিষ্কার করিবার জন্য যোগপন্থাগুলি, ব্যঞ্জনায় ভরপুর রূপ প্রতীক ও অনুষ্ঠানাবলীর নানা অপরূপ সম্পদ, যাহা পরিণতির সকল স্তরে অবস্থিত মনকে ভগবদভিমুখী সাধনার জন্য শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রকৃতই শক্তিশালী। ইহার দৃঢ় গঠন, বিপদের আশঙ্কাশূন্য এক বৃহৎ সহিষ্ণুতা ও

পরিপাক করিয়া অঙ্গীভূত করিবার শক্তি, ইহার সজীবতা, তীব্রতা, গভীরতা, অনুভূতির বহুবৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল হইতে ইহাকে সমর্থ করিয়াছে; ইউরোপে এক দিকে পার্থিব জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অন্যদিকে ধর্ম এ উভয়ের মধ্যে যে এক অস্বাভাবিক বিরোধ ও বিচ্ছেদ আছে তাহা হইতে ভারত যে মুক্ত আছে, মানসিক বুদ্ধির দাবির সঙ্গে আত্মার দাবির যে মিলন ভারত সংসাধিত করিয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া উদ্‌বর্তন এবং পুনরুজ্জীবনের অমেয় সামর্থ্যে যে ভারত বিভূষিত আছে, সে সমস্তেরও মূলে রহিয়াছে তাহার সেই দৃঢ় গঠন, আবার তাহাই সকল ধর্মের মধ্যে তাহাকে অসাধারণ, সর্বাপেক্ষা বৈভবশালী ও জীবন্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী ইহার উপর নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের অতি প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ ইহার সুদৃঢ় মূল-শিকড় নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। জাতির প্রাণ-শক্তির এক বৃহত্তম অবসাদের যুগে এই আক্রমণের ফলে ইহা কতকটা বিক্ষুব্ধ, হতবুদ্ধি ও সাময়িকভাবে বিকম্পিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা, বাহির হইতে আগত বস্তুকে পরিপাক করিবার শক্তি এবং গঠনক্ষম প্রচেষ্টার এক নূতন উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়া ভারত প্রায় অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। এক মহৎ নূতন জীবন স্পষ্টভাবে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, এক প্রবল রূপান্তর ও অধিকতর সক্রিয় বিকাশ ও পরিণতি এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির অফুরন্ত আনন্ত্যের দিকে শক্তিশালীভাবে অভিযানের এক প্রস্তুতি চলিয়াছে।

ভারতীয় ধর্মপ্রণালী ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নানামুখী নমনীয়তাই তাহার সত্য, তাহার জীবন্ত বাস্তবতা, তাহার সাধনা ও আবিষ্কারের অযাচিত ঐকান্তিকতার স্বভাবসিদ্ধ চিহ্ন; কিন্তু ইউরোপীয় মনের ভারতকে বুঝিবার পক্ষে এই নমনীয়তাই সর্বদা প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। ইউরোপ ধর্মচিন্তাকে দারিদ্র্যসমর্থক অনমনীয় সংজ্ঞা দিতে, কঠোরভাবে বর্জন করিতে, বাহ্য ধারণা ব্যবস্থা ও রূপের প্রতি সর্বদা নিবিষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত। তর্কবিদ্যা বা ধর্মশাস্ত্র-সম্মত বুদ্ধি দ্বারা গঠিত সুস্পষ্ট ধর্মপ্রণালী, আচরণকে নির্ধারিত করিবার কঠোর ও সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিধিব্যবস্থা, আচার ও অনুষ্ঠানের এক সমষ্টি, ধর্মযাজনার জন্য পুরোহিত বা উপাসকমণ্ডলী দ্বারা পরিকল্পিত এক ব্যবস্থা —ইহাই পাশ্চাত্য ধর্ম। একবার এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মাকে সতর্কভাবে কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিতে পারিলে, হৃদয়ের কিছু আবেগ ও উচ্ছ্বাস এমন কি কিছু রহস্যসমাচ্ছন্ন সাধনাকে সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে যুক্তিবুদ্ধির সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করিলে মনে হয় এই সমস্ত বিপদজনক অনুপানসমূহকে বাদ দিয়া দেওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই সমস্ত ধারণায় শিক্ষিত হইয়া, ইউরোপীয় সমালোচক ভারতে

আসে এবং যাহার শীর্ষদেশে এক অদ্বয় অনন্তের বিশ্বাস বর্তমান তেমন বহু ঈশ্বরবাদের বিরাট স্তূপ ও তাহার জটিলতা হইতে প্রবল ধাক্কা পায়। এই বিশ্বাসকে সে ভুল করিয়া পাশ্চাত্য দেশের নিষ্ফল ও বস্তুনিরপেক্ষ বুদ্ধিচালিত সর্বেশ্বরবাদ (pantheism)এর সহিত এক মনে করে। সে নিজের ভাবনায় পূর্বেই যে সকল ধারণা ও সংজ্ঞা গড়িয়া তুলিয়াছে, অনমনীয় ভাবে তাহাই এখানে প্রয়োগ করে, আর অবৈধ ভাবে এই আমদানির ফলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারণার অনেক মিথ্যা মূল্যাবধারণ করা হইয়াছে—দুঃখের বিষয় "শিক্ষিত" কোন কোন ভারতীয় মনও সেই অবধারণ মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু যেখানেই আমাদের ধর্ম তাহার দেওয়া নির্দিষ্ট মান, ভুল ধারণা, প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ও দম্ভ-পূর্ণ নিন্দাবাদের হাত এড়াইতে পারিয়াছে সেখানে তৎক্ষণাৎ তাহা তাহাকে মুক্ত করিয়াছে। পক্ষান্তরে মানসিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মন অসহিষ্ণুভাবে কোন কিছুকে একান্তভাবে বাদ দিতে বা পরিহার করিতে অনিচ্ছুক, কেননা বোধি ও আন্তর অনুভূতির এক মহান শক্তি প্রথম হইতেই তাহাকে একটি বস্তু দিয়াছে, পাশ্চাত্য মন আনাড়ির মত অনেক কিছু করিয়া বহু বাধা পার হইয়া যাহাতে কেবল পেঁৗছিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে বস্তুটি হইল বিশ্বচেতনা, সার্বভৌম দৃষ্টি। এমন কি যখন সে মন এক ও অদ্বিতীয়কে দেখে তখনও সে তাঁহার আত্মা ও প্রকৃতির দ্বৈতরূপ স্বীকার করে, তাহার মধ্যে বহু প্রকার ত্রিমূর্তি এবং অনন্ত বিভাবের স্থান আছে বলিয়া অনুভব করে। যখন সে ভগবানের কোন একমাত্র সীমিত বিভাবের উপর মনঃসংযোগ করে এবং মনে করে তাহা ছাড়া আর কিছু দেখিতেছে না, তখনও সে তাহার চেতনার পশ্চাতে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই সর্বের বোধ এবং অদ্বয় ব্রহ্মের ধারণা রক্ষা করে। এমন কি যখন সে তাহার পূজা বহু দেবতার মধ্যে ভাগ করিয়া দেয় তখনও তাহার পূজার বস্তুর মধ্য দিয়া অসংখ্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া পরম এককে দেখিতে পায়। এই সমন্বয়ী দৃষ্টি রহস্যবিদ ভাবুকের বা স্বল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জনশ্রেণী অথবা বেদ ও বেদান্তের উচ্চশিখরে বিচরণশীল দার্শনিক মনীষীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্য রূপে যে ছিল তাহা নহে; পুরাণ ও তন্ত্রের ভাবনা ও প্রতিরূপাবলি, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রতীকসকলের দ্বারা পরিপুষ্ট সাধারণ লোকের মধ্যেও এ দৃষ্টি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কেননা এই সমস্ত বস্তু বৈদিক শাস্ত্রের সমন্বয়-সাধক অদ্বৈতবাদ, বহুমুখী একেশ্বরবাদ এবং বৃহৎ বিশ্বগত সর্বজনীনতার বাস্তব প্রতিরূপ বা জীবন্ত মূর্তি মাত্র।

ভারতীয় ধর্ম নাম রূপ ও কালের অতীত পরংব্রহ্মের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তরুণ জাতিদের সংকীর্ণতর ও অধিকতর অবিদ্যাচ্ছন্ন একেশ্বরবাদের মত শাশ্বত ও অনন্ত সত্তার মধ্যবর্তীস্থানীয় সকল নাম রূপ, শক্তি ও ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার ও বিলোপ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন কখনও সে অনুভব করে নাই।

সকল বর্ণবৈচিত্র্য-বিরহিত এক একেশ্বরবাদ অথবা মলিন অস্পষ্ট সর্বাতীগ এক ঈশ্বরবাদ ইহার প্রথম মধ্য ও শেষ ভাগ নয়। অন্বয় ঈশ্বরকেই সর্ব রূপে পূজা করা হয়, কেননা বিশ্বের সব কিছুই তিনি অথবা তাঁহার সত্তা বা তাঁহার প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় ধর্ম সর্বেশ্বরবাদ (বা pantheism) বলিলে যাহা বুঝায় তাহা নহে, কেননা ইহা সর্বগত ভাবের অতীত বিশ্বাতীত শাশ্বতকে স্বীকার করে। ভারতের বহু-ঈশ্বরবাদ প্রাচীন ইউরোপের জনগণ পরিসেবিত বহু-ঈশ্বরবাদ নহে; কারণ এখানে যে বহু দেবতার পূজা করে সেও জানে যে তাহার সকল দেবতা এক পরম অন্বয়-সত্তার বিভিন্ন নাম, রূপ, ব্যক্তিত্ব বা শক্তি; তাহার সকল দেবতা একই পুরুষ হইতে আসিয়াছে, তাহার সকল দেবী একই ভাগবতী শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। পাশ্চাত্য দেশে থিইজ্‌ম (Theism) নামে পরিচিত ঈশ্বরবাদের লোক-প্রসিদ্ধ যে রূপ আছে, তাহার সহিত যে সমস্ত ভারতীয় ধর্মপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাদেরও মধ্যে আরও বেশী কিছু আছে, কারণ তাহারা ঈশ্বরের বহু বিভাব স্বীকার করে, কোন ভাবকে বাদ দেয় না। ভারতের মূর্তিপূজা বর্বরগণের বা অপরিণত মনের পৌত্তলিকতা নহে, কেননা অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও জানে যে মূর্তি একটা প্রতীক ও আশ্রয় এবং যখন তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া যায় তখন তাহাকে বিসর্জন দেওয়া যায়। যাহারা মুসলমান ধর্মের ভাবধারার বা সূত্রের ছাপ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে, পরবর্তী কালের সেই সকল ধর্মমত—যথা নানকের কালাতীত এক অন্বয়সত্তা বা অকালের পূজাপদ্ধতি—অথবা অধুনাতন কালের প্রতীচ্য প্রভাবে জাত সংস্কারপরায়ণ ধর্ম-সকল,—ইহারাও সেমেটিক জাতির বা পাশ্চাত্য দেশের একেশ্বরবাদের সীমাগুলি স্বীকার করে না; ইহারা সকলেই অপ্রতিহত প্রভাবে বালকোচিত সেই ধারণা হইতে বেদান্তের অতলস্পর্শ সত্যের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মে ঈশ্বরের দিব্য ব্যক্তিত্ব এবং মানুষের সহিত তাঁহার মানুষী সম্বন্ধ এ উভয়কে সক্রিয় মহাসত্যরূপে গ্রহণের উপর অত্যন্ত জোর দেয় বটে, কিন্তু ইহাই ঐ সকল ধর্মমতের সকল কথা নয়; প্রতীচ্যে মানুষীভাবকে স্ফীত ও বর্ধিত করিয়া যে সীমিত ব্যক্তিক ঈশ্বরকে স্থাপন করা হইয়াছে এই দিব্য ব্যক্তিত্ব তাহা নহে। পাশ্চাত্য বুদ্ধির পরিজ্ঞাত কোন সংজ্ঞা দ্বারা ভারতীয় ধর্ম বর্ণিত হইতে পারে না। ইহার সমগ্রতায় ইহা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনা উপলব্ধি ও অনুভূতির এক স্বাধীন ও পরমতসহিষ্ণু সমন্বয়। একই সত্যকে ইহার বহু-দিকের প্রত্যেকটি হইতে দেখিয়াছে বলিয়া ইহা কোন সত্যের প্রবেশে বাধা দেয় নাই। ইহা নিজেকে কোন বিশেষ নাম দেয় নাই এবং সীমানির্দেশক কোন পার্থক্য দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে নাই। কিন্তু ইহার অন্তর্বর্তী সাধনপদ্ধতি বা অংশসকলের পৃথক পৃথক নাম দিয়াছে, আর যে ব্রহ্মকে যুগযুগান্ত ধরিয়া

সে অন্বেষণ করিয়াছে নিজে তাহারই মত নামরূপ-পরিশূন্য সার্বভৌম অনন্ত রহিয়া গিয়াছে। যদিও পরম্পরাগত শাস্ত্র সাধনপদ্ধতি ও প্রতীকসমূহের জন্য ইহাকে অন্য সকল ধর্মমত হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়, তথাপি ইহার মৌলিক প্রকৃতিতে ইহা মতবাদ-পরিশাসিত ধর্ম নহে পরন্তু ইহা একটি বৃহৎ বহুমুখী একত্ববিধায়ক সর্বদা প্রগতিশীল ও সর্বদা আত্মবিস্তারপরায়ণ এক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।*

ভারতীয় ধর্মগত মনের সমন্বয়সাধনের এই প্রকৃতি, সব কিছুকে আলিঙ্গন করিয়া লইবার এই প্রবৃত্তির উপর জোর দিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, কেননা তাহা না হইলে আমরা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না। কেবলমাত্র এই উদার ও নমনীয় প্রকৃতিকে স্বীকার করিলে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ প্রভাব কি তাহা বুঝিতে পারিব। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে "কিন্তু মোটের উপর হিন্দুধর্ম কি, ইহা কি শিক্ষা দেয়, ইহার সাধনার ধারা কি, ইহার সাধারণ উপাদান কি?" তাহা হইলে আমরা উত্তর দিতে পারি যে ভারতীয় ধর্ম তিনটি মূল ধারণার অথবা বরং উচ্চতম ও উদারতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদে যে এক সদ্‌বস্তুর কথা আছে, ঋষিগণ যাহার বহু নাম দিয়াছেন (একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি) উপনিষদ যাহাকে (একমেবাদ্বিতীয়ং) এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াছে, যাহা কিছু আছে যিনি তাহা, আবার যিনি সব কিছুকে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছেন, বৌদ্ধদের যাহা নিত্য সত্য, মায়াবাদীদের যাহা পরম ও চরম তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদীগণের যিনি পরাৎপর ভগবান বা পুরুষোত্তম, অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি যাঁহার শক্তিতে বিধৃত রহিয়াছে—এক কথায় যিনি শাশ্বত ও অনন্ত তাহাই হইতেছে ইহাদের প্রথম ধারণা। ইহাই এ সংস্কৃতির প্রথম সাধারণ ভিত্তি, কিন্তু মানুষী বুদ্ধি দ্বারা ইহা নানা বৈচিত্র্যময় অসংখ্য সূত্রে প্রকাশিত হইতে পারে ও হইয়াছে। এই অনন্তকে এই সনাতনকে এই শাশ্বতকে আবিষ্কার করা, ইহার নিকটে পেঁছা, ইহার সহিত কোন এক ভাবে এক হওয়া—ইহাই আধ্যাত্মিকতার চরম কথা ও পরমসাধনা। ভারতীয় ধর্মমতের ইহাই প্রথম সর্বজনীন ধারণা।

যে কোন সূত্রাকারে এই ভিত্তিকে যদি স্বীকার কর, ভারতে যে সহস্র পন্থা

* শেষ পর্যন্ত কেবল যে একমাত্র ধর্মকে ভারতবর্ষ দৃশ্যতঃ বর্জন করিয়াছে তাহা হইল বৌদ্ধধর্ম, কিন্তু এইভাবে যাহা দেখা যাইতেছে বস্তুতঃ তাহা একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। বৌদ্ধধর্ম তাহার পৃথক থাকিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কেননা তাহার মতবাদের অংশের কথা নয় কিন্তু তাহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উপাদান ছিল ভারতের হিন্দুধর্ম তাহা নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। এরূপ অবস্থার পরও উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম বাঁচিয়া ছিল, শঙ্করাচার্য বা বা অন্য কেহ তাহার উচ্ছেদ করেন নাই, আক্রমণশীল মুসলমান শক্তিই তাহাকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিল।

স্বীকৃত হইয়াছে তাহার যে কোন পন্থা, অথবা এমন কি সেই সব পন্থা হইতে বহির্গত কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া এই মহৎ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি অনুসরণ কর, তাহা হইলে তুমি এ ধর্মের মর্মস্থলে পেঁাছিতে পারিবে। কেন-না, সেই শাশ্বত অনন্তে পেঁাছিবার জন্য মানুষের পক্ষে বহুবিধ পন্থা আছে, ইহাই এ ধর্মের দ্বিতীয় মৌলিক ধারণা। এই অনন্তের মধ্যে অনন্ত প্রকার ভঙ্গী বা ভাব আছে এবং এই অনন্ত ভাবের প্রত্যেকটি তাহার স্বমহিমায় শাশ্বতেরই এক প্রকাশ। এই বিশ্বের নানা সীমার মধ্যে ঈশ্বর নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন এবং জগতে নিজেকে সার্থক করিয়া তোলেন কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি শাশ্বতে পেঁাছিবার এক একটি পন্থা। কেননা প্রত্যেক সসীম পদার্থে আমরা অসীমকে আবিষ্কার করিতে এবং তাহার রূপ ও প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তাহাতে পেঁাছিতে পারি; বিশ্বের সকল শক্তি পরম একেরই শক্তি, তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির কর্মধারার পশ্চাতে যে বহু দেবতা আছে তাহাদিগকে একই পরম দেবতার শক্তি নাম ও বিভূতি বলিয়া দেখিতে ও আরাধনা করিতে হইবে। ভাল বা মন্দ, সৌভাগ্যদায়ক অথবা দুর্ভাগ্যপ্রদ যে রূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হউক না কেন, আমরা স্বীকার করি বা না করি—সকল ঘটনার পশ্চাতে এক অনন্ত চৈতন্য, কার্যকরী শক্তি, ইচ্ছা বা বিধান, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি বা কর্ম রহিয়াছে। যিনি অনন্ত তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন, রুদ্র বা শিবরূপে ধ্বংস করেন বা নিজের মধ্যে প্রত্যাহৃত করিয়া নেন। পরাশক্তিই মঙ্গলময়ী রূপে ধারণ ও পালনের জন্য হন জগন্মাতা লক্ষ্মী বা দুর্গা অথবা সেই রূপে নিজেকে রূপায়িত করেন; অথবা এমন কি মুখোশপরা হইলেও মঙ্গলের জন্যই চণ্ডী বা ঘোররূপা কালীমাতা মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। একই অদ্বয় ভগবান তাঁহার গুণাবলীর নানা রূপে নানা নামে নানা দেবতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বৈষ্ণব-গণের দিব্যপ্রেমের মূর্তি এবং শাক্তগণের দিব্যশক্তির প্রভু ঈশ্বর পৃথক দেবতা বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে ইহারা উভয়েই একই অনন্ত ব্রহ্মের বিভিন্ন মূর্তি*। এই সমস্ত নাম ও রূপের যে কোনটির মধ্য দিয়া সাধক জ্ঞান বা অজ্ঞানের সঙ্গে পরমবস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে পারে, কেননা ইহাদের মধ্য দিয়া এবং ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা চরম উপলব্ধিতে পেঁাছি।

অবশ্য ইহাও বলিতে হইবে যে অনেক আধুনিক ভাবাপন্ন ধর্মবাদী এই

*ভারতীয় বহু ঈশ্বরবাদের এই ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যের নিন্দার উত্তর দিবার জন্য এক আধুনিক আবিষ্কার নয়; দেখা যায় গীতায় স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ আছে, আরও পূর্ববর্তী-কালীন উপনিষদের ইহাই অর্থ; অতি প্রাচীনকালে বেদের "সাবেক ধরনের" কবিগণের দ্বারা —প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা গভীর রহস্যবিদ্যাবিদ্ ভাবযোগী ছিলেন—বহুস্থানে নানা বাক্যে ইহা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

সমস্ত বস্তুকে প্রতীক বলিয়া কতকটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, সে চেষ্টা বর্তমানকালের জড়াশ্রিত যুক্তিবাদের সহিত তাহাদের বুদ্ধির একটা আপোষের ফল, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় মন ইহাদিগকে শুধু প্রতীকরূপে দেখে নাই জগতের সত্যরূপেও দেখিয়াছে—যদিওবা মায়াবাদীদের কাছে এ সমস্ত মায়িক জগতের সত্য মাত্র। কেননা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক জ্ঞান একদিকে উচ্চতম কল্পনাতীত সদ্বস্তু, অন্যদিকে আমাদের ভৌতিক ভাবের সত্তা, এ উভয়কে পরস্পরবিরোধী বস্তু মনে করে নাই অথবা তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করে নাই। ইহারা চৈতন্যের ও অনুভূতির অন্য জড়াতীত ভূমি বা লোকসমূহের বিষয় অবগত ছিল এবং তাহাদের কাছে এই সমস্ত ভূমির সত্য ভৌতিক জগতের বাহ্য সত্য হইতে কোন অংশে কম ছিল না। মানুষ প্রথমে তাহার মানসপ্রকৃতি ও গভীরতর অনুভূতির সামর্থ্য, তাহার স্বভাব ও অধিকার অনুসারে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়। সাধক পরিণতির পথে অন্তরের কোন্ স্তরে আছে তাহা দ্বারাই সত্যের কোন্ স্তরে, চেতনার কোন্ ভূমিতে সে পৌঁছিতে পারিবে তাহা নির্ণীত হয়। ইহা হইতেই ধর্মপ্রণালীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়; কিন্তু যে সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সমস্ত প্রণালী গঠিত হয় তাহা কাল্পনিক নহে, পুরোহিত বা কবির আবিষ্কৃত অবাস্তব কিছু নহে: কিন্তু তাহারা জড়জগতের চেতনা ও পরমতত্ত্বের অনির্বচনীয় অতিচেতনার মধ্যবর্তী প্রদেশে অবস্থিত জড়াতীত জীবনের সত্য।

আধ্যাত্মিক আন্তর জীবনের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও শক্তিশালী ভারতীয় ধর্মের মূলীভূত সেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এই যে, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বে যে সর্বজনীন চেতনার মধ্য দিয়া এবং সমগ্র অন্তর বা বাহ্য প্রকৃতি ভেদ বা অতিক্রম করিয়া পৌঁছা যায় শুধু তাহা নহে কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মা নিজের বা নিজের আধ্যাত্মিক অংশের মধ্যে ভগবানের বা তৎস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইতে পারে, কেননা তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেই অদ্বয় দিব্যসত্তার সহিত অন্তরঙ্গভাবে এক এবং অন্ততঃপক্ষে অন্তরঙ্গভাবের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ভারতীয় ধর্মের সারমর্ম বা মূল উদ্দেশ্য এমনভাবে জীবন যাপন করা, এমন ভাবে বর্ধিত হওয়া যাহাতে যে অজ্ঞান আমাদের মন ও প্রাণের কাছে এই আত্মজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের অন্তরস্থ দিব্য-পুরুষকে জানিতে পারা যাইবে। এই তিনটি বিষয় একত্রে স্থাপন করিলে সমগ্র হিন্দুধর্ম ও তাহার মূল তাৎপর্য জানা যাইবে এবং যদি তাহার কোন ধর্মমতের প্রয়োজন হয় তবে ইহাই হইল সে ধর্মমত।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর অর্পিত কার্যভার হইল একদিকে ঈশ্বর ও অন্যদিকে মানুষের মধ্যে, একদিকে শাশ্বত ও অনন্ত এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ অব্যাহত এই সান্তের মধ্যে যাহা এখানে বা আজিও প্রকাশিত হয় নাই এমন এক জ্যোতির্ময় সত্য-চেতনা এবং অন্যদিকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মননের মধ্যে মধ্যস্থতা করা। কিন্তু মানব জাতির অধিকাংশ যেরূপ প্রাকৃত লোকের দ্বারা গঠিত তাহাদের নিকট আধ্যাত্মিক চেতনার মহত্ত্ব এবং মানুষকে ঊর্ধ্বে তুলিবার তাহার যে শক্তি আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করানো অপেক্ষা কঠিন আর কিছু নাই, কেননা মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী, জগতের ও বস্তুনিচয়ের বাহিরের আহ্বান মাত্র তাহাদের কর্ণকুহরে পেঁাছে, এ সমস্তের পশ্চাতে অবস্থিত সত্যের বাণী তাহারা শুনিতে পায় না। এই বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাহিরের দিকের এই আকর্ষণই হইল সেই শক্তির মূল যাহা সর্বজনীন ভাবে মানুষকে অন্ধ করিয়াছে, ভারতীয় দর্শনে যাহাকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করিয়াছে যে মানুষ এই অবিদ্যার মধ্যে বাস করে আর ইহার অপূর্ণ ইঙ্গিত ও নির্দেশের মধ্য দিয়াই উচ্চতম ও অন্তরতম এক জ্ঞানে তাহাকে পেঁাছাইয়া দিতে হইবে। আমাদের জীবন দুই জগতের মধ্যে বিচরণ করে, এক হইল অন্তর জগৎ যেখানে সত্তার গভীর হইতে গভীরতর ভূমিসকল আছে, অপরটি বাহ্য জগৎ যাহা আমাদের বহিশ্চর প্রকৃতির বাহ্য ক্ষেত্র। অধিকাংশ মানুষই বাহ্যজীবনের উপর পূর্ণ গুরুত্ব স্থাপন করে, অতি দৃঢ়তার সহিত বাহ্য-চেতনায় বাস করে, অন্তর্জগতে একরূপ বাস করে না বলিলেই চলে। চিন্তা এবং শিক্ষা বা সাধনার শক্তিতে মাত্র কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানব জড়ীয় ও প্রাণিক সত্তা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ তাহারাও দৃঢ়ভাবে মানসিক জীবনযাপন অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় পেঁাছিতে পারে না। পাশ্চাত্য জগৎ মনের যে উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে, এবং যাহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া সে ক্রমাগতই ভুল করিয়া আসিতেছে তাহা, বাহ্য স্থূল জীবন অপেক্ষা বৃহত্তর মন ও হৃদয়ের মধ্যে বাস করিবার এক প্রবৃত্তি, মনোময় সত্য বা নৈতিক বুদ্ধি ও সংকল্প

অথবা রসানুভূতিমূলক সৌন্দর্যবোধ দ্বারা অথবা একত্র-যোগে এই তিনের দ্বারা জীবনের বিদ্রোহী উপাদানকে অধীনে বা বশে আনিবার সাধনা হইতে উচ্চতর কিছু নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুভব করে যে আমাদের মধ্যে বৃহত্তর এক বস্তু আছে; আমাদের অন্তরতম ও প্রকৃত সত্তা বুদ্ধি, নৈতিক-বিচার বা সৌন্দর্যবোধ অথবা মনন ক্ষেত্রের অন্য কোন পদার্থ নহে, সে সত্তা হইল অন্তরস্থ ঈশ্বর বা চিৎপুরুষ এবং এই অন্যসকল বস্তু সেই পুরুষের যন্ত্র মাত্র। যে শিক্ষা বা সংস্কৃতি কেবলমাত্র মন, নীতি বা সৌন্দর্যবোধের মধ্যে নিবদ্ধ তাহা আত্মার অন্তরতম সত্যে পেঁাছিতে পারে না, তখনও তাহা অবিদ্যা, অপূর্ণ ও অগভীর বাহ্য এক জ্ঞান মাত্র। আমাদের গভীরতম সত্তার এবং গোপন চিন্ময় প্রকৃতির আবিষ্কার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন আর অন্তরতম আধ্যাত্মিক জীবনে বাস করাকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিশিষ্ট চিহ্ন।

এই চেষ্টা কোন কোন ধর্মে অন্য সকল দিক বর্জন করিয়া একপ্রকার একদেশদর্শী আধ্যাত্মিকতার রূপ গ্রহণ এবং বাহ্যসত্তা ও জীবনের রূপান্তর সাধন না করিয়া বরং তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্মের সাধনা জড়গত ও প্রাণগত জীবনযাপনকে ঘৃণা করিবার দিকে যে প্রবলভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল শুধু তাহা নহে, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে মানসিক জ্ঞানবিচারের যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহাকে তাচ্ছিল্য ও বন্দী করিয়াছিল, আর সৌন্দর্যানুভূতির দিকে যে তৃষ্ণা আছে তাহাকে বিশ্বাস করে নাই বরং নিরুৎসাহিত করিয়াছিল। এ সমস্তের বিরুদ্ধে তাহা এক সীমিত আধ্যাত্মিক আবেগের বা ভাবপ্রবণতার উপর জোর দিয়াছিল এবং তাহার তীব্র অনুভূতিই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়াছিল, মননের ক্ষেত্রে নৈতিক বোধকে ফুটাইয়া তোলাই একমাত্র প্রয়োজন এবং কার্যক্ষেত্রে সেই বোধ অনুসারে চলা আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র অপরিহার্য বিধান বা পরিণাম বোধ করিয়াছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এত বড় এক উদার ও বহুমুখী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে তাহা এরূপ সংকীর্ণ গতিবৃত্তিকে নিজের ভিত্তিভূমিতে স্থান দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার নিঃসঙ্গ শিখরদেশে অন্ততঃপক্ষে তাহার পরবর্তী যুগে তাহার মধ্যে ব্যতিরেকী বা একদেশদর্শী এক আধ্যাত্মিকতার দিকে একটা ঝোঁক আসিয়াছিল, তখন তাহার দৃষ্টি উচ্চতর ভূমিতে নিবদ্ধ ছিল আর এ ঝোঁক অধিকতর অলঙ্ঘনীয় ও প্রবল ছিল। জগৎ ও জীবনের প্রতি অসহিষ্ণু এই ধরনের ঊর্ধ্বমুখী আধ্যাত্মিকতা যতই উচ্চে উঠুক না কেন, জীবনকে যতই পবিত্র করুক না কেন অথবা একভাবের ব্যক্তিগত মুক্তির দিকে যতই লইয়া যাউক না কেন তাহা কখনই পূর্ণ বস্তু হইতে পারে না। কেননা ইহার একদেশদর্শিতাই ইহাকে এমন এক

ভাবে শক্তিহীন করে যাহাতে ইহা কার্যকরীভাবে মানব জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে; ইহা জীবনকে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিতে অথবা পরম উচ্চতার সহিত পরম বিস্তারের মিলন সাধন করিতে পারে না। উদারতর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে স্বীকার করিতেই হইবে যে আত্মা বা চিৎপুরুষ কেবলমাত্র উচ্চতম ও অন্তরতম পদার্থ মাত্র নহেন পরন্তু বিশ্বের সবকিছুই তাঁহার সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। সে-সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর ব্যাপক ও তাহার প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিধি অনেক অধিক বিস্তৃত হইবে, এমন কি তাহার সাধনার আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য ও অভীপ্সা থাকিবে। বাছাই করা কয়েকজনকে দূরধিগম্য উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে শুধু চলিবে না, বরং সকল লোক সকল জীবন সমগ্র মানবসত্তাকে ঊর্ধ্বে টানিয়া তুলিতে, জীবনকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে এবং অবশেষে মানব প্রকৃতিকে দিব্য-প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে গভীরতম ব্যক্তিসত্তার উপর শুধু প্রভাব বিস্তার করিলে চলিবে না, তাহার সংঘগত জীবনকেও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। তাহাকে আধ্যাত্মিক পরিণতির দ্বারা মানবতার সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করিতে, মানবীয় সকল বস্তুকে ভাগবত জীবনের যন্ত্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে এই উদ্দেশ্যের দিকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ গতি ছিল, ক্রমোন্নতির পথে নানা উত্থান-পতন, নানা বাধা ও নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও এইরূপ গতিই ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি। কিন্তু অন্য সকল সংস্কৃতির মত সব সময়ে তাহার সকল অংশে ও ক্রিয়াতে তাহার নিজের এই পূর্ণ তাৎপর্য সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। দেখা যায় যে এই বৃহৎ অর্থ ও তাৎপর্য কোন কোন সময় সচেতন ভাবে সমন্বয়সাধনের মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তাহা অন্তরের গভীরে লুকান রহিয়াছে, বহিস্তরে কতকগুলি গৌণ ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু দেখা গিয়াছে। তথাপি কেবল এই পূর্ণ গতির কথা বুঝিলে আমরা এ সংস্কৃতির বহু দিক এবং ইহার চেষ্টা শিক্ষা ও সাধনার নানা প্রকার সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, কিরূপে তাহাদের সমন্বয়কারী পূর্ণ একত্বের মধ্যে সুসমঞ্জস হইয়াছে তাহা ইহারই গভীরতম প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যের আলোকে বুঝিতে পারিব।

যে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও ধর্মগত সংস্কৃতি সতেজ ছিল তখন ইহার মূল প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই, বরাবরই এক রূপ ছিল যদিও তাহার আকারের বিশেষ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। যদি আমরা যথার্থ কেন্দ্র হইতে দেখি তবে দেখিতে পাইব যে ঊর্ধ্বের দিকে মানুষের প্রগতির ধারার বশে স্বাভাবিকভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্যরূপে সে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার প্রাচীনতম ধারায় আদিম বৈদিক যুগে

দেখিতে পাই, যে মন জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিদৃশ্যমান বস্তুকে, আবির্ভাবকে বা প্রতিরূপকে স্বভাবতঃ বিশ্বাস করে, যে মন বাহিরের কর্ম ও ভৌতিক জগতের উদ্দেশ্যাবলিকে অনুসরণ করিয়া চলে, মানুষের সেই দেহগত মনকে ইহার বাহ্য ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। যে সমস্ত উপায় প্রতীক ক্রিয়াকর্ম ও মূর্তির সাহায্যে ইহা চিৎপুরুষের সহিত সাধারণ মানব মনের সংযোগ সাধন করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের সমস্তই এই সমস্ত অতি স্থূল বাহ্য জড় বস্তু হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মানুষের মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধে প্রথম ও আদিম ধারণা বাহ্য প্রকৃতির দিকে তাহার দৃষ্টি হইতে এবং সেই প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত এবং প্রাকৃত বস্তু ও ঘটনার আবরণে আবৃত, উচ্চতর এক বা বহুশক্তির বোধ হইতে মাত্র আসিতে পারে; মানবগণের স্বর্গে ও মর্ত্যে, তাহাদের পিতাতে ও মাতাতে, সূর্য চন্দ্র তারকাসকলে, তাহাদের আলোক ও নিয়ামকসকলে, ঊষা দিন ও রাত্রিতে, বর্ষা বায়ু ও ঝটিকাতে, সমুদ্র নদী ও অরণ্যানিতে, তাহাদের কার্যক্ষেত্রের সকল ঘটনায় ও শক্তিতে, তাহারা নিজে যাহার অংশ সেই বিশাল ও রহস্যময় সকল পরিবেশে, মানুষের স্বাভাবিক হৃদয় ও মনে সহজ ও সরলভাবে, কখনও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট কখনও অন্ধকারময় ও অস্পষ্ট এবং কখনও বা বিকৃত বা বিশৃঙ্খল ভাবে, এই ধারণা আসিয়াছে যে, এ সমস্তের অন্তরালে এক দিব্য বহুত্ব অথবা মহাশক্তির আধার অতি রহস্যময় অনন্ত অথচ এক সত্তা বহু রূপে প্রকাশ পাইতেছে আর এ-সমস্ত তাঁহারই রূপ, এ-সমস্ত গতির মধ্যে চলিতেছে তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। বৈদিক ধর্ম দেহগত মানবের এই সহজ বোধ ও অনুভূতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে যে সমস্ত ধারণা জাত হইয়াছে তাহা ব্যবহার করিয়াছে এবং ইহাদের মধ্য দিয়া মানুষকে তাঁহার ও জগতের সত্তার চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসমূহে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। এ ধর্ম বলে যে, প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির পশ্চাতে জীবন্ত শক্তিরাজি এবং দেবতাবৃন্দ যখন সে দেখিতে পাইয়াছে তখন সে ভুল করে নাই, সত্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে—যদিও সে আন্তর সত্য তখনও জানিতে পারে নাই, সে আরও স্বীকার করে যে পূজা করা, তাঁহাদের পরিতুষ্টিসাধনের ও তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে ঠিকই হইয়াছে, কেননা ইহাই হইল তাহার অপরিহার্য প্রাথমিক পথ যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার দেহ-প্রাণ-মন-ময় প্রকৃতি ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তাঁহার পরিদৃশ্যমান বাহ্য প্রকাশের মধ্য দিয়াই মানুষ এমন কিছুর দিকে—যে কিছু এক বা বহু যাহাই হউক না কেন—অগ্রসর হয় যাহা তাহার নিজের প্রাকৃত সত্তার অপেক্ষা বৃহত্তর, যাহা তাহাকে চালনা করিতেছে, তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষায়, তাহার বাধা-বিপত্তিতে, তাহার সংঘর্ষ ও সংগ্রামে আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য যাহাকে সে

আহ্বান করে*। আদিম যুগের মানুষ সর্বত্র যে ভাবে যে রূপে তাহার সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যগত দেবতাগণের সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিয়াছে বৈদিক ধর্ম তাহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছে; যজ্ঞের বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকে সে তাহার নিজের কেন্দ্রগত প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে স্থূলত্ব যতই থাকুক না কেন, যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার এই ধারণা অস্পষ্টভাবে সত্তার প্রাথমিক এক বিধানকেই প্রকাশ করিয়াছে। কেননা যাহারা জীবনের সকল ধারা নিগূঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে এবং প্রকৃতির ক্রিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে সেই সর্বজনীন বিশ্বশক্তিরাজির সহিত ব্যষ্টি জীবের যে আদান-প্রদান গোপনে নিয়ত চলিতেছে তাহার উপরই যজ্ঞের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু বাহ্য ও বহিরঙ্গ দিকেও বৈদিক ধর্ম মানুষের দেহগত মনের এই প্রাথমিক ধর্ম ধারণার-স্বীকার-ও-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখে নাই। বৈদিক ঋষিগণ জনগণ দ্বারা পূজিত দেবতাগণকে চেতনার নানা ক্রিয়া-সম্পাদক রূপেও দেখিয়াছেন; তাঁহারা জনসাধারণকে উচ্চতর সত্য, ন্যায় ও বিধানাবলির কথা শুনাইয়াছেন এবং দেবতাগণকে এ-সমস্তের অভিভাবক ও চালক রূপে দেখিয়াছেন, এই সত্য ও ন্যায়ের বিধানানুসারে চলিয়া এক সত্যতর জ্ঞান ও বৃহত্তর আন্তর জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন; সত্যের এবং যথার্থ পথে চলিবার শক্তি দ্বারা মানবাত্মাকে অমরত্বের এক দিব্য ধামে উন্নীত করা যায় ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ লোকে এ সমস্ত অত্যন্ত বাহ্য অর্থে বুঝিত বটে; কিন্তু তাহাদের নৈতিক প্রকৃতিকে শিক্ষা দিয়া পরিণত করিয়া তুলিবার জন্য, যাহাতে তাহাদের অন্তরাত্মার কতকটা প্রাথমিক সংগঠন ও সংবর্ধন হয় এবং বাহ্য-প্রাকৃত-জীবনাতিরিক্ত উচ্চতর সত্য ও জ্ঞানের কিছু ধারণা লাভ হয়, এমনকি মানুষের সাধনা ও অভীপ্সা চরমে যেখানে পৌঁছিতে চায় সেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের কতকটা প্রাথমিক ধারণা তাহারা যাহাতে পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইত। এই বাহ্য পূজা-অর্চনা আচার-ব্যবহার ধর্ম ও নৈতিকতার শক্তিতে ততটা উচ্চস্তরে পৌঁছিত, জনগণের অধিকাংশ যতটা বুঝিতে বা অনুসরণ করিতে পারিত।

যে সমস্ত দীক্ষিত সাধক বেদের নিগূঢ় ও অন্তরঙ্গ অর্থ বুঝিতে এবং তদনুসারে সাধনা করিতে প্রস্তুত হইতেন এ সকল বিষয়ের গভীরতর সত্য

---

*গীতা চারি প্রকার বা চারি শ্রেণীর ভক্ত ও সাধকের কথা স্বীকার করিয়াছে; প্রথমে 'অর্থার্থী' ও 'আর্ত' যাহারা বাসনার পরিপূরণ চায় এবং যাহারা মানবজীবনের দুঃখযন্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে; তাহার পর 'জিজ্ঞাসু' বা জ্ঞানান্বেষু—যাহারা দিব্যসত্য জানিতে এবং তাহার মধ্য দিয়া ভগবানে পৌঁছিতে চায়; সর্বশেষে ও সর্বোপরি 'জ্ঞানী' যাহারা ইতিমধ্যেই সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং পরমাত্মার সহিত একত্ববোধে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কেবল তাঁহারাই লাভ করিতে পারিতেন। কারণ বেদ অন্তর্গূঢ় বাক্যসমূহে পূর্ণ এবং তাহাদের ভিতরের গভীরার্থ দ্রষ্টা-সাধকগণের নিকট শুধু প্রকাশিত হইত, ইহা ঋষিরাই বলিয়া গিয়াছেন—'কবয়ে নিবচনানি নিন্যানি বচাংসি।' প্রাচীন কালের পবিত্র স্তোত্রাবলির এই বিশেষত্ব পরবর্তী যুগে অস্পষ্ট হইয়া পড়িল, মৃত ঐতিহ্যে পরিণত হইল এবং বর্তমান কালের গবেষণা দুর্বোধ্য বৈদিক প্রতীকসমূহ বুঝিবার জন্য যে প্রবল চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছে তাহাতেও এদিকটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। তথাপি প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্ম খাঁটিরূপে বুঝিতে গেলে এই বিশেষত্বকে বুঝা ও স্বীকার করা অপরিহার্য; কেননা অধিকাংশ লোক যে সমস্ত গোপন সাধনার মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বাভিমুখে যাত্রা করিত তাহার অর্থ সকলকে জানিতে দেওয়া হইত না। সকল অথবা প্রায় সকল ধর্মে যাহারা চৈত্য বা আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে অশক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত এরূপ সাধারণ প্রাকৃত লোকের জন্য একপ্রকার বাহ্য ধর্মব্যবস্থা থাকিত এবং রহস্যপূর্ণ প্রতীকের মধ্যে গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে যে ব্যবস্থা থাকিত তাহার গূঢ়ার্থ দীক্ষিত উচ্চাঙ্গের সাধকগণের নিকট মাত্র প্রকাশিত হইত। একদিকে দেহাত্মবোধী অসংস্কৃত শূদ্র এবং অন্যদিকে যাহারা দীক্ষা দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইত এবং যাহাদিগকে শুধু বৈদিক শিক্ষা নিরাপদে দেওয়া চলিত সেই দ্বিজগণ, এ উভয়ের মধ্যে যে ভেদ পরবর্তী যুগে দেখা দিয়াছিল তাহার মূল এইখানে। এই ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পরবর্তী যুগে শূদ্রের বেদ পাঠ অথবা বেদ শিক্ষা নিষিদ্ধ হইল। এই স্তোত্রাবলির মধ্যে যে আন্তর অর্থ, চৈত্য জীবন ও অধ্যাত্ম জগতের যে উচ্চতর সত্যসমূহ বাহ্য বোধ হইতে গোপনে বর্তমান ছিল তাহার জন্যই ইহাদের 'বেদ' বা জ্ঞানের গ্রন্থ নাম দেওয়া হইয়াছে, যে নামে তাহারা আজিও পরিচিত রহিয়াছে। এই পূজা ও সাধনার নিগূঢ়ার্থের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই উপনিষদে যে বৈদিক ধর্ম পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সাধনা ও অভিজ্ঞতা যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিব। কেননা বেদে এ সমস্ত উজ্জ্বল বীজ রূপে আছে, সেই আদি দ্রষ্টা ঋষিগণের শ্লোকাবলিতে ইহাদের আভাস আছে এমন কি পরবর্তীকালে ইহারা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরও পূর্ববর্তী রূপ তথায় রহিয়াছে। নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি যে বৈদিক ঋষিরা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, অবিচলিত ও স্থায়ী এই ধারণার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনী বা গালগল্প যাহাই থাকুক না কেন, ইহা ঠিক যে তাহার মধ্যে একটা খাঁটি সত্য আছে, এ ঐতিহ্যের একটা প্রকৃত মূল ও মূল্য গোপনে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে এই তথ্যের আভাস পাওয়া যায় যে, প্রকৃত দীক্ষা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আমাদের এই সংস্কৃতির আদিম মহৎ যুগে এবং পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকতার

পক্কতর—কিন্তু বৃহত্তর কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়—পরিণতির মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা বা ধারা রহিয়াছে।

বেদের এই আন্তর ধর্ম বিশ্বের দেবতাগণের মানসিক বা চৈত্যিক (psychic) তাৎপর্যের বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক ধারণা এই যে এই বিশ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু জগৎ, সত্তার নানা স্তর বা ভূমি আছে। ইহা দেখিতে পাইয়াছিল যে মানবপ্রকৃতিতে চেতনার ক্রমোচ্চ নানা স্তর, ক্ষেত্র বা ভূমি আছে, আবার তাহার অনুরূপভাবে পর পর শ্রেণীবদ্ধ জগৎসমূহও আছে। এক সত্য ন্যায় ও বিধান প্রকৃতির এই সমস্ত স্তর বা ভূমিকে ধারণ ও পরিচালন করিতেছে; এই সত্য বা বিধান মূলতঃ এক হইলেও বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন কিন্তু সমধর্মী রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ আলোকের কথা ধরা যাইতে পারে, স্থূলে ইহা জড় আলোকের এক পর্যায়, সূক্ষ্মে ইহা উচ্চতর এক আন্তর আলোক, যাহা মনোময় প্রাণময় ও চৈত্যিক চৈতন্যের বাহন; আবার উচ্চতম ও অন্তরতম রূপে ইহাই আধ্যাত্মিক জ্যোতি বা আলোক রূপে প্রকাশ পায়। তেমনি সূর্য নামক দেবতা জড় সূর্যের প্রভু, সেই সঙ্গে বৈদিক দ্রষ্টা-কবির দৃষ্টিতে যাহা মনকে আলোকিত করে জ্ঞানের সেই রশ্মিরাজি যিনি বিকীরণ করেন তিনিও সূর্য, আবার এই সূর্যই আধ্যাত্মিক জ্যোতির আত্মা শক্তি ও দেহ, আবার এই সকল শক্তিতে ইনি সেই এক ও অনন্ত ঈশ্বরের এক জ্যোতির্ময় রূপ। সকল বৈদিক দেবতার এই বাহ্য এই অন্তরতর এবং এই অন্তরতম ক্রিয়াধারা আছে, তাহাদের পরিচিত ও গোপন নাম আছে। বেদের সকল দেবতাকে এই ভাবে বাহ্য জড় প্রকৃতির শক্তি রূপে দেখা হয়; অন্তরের অর্থে তাহাদের সকলেরই চৈত্যিক ক্রিয়াধারা এবং মনোময় নির্দেশ বা রূপ আছে; আবার এই সকল দেবতা যাহাকে 'একং সৎ' বলা হইয়াছে সেই অদ্বয় উচ্চতম সত্যের সেই অনন্ত সত্তার বিভিন্ন শক্তি। প্রায় অবিজ্ঞেয় এই পরম তত্ত্বকে বহুস্থানে বেদে 'তৎ সত্যম্' 'সেই সত্য' বা 'তদ্ একম্' 'সেই এক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যাহারা এই সমস্তের উপর শুধু বাহ্য ভৌতিক তাৎপর্য আরোপ করিতে চাহিয়াছে তাহারা বৈদিক দেবতাগণের এই জটিল প্রকৃতি যে সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা বুঝিতে গিয়া পূর্ণরূপে ভুল করিয়াছে। এই সমস্ত দেবতার প্রত্যেকে যিনি এক সৎস্বরূপ তাঁহারই এক এক পূর্ণ ও পৃথক সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব এবং ইহাদের সকলের শক্তিরাজি মিলিত হইয়া ঈশ্বরের সমগ্র সার্বভৌম শক্তি বিশ্বগত সমগ্র তত্ত্ব 'বৈশ্বদেব্যম্' গঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকে নিজের বিশিষ্ট ক্রিয়াধারায় পৃথক হওয়া সত্ত্বেও অপর সকল দেবতার সহিত এক; প্রত্যেকে নিজের মধ্যে বিশ্বাত্মা ভগবানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; প্রত্যেক দেবতা নিজেই অন্য সকল দেবতা হইয়াছে। বেদের শিক্ষা ও পূজাপদ্ধতির এই বিভাবটির অর্থ ইউরোপীয় মনীষীগণ

একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই, ইউরোপীয় ধর্মের অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ও অপ্রচুর আলোকেই ইহাকে পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে 'হিনোথি-ইজ্‌ম' (henotheism), 'একদেববাদ' শুনিতে বড় হইলেও এই ভুল নামে অভিহিত করিয়াছেন। জগদতীত ক্ষেত্রে, অনন্ত ত্রিতত্ত্বে (বা সচ্চিদানন্দে) এই সমস্ত দেবতা তাঁহাদের পরম প্রকৃতি লাভ করে। নাম-রূপের অতীত সেই অনির্বচনীয় সত্তার নাম রূপে অভিহিত হয়।

কিন্তু বৈদিক শিক্ষার সর্বপ্রধান শক্তি এই যে ইহা মানুষের অন্তর্জীবন গঠনে প্রযুক্ত হইতে পারে, এই শক্তিই বেদকে পরবর্তী সকল দর্শন ধর্ম ও যোগ মার্গের উৎস করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ জড় বিশ্বে বাস করে, সে মৃত্যুর এবং মরণধর্মী সত্তার অঙ্গীভূত 'অনেক মিথ্যা' বা অসত্যের অধীন। এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরগণের অন্যতম হইতে হইলে তাহাকে অসত্য হইতে সত্যে ফিরিতে হইবে; আলোকের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকারের শক্তিসমূহের সহিত যুদ্ধ ও জয়লাভ করিতে হইবে। দিব্য শক্তিসকলের সহিত যুক্ত হইয়া এবং তাহাদের সাহায্য লইয়া মানুষ ইহা করিতে পারে; যে উপায়ে সেই সাহায্য নামাইয়া আনা যায় তাহাই ছিল বেদের গোপন রহস্য। সকল দেশের রহস্যবিদ্যার মতই এই উদ্দেশ্যে বাহ্য যজ্ঞের প্রতীকসমূহের রহস্যরাজির অন্তরালে আভ্যন্তরীণ একটা গূঢ়ার্থ লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে এবং উহাতে অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরের আদান-প্রদান, পরস্পরের সাহায্য ও মিলনের জন্য যজ্ঞরূপ সূত্রের সাহায্যে দেবতাগণকে মানুষের অন্তরতর সত্তার ভিতরে আবাহন করা হয়। এইভাবে মানুষের মধ্যে দেবতাগণের শক্তি গঠিত হইয়া উঠে এবং এক সর্বজনীন দৈবী প্রকৃতি তাহার মধ্যে রূপায়িত হয়। কারণ দেবতাগণ সত্যকে ধারণ পোষণ ও বর্ধন করেন, তাঁহারা অমরত্ব ও অমৃততত্ত্বের শক্তি, অনন্ত বিশ্বজননীর পুত্র; অমৃতত্বে পৌঁছিবার পথ দেবতাগণের ঊর্ধ্ব-গামী পথ, সত্যেরই পথ, তাহা এক প্রগতি, তাহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া এবং বর্ধিত হইয়া সত্যের বিধানে পৌঁছিবার পথ, বেদের 'ঋতস্য পন্থা'। মানুষকে এই অমৃতত্বে পৌঁছিতে গিয়া শুধু দৈহিক বাধা ও সীমা অতিক্রম করিয়া যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয় তাহা নহে, তাহাকে মনের ও অন্তর প্রকৃতির সাধারণ সীমা ও বাধাসমূহকেও জয় করিয়া ইহাদের উপরিস্থিত এক উচ্চতম ভূমিতে, সত্যের পরম ব্যোমে উপস্থিত হইতে হয়; কেননা সেই ভূমি ত্রয়ী-অনন্তের বা সচ্চিদানন্দের স্বধাম এবং সেখানেই আছে অমরত্বের ভিত্তি। এই সমস্ত ভাব ও ধারণাকে ভিত্তি করিয়া বৈদিক ঋষিগণ মানসিক ও আন্তর সাধনার এক বর্ত্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন যাহা নিজেকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানুষকে লইয়া যাইতে পারিত, যাহার মধ্যে পরবর্তীকালে প্রকাশিত ভারতীয় যোগের বীজ নিহিত ছিল। পূর্ণ বিকশিতভাবে না হইলেও ভারতীয়

আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্বজ্ঞাপক সমস্ত ধারণা বীজাকারে ইহার মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল দেখিতে পাই। বেদের মধ্যেই পাই 'একং সৎ' 'একমাত্র সত্য বস্তু'র কথা, যিনি বা যাহা ব্যষ্টিজীব ও বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাতীত রূপে বর্তমান। সেখানেই পাই সেই অদ্বয় ঈশ্বরের কথা যিনি তাঁহার নানা বিচিত্র রূপে ও নামে, শক্তিতে ও ব্যক্তিত্বে নানা দেবতা রূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। সেখানেই রহিয়াছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের* বিভেদের কথা, অমর জীবনের বৃহত্তর সত্যের ও তদ্বিরোধী মর জগতের বহু মিথ্যায় ভরা বা সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত জীবনের কথা; সাধনার দ্বারা মানুষের আন্তর পরিণতির ফলে দেহগত সত্তার অন্তর ও মানস রাজ্যের মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা; মৃত্যুকে জয় করিবার এবং অমৃতত্বলাভের গোপন পন্থার কথা; মানুষের যে দিব্য সত্তা আছে এবং ইচ্ছা করিলে সে যাহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তাহার কথা। বর্তমানে বাহ্যজ্ঞানের ঔদ্ধত্যে যে যুগকে আমরা মানব জাতির জীবনের শৈশবকাল অথবা বড়জোর সতেজ বর্বরতার যুগ বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি সেই যুগে মানবজাতির প্রাচীন পূর্ব পিতৃগণ "পূর্বে পিতরঃ মনুষ্যাঃ" এইরূপ বোধি ও অনুপ্রেরণাজাত মানস ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং এক মহান ও গভীর সভ্যতা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এতাদৃশ মহদারম্ভ হইতে জাত ভাবধারা পরবর্তীকালে অধিকতর পূর্ণ ও সমৃদ্ধ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপনিষদগুলি বেদের শ্রেষ্ঠ ও শেষাংশ বলিয়া সর্বদাই যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাদের বেদান্ত এই নাম দেওয়াতেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে; বস্তুতঃ উপনিষদ বেদের সাধনা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বৃহৎ মুকুটমণি স্বরূপ। যে যুগে বৈদান্তিক সত্য পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং উপনিষদসকল রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল যাহার কথা আমরা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রদত্ত বিবরণে দেখিতে পাই, সে যুগ ছিল প্রবল উৎসাহসম্পন্ন কঠোর সাধনার বিরাট যুগ, গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার বীজ বপণের কাল। এই যুগের প্রবল চাপে যে সমস্ত সত্যের ধারা শুধু দীক্ষিত সাধকের মধ্যে নিবদ্ধ এবং সাধারণ লোকের নিকট হইতে গোপনে রক্ষিত ছিল, তাহারা বাঁধ ভাঙিয়া জাতির উচ্চতর মনঃশক্তিসম্পন্ন লোকের মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক চেতনা ও অভিজ্ঞতার শস্যভার যাহাতে ক্রমবর্ধমানভাবে সতত জন্মিতে পারে তজ্জন্য ভারতীয় সভ্যতার ভূমিকে উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য তখনও সকলেই যে ইহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল তাহা নহে, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই উচ্চতর

* "চিত্তিম্ অচিত্তিম্ চিনবদ্ বি বিদ্বান"—'যিনি জ্ঞানী তিনি চিত্তি বা বিদ্যা এবং অচিত্তি বা অবিদ্যাকে পৃথক করিয়া দেখুন'।

বর্ণের লোক যাহারা বৈদিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইত এবং যাহারা বাহ্য সত্য এবং বাহ্য যজ্ঞকর্মে আর নিবদ্ধ ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিল না, তাহারা সর্বত্র যে সমস্ত ঋষি সেই পরম একের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহাদের যে অভিজ্ঞতায় সত্যদর্শন হইয়াছে সেই উচ্চতম অভিজ্ঞতার বাণী শুনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহারা এ সত্য লাভ করিয়া মহৎ লোকশিক্ষকরূপে পূজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ধনশালী শূদ্র জনশ্রুতি অথবা পিতৃপরিচয় অজ্ঞ দাসীপুত্র সত্যকাম জাবালির মত নিম্নজাতিসম্ভব ব্যক্তি অথবা যাহার জন্মে সন্দেহ আছে এরূপ লোকও ছিল। এই যুগে যে কর্ম কৃত হইয়াছিল যে ভাবধারা লাভ হইয়াছিল তাহা পরবর্তী যুগে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে পরিণত হইয়াছিল এবং সেই উৎস হইতে শাশ্বত ও সদাফলপ্রসূ অনুপ্রেরণার প্রাণপ্রদ ধারা এখনও প্রবলবেগে উৎসারিত হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতা এবং সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ অন্য সকল সভ্যতার মধ্যে যে ভেদ দেখা যায় তাহা সমগ্রভাবে এই যুগের এই সাধনা ও এই বিরাট অবদানই সৃষ্টি করিয়াছে।

কারণ, এক সময় আসিয়াছিল যখন যেমন অন্য সকল দেশে তেমনি এখানেও ধর্মরহস্যের গূঢ় অন্তরের অর্থ হারাইয়া গেল, তেমনি বেদের মৌলিক প্রতীকসমূহের প্রকৃত তাৎপর্যও নষ্ট হইল এবং তাহারা লোকের কাছে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। একদিকে দেহাত্মবোধী বহির্মুখী অর্ধশিক্ষিত সাধারণ লোকের স্থূল সহজ জীবন এবং অন্যদিকে দীক্ষিত সাধকের অন্তরের গূঢ় চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, দুই প্রান্তস্থিত এই উভয় প্রান্তকে ধর্ম-প্রণালী ও প্রতীকসমূহ দ্বারা মিলিত করিয়া সংস্কৃতির যে পুরাতন সাম্য ছিল, এ যুগে আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তিরূপে তাহা অপ্রচুর হইয়া পড়িল। মানবজাতির সভ্যতার গতিচক্রে বৃহত্তরভাবে অগ্রসর হওয়ার বেগ সঞ্চার করিবার প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছিল, জ্ঞানালোকের দিকে ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করিবার জন্য ক্রমশঃ ব্যাপকতর ও মহত্তর ভাবে মনের, নীতির ও সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও এ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যে সকল বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সত্য পূর্বে লাভ হইয়াছে তীক্ষ্ণ কিন্তু অধ্যাত্ম-জ্ঞানালোকবঞ্চিত বুদ্ধির আত্মপ্রত্যয়শীল নিম্নতর অর্ধালোকের মধ্যে তাহারা হারাইয়া যাইতে অথবা নিজ শক্তির উপর পূর্ণ আস্থাশীল যুক্তিবিচারের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এই বিপদের আশঙ্কা ছিল। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশে তাহাই ঘটিয়াছিল, সেখানে গ্রীসই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছিল। যদিও অনুপ্রেরণা ও সক্রিয়তা অনেকটা হ্রাস পাইল তথাপি অনেকটা অধিক মানসিক রূপে ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ এবং পাইথাগোরাস প্লেটো ও প্লেটোর অনুবর্তী-

গণের দ্বারা আরও কিছুকাল সে সত্য রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি, এবং এসিয়া হইতে আগত খৃষ্টধর্ম—যে ধর্মকে ইউরোপীয়েরা ভাল বুঝিতে পারে নাই—ইউরোপকে পরিচালিত ও অর্ধলোকিত করা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য সভ্যতার সমগ্র গতিমুখ প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি-বিচার, বাহ্যিক এমন কি জড় বিষয়ের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহার এই বৈশিষ্ট্য সে আজিও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সংস্কৃতির সাধারণ উদ্দেশ্য মননশক্তি পরিচালিত নীতি, সৌন্দর্য ও বিচার-শক্তির সাহায্যে বৃহৎভাবে বা সূক্ষ্মরূপে দেহগত প্রাণময় মানুষের সংস্কার ও উন্নতিসাধন; আমাদের সত্তার নিম্নতর অংগ ও বৃত্তিসকলকে চিৎপুরুষের পরম আলোক ও শক্তির মধ্যে উত্তোলিত করা কখনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবর্ষে উপনিষদের যুগের প্রবল চেষ্টা ও সাধনার ফলে তাহার প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞান এবং তাহা যে আধ্যাত্মিকতার অভিমুখী গতিপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এইভাবে নষ্ট হইতে পারে নাই। বেদান্তের ঋষিগণ গূঢ় প্রতীকের দুর্বোধ্যতা হইতে উদ্ধার করিয়া বৈদিক সত্যকে নূতন রূপ দিলেন এবং বোধি ও অন্তরের অভিজ্ঞতাপূর্ণ শক্তিশালী ভাষায় উচ্চতম আকারে অত্যন্ত সাক্ষাৎ ভাবে তাহাদিগকে প্রকাশ করিলেন। ইহা অবশ্য বুদ্ধিবিচারের ভাষা ছিল না, তথাপি ইহা এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে বুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারিত, এবং তাহাকে নিজের অধিকতর বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) ভাষায় অনুবাদ করিয়া সদা বর্ধমান উদার ও গভীর দার্শনিক আলোচনা ও যুক্তিবিচারের মৌলিক চরম ও পরম সত্যের দীর্ঘ অনুসন্ধানের পথে যাত্রার আদিবিন্দুরূপে গ্রহণ করিতে পারিত। পাশ্চাত্যের মত ভারতেও নানা সৌন্দর্যে বিভূষিত মানসিক ও নৈতিক ভাবে বিভাবিত এক উচ্চ উদার ও জটিল সামাজিক সংস্কৃতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে এ সংস্কৃতিকে নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে, ধর্মের অস্পষ্ট আবেগ ও মতবাদের নিকট সাহায্য পায় নাই বরং তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, কিন্তু ভারতে ধর্মই এই সংস্কৃতিকে পরিচালিত ও উন্নীত করিয়াছে, আধ্যাত্মিকতার মুক্তিপ্রদ শক্তি এবং উচ্চতম ব্যোম হইতে আগত প্রজ্ঞালোকের পরমতসহিষ্ণু ও বৃহদ্ভাবে অনুপ্রেরণাদায়ী ধারা অধিকতর রূপে ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় অথবা বেদের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের বিশেষত্ব এই যে এ যুগে মহান দর্শনশাস্ত্রসমূহের উদ্ভব, প্রচুর ও প্রদীপ্ত বহু চিন্তাধারা সমন্বিত ও বহুমুখী সাহিত্য ও মহাকাব্যের সৃষ্টি, শিল্প ও বিজ্ঞানের আরম্ভ, জটিল অথচ সতেজ সমাজ, এবং বহু বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, জীবন যাপন ও চিন্তাজগতের সম্বন্ধে অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সকল ক্ষেত্রে গঠনমূলক নানা বিচিত্র কর্মধারা দেখা

দিয়াছিল। গ্রীস, রোম, পারস্য ও চীন দেশের ন্যায় এখানেও এই যুগ বুদ্ধির উচ্চ ও প্রবল বিকাশ ও উচ্ছ্বাসের যুগ, যে বুদ্ধি জীবন ও মনোময় ভাবসকলের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদের হেতু ও যথাযথ কার্যপ্রণালী নির্ণয়ের এবং মানব-জীবনের উদারতা, মহত্ত্ব ও পূর্ণতা আনয়নের জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ভারতের বিশেষত্ব এই যে এই প্রবল প্রচেষ্টা কখনই আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিহারা, ধর্মবোধের সহিত সংস্পর্শশূন্য হয় নাই। ইহা ছিল জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধির জন্ম ও যৌবন কাল, এ যুগে গ্রীসের মত ভারত দর্শনকে প্রধান যন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ও জগতের সমস্যারাজি সমাধানের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল, জড়বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু তাহা কেবল সহকারী শক্তি রূপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্বোধী ও আত্মিক অনুভূতি দ্বারা অধিকতর জীবন্ত শক্তির সহিত পূর্বযুগে যে সমস্ত সত্য ও তথ্যে মানুষ পেঁীছিয়াছিল, এ সময় গভীর ও সূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রে ভারতের বুদ্ধি মনন ও বিচারশক্তি তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে সচেষ্ট হইল। সম্বোধী ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বীর্যবত্তর আবিষ্কৃত বিষয়গুলিকে স্বীকৃত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া দার্শনিক মনের বিচার ও আলোচনা আরম্ভ হইত, এবং যে দিব্য আলোক হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে তাহার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সে কখনও হারাইত না; দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি কোন না কোন রূপে উপনিষদের গভীর সত্যাবলিতে পেঁীছিত, উপনিষদই যে এই সমস্ত বিষয়ে প্রধানতম প্রামাণিক গ্রন্থ এ বোধ সর্বদাই ছিল। ইহা সর্বদাই স্বীকৃত হইত যে আধ্যাত্মিক অনুভূতিই বৃহত্তর বস্তু এবং তাহার আলোক মানুষের নিকট কতকটা অনিশ্চিত হইলেও নির্মল বুদ্ধিবিচার অপেক্ষা অধিকতর খাঁটিভাবে মানুষকে পরিচালিত করিতে পারে।

শাসন ও পরিচালনার সেই একই শক্তি ভারতের প্রাণ ও মনের অন্য সকল ক্রিয়াতেও তাহার আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। তখনকার মহাকাব্যসমূহ স্বাধীন ও প্রবল মানস ও নৈতিক ভাবনা দ্বারা প্রায় মাত্রাতিরিক্তভাবে পূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে মানসিক ও নৈতিক যুক্তিবিচার দ্বারা জীবনের অবিরাম সমালোচনার প্রাচুর্য দেখা যায়, আর সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে সত্যের আদর্শ বা মান নির্ধারণের এক আকর্ষী ঔৎসুক্য ও আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে পটভূমিকায় এই সংস্কৃতির অবিচলিত ভিত্তি রূপে অবস্থিত এক ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যক্ত বা অব্যক্ত অনুমোদন সদা বর্তমান রহিয়াছে, আর তাহা নিয়তই বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্ত সত্যের উচ্চতর আলোকধারাতে ঐহিক চিন্তা ও কার্য সর্বদা পরিপ্লুত হইয়াছে অথবা তাহা উপরে অবস্থিত থাকিয়া মানুষকে মনে করাইয়া দিয়াছে যে এ সমস্ত এক চরম লক্ষ্যে পেঁীছিবার জন্য সোপানাবলি মাত্র। সাধারণ ধারণা অন্যরূপ হইলেও,

জীবনের বিষয়সমূহকে লইয়া শিল্পচর্যা ভারতে প্রভূত পরিমাণেই হইয়াছে, তথাপি ধর্ম ও দর্শনানুগত ভারতীয় মনের ব্যাখ্যা ও অনুধ্যানের ক্ষেত্রেই ইহার শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের সাক্ষাৎ সর্বদা পাওয়া যায়, এবং ইহার সমগ্র গতি ও প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা ও অনন্তের ব্যঞ্জনার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ কাম ও অর্থগত পার্থিব জীবনকে স্থায়ী কার্যকরীভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এমনভাবে সমন্বিত ও এমন সামর্থ্যের সহিত সুগঠিত করিয়াছিল যে এ বিষয়ে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই; প্রত্যেক বিষয়ে সর্বদাই সে তাহার কার্য নীতি-ও-ধর্মের ধারণা ও বিধান দ্বারা পরিচালিত করিয়াছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক মুক্তিই যে সর্বোচ্চ সত্য পদার্থ এবং জীবনের সর্ব প্রচেষ্টার চরম উদ্দেশ্য ইহা কখনই তাহা ভুলিয়া যায় নাই। ইহার পরবর্তী কালে মানসিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে একটা প্রবলতর পার্থিব ভাবের প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, তখন পার্থিব বুদ্ধি বিশাল পরিণতি লাভ করিল, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সমৃদ্ধি ও উন্নতি দেখা দিল, ইন্দ্রিয় ভোগ সুখ, সৌন্দর্য ও রসবোধের অনুভূতির উপর প্রবল ঝোঁক আসিয়া পড়িল। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও নিজেকে প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সর্বদা প্রয়াস পাইত এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারণার বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন কখনও যাহাতে লোপ না পায় সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিত। আবার বর্ধিত এই বহির্মুখী গতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ধর্মের আন্তর অনুভবের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সময় ধর্ম ও রহস্যবিদ্যার অনেক নূতন রূপ ও সাধনা কেবল যে মানুষের অন্তরাত্মা ও বুদ্ধিকে অধিকার করিতে চাহিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের আবেগ, ইন্দ্রিয়রাজি, প্রাণ ও রসবোধময় প্রকৃতিকে পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের উপাদানে পরিণত করিয়াছে। প্রতিবারে যখন ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের জীবনের ভোগসুখ ও তাহার শক্তির উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে তখনি প্রতিক্ষেপ দেখা গিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক বৈরাগ্য ও ত্যাগ যে জীবনের উচ্চতর গতি ও পথ, এ ধারণার উপর ঝোঁক আসিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। একদিকে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতার চরম ঐশ্বর্য, অন্যদিকে বিশুদ্ধ কঠোর ও গভীর ক্রিয়া, আধ্যাত্মিকতার প্রতি চরম নিষ্ঠা, এ উভয় ধারা পাশাপাশি থাকিয়া তাহাদের প্রতিক্রিয়াজাত যুগ্ম আকর্ষণ দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্য ও সামঞ্জস্য কতকটা রক্ষা করিয়াছে যদিও তাহাতে প্রাচীন যুগের গভীর ঐক্য ও বৃহৎ সমন্বয় কিছুটা খর্ব হইয়াছে।

এ সময় ভারতীয় ধর্ম ক্রমবিকাশের এই ধারা অনুসরণ করিয়া তাহার উৎপত্তির মূল উৎস বেদ ও বেদান্তের সহিত অন্তরের যোগধারা রক্ষা করিয়াছিল, যদিও তাহার মানসজগতের বর্ণ ও বাহ্যভিত্তি, তাহার অভ্যন্তরস্থিত বিষয়সমূহের সহিত পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই

পরিবর্তনকে আনিবার জন্য বিদ্রোহ বা বিপ্লব আনিয়া পুরাতন রূপকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সংস্কার সাধন করিবার কোন ধারণা ইহাতে স্থান পায় নাই। কিন্তু সুগঠিত জীবনের অবিচ্ছিন্ন উন্নতি ও পরিণতি সাধন করিয়া স্বাভাবিক-ভাবে রূপান্তর সাধন করা এবং অব্যক্ত ভাব ও প্রেরণাকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল, অথবা পূর্বগঠিত ভাব ও উদ্দেশ্যসকলকে অধিকতর প্রধান স্থান ও কার্যকরী রূপ দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এক সময় মনে হইয়াছিল যে পুরাতন ধারা ভঙ্গ করিয়া একেবারে নূতনভাবে আরম্ভ করিবার প্রয়োজনীয়তা আসিয়াছে এবং মনে হইয়াছিল যেন তাহাই হইবে। কারণ বৈদিক ধর্মের যুগ হইতে আধ্যাত্মিকতার যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল বৌদ্ধধর্ম তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে এরূপ যেন দেখা গেল। কিন্তু সব দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বাহ্যতঃ এরূপ বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে যোগধারা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। কেননা বেদান্তে যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা আছে তাহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রবল নেতিবাচকভাবে অভিহিত করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই বৌদ্ধমতের নির্বাণের ধারণা ও আদর্শ। অমৃতত্বে পৌঁছিবার পথে 'ঋতস্য পন্থা', বেদে যাহাকে সত্য ঋত ও বিধান বলিয়া ধরা হইয়াছে কঠোর শিক্ষা দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ ও পৃথক করিয়া নিয়াই এ মতের নৈতিক পদ্ধতিতে মুক্তির জন্য অষ্টশীল বা অষ্টাঙ্গ সাধনার পথ স্থির করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মার্গের সর্বপ্রধান সুর, সর্বজনীন করুণা ও মৈত্রীর দিকে প্রবল ঝোঁক, যাহা বেদান্তের মূল ধারণা সেই আধ্যাত্মিক একত্বকে নীতির জগতে প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নহে*। এই নূতন সাধনার নির্বাণ ও কর্ম সম্বন্ধে একান্ত বিশিষ্ট মতগুলিও বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও উপনিষদ হইতে বাক্যাবলি উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করা যায়। সাংখ্যদর্শন ও তাহার সাধন-পদ্ধতির অনেক বিষয়ের সঙ্গে বৌদ্ধমতের অন্তরঙ্গ মিল আছে; সাংখ্যদর্শন বেদমূলক ইহাই স্বীকৃত তথ্য; বৌদ্ধধর্ম সহজে এ দাবি করিতে পারিত যে তাহাও বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যদি করিত তবে তাহার সে দাবির শক্তি সাংখ্য হইতে কম হইত না। বেদ হইতে উদ্ভূত নহে এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না প্রধানতঃ এই জন্যই যে বৌদ্ধধর্ম আঘাত পাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে অবশেষে তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, মনননীতি ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এ ধর্ম যেভাবে দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে বর্তমান তাহার তীক্ষ্ণ একদেশদর্শিতাই তাহার কারণ। সুস্পষ্ট কঠোর যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক তীব্র আধ্যাত্মিক প্রবেগ ও প্রচেষ্টার জন্যই ইহা একটি পৃথক ধর্মরূপে

* বুদ্ধ নিজে তাঁহার মতবাদকে নূতন বিপ্লবাত্মক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; তিনি ইহাকে প্রাচীন আর্যপন্থা বা সনাতন ধর্মের প্রকৃত রূপ বলিয়াছেন।

জাত হইয়াছে, কেননা বিচারবুদ্ধির সহিত আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের মিলনের ফলে ইহার তীক্ষ্ণ ও অনমনীয় উক্তিরাজি বিশেষতঃ ইহার একদেশদর্শী নৈতিবাদ ও নিষেধাত্মক বিধিগুলি ভারতীয় ধর্মচেতনার স্বাভাবিক নমনীয়তা ও সাবলীলতা বহুমুখী গ্রহণশীলতা এবং সমৃদ্ধভাবে সমন্বয়শীল প্রকৃতির সহিত যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার মতবাদ অতি উচ্চাঙ্গের ছিল কিন্তু সাধারণ লোকের হৃদয় অধিকার করিবার মত নমনীয়তা তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ছিল না। ভারতীয় ধর্ম বৌদ্ধধর্মের যাহা কিছু গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করিতে পারিল তাহা করিয়া প্রাচীন বেদান্তের ধারাতে ফিরিয়া গেল এবং ইহার একদেশদর্শী ভাব বর্জন ও নিজের ধর্মধারার অক্ষুন্নতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিল।

মূলতত্ত্ব নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে যে দীর্ঘকালব্যাপী এই পরিবর্তন চলিতে লাগিল তাহা নহে, কিন্তু প্রধান বৈদিক রূপসকল ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়িবার ও তাহাদের স্থানে অন্য রূপরাজি দেখা দেওয়ার জন্যই ইহা ঘটিতে লাগিল। প্রতীক, আচার ও অনুষ্ঠান ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইতে অথবা সমজাতীয় নূতন আকারে দেখা দিতে লাগিল, মূল পদ্ধতিতে যাহা আভাসরূপে ছিল এমন অনেক কিছু স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, মূল চিন্তাধারার বীজ হইতে ধারণার নবরূপ উদ্ভূত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। আর বিশেষতঃ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি আরও বিস্তৃত ও গভীর রূপে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল। বৈদিক দেবতাগণের গভীর মূল-তাৎপর্য দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে বাহ্য বিশ্বগত অর্থে কিছুদিন পর্যন্ত লোকের মনের উপর তাহাদের প্রভাব ছিল কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই বিরাট ত্রিমূর্তি দ্বারা তাহারা ছায়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং পরে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। নূতন এক দেবসমাজের আবির্ভাব হইল, প্রতীকের বাহ্য দিক দিয়া তাহারা উচ্চতর সত্য, বিস্তৃততর ধর্মানুভূতি, গভীরতর সংবেদন ও বৃহত্তর ভাব বা ধারণা প্রকাশ করিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ভগ্ন ও ক্ষুদ্রতর খণ্ড রূপে মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অগ্নিগৃহের স্থানে মন্দির স্থাপিত হইল; যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের বাহ্যাচরণের স্থানে মন্দিরে ভক্তিপূর্ণ সেবার অনুষ্ঠানাবলি দেখা দিল; বৈদিক মন্ত্রের মধ্য দিয়া দেবতাগণের অস্পষ্ট ও পরিবর্তনশীল যে সকল মানসমূর্তি লোকের মনে ফুটিয়া উঠিত তাহাদের স্থান বিষ্ণু ও শিব এই দুই মহাদেবতা ও তাঁহাদের শক্তিগণ এবং তজ্জাত অন্য দেব-দেবীগণের সুস্পষ্ট ভাবময় মূর্তি অধিকার করিল। এই সমস্ত নূতন ধারণাকে জড় মূর্তিরাজির মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে অন্তরের ভক্তির ও বাহ্য পূজার ভিত্তি করা হইল এবং তাহা যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিল। চৈত্য ও আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্যপূর্ণ যে সাধনা বৈদিক স্তোত্রের অন্তরতর তাৎপর্য ছিল তাহা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম ও যোগের ন্যূনতর

আলোকপ্রদ, কিন্তু বিশালতর সমৃদ্ধতর ও জটিলতর চৈত্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এক সময় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মযুগকে পূর্বতর কালের বিশুদ্ধতর ধর্মের নীচ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন অবনতি বলিয়া ইউরোপীয় সমালোচক ও ভারতীয় সংস্কারকগণ অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু সত্য বরং এই যে, সাধারণ জনগণমনকে উচ্চতর ও গভীরতর সত্যের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে উন্নীত করিবার অনেকখানি সফল চেষ্টা ইহাতে করা হইয়াছে। এই যে বিরুদ্ধ সমালোচনা এক সময় শুনা গিয়াছিল তাহার অনেকটা পূজা ও সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের পূর্ণ অজ্ঞানতা হইতেই জাত হইয়াছিল। সংস্কৃতির ভিত্তিকে পরীক্ষামূলক ভাবে অসম সাহসের সহিত বিস্তৃত করিতে গেলে যে সমস্ত অন্ধ বন্ধ গলি বা যে সমস্ত বিকৃতি আসিয়া পড়া প্রায়ই প্রতিরোধ করা যায় না, বিরুদ্ধ সমালোচনার অনেকটা তাঁহাদের উপর বৃথাই কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। কেননা ইহাতে সকল শ্রেণীর লোককে সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট মনকে উদারভাবে আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। একথা সত্য যে বৈদিক ঋষিদের গভীর চৈত্য জ্ঞানের অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু ইহাও সত্য যে অনেক নূতন জ্ঞান বর্ধিত হইয়াছিল, যে পথে পূর্বে কেহ চলে নাই এরূপ নানা পথ খোলা, অনন্তে পেঁাছিবার শত দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যদি আমরা এই যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মুখ্য অর্থ ও উদ্দেশ্য দেখিতে, এই সমস্ত রূপ উপায় ও প্রতীকের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি তবে দেখিতে পাইব, আদিযুগের পৌত্তলিক ধর্ম-সমূহের বলিদান ও রহস্যপূর্ণ অনুষ্ঠানসকলের স্থান যে কারণে ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম অধিকার করিয়াছিল, বহুল পরিমাণে সেই কারণে প্রাচীন বৈদিক রূপ হইতে পরিণত হইয়া এ সমস্ত রূপ দেখা দিয়াছিল। কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীনতর ধর্মের বাহ্য ভিত্তি জনসাধারণের দেহগত মনের কাছেই কথা বলিয়াছে এবং তাহাকেই তাহার আবেদনের আদি বিন্দু রূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এই নব পরিণতি সাধারণ লোকের মধ্যেও অধিকতরভাবে আন্তর মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে, তাহার অন্তরের আবেগময় প্রাণপ্রকৃতিকে অধিকার করিতে, অন্তরাত্মার জাগরণ দ্বারা সব কিছুকে ধারণ করিতে এবং এই সমস্তের মধ্য দিয়া তাহাকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোককে চিৎস্বরূপের মন্দিরের বহিঃসীমাপ্রান্তে না রাখিয়া তাহাকে মন্দিরাভ্যন্তরে ডাকিয়া আনিতে প্রয়াস পাইয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থিত বাহ্য জড় মূর্তি তাহার সুরম্য ও বিচিত্র পূজাপদ্ধতি এবং বহু প্রকারের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহার রসবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির মাধ্যমে মানুষের স্থূল বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইত; তদুপরি এ সমস্তের মধ্য দিয়া

আন্তর আবেগময় এক তাৎপর্য ও নির্দেশ দেওয়া হইত, তাহা সাধারণ লোকের হৃদয় ও কল্পনার নিকট উন্মুক্ত রাখা হইত, শুধু ধর্মপথে নির্বাচিত সাধুর গভীর দৃষ্টি অথবা দীক্ষিত সাধকের প্রবল তপস্যার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইত না। গোপন দীক্ষার পদ্ধতি তখনও ছিল কিন্তু তাহা হইত বহিঃসত্তার আবেগময় ধর্মানুভূতি হইতে গভীরতর চৈত্য ও আধ্যাত্মিক সত্য ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রবেশের কারণ বা নিমিত্ত।

এই নূতন দিক্‌পরিবর্তনে পূর্বের কোন মৌলিক তত্ত্বের মর্মকে কিছু পরিমাণেও নষ্ট বা বিকৃত করা হয় নাই, কেবল সাধনযন্ত্র পরিবেশ ও ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রের প্রভূত পরিবর্তন করা হইয়াছে। বৈদিক দেবতাগণকে তাঁহাদের পূজকের অধিকাংশ ব্যক্তিই বাহ্য জাগতিক জীবন পরিচালনার জন্য বিবিধ দিব্যশক্তি রূপে দেখিত; কিন্তু পৌরাণিক ত্রিমূর্তির মধ্যে সাধারণ লোকসকলও আন্তর ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রবল তাৎপর্য দেখিতে পাইত। ত্রিমূর্তির অধিকতর বাহ্য অর্থ—যথা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশরূপ বাহ্য কর্ম—এই সমস্ত অতলস্পর্শ গভীর তাৎপর্যের আশ্রিত প্রত্যন্ত দেশ মাত্র ছিল, আর একমাত্র এই সকলই তাহার নিগূঢ় রহস্যের মর্মস্পর্শ করিল। বহু ভাবের মধ্যে যে একেরই প্রকাশ হইতেছে এই কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক সত্য উভয় প্রণালীর মধ্যে একই ছিল। ত্রিমূর্তি একই পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের তিন রূপ বা ত্রিধা অভিব্যক্তি, সকল শক্তিই উচ্চতম দিব্য সত্তার একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু ধর্মের এই বৃহত্তম সত্য এ সময় কেবল মাত্র কয়েকজন দীক্ষিত সাধকের জন্য পৃথক করিয়া রাখা আর রহিল না, কিন্তু এ সত্যকে অধিক হইতে অধিকতর বিস্তৃত গভীর ও প্রবলরূপে সাধারণ জনগণের মনে ও অনুভূতিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইল। এমন কি বৈদিক যুগের ধারণা তথাকথিত একদেববাদ (বা henotheism)-কে দীর্ঘকাল স্থায়ী ও উন্নীত করিয়া একমাত্র সার্বভৌম পরম দেবতা রূপে বিষ্ণু বা শিবের বৃহত্তর ও সরলতর এক পূজায় পর্যবসিত করা হইয়াছিল এবং অন্য সকল দেবতাকে তাহার সজীব অভিব্যক্তি ও শক্তি রূপে অনুভব করা হইত। মানুষের মধ্যে যে ভগবত্তা রহিয়াছে ইহা অতি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইয়াছিল, যাহা অবতারের পূজা প্রবর্তিত করিয়াছে মানুষের মধ্যে ভগবানের সেই সাময়িক অভিব্যক্তির কথায় শুধু নয়, প্রচার করা হইয়াছিল যে প্রতি জীবের হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন এবং মানুষ তাহা আবিষ্কার করিতে পারে। এই একই সাধারণ ভিত্তিতে যোগের বিভিন্ন প্রণালী গঠিত ও পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল প্রণালীই সাধককে বহু প্রকার চৈত্য-দৈহিক (psycho-physical) আন্তর প্রাণময়, আন্তর মনোময় এবং মনোভাবিত আধ্যাত্মিক (psycho-spiritual) নানা সাধনার মধ্য দিয়া যাহা ভারতের সকল সাধনার

লক্ষ্য সেই এক বৃহত্তর চেতনার দিকে, অন্বয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত অল্পাধিকতর পূর্ণ মিলনের দিকে অথবা পরব্রহ্মের মধ্যে ব্যষ্টিসত্তাকে ডুবাইয়া দেওয়ার দিকে পরিচালিত করিয়াছে বা পরিচালনা করিবার আশা করিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের মিলিত পদ্ধতি ছিল উদার নিশ্চিত ও বহুমুখী সাধনার এক ধারা; মানবজাতির জন্য আন্তর ধর্মের অনুভূতির সাধারণ ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও বিশালতায় অন্য কোন ধর্মই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই, আর অন্তরের এই অনুভূতি হইতে মানুষ জ্ঞান, কর্ম বা প্রেমের অথবা তাহার প্রকৃতির অন্য কোন মৌলিক শক্তির মধ্য দিয়া উন্নীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত কোন পরম অনুভূতি লাভ করিতে বা কোন উচ্চতম চরম স্থিতিতে পৌঁছিতে পারিত।

বৈদিক যুগের পর হইতে বৌদ্ধযুগের অবনতি পর্যন্ত সময়ে এই যে মহৎ প্রচেষ্টা ও সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের ক্রম-পরিণতির ক্ষেত্রে তাহাই যে তাহার চরম সম্ভাবনা ছিল তাহা নহে, দেহগত মন-যুক্ত মানুষকে এইভাবে গঠিত ও পরিণত করা বৈদিক শিক্ষাই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এইভাবে ধর্মের ভিত্তি যে আন্তর মন, আন্তর প্রাণ ও চৈত্যপ্রকৃতিতে উন্নীত করা, চৈত্যসত্তাকে এই যে জাগাইয়া তোলা ও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলে মানুষকে পরিণতির পথে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীবনের প্রধান শক্তি রূপে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক গতিবৃত্তিকে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব হইয়াছিল। প্রথম ধাপ বহিরঙ্গ প্রাকৃত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি সম্ভব করিয়া তুলিবে, দ্বিতীয় ধাপ মানুষের বাহ্য জীবনকে গ্রহণ করিবে এবং তাহাকে গভীরতর মন ও অন্তরপুরুষের জীবনে পরিণত এবং তাহাকে তাহার অন্তরস্থ আত্মা বা ভগবানের আরও অব্যবহিত সংস্পর্শে আনয়ন করিবে; তৃতীয় ধাপ তাহার সমগ্র বাহ্য ভৌতিক মানসিক ও চৈত্য জীবনকে এক কথায় সমগ্র মানবীয় সত্তাকে গ্রহণ করিয়া অন্ততঃপক্ষে সার্বভৌম অধ্যাত্ম জীবনের প্রারম্ভে পৌঁছাইয়া দিবে, ইহাই ছিল কাম্য। ভারতের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতিক্ষেত্রে এই চেষ্টাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার অতীত শেষ যুগের দর্শনসমূহের, সাধু সন্ত ও ভক্তগণ দ্বারা প্রবর্তিত অধ্যাত্ম সাধনার, এবং নানা প্রকার যোগপন্থা ক্রমশঃ বেশী করিয়া গ্রহণের ইহাই ছিল অন্তরগত তাৎপর্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই চেষ্টার সময় ভারতীয় সংস্কৃতি অবনতির পথে চলিতেছিল, তাহার সাধারণ জ্ঞান ও শক্তি ক্রমশ অধিক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া পড়িতেছিল; এইরূপ পরিবেশের মধ্যে পড়াতে সে চেষ্টাও তাহার স্বাভাবিক ফল প্রসব করিতে পারে নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য অনেক কিছু করিয়াছে। যদি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং তাহার আধ্যাত্মিক

ভিত্তি ও বিশিষ্ট প্রকৃতি বজায় রাখিতে হয়, তবে তাহাকে এইভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, শুধু কোনক্রমে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত অথবা কেবলমাত্র পৌরাণিক পদ্ধতিকে তাহার দীর্ঘ জীবন দান করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না; বহুসহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক দ্রষ্টাগণ যাহাকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বেদান্তের ঋষিগণ তাঁহাদের জ্যোতিরুদ্ভাসিত দিব্য দৃষ্টির নিকট উপস্থিত যে পরম বাণীর কথা সুস্পষ্ট ও অমর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, জীবনে তাহারই পূর্ণতা সাধন করিবার দিকেই রহিয়াছে ভারতের উন্নতির পথ, ইহা বুঝিয়া তাহাকে সেই দিকেই ফিরিতে হইবে। এমন কি মানব-প্রকৃতির চৈত্য আবেগময় অংশও ধর্মবোধের মধ্যে প্রবেশের অন্তরতম দ্বার নহে; তাহার আন্তর মনও তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চতম সাক্ষী নহে। মানুষের এই প্রাথমিক সত্তার পশ্চাতে, হৃদয়ের গভীরতম গোপন প্রদেশে 'হৃদয়ে গুহায়াম্' যেখানে প্রাচীন ঋষিগণ অন্তর্যামী ভগবানের দিব্য-মন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন সেইখানে মানুষের এক অন্তরতম সত্তা আছে, তাহার এই দ্বিতীয় সত্তারও ঊর্ধ্বে জ্যোতিপরিপ্লাবিত এক উচ্চতম মন আছে যে মন চিৎপুরুষের সত্যের দিকে সাক্ষাৎভাবে খোলা, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি আজ পর্যন্ত যে মনে ক্বচিৎ কখনও সাময়িকভাবে মাত্র প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। ধর্মের পরিণতি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি যখন এই সমস্ত গোপন শক্তির নিকট নিজদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারিবে এবং মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত করিয়া, তাহাদিগকে দিব্য জীবনে ও দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত করিবার জন্য সেই শক্তিরাজির আশ্রয় গ্রহণ করিবে কেবল তখন তাহারা নিজেদের প্রকৃত পন্থা খুঁজিয়া পাইবে। সেই শেষযুগে ভারতে ধর্মান্দোলনের যে সমস্ত বিপুল ধারা দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলি অতি প্রদীপ্ত ও সুস্পষ্ট তাহাদের পশ্চাতে যে শক্তি ছিল তাহা এইদিকের চেষ্টা ও সাধনার শক্তি। বৈষ্ণবধর্ম তন্ত্র ও যোগের পরম শক্তিশালী রূপ-সকলের ইহাই গোপন রহস্য। আমাদের অর্ধপাশব মানবপ্রকৃতি হইতে আধ্যাত্মিক চেতনার সতেজ পবিত্রতার মধ্যে উত্থিত হইবার সাধনার পর তাহার পরিপূরক রূপে মানুষের সকল অঙ্গে সকল বৃত্তিতে চিৎপুরুষের শক্তি ও আলোকের অবতরণ ও তাহাদের সাহায্যে মানুষের প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কিন্তু এ সাধনা নিজের পূর্ণ পথ খুঁজিয়া পায় নাই অথবা পূর্ণ ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, কেননা এই সময়ে ভারতের জীবনীশক্তিতে অবনতি দেখা দিয়াছিল এবং সাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জ্ঞান ও শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। তথাপি এখানেই ভারতের পুনরুজ্জীবনের এবং নবরূপ লাভের নিয়তি-নির্দিষ্ট শক্তি রহিয়াছে; ইহাই তাহার ভবিষ্যতের সক্রিয় ও সবল তাৎপর্য।

বাহ্যতম হইতে অন্তরতম সকল ক্ষেত্রে আত্মার অনুভূতির জন্য সহস্র পন্থায় অতি বিশাল ও অভূতপূর্ব সাধনা ও পরীক্ষা এখানে চলিয়াছে, তাহাদের শেষ দৃষ্টি ছিল পার্থিব জীবনকে উদারতম ও উচ্চতম ভাবে আধ্যাত্মিক করিয়া তোলা, যাহা ভারতের অতীত জীবনের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য; অবশেষে ইহাই ছিল তাহার জীবনের ব্রত, এইজন্যই সে জন্মিয়াছিল, ইহাই ভারতের জীবনের তাৎপর্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

ভারতীয় অথবা যে কোন সভ্যতাকে সঠিকভাবে বুঝিতে গেলে তাহার কেন্দ্রগত, সজীব ও পরিচালক ভাবধারাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, দৈবক্রমে আগত ব্যাপার অথবা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহাদের দ্বারা চালিত হইলে চলিবে না। আমাদের সংস্কৃতির সমালোচকগণ এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় সাবধানতা লইতে নিয়তই অস্বীকার করেন। বিচারাধীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার হৃদয়স্থিত নিত্য বর্তমান কোন্ কোন্ তত্ত্ব তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া তাহার কর্মে স্থায়ী প্রেরণা ও প্রবৃত্তি দিতেছে, তাহাই আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে; নতুবা এই সমস্ত সমালোচকদের ন্যায় আমরাও হয়ত দেখিতে পাইব যে গোলকধাঁধায় পড়িয়া সত্যনির্ণয়ের পথ খুঁজিয়া মরিতেছি, ভুল বা অর্ধসত্যের বাধায় ঠক্কর খাইয়া ফিরিতেছি, বস্তুর প্রকৃত সত্য একেবারেই দেখিতে পাইতেছি না। ভারতীয় ধর্মবিষয়ে সংস্কৃতির মূল তাৎপর্য যখন আমরা অনুসন্ধান করিতেছি তখন যাহাতে এই ভুল আমরা না করি, তাহা দেখা স্পষ্টতই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন জীবনের উপর ধর্মের সক্রিয় রূপায়ণের ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রভাব ও ফল বুঝিতে চাই তখন এই একই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি আত্মাকেই আমাদের সত্তার সত্য, এবং জীবনকে অন্তরাত্মার উন্নতি ও পরিণতির ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করে। যিনি শাশ্বত অনন্ত পরমতত্ত্ব সর্বস্বরূপ, এ সংস্কৃতি তাঁহাকেই দেখে, সকলের গোপন উচ্চতম আত্মা বলিয়া জানে, ইঁহাকেই সে ঈশ্বর বা নিত্য সত্যবস্তু বলে, আর মানুষকে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের এই সত্তার এক আত্মা বা শক্তি বলিয়া অনুভব করে। মানুষের সান্ত চেতনা প্রগতির পথে এই পরমাত্মা, এই ঈশ্বর, বিশ্বময় অনন্ত শাশ্বত এই বস্তুর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইবে, অন্য এক কথায় তাহার সাধারণ অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত সত্তাকে জ্যোতির্ময় দিব্য চেতনায় পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে, ভারতীয় ভাবনায়

ইহাই জীবনের অর্থ এবং মানুষের অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য। ইহা উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি ইউরোপীয় চিন্তাধারার একটি প্রধান অংশ প্রকৃতি ও সত্তার সেই গভীরতর আধ্যাত্মিক ধারণার দিকে ক্রমবর্ধমান উদ্যমের সহিত অধিকতররূপে ফিরিতেছে, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উন্নতি ও পরিণতির প্রবলতম ফলপ্রসূ সম্ভাবনা যাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে ফিরিবার ফলে সে কি 'বর্বরতার' দিকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছে অথবা তাহার ক্রমবর্ধমান ও পরিপক্ক সংস্কৃতির উন্নতি ও পরিণতির ফলে সহজভাবে সে এক উচ্চ অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ-প্রশ্ন ইউরোপেরই বিচার্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য, তাহার ধর্মের পরিপোষক শক্তি, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ধারণার সম্মুখে সর্বদাই ছিল এই আদর্শ-অনুপ্রেরণা অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে, ছিল ঈশ্বর আত্মা বা চিৎপুরুষের এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, বিশ্বময় এক চেতনাবোধ ও অনুভূতির বিশ্বগত ধারণা ও সংকল্পের, প্রেম ও আনন্দের—যাহার মধ্যে আমরা আমাদের সান্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং দুঃখ-যন্ত্রণাপ্রপীড়িত অহং-এর মুক্তি দিতে পারি—সহিত এই নৈকট্যবোধ, বিশ্বাতীত শাশ্বত অনন্তের দিকে এই প্রবল ঝোঁক ও প্রগতি এবং সেই বৃহত্তর সৎস্বরূপের আত্মা ও শক্তির মধ্যে এইভাবে মানুষের উন্নয়ন ও রূপায়ণ।

আমি আভাস দিয়াছি যে তাহার বাহ্য পরিণতিতে এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ছন্দোময় গতিধারা পূর্ণরূপে দুইটি বাহ্য ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তৃতীয় ধাপের প্রাথমিক অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে, এই ধাপই তাহার ভবিষ্যৎ নিয়তি। ইহার প্রথম ধাপ ছিল প্রাচীন বৈদিক ধারা, যেখানে ধর্ম এমন এক বহিরঙ্গ সাধনার উপর দাঁড়াইয়াছিল যাহাতে দেহগত মনযুক্ত মানুষ বিশ্বে অবস্থিত ভগবানের দিকে সহজে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু তখন দীক্ষিত সাধকগণ ধর্মের নানারূপ বাহ্য পূজা ও ধারণার অন্তরালে মহত্তর আধ্যাত্মিক সত্যের যজ্ঞাগ্নি সযত্নে রক্ষা করিতেন। দ্বিতীয় ধাপটি পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ, এ যুগে ধর্ম বহিরঙ্গ সাধনায়ও মানুষের আন্তরপ্রাণ বিশ্বে অবস্থিত ভগবানের দিকে গভীরতরভাবে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তখন মহত্তর দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকের পক্ষে অনেক অধিক অন্তরঙ্গ সত্যে পৌঁছিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং উচ্চতম ও গভীরতম অভিজ্ঞতার অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের মহত্তম প্রেরণা লাভ করিয়াছে। ভারত তৃতীয় আর একটি ধাপের জন্য বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইতেছে, ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ ধাপ। ইহারই অনুপ্রেরণাদায়ী আদর্শ ও ধারণা নানা প্রকার আধ্যাত্মিক পদ্ধতি, শক্তিশালী নূতন সাধনপন্থা ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কখনও সীমাবদ্ধভাবে কখনও বা বিস্তৃত রূপে কখনও বা আবৃত ও শান্তভাবে কখনও বা সজীব ও বিস্ময়কর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু এ ধাপ

এখনও সফল হইয়া উঠে নাই অথবা মানবজীবনের উপর তাহার নবীন ধারা আজিও আরোপ করিতে পারে নাই। পরিবেশ প্রতিকূল ছিল, এ অবস্থার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রধানতম গতি-বৃত্তির মধ্যে দুইটি আবেগ রহিয়াছে। ইহার সংকল্প, সকল মানব ও মানব-সংঘকে প্রত্যেকের শক্তি অনুসারে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকের মধ্যে বাস করিতে, এবং পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশিত কোন শক্তি বা পরমপাবন কোন মহাসত্যের উপর তাহাদের সমগ্র জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবাহন করা। কিন্তু কখনও কখনও সে এক উচ্চতম দিব্য দৃষ্টিও লাভ করিয়াছে, তখন দেখিয়াছে যে মানুষের পক্ষে আরোহণের পথে শাশ্বত সত্তায় পেঁছা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, কিন্তু দিব্য চেতনার অবতরণ এবং মানব প্রকৃতির দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরও সম্ভব। মানুষের মধ্যে গোপনে যে ভগবত্তা রহিয়াছে এই অনুভূতিই তাহার সর্বপ্রধান শক্তি। ইউরোপের ধর্মসংস্কারক অথবা তাঁহাদের অনুসরণকারীগণ তাঁহাদের ধারণায় বা ভাষায় এই বিশেষ গতিমুখ যথার্থভাবে বুঝিতে পারে না। যাহারা বিচারবুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে কেবল চমৎকার ভাষা প্রয়োগে আগ্রহশীল সেই রুচিবাগীশগণ যাহা বলিয়া কল্পনা করেন ইহা তাহা নহে, তাঁহাদের সেই অতি ক্ষিপ্র অবিবেচক কল্পনার জন্যই তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই উচ্চতম দৃষ্টি এমন এক সত্যকে নির্দেশ করে যাহা মানুষের মনকে অতিক্রম করিয়া যায়, এবং আদৌ যদি মানুষ সে সত্যকে তাহার অঙ্গসকলের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে তাহার মানবজীবন এক দিব্য অতিজীবনে (superlife) রূপান্তরিত হইয়া যাইত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই তৃতীয় ধাপের ভাবধারা প্রবলভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতেছে ততদিন পর্যন্ত, ভারতীয় সভ্যতা তাহার বিধিনির্দিষ্ট জীবনব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছে, জগতকে তাহার শেষ বাণী দিয়াছে, মানুষের জীবন ও পরমাত্মার মধ্যে সংযোগ-সাধন রূপ যে গুরুভার তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিয়া তাহার জীবনের পূর্ণতাসাধন এবং সিদ্ধির রাজমুকুট পরিয়াছে, একথা বলা চলে না।

অতীতে ভারতীয় ধর্ম জীবনকে কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহার বিচার করিতে গেলে প্রগতির কোন্ ধাপে সে অবস্থিত ছিল তাহা জানা চাই; আবার প্রত্যেক যুগে তাহার যে গতিধারা ছিল তাহারই ভিত্তিতে তাহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ ধর্ম বিপুল ব্যবহারিক জ্ঞান এবং নিপুণ আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক দুইটি ধারণা সুসঙ্গতির সহিত সর্বদা দৃঢ়ভাবে ধারণ ও রক্ষণ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা দেখিয়াছিল যে, সকল ব্যক্তি বা সংঘ সহজ ও সাক্ষাৎভাবে একেবারে সহসা চিৎপুরুষের নিকট পেঁছিতে পারে না। সাধারণতঃ অথবা অন্ততঃ প্রথমে সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা সাধনা ও প্রগতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ক্রমবর্ধনশীলভাবে স্বাভাবিক জীবনধারার উন্নতিবিধান

করিতে এবং তাহার কর্মের প্রণোদনাসকলকে ক্রমশঃ উচ্চতরভাবে পরিণত করিতে হইবে, যাহাতে বুদ্ধি নীতি ও অন্তরাত্মার উচ্চতর শক্তিসকল ক্রমশঃ প্রাকৃত জীবন অধিকতর রূপে অধিকার করিয়া তাহাকে প্রস্তুত করিতে এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিধানের দিকে লইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের ধর্মগত মন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাইয়াছিল যে যদি তাহার বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হয়, যদি তাহার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যম্ভাবীরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদা ও প্রতি মুহূর্তের জন্য তাহার আধ্যাত্মিক প্রবর্তনা ও প্রয়োজনের কোন এক প্রকার সনির্বন্ধতা থাকা চাই। আর জনসাধারণের পক্ষে ইহার অর্থ এই যে সর্বদাই কোন না কোন প্রকার ধর্ম-প্রভাব তাহার উপর থাকা চাই। যাহাতে প্রথম হইতেই মানুষের প্রাকৃত জীবনের উপর সার্বভৌম আন্তর সত্যের কোন শক্তি, আমাদের সত্তার খাঁটি সত্যের আলোকের কোন রশ্মি, অথবা অন্ততঃপক্ষে সূক্ষ্ম হইলেও বোধগম্যভাবে তাহার কোন প্রভাব আসিয়া পড়িতে পারে তজ্জন্যই সেই ব্যাপক সনির্বন্ধতার প্রয়োজন রহিয়াছে। কোন এক উপায়ে মানবজীবনকে স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই প্রণোদিত করিতে হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত তাহার নিজের গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যেই তাহাকে পোষণ করিতে ও শিক্ষা দিতে এবং গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি যে দুইটি পরস্পরের উদ্দীপক ও পরিপোষক ভাবের সংযোগ ও সমন্বয় করিয়া তাহাদের মিলিত ধারাযোগে চলিতে সর্বদা চেষ্টা করিয়াছে এই দুইটি ধারণাই তাহাদের মূলতত্ত্ব। প্রথমতঃ যতদিন মানুষ অধ্যাত্ম ভূমিতে পেঁৗছিবার উপযুক্ত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত, এ সংস্কৃতি সমাজের মধ্যস্থিত ব্যষ্টি জীবনকে তাহার স্বাভাবিক স্তরসমূহের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত ও উচ্চতর ক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে। আর দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রতি স্তরে তাহার মনের সম্মুখে সর্বদা উচ্চতম উদ্দেশ্য ও আদর্শ রক্ষা করিয়াছে এবং মানুষের অন্তর ও বাহ্য জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও ক্রিয়ার উপর তাহার প্রভাব ফেলিতে সচেষ্ট রহিয়াছে।

তাহার এই প্রথম উদ্দেশ্যের পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের উচ্চতম সংস্কৃতিসমূহের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও ভাবে কার্যে ও উদ্দেশ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য সে রক্ষা করিয়াছে। তিনটি বৃত্তের প্রত্যেকটিতে চারি বস্তুর সমন্বয় করিয়া ইহার সংস্কৃতির কাঠামো গঠিত হইয়াছে, সে তিনটি চতুর্বর্গ, চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম। প্রথম বৃত্তে প্রাণের কামনা ও ভোগসুখ, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত স্বার্থ, নৈতিক অধিকার ও বিধি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি, কাম অর্থ ধর্ম ও মোক্ষ জীবনের এই চারি উদ্দেশ্যের বা চতুর্বর্গের সমন্বয় ও ক্রমবিন্যাস করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৃত্ত চতুর্বর্ণের,

যাহাতে ছিল বুদ্ধিপূর্বক সাবধানতার সহিত শ্রেণীবন্ধ ও সুবিন্যস্ত চারি-বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের) বিধান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক বর্ণের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি, আর ছিল তাহার মধ্যে নিহিত প্রত্যেক বর্ণের সংস্কৃতি, নীতি বা ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার গভীরতর তাৎপর্য। তৃতীয় বৃত্তে ছিল জীবনের ক্ষেত্রে পর পর সজ্জিত চারিটি স্তর বা চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য বা গৃহীর জীবন, বানপ্রস্থ বা বনবাসীর বিবিক্ত জীবন এবং যতি বা সন্ন্যাস অথবা সমাজবন্ধনের অতীত জীবন; এ চারি আশ্রম জীবনে একের পর অন্য আসিত, জীবনের সকল প্রকার আদর্শ ও নমুনা লইয়া গঠিত এই চতুরাশ্রম ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং বস্তুতঃ অনন্যসাধারণ ব্যবস্থা। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে তাহার শৌর্যময় যুগে এই কাঠামো, জীবন-শিক্ষার এই বৃহৎ ও মহৎ ধারাগুলি, তাহাদের পবিত্রতা, তপশ্চর্যা ও সুব্যবস্থার এই সমৃদ্ধ ও স্বাভাবিক সমন্বয়, তাহাদের সুন্দর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; পরে তাহারা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়াছে অথবা তাহাদের পূর্ণতা ও সুশৃঙ্খলা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও যতদিন তাহার সংস্কৃতি সতেজ ছিল ততদিন পর্যন্ত তাহার সেই ঐতিহ্য সেই ভাব ও ধারণা এবং তৎসঙ্গে তাহার শক্তির অনেকটা অংশ এবং তাহার ধারাগুলির বহু আকার বরাবরই বজায় ছিল। নিজের খাঁটি রূপ ও ভাব হইতে যতই দূরে সরিয়া যাউক না কেন, যতই অঙ্গহানি হউক না কেন, যতই জটিল ভাবে অবনত হইয়া পড়ুক না কেন, তবুও তাহার প্রেরণা ও শক্তির কতকটা অস্তিত্ব সর্বদাই বর্তমান ছিল। কেবল অবনতির যুগে দেখিতে পাই, ধীরে ধীরে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তখন অধঃপতিত বিপুল বিশৃঙ্খল গতানুগতিক যে লোক-ব্যবহার প্রচলিত হইতেছিল, তাহা তখনও নিজেকে প্রাচীন ও মহান আর্য প্রণালী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাচীন সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের কিছু স্মৃতিচিহ্ন, আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের অনেকটা উদ্বর্তন, পুরাতন উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষার কতকটা অবশেষ থাকিলেও, তাহা তাহার মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা বিশৃঙ্খল ধ্বংসাবশেষের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই অবনতির মধ্যেও তাহার যে মূল ধর্ম বা গুণ অবশিষ্ট আছে তাহাও তাহার প্রাচীন সৌন্দর্য তাহার আকর্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের শক্তির পরিচয় দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু অন্যদিকে আরও সাক্ষাৎ ভাবে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াধারার দিকে এই সংস্কৃতির যে গতির মুখ ছিল তাহার মূল্য ছিল আরও অধিক। কেননা ইহাই হইল সেই বস্তু যাহা সর্বদা বাঁচিয়া আছে এবং ভারতের মন ও প্রাণকে স্থায়ী ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ইহা সংস্কৃতির সকল যুগের মধ্যে বাহ্য রূপের সর্বপ্রকার পরিবর্তনের পশ্চাতে এক অবস্থায় থাকিয়া নিজের কার্যকরী

শক্তিকে নবায়িত করিয়া নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার এই দ্বিতীয় ধারা সমস্ত জীবনকে ধর্মের ছাঁচে ঢালাই ও গঠিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; ইহা এমন বহু প্রকার উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল যাহারা পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা দিয়া সুযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরিণামের বিপুলতা দ্বারা সমগ্র সত্তার উপর ভগবদভিমুখীনতার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছিল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবন এমন এক ধর্মগত ভাব ও ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যাহা ব্যষ্টিব্যক্তি ও সমাজ এ উভয়কে নিজ প্রভাবে সঞ্জীবিত রাখিত। শিক্ষা ও তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতিই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে সকলের উপর এই ভাবের ছাপ লাগাইয়া দিত; ইহা তাহার প্রাণের সমগ্র পরিমণ্ডল, সামাজিক সকল পরিবেশ পূর্ণরূপে পরিপ্লুত করিয়া থাকিত; সংস্কৃতির সমগ্র আদি রূপ ও পবিত্র প্রকৃতির মধ্য দিয়া ইহা নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিত। আধ্যাত্মিক জীবনের ধারণা সর্বদা নিবিড় ভাবে অনুভূত হইত, আদর্শ রূপে তাহা যে সকল আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা স্বীকৃত হইত; বিশ্ব যে দিব্য শক্তিরাজির অভিব্যক্তি এবং ইহার সমস্ত ক্রিয়া ও গতি যে ভগবানের অবস্থিতি বা উপস্থিতিতে পূর্ণ এ ধারণার নিয়ত-চাপ তাহার সমাজ জীবনের সর্বত্র পড়িত। মানুষকে শুধু বিচারশক্তিসম্পন্ন পশু বলিয়া বিবেচনা করা হইত না, পরন্তু মনে করা হইত সে আত্মা, ভগবান ও বিশ্বগত দিব্যশক্তিসকলের সহিত তাহার এক নিত্য সম্বন্ধ আছে। অন্তরাত্মার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ছিল জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া চক্রাকারে কিম্বা ঊর্ধ্বমুখে এক প্রগতি; জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তিতে মানবজীবন সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, আর সে জীবন চিৎস্বরূপের সত্তাতে গিয়া শেষ হইবে আর সেই জীবনের প্রত্যেক অবস্থা তাহার সেই তীর্থাভিযানের পথে অগ্রসর হইবার এক একটি ধাপ। মানুষের প্রত্যেক কার্যের মূল্য আছে, ভবিষ্যৎ জীবনাবলিতে অথবা ভৌতিক অস্তিত্বের পরপারস্থিত জগৎসমূহে সে-কর্ম ফলপ্রসূ হইবে।

কিন্তু এই সমস্ত ধারণা, তাহাদের দেওয়া শিক্ষা, তাহাদের সৃষ্ট এই আবহাওয়া, বা সংস্কৃতির উপর দেওয়া এই ছাপ সাধারণ ভাবে জীবনের উপর যে চাপ দেয় তাহা লইয়া ভারতীয় ধর্ম সন্তুষ্ট থাকে নাই। প্রতি মুহূর্তে প্রতি ঘটনায় ধর্মের প্রভাব যাহাতে মনের উপর গভীর ভাবে কার্যকরী হয় তজ্জন্য সে নিয়ত চেষ্টা করিয়াছে। আর ব্যবহারিক জীবনে সজীব ভাবে অধিকতর সুষ্ঠুরূপে এই চেষ্টা করিবার জন্য লোকের সাধারণ সামর্থ্যে যে পার্থক্য, বৈচিত্র্য ও ইতরবিশেষ আছে সেই অধিকারভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল; কাহারও নিকট যেমন তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু দাবি করা হইত না তদ্রূপ সে সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার চাওয়া হইত। এমন ভাবে ধর্মের বিধান ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা হইত, যাহাতে প্রত্যেক লোকই উচ্চ বা নীচ, জ্ঞানী

বা মূর্খ, সাধারণ বা অসাধারণ যাহাই হউক না কেন, তাহার নিজ প্রকৃতির ও পরিণতিপথের স্তরের উপযোগী ভাবে ধর্মের আহ্বান শুনিতে, তাহার চাপ ও প্রভাব অনুভব করিতে পারিত। যে সমস্ত ধর্ম একটিমাত্র মতবাদ সকল লোকের উপর চাপাইতে চায়, মানুষের প্রকৃতির সম্ভাবনাগুলি না দেখিয়া অপরিবর্তনীয় একই বিধানে সকলকে বাঁধিতে চেষ্টা করে তাহারা যে ভুল করে, সে ভুল হইতে এ ধর্ম মুক্ত রহিয়াছে, বরং ইহা সকল মানুষকেই ধীরে ধীরে প্রগতির পথে চলিতে এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অনুভূতির মধ্যে নিয়ত গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া এ পদ্ধতিতে মানুষের প্রকৃতির প্রত্যেক অংশ, তাহার কার্যকরী শক্তির প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যকে স্থান দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক ধারণা এবং ধর্মের প্রভাব দ্বারা পরিবৃত করা হইত, প্রত্যেকের জন্য এমন সকল সোপানের ব্যবস্থা ছিল যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তাহার নিজের সম্ভাবনা ও সার্থকতার দিকে উন্নীত হইয়া উঠিতে পারিত। মানবপ্রকৃতির পরিণতিশীল প্রত্যেক বৃত্তি বা শক্তির শীর্ষস্থানে জীবনের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অর্থ সন্নিবেশিত করা হইত। বুদ্ধিকে পরমজ্ঞানে পৌঁছিতে আবাহন করা হইত; সক্রিয় সৃষ্টিশীল সবল শক্তিকে এক অনন্ত বিশ্বগত ইচ্ছার দিকে নিজেকে খোলা রাখিতে এবং তাহার সহিত যুক্ত হইতে বলা হইত, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়কে এক দিব্য প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্যের সংস্পর্শে আনিবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু এই উচ্চতম অর্থ অভিব্যঞ্জক-রূপে সর্বত্র অথবা প্রতীক রূপে জীবনের সমগ্র প্রণালীর পশ্চাতে রাখা হইত, এমন কি সবিস্তারেই রাখা হইত যাহাতে তাহার ছাপ অল্পবিস্তর সমগ্র জীবনের উপর পড়িতে এবং ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে এবং অবশেষে তাহা সমগ্র ভাবে জীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে। ইহাই ছিল লক্ষ্য, এবং মানবপ্রকৃতির অপূর্ণতা ও এ-সাধনার দুরূহতার কথা বিবেচনা করিলে আমরা বলিতে পারি যে এ প্রচেষ্টা অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। বলা হইয়াছে যে ভারতীয়ের পক্ষে তাহার সমস্ত জীবনই একটা ধর্ম, এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। ভারতীয় জীবনের আদর্শের দিক দিয়া কোন কোন অর্থে একথা সত্য এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যতঃও ইহা এক বিশেষ অর্থে অনেকটা সত্য। কারণ তাহার আন্তর বা বাহ্য জীবনে ভারতবাসীর এমন কোন পদক্ষেপ সম্ভব ছিল না যেখানে তাহাকে আধ্যাত্মিক জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত না। সর্বত্র সে এমন কিছুর নৈকট্য অনুভব করিত অথবা অন্ততঃপক্ষে চিহ্ন দেখিতে পাইত, যাহা তাহার স্বাভাবিক জীবন, তাহার কালের সাধারণ মুহূর্ত এবং তাহার ব্যক্তিগত অহংকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, যাহা তাহার দেহপ্রাণময় প্রকৃতির স্বার্থ ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। এই রূপ দৃঢ় প্রচেষ্টা ভারতের চিন্তা কার্য ও অনুভূতিকে এমন ভাবে শক্তিশালী

করিয়াছিল, তাহাদের ধারার গতিমুখ এমন ভাবে ফিরাইয়া দিয়াছিল, আধ্যাত্মিক আবেদন ও অভীপ্সার এমন এক সূক্ষ্ম সংবেদন তাহার প্রকৃতিতে যোজনা করিয়াছিল, এমন বৃহৎ ভাবে তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল যে আজিও এ সমস্ত ভারতীয় প্রকৃতির পার্থক্যসূচক বিশেষ চিহ্ন হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা যখন ভারতবাসীর বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতার কথা বলি তখন এই তৎপরতা ও উন্মুখতা এবং এই সংবেদন-শীলতাই আমাদিগকে সমর্থন করে।

ভারতীয় ধর্মের বিশিষ্ট প্রকৃতি বুঝিতে গেলে অধিকার ভেদের এই প্রাচীন ধারণা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। অন্য অধিকাংশ ধর্মপ্রণালীতে দেখিতে পাই যে তাহারা, মানুষের জীবনতন্ত্রীকে আধ্যাত্মিকতার এমন এক উচ্চ সুরে বাঁধিতে তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, এমন এক দুরূহ অনমনীয় নৈতিক আদর্শ তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে যে, অর্ধপরিণত নানা দোষযুক্ত অপূর্ণ সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে তাহা গ্রহণ ও পালন করা অসম্ভব। বলা হয় যে সকলের জীবনতন্ত্রী সেই সুরে বাঁধিতেই, সকলকে সেই আদর্শ নৈতিক বিধান মানিয়া চলিতেই হইবে; কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে অতি অল্প লোকেই ইহাতে যথাযথ ভাবে সাড়া দিতে পারে। তাই মানব জীবনের ছবিতে আমরা দুই প্রান্তবর্তী ভাবের মধ্যে তীব্র বিভেদ দর্শন করি; বিষয়-বিরক্ত সাধু ও বিষয়াসক্ত সাংসারিক জীব, ধার্মিক ও অধার্মিক, সজ্জন ও দুর্জন, ভক্তিমান ও ভক্তিহীন, পরিগৃহীত আত্মা ও পরিবর্জিত আত্মা, সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্র, পরিত্রাণপ্রাপ্ত ও অনন্ত নরক দণ্ডে দণ্ডিত, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী —মানুষকে সর্বদা এই রূপ দুই ভাগে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থায় গোলযোগ অথবা মিশ্রণ থাকে, দুই দিকে পরস্পর টানাটানি চলে, একটা অনিশ্চিত সাম্য দেখা যায়। এই স্থূল ও সরাসরি শ্রেণীবিভাগই খৃষ্টধর্ম-পদ্ধতির অনন্ত স্বর্গ ও চিরনরকের ভিত্তিভূমি; বড়জোর দেখিতে পাই যে ধর্মের ক্যাথলিক শাখা করুণা করিয়া সেই পরম সুখকর স্বর্গ এবং এই অশেষ ভীতিজনক নরকের মধ্যে দুঃখযন্ত্রণাময় পাপ সংশোধনের স্থান এক প্রেতলোকে (purgatory) অনিশ্চিত সম্ভাবনার সূত্রে মানবজাতির নয় দশমাংশ হইতেও অধিক সংখ্যক লোককে ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম তাহার শিখরদেশে আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর সুরে জীবনতন্ত্রী বাঁধিতে আহ্বান জানাইয়াছে, এবং আরো বেশী পূর্ণ ও আরও বেশী চরম রূপে আচরণের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার কর্মে এরূপ সরাসরি ভাবে ও বিচারহীন অজ্ঞতার সহিত অগ্রসর হয় নাই। ভারতীয় মনের কাছে সকল সত্তাই ভগবানের অংশ, সকলেই পরিণতিশীল আত্মা, পরিণামে সকলেরই পরিত্রাণ এবং চিৎস্বরূপের মধ্যে মুক্তিলাভ

সুনিশ্চিত। মানুষের মধ্যে সাধুতা যখন পরিণতি লাভ করিবে অথবা আরও খাঁটি ভাবে বলিতে গেলে তাহার মধ্যস্থিত পরম দেবতা যখন নিজেকে খুঁজিয়া পাইবেন এবং সচেতন হইয়া উঠিবেন, তখন প্রত্যেকেই তাহার পরম আত্মার সেই অতিদূরবর্তী সংস্পর্শ লাভ করিবে, সে আহ্বান শুনিতে পাইবে এবং সেই আহ্বানের মধ্য দিয়া সেই শাশ্বত দিব্য পুরুষের দিকে আকর্ষণ অনুভব করিবে। কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অনন্ত ভেদ ও পার্থক্য রহিয়াছে; কয়েকজন আন্তর ক্ষেত্রে অধিকতর পরিণত হইয়াছে, অন্য সকলে ততটা পরিপক্ক হয় নাই, প্রায় সকলে না হউক অধিকাংশই এখন শিশু আত্মা রহিয়া গিয়াছে, তাহারা এখনও বৃহৎ পদক্ষেপের অথবা দুরূহ সাধনার শক্তি লাভ করে নাই। প্রত্যেকের সহিত ব্যবহারে তাহার প্রকৃতি ও তাহার অন্তরাত্মার অগ্রগতির পরিমাণ অনুসারে চলিতে হইবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক আবেদন অথবা ধর্মের প্রভাব বা আবেগের দিকে উন্মুখতার তারতম্য অনুসারে সকল মানুষকে সাধারণ ভাবে তিনটি প্রধান ভাগেই পৃথক করিয়া দেখা যায়। এই পার্থক্যের জন্য বর্ধমান মানব চেতনাকে তিনটি স্তরে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি হইল স্থূল, অগঠিত, এখনও বহির্মুখী, এখনও দেহপ্রাণগত মনে আবদ্ধ-চেতন, ইহার অজ্ঞতার উপযোগী কৌশল দ্বারাই ইহাকে পরিচালিত করা যায়। আর একটি চেতনা অধিকতর পরিণত, সবলতর ও গভীরতর চৈত্য-আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে সমর্থ, যে চেতনা পরিপক্কতর এমন এক মানবতা গড়িয়া তোলে যাহার মধ্যে অধিকতর সচেতন বুদ্ধি, প্রাণ ও রসবোধের বৃহত্তর উন্মুখতা, প্রকৃতির আরও শক্তিশালী নৈতিকতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা পরিপক্ক ও পরিণত, আধ্যাত্মিকতার শীর্ষদেশে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, ভগবানের ও তাহার নিজ সত্তার উচ্চতম চরম সত্যকে গ্রহণ করিবার অথবা তাহাতে আরূঢ় হইবার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে এবং দিব্য অনুভূতির শিখরসমূহে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে।*

ইহাদের মধ্যে প্রথম ধরনের বা প্রাথমিক স্তরের লোকের প্রয়োজনের জন্যই ভারতীয় ধর্ম সেই সমস্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ অনুষ্ঠান, কার্যকরী আচার-ব্যবহার এবং কঠোর বাহ্য বিধিনিষেধের প্রাণমনবিমোহন বিপুল সমাহার এবং সেই সমস্ত শক্তিশালী প্রতীকসমূহের প্রচুর সমারোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং তাহাদের

*তন্ত্র মানুষকে পশুমানব, বীরমানব ও দেবমানব—এই তিন ভাবে পৃথক করিয়া দেখিয়াছে। অথবা আমরা তিন গুণের দ্বারা এই ভেদের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি,—প্রথম তামসিক বা রাজস-তামসিক মানুষ, যে অজ্ঞান, জড় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রযোজক শক্তির স্বল্প আলোকে শুধু পরিচালিত হয়; দ্বিতীয় রাজসিক বা সত্ত্ব-রাজসিক মানুষ, যে জাগ্রত মন ও সংকল্প লইয়া আত্ম-পরিণতি বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তৃতীয় সাত্ত্বিক মানুষ—যাহার মন হৃদয় ও সংকল্প আলোকের দিকে খুলিয়া গিয়াছে, যে সর্বোচ্চ ধাপে অধিষ্ঠিত এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

দ্বারা নিজের প্রণালী ও পদ্ধতিকে এত সমৃদ্ধ ভাবে সুসজ্জিত অথবা এত প্রাচুর্যের সঙ্গে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত হইত এরূপ গঠনক্ষম ও নির্দেশপ্রদানসমর্থ বস্তু যাহা সচেতন এবং অবচেতন ভাবে মনের উপর ক্রিয়া করিয়া, ইহাদের পশ্চাতে অবস্থিত বৃহত্তর স্থায়ী তত্ত্বসকলের তাৎপর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিত। আবার এই ধরনের লোকের কল্যাণার্থ ও তাহাদের প্রাণময় মন ও সংকল্পের জন্য ধর্মের মধ্যে সেই সব কিছু পরিকল্পিত হইয়াছিল, যাহা তাহার বাসনা ও স্বার্থের ন্যায়সঙ্গত পরিতৃপ্তি লাভের জন্য এক বা বহু দিব্যশক্তির শরণ লইতে মানুষকে আহবান করে—ন্যায়সঙ্গত, কেননা তাহা যথার্থ বিধান বা ধর্মের অধীন। বৈদিক যুগের বাহ্য আচার-ব্যবহারমূলক যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইত এবং পরবর্তী কালে মন্দিরে মূর্তিপূজা ও নানা ক্রিয়াকলাপের চতুর্দিকে ধর্ম-সাধনার যে সমস্ত রূপ ও ধারণা দৃশ্যতঃ আসিয়া জড় হইয়াছিল, বাহ্য ভক্তি-ভাবে প্রণোদিত যে সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন ক্রিয়া নির্বাহ করা হইত, তাহা সমস্তই এই ধরনের লোকের বা আত্মার এই অবস্থার উপযোগী করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক কিছু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বা অর্ধ-জাগরিত ধর্মবাদের মধ্যে শুধু থাকিতে পারে,—পরিণত মনের পক্ষে ইহা মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও গোপন সত্য এবং চৈত্যসত্তার পক্ষে মূল্যবান বস্তু ছিল, মানুষের এই স্তরে জড়-প্রকৃতির অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন অন্তরাত্মার দুরূহ জাগরণ ও পরিণতির পক্ষে যাহা অপরিহার্য।

মধ্যবর্তী স্তর বা দ্বিতীয় ধরনের লোকসকল এই সমস্ত বস্তু হইতে যাত্রা করে কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তাহাতে পৌঁছে; ইহারা চৈত্য সত্য, বুদ্ধির ধারণা, রসবোধের নির্দেশ, নৈতিক মূল্য, এবং ভারতীয় ধর্ম যত্ন সহকারে তাহার প্রতীকসমূহের অন্তরালে সংযোগ সাধক অন্য যে সমস্ত সন্ধান রক্ষা করিয়াছে, সে সকলই অধিকতর স্পষ্ট ও সচেতন ভাবে বুঝিতে সমর্থ হয়। মধ্যবর্তী স্থানীয় এই সমস্ত সত্য এই ধর্মপ্রণালীর বাহ্য রূপসকলকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে, এবং যাহারা তাহাদের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে তাহারা এই সমস্ত মনোময় নিদর্শনের মধ্য দিয়া মনের পরপারস্থিত বস্তুসকলের দিকে অগ্রসর হইতে ও আত্মার গভীরতর সত্যে পৌঁছিতে পারে। কেননা এই স্তরে ইতিমধ্যেই এমন কিছু জাগ্রত হয় যাহা অন্তরের দিকে গভীরতর রূপে মনোময় ধর্মানুভূতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এ সময় মন হৃদয় ও সংকল্পের এমন কিছু শক্তি লাভ হয়, যাহার ফলে তাহারা আত্মা ও প্রাণের মধ্যে সম্বন্ধ-অবগতির পথে স্থিত বাধাগুলির বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য লাভ করে, যুক্তি বুদ্ধি রসচেতনা ও নৈতিক প্রকৃতিকে আরও উজ্জ্বল ও অন্তরঙ্গ ভাবে পরিতৃপ্ত করিবার এবং ঊর্ধ্বমুখে তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোচ্চ শিখরের

দিকে পরিচালিত করিবার কতকটা প্রণোদনা প্রাপ্ত হয়; তখন সাধক মন ও অন্তরাত্মাকে আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে, আধ্যাত্মিক জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতে পারে। এই ধরনের ঊর্ধ্বপথযাত্রী মানুষ তাহাদের ব্যবহারের জন্য দার্শনিক, চৈত্য-আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রসবোধ ও আবেগময় ধর্মসাধনার সেই সমস্ত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ মধ্য প্রদেশ দাবি করে—ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের যাহা বৃহত্তর ও অধিকতর গূঢ়ার্থপ্রকাশক অংশ। এই স্তরেই দার্শনিক মতবাদ ও প্রণালীসকল, চিন্তাশীল মনীষীগণের সূক্ষ্ম ও প্রদীপ্ত আলোচনা ও অনুসন্ধানসমূহ আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়ায়; এখানেই ভক্তির মহত্তর ও অধিকতর আবেগময় বিস্তার দেখা দেয়; এখানেই ধর্মের উচ্চতর প্রশস্ততর বা কঠোরতর আদর্শরাজি উপস্থাপিত করা হয়; এখানেই চৈত্যসত্তার ব্যঞ্জনা এবং শাশ্বত ও অনন্তের দিকে গতির প্রণোদনা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ে যাহা তাহাদের আবেদন ও আশ্বাসের দ্বারা মানুষকে যোগাভ্যাসের পথে লইয়া যায়।

কিন্তু মহৎ হইলেও এই সমস্ত চরম বা পরম বস্তু নয়; ইহারা আধ্যাত্মিক সত্যের জ্যোতির্ময় মহৈশ্বর্যের দিকে আরোহণের পক্ষে দ্বার উদঘাটন ও প্রাথমিক সোপানাবলি মাত্র; মানুষের মধ্যে যাহা তৃতীয় ও মহত্তম শ্রেণীর, আধ্যাত্মিক পরিণতির পক্ষে সর্বোচ্চ সেই তৃতীয় স্তরের জন্য পরম-সত্যের সাধনধারা প্রস্তুত রাখা এবং তাহাতে পৌঁছিবার উপায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকল আবরণ ও আপোষরফা হইতে নির্মুক্ত, সকল প্রতীক ও মধ্যবর্তী সময়কালীন তাৎপর্য অতিক্রমী আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের পরিপূর্ণ আলোক, পরম ও সার্বভৌম দিব্যপ্রেম, সর্বসুন্দরের সৌন্দর্য, সর্বসত্তার সহিত একত্ববোধের মহত্তম ধর্ম, আত্মার পূর্ণ পরিশুদ্ধির মধ্যস্থিত স্থির ও মধুর বিশ্বজনীন প্রেম ও করুণা, আধ্যাত্মিক পরমানন্দের মধ্যে চৈত্যসত্তার প্রবল তরঙ্গাকারে ঊর্ধ্বারোহণ—ভারতে এই সমস্ত দিব্যতম বস্তু ছিল ভাগবতভাব লাভের জন্য প্রস্তুত মানবসত্তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি, আর তাহা প্রাপ্তির জন্য আবাহন ও পথনির্দেশ করাই ছিল ভারতীয় ধর্ম ও যোগের পরম তাৎপর্য। ভারতের সাধক তাহাদের সাহায্যে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিণতির ফল লাভ করিত, আত্মা ও চিৎপুরুষের সহিত তাদাত্ম্যে মিলিত হইত, ভগবানের মধ্যে বা তাঁহার সহিত বাস করিত, তাঁহার সত্তার দিব্য বিধান তাঁহার সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক সার্বভৌমতা ও বিশ্বাতীত পরম বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইত।

কিন্তু মানব প্রকৃতির অনন্ত জটিলতার মধ্যে ভেদের এই সকল রেখা সর্বদা পার হইয়া যাওয়া চলিত এবং কঠোর ও দুষ্কর ভাবের বিভেদ ছিল না, শুধু একটা ক্রমবিন্যাস ছিল, কেননা সকল মানুষের মধ্যে বাস্তব বা সম্ভাবনা রূপে

এই তিন শক্তি একত্রে বিদ্যমান আছে। মধ্যবর্তী ও উচ্চতম এ উভয় অবস্থার তাৎপর্য পরস্পরের সন্নিকটে ছিল, সমগ্র সমাজব্যবস্থার মধ্যে তাহা বর্তমান ও পরিব্যাপ্ত ছিল, কোন কোন নিষেধ থাকা সত্ত্বেও উচ্চতম অবস্থায় পেঁৗছা কোন লোকের পক্ষেই পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় নাই; কিন্তু যে মানুষ অন্তরের ডাক শুনিতে পাইয়াছে সে কার্যতঃ এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিত অথবা অন্য উপায়ে তাহার হাত এড়াইয়া যাইত; এই ডাকই উচ্চশ্রেণীর জন্য মনোনয়নের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। যাঁহার নিকট ডাক পেঁৗছিয়াছে তাঁহাকে শুধু গুরু ও সাধন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ পথেও অধিকারের তত্ত্ব, স্বভাবের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন সামর্থ্যকে নানা সূক্ষ্মভাবে স্বীকার করা হইত, সে সমস্তের হিসাব দেওয়া আমার বর্তমান উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। শুধু উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয়দের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে সার্থক ধারণার উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই ধারণা অনুসারে পূজা ও যোগাযোগ-স্থাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবানের এক বিশেষ নাম, বিশেষ রূপ, বিশেষ প্রত্যয় নির্বাচিত করিয়া লইতে এবং তাঁহার স্বভাবের আকর্ষণ ও অধ্যাত্ম-বুদ্ধির সামর্থ্য অনুসারে তাহা লইয়া সাধনা করিতে পারিত। এই ভাবের প্রত্যেক রূপের সঙ্গে পূজার্থীর জন্য প্রাথমিকভাবে নানা বাহ্য ভাব ও বস্তুর সাহচর্য ও নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ব্যবস্থা ছিল, সাধকের মন, বুদ্ধি ও তাঁহার প্রকৃতির রসবোধ ও আবেগের শক্তি সেই রূপে সহজে আকৃষ্ট হইত এবং সে রূপের উচ্চতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ঈশ্বরের কোন এক সত্যের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিকতার মূল স্বরূপে লইয়া যাইত। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যোগাভ্যাসে শিষ্যকে তাহার প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাহার সামর্থ্য অনুসারে পরিচালিত করিতে হইবে এবং ইহা আশা করা হইত যে গুরু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক, শিষ্যের পক্ষে উপযোগী স্তর, তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও শক্তিকে অনুভব করিতে পারিবেন ও তৎসমস্ত হিসাব করিয়াই তাহাকে সাহায্য ও পরিচালনা করিবেন। এই বৃহৎ ও নমনীয় পদ্ধতির বাস্তব কার্যক্ষেত্রে অনেক কিছুতে আপত্তি তোলা যাইতে পারে; যাঁহাদের বিরুদ্ধে এই বিরোধী সমালোচক বিভ্রান্তিকর অতিশয়োক্তি সহকারে বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের সংস্কৃতির সেই সমস্ত দুর্বল বিষয় বা অপকর্ষসূচক দিকগুলির কথা যখন আমাকে আলোচনা করিতে হইবে তখন তাহাদের কথা কিছুটা উল্লেখ করিব। কিন্তু ইহার তত্ত্ব এবং তাহার প্রধান প্রধান প্রয়োগধারার মধ্যে এক আশ্চর্য প্রজ্ঞা, জ্ঞান, মানবপ্রকৃতির সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং এই সমস্তের মূল ভাবের এক নিশ্চিত অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই; যাহারা এই সমস্ত দুরূহ বিষয় গভীর ও নমনীয়ভাবে বিবেচনা করিয়াছে, অথবা গোপন আধ্যাত্মিক সত্যে পেঁৗছিবার পথে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সমস্ত বাধা ও অব্যক্ত

সম্ভাবনা আছে তাহাদের সম্বন্ধে যাহাদের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদের কেহই তাহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিতে পারে না।

সভ্য নামে পরিচিত হইতে গেলে প্রত্যেক জাতির যাহা প্রথম ভাবিবার ও গঠিত করিবার কথা সেই সাধারণ সংস্কৃতির সহিত, ধর্মজীবনের প্রগতি ও আধ্যাত্মিক পরিণতির সতর্কভাবে শ্রেণীবদ্ধ ও জটিল এই পদ্ধতিকে অতি ব্যাপক ও অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত করা হইয়াছিল। মানব পরিণতির এই কার্যভারের অতি গুরুতর ও দুরূহ অংশ মানুষের ভাবনাময় সত্তার, তাহার যুক্তি-বিচারশীল জ্ঞানময় মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। আমাদের জানা কোন প্রাচীন সংস্কৃতি, এমন কি গ্রীক সংস্কৃতি পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর ভারত অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ, অথবা তাহার অনুশীলনের জন্য তাহার অপেক্ষা অধিক চেষ্টা করে নাই। শুধু ভগবানকে জানাই প্রাচীন ঋষিদের কার্য ছিল না, জগত ও জীবনকে জানিতে এবং জ্ঞানদ্বারা তাহাদিগকে এরূপভাবে বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও সংকল্প নিশ্চিত ধারায় জ্ঞানালোকিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় ও সুন্দর প্রণালীতে তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারিত। এই চেষ্টার সুপক্ক ফল হইল শাস্ত্র। আজকাল আমরা যখন শাস্ত্রের কথা বলি তখন এ শব্দে অনেক সময় আমরা শুধু মধ্যযুগের সেই সকল ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থার প্রণালী বুঝি পূরাবৃত্তে যেগুলিকে মনু পরাশর এবং অন্যান্য বৈদিক ঋষিদের প্রণীত বলিয়া পবিত্র মনে করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতর ভারত শাস্ত্র অর্থে যে কোন সুপ্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান বা শিক্ষণকে বুঝিত; জীবনের প্রতি বিভাগের, কর্মের প্রতি ধারার, জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়ের নিজ নিজ বিজ্ঞান বা শাস্ত্র ছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, যথাযথ সাধারণ সিদ্ধান্ত, পরিপূর্ণ অনুভূতি, বোধি, যুক্তিসঙ্গত ও পরীক্ষামূলক ভাবের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের উপপত্তিসকল এরূপভাবে গড়িয়া তোলা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগের এরূপ সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল যাহাতে মানুষ, জীবনের জন্য কোন্ বস্তু কিরূপ ফলপ্রসূ তাহা জানিতে এবং যথার্থ জ্ঞানের নিশ্চয়তা লইয়া কার্য করিতে পারিত। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম পর্যন্ত সকল বস্তুকে সমান সতর্কতা ও মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করা হইত এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। উপনিষদের মত উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা যখন পুঞ্জীভূত বোধিজাত অভিজ্ঞতা ও দিব্যভাবজাত জ্ঞানের ভাষায় না বলিয়া বিধিবদ্ধভাবে মনোময় উপলব্ধির জন্য বলা হইয়াছে তখনও তাহাকে শাস্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে—এই অর্থে গীতা তাহার গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে গুহ্যতম বিজ্ঞান বা শাস্ত্র, 'গুহ্যতমম্ শাস্ত্রম্' নামে অভিহিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সকল ক্রিয়া-

ধারাই এই উচ্চ দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব লইয়া সম্পন্ন হইত। প্রস্তুতির জন্য সাধনার বাহ্য রূপ, আশ্রয় ও সমর্থনের জন্য উপযোগী দর্শন ও আন্তর সাধনার জন্য যোগ বা আধ্যাত্মিকভাবে জীবন পরিচালনার প্রণালী না থাকিলে ভারতীয় কোন ধর্ম পরিপূর্ণ বলিয়া গৃহীত হইত না; এমন কি যাহাদিগকে প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ মনে হয় তাহাদেরও অধিকাংশের মধ্যে দার্শনিক একটা ভাব ও তাৎপর্য ছিল। এই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমূলক ও দার্শনিক প্রকৃতিই ভারতে ধর্মকে এরূপ স্থায়ীভাবে সুনিশ্চিত করিয়াছে, এমন প্রবল জীবনীশক্তি দিয়াছে এবং বর্তমান যুগের সন্দেহবাদী গবেষণার অম্ল-বিদ্রাবক (acid dissolvent) শক্তিকে বাধা দিতে সমর্থ করিয়াছে; সে শক্তি অনুভূতি ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে যাহা দোষত্রুটিযুক্ত তাহাকে গলাইয়া দিতে পারে কিন্তু এই সমস্ত মহান উপদেশ ও শিক্ষার হৃদয় ও মন গলাইতে পারে নাই। কিন্তু যাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে তাহা এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতি নিম্নতর ও উচ্চতর জ্ঞান অথবা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ও আত্মার জ্ঞান এ উভয়কে পৃথক করিয়া দেখা সত্ত্বেও কোন কোন ধর্মের মত তাহাদের ভিতরে ভেদের কোন দুস্তর সমুদ্র ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু বিবেচনা করিয়াছে যে জাগতিক বস্তুজ্ঞান, আত্মা ও ভগবানের জ্ঞানের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে এবং সেই জ্ঞানে তাহাকে লইয়া যায়। সকল শাস্ত্রই ঋষিদের নামে অনুমোদন লাভ করিত, তাঁহারা প্রথমদিকে শুধু আধ্যাত্মিক সত্য ও দর্শনের—এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে ভারতীয় সকল দর্শনের, এমন কি ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের এবং বৈশেশিকগণের পরমাণুবাদের, উচ্চতম শীর্ষস্থানীয় সুর ও শেষ উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মুক্তি—শিক্ষক যে শুধু ছিলেন তাহা নয়, পরন্তু শিল্পকলা, সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, সামরিক, জড়ীয় ও চৈত্যিক সকল প্রকার বিজ্ঞানও তাঁহারাই শিক্ষা দিতেন এবং প্রত্যেক শিক্ষক তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে গুরু বা আচার্য, মানবাত্মার দিশারী উপদেষ্টা রূপে সম্মানিত হইতেন। সকল প্রকার জ্ঞান সমন্বিত করিয়া এক জ্ঞানে পরিণত করা এবং তাহাকে ক্রমশঃ এক উচ্চতম জ্ঞানের দিকে লইয়া যাওয়া হইত।

ভারতীয় সংস্কৃতির মতে এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের সমগ্র যথার্থ সাধনাই ছিল ধর্ম, অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ এবং বস্তু, প্রাণ ও ক্রিয়ার জ্ঞানের যথার্থ বোধ ও যথার্থ দৃষ্টি লইয়া তদনুসারে সেই জ্ঞানের মধ্যে বাস। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের শ্রেণী জাতি ও উপজাতির, অন্তরাত্মা মন প্রাণ ও দেহের প্রত্যেক ক্রিয়াধারার নিজস্ব ধর্ম আছে। মানুষের নৈতিক প্রকৃতির অনুশীলন ও সুব্যবস্থাই ধর্মের বৃহত্তম অথবা অন্ততপক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া গৃহীত হইত। এক ধরনের সমালোচকগণের বিস্ময়জনক অজ্ঞতা-প্রসূত উক্তির ঠিক বিপরীত সত্য এই যে, জীবনের নৈতিক বিভাব ভারতে অতি

বিশাল পরিমাণে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং বিশেষভাবে যাহা শুদ্ধ জ্ঞান ও আত্মতত্ত্বে নিবদ্ধ নয়, তেমন সকল প্রকার ভারতীয় ভাবনা ও রচনার অধিকাংশই নৈতিক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত, আর সে আলোচনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল যে এমন কোন নৈতিক রূপায়ণ বা আদর্শ ছিল না যাহা এ সংস্কৃতিতে তাহার ধারণার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে নাই এবং আদর্শ সাধনায় যাহা এক প্রকার দিব্য চরম অবস্থায় নীত হয় নাই। কোন কোন প্রণিধান-যোগ্য বিপরীতমুখী পরিচিন্তন থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ভাবনা মানুষের নৈতিক প্রকৃতি এবং জগতের নৈতিক বিধান অবশ্যস্বীকার্য বলিয়া মানিয়া লইত। ইহা বিবেচনা করিত মানুষের বাসনার সম্ভোগ সমর্থনযোগ্য-ব্যাপার, কেননা জীবনের পরিতৃপ্তি ও বিস্তারসাধনের জন্য তাহা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার সত্তার বিধান বলিয়া বাসনার আদেশ অনুসারে চলাকে কখনও সমর্থন করা যায় না; কেননা সর্ববস্তুরই একটা বৃহত্তর বিধান আছে, প্রত্যেকের পক্ষে যে শুধু তাহার স্বার্থ ও কামনার দিক আছে তাহা নহে তাহার ধর্ম বা যথার্থ আচরণ, প্রয়োগ, পরিতৃপ্তি, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের বিধানও আছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শাস্ত্রে যাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহার পরিপালনই যথার্থ বস্তু, কর্মের প্রকৃত বিধান। ধর্মের কথায় প্রথমে আসে সামাজিক বিধানের কথা; কেননা মানুষের জীবন শুধু প্রথমদিকেই রহিয়াছে কেবলমাত্র তাহার ব্যক্তিগত প্রাণময় ব্যষ্টিসত্তার জন্য, কিন্তু তদপেক্ষা অবশ্যকর্তব্য রূপে রহিয়াছে সমাজের জন্য, যদিও সর্বাপেক্ষা অপরিহার্যরূপে রহিয়াছে মহত্তম আত্মার জন্য, যে আত্মা তাহাতে ও সর্ব সত্তাতে একই বস্তু, রহিয়াছে ভগবানের জন্য, চিৎপুরুষের জন্য। অতএব ব্যষ্টি ব্যক্তিকে প্রথমে সমাজগত আত্মার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে যদিও সমাজতান্ত্রিকতার ধারণার চরমপন্থীরা যেরূপ কল্পনা করে তেমনভাবে নিজেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে কোন মতেই সে বাধ্য নহে। তাহার নিজের সামাজিক ধরণ ও শ্রেণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার নিজ প্রকৃতির বিধান অনুসারেই তাহার নিজ জাতি এবং তাহার সত্তার এক উচ্চতর প্রসারে সমগ্র মানবজাতির জন্য তাহাকে বাস করিতে হইবে। এই শেষোক্ত ধারার উপর বৌদ্ধগণ অত্যন্ত জোর দিয়াছিল। এইভাবে বাস ও ক্রিয়া করিয়া ভারতে মানুষ ধর্মের সামাজিক সোপানকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া শিক্ষা করিতে পারিত, জীবনের ভিত্তির ক্ষতিসাধন না করিয়া আদর্শ সোপানের আচরণ করিতে এবং অবশেষে আত্মার স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিত, তখন কর্তব্য বা বিধানে সে আর আবদ্ধ থাকিত না, কেননা সে দিব্যপ্রকৃতির উচ্চতম মুক্ত ও অমর ধর্মের মধ্যে বিচরণ ও কর্ম করিতেছে। একটা প্রগতিশীল একত্বের মধ্যে ধর্মের এই সকল বিভাবই অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ও সম্বন্ধ করা হইয়াছিল। এই ভাবের উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে চারিবর্ণের প্রত্যেকের নিজস্ব সামাজিক

কর্মধারা ও নীতি ছিল কিন্তু তৎসঙ্গে শুদ্ধ নৈতিক সত্তার পরিপুষ্টির জন্য এক আদর্শ বিধানও ছিল, এবং প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজ ধর্ম পালন করিয়া এবং তাহার ক্রিয়াধারা ভগবানের দিকে ফিরাইয়া ধরিয়া তাহার মধ্য হইতে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সকল ধর্ম ও নীতির পশ্চাতে শুধু রক্ষণ ও সতর্কতার জন্য নহে, কিন্তু এক আলোক, ধর্মের এক অনুমোদন রূপে, মানব জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা ও বহু জন্মের মধ্য দিয়া মানুষের দীর্ঘ তীর্থপর্যটনের এক স্মারকলিপি স্থাপিত করা হইত, এক স্মারকলিপি যাহাতে থাকিত দেবতাগণের ও এ-জগতের পরপারস্থিত ভূমি-সকলের এবং ভগবানের কথা, আর সর্বোপরি থাকিত পরিপূর্ণ জ্ঞান ও একত্ব এবং সব কিছু অতিক্রম করিয়া দিব্যভাবে যাওয়ার শেষ সোপানের এক অলৌকিক দর্শনের কথা।

প্রাচীন মনের প্রসারতা দ্বারা উদারভাবাপন্ন ভারতীয় নীতিশাস্ত্র তাঁহার মধ্যে বর্ধমান ভাবে তপশ্চর্যার মনোভাব ও শীর্ষস্থানগত এক প্রকার উচ্চ কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের রসময় এমন কি সুখাসক্ত সত্তাকে প্রতিষেধ অথবা প্রবলভাবে দমিত করে নাই। সর্বপ্রকার রসবোধের, সকল শ্রেণীর হৃদয়-রঞ্জিনী বৃত্তির চরিতার্থতা সংস্কৃতির এক প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত। কাব্য ও নাটক, গান নৃত্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র, ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর শিল্পকলা ঋষিদের অনুমোদনে আত্মানুশীলনের যন্ত্র করিয়া তোলা হইত। একটা যথার্থ সিদ্ধান্ত অনুসারে এ-সমস্তকে প্রাথমিকভাবে শুদ্ধ রসচেতনা পরি-তৃপ্তির উপায় বলিয়া ধরা হইত এবং ইহাদের প্রত্যেকটি নিজস্ব মৌলিক বিধি-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, কিন্তু সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এবং তাহার প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া এগুলিকে সত্তার বুদ্ধি, নীতি ও ধর্মময় জীবনের পরিণতিসাধনরূপ উন্নততর কার্যেও নিয়োজিত করা হইত। ইহা উল্লেখযোগ্য ভারতের দুইখানি বিশাল মহাগ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত যেমন ধর্মশাস্ত্র তেমনি পুরাণ ও ইতিহাসের মিলিত মহাকাব্যরূপে গৃহীত হইত; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে মানবজীবনের মহান জীবন্ত এবং শক্তিশালী চিত্ররাজি যেমন রহিয়াছে তেমনি আছে সর্বত্রই প্রাণের ক্ষেত্রে বৃহৎ ও উচ্চ নীতি ও ধর্মের বিধান ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বর্ণনা, ইহাই যেন তাহাদের প্রাণের নিঃশ্বাস, আর তাহাদের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে ভগবদ্‌ভাব লাভ এবং জাগতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া উন্নতিশীল অন্তরাত্মার আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করা। ভারতীয় চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিজ্ঞান মানুষের রসচেতনা পরিতৃপ্তি এবং তাহার সামাজিক রাষ্ট্রিয় ও ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাখ্যা করিতে অস্বীকার করে নাই; সকল সাক্ষ্য প্রমাণেই পাওয়া যায় যে এই সমস্ত হইতেই ইহাদের সৃষ্টিপ্রেরণার বৃহৎ এক অংশ আসিয়াছে কিন্তু তথাপি এ সমস্ত শিল্পের

সর্বোত্তম কার্য এ সংস্কৃতির বৃহত্তম আধ্যাত্মিক দিকের জন্য যে সংরক্ষিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং বরাবরই আমরা দেখিতে পাই যে ভারতীয় ধ্যানশীল মননের শক্তি তাহাদিগকে অন্তরাত্মা, ভগবান, আধ্যাত্মিকতা ও আনন্ত্যের মধ্যে গ্রহণ ও তাহাদের দ্বারা পরিপ্লুত করিয়াছে। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে রসগ্রাহী ও ভোগবাদী সত্তা যে শুধু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সহায়রূপে স্বীকৃত এবং সেই উদ্দেশ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, এমন কি তাহাকে চিৎপুরুষের নিকটে পৌঁছিবার অন্যতম প্রধান দ্বারস্বরূপও গ্রহণ করা হইত। বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষতঃ প্রেম ও সৌন্দর্যের এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের সমগ্র আনন্দময় আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনেরই ধর্ম, এমন কি ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র জীবনের বাসনা ও প্রতিরূপসকলকেও ইহার দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যভাবে আত্মানুভূতির মূর্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। জগতে এরূপ ধর্ম আর কোথায় আছে যাহা এই বিশাল উদারতা দেখাইতে পারিয়াছে অথবা যাহা আধ্যাত্মিকতা ও আনন্ত্যে পৌঁছিবার জন্য সমগ্র প্রকৃতিকে এরূপ বৃহৎ শক্তিশালী ও বহুমুখী রূপে, এত বৃহৎ ও উচ্চভাবে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

অবশেষে রহিয়াছে মানুষের অত্যন্ত বহির্মুখী সত্তা, তাহার সাধারণ সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রাণময় জীবন। ভারতীয় সংস্কৃতি এই সত্তাকেও নিজ হাতে লইয়াছিল এবং তাহার নিজস্ব আদর্শ ও ধারণার চাপে সমগ্রভাবে অধিকার করিয়াছিল। তাহার পদ্ধতি ছিল সামাজিক জীবন-যাপন, কর্তব্যকর্ম ও উপভোগ, সাধারণ ও রাজনৈতিক বিধান ও আচরণ, অর্থ-নৈতিক সন্ধান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে এক এক বৃহৎ শাস্ত্র গড়িয়া তোলা। এই সমস্ত শাস্ত্র একদিকে যেমন এই সকল কার্যের সফলতা, প্রসারতা, সমৃদ্ধি, যথার্থ কলাকৌশল এবং পরস্পরের সম্বন্ধ অনুশাসন করিত তেমনি অন্যদিকে প্রাণময় মানুষ ও তাহার কর্মের প্রকৃতির দাবি দ্বারা পরিচালিত এই সমস্ত প্রেরণার উপর ধর্মের বিধান, সমাজ ও নীতির কঠোর আদর্শ ও নিয়ম চাপাইয়া এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহার কর্তব্য সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিত—এইভাবে দেখিতে পাই শক্তি ও দায়িত্বের দিক দিয়া যিনি প্রধান নেতা সেই রাজার সমস্ত জীবন প্রতি ঘণ্টায় ও প্রতি ক্রিয়াধারাতে শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রশাসনকৌশল হিসাবে চতুরতা ও ধূর্ততাপূর্ণ কূট রাজনীতি (Machiavellian principle)—যাহা সকল রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাষ্ট্রনেতাগণ সর্বত্র ও সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন—এই মহত্তর শাসনপ্রণালীকে অধিকার করিয়াছিল কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ যুগে এই ভ্রষ্টতাকে সাময়িক ভাবে ফলপ্রসূ কিন্তু ক্ষুদ্রতর নিকৃষ্টতর এবং নিম্নতর কার্যসাধনপদ্ধতি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। সাংস্কৃতিক এক মহান বিধান

এই ছিল যে, মানুষ তাহার পদ পদবী ও শক্তিতে যতই উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত, তাহার ক্রিয়া ও উদাহরণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যতই সুদূরপ্রসারী হইবে, তাহার উপর ধর্মপথে চলিবার দাবি ততই প্রবল হইবে। সমাজের সমস্ত বিধান ও আচার-ব্যবহার ঋষি ও দেবতাগণের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল এবং প্রধান ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের অত্যাচার হইতে রক্ষিত হইত, তাহাদিগকে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট করা হইত, আর রাজাকেও ধর্মের রক্ষক ও সেবক রূপে যেমন বাস করিতে তেমনি রাজ্যশাসন করিতে হইত। জনসংঘের মধ্যে এই সমস্ত বিধান ও আচার কার্যকরী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা শুধু তাঁহার ছিল, এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বস্তভাবে সে সমস্ত মানিয়া চলিতেন শুধু ততদিন পর্যন্ত সে-শক্তি পরিচালনার অধিকার তাঁহার থাকিত। আর মানবজীবনের এই প্রাণের দিকটা তাহাকে অন্তরতর আত্মা এবং জীবনের দিব্য উদ্দেশ্য হইতে অতি সহজে দূরে বাহিরের দিকে লইয়া যায় বলিয়া, যাহাতে মানুষের প্রাণময় সত্তা ভাল-ভাবে বুঝিতে পারে তেমন উপায়ে, ইহাকে প্রতি পদে ধর্মের ধারণা ও আদর্শের সহিত অতি অবিচলিতভাবে বন্ধন করা হইত—সেই জন্যই বৈদিক যুগে প্রত্যেক সামাজিক বা নাগরিক কার্যের পশ্চাতে স্থিত যজ্ঞ দ্বারা এ কথা সর্বদা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এবং পরবর্তী কালে সে কাজ ধর্মমূলক আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, দেবতাগণের আবাহন, কর্মের পরবর্তী ফল বা পারলৌকিক লক্ষ্যের উপর নির্বন্ধাতিশয়তা দ্বারা করা হইত। ইহাকে সর্বাগ্রে করণীয় কার্য রূপে এরূপ বৃহৎভাবে ধরা হইত যে, আধ্যাত্মিক মানসিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচার ও আলোচনা, ক্রিয়া ও বিসৃষ্টির যথেষ্ট বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া থাকা সত্ত্বেও, এ বিষয়ে কঠোর বিধান ও শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিকে অত্যন্ত ঝোঁক দেওয়া হইত; এই ঝোঁক অতিমাত্রায় বর্ধিত হইয়া অবশেষে যুগধর্মের প্রকৃতির প্রয়োজনে যাহা অধিকতর উপযোগী এরূপ নূতন রূপে সমাজের সম্প্রসারণকে পর্যন্ত বাধা দিয়াছে। পরিবর্তিত আচার-ব্যবহারে স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুমতি দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত, আর ব্যষ্টি ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইত যখন তাহার নিজস্ব উচ্চতর সংযম ও সাধনার সহিত সে ধর্মজীবন গ্রহণ করিত, অথবা সমাজের বাহিরে গিয়া সাধারণ সমাজজীবনের অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধান না মানিয়া চলিবার অধিকার পাইত। কঠোরভাবে সামাজিক বিধানের শাসনানুবর্তী হইয়া তাহার পরিপালন, ধর্মের আদর্শাদিকবর্তী বৃহত্তর এবং মহত্তর সাধনা ও স্বাধীনতরভাবে আত্মোৎকর্ষ, এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের উদার স্বাধীনতা এই তিনটি হইয়া উঠিয়াছিল এ পদ্ধতির তিনটি শক্তি। আত্মপ্রসারণশীল মানবাত্মা এই সমস্ত শক্তিকে সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া সিদ্ধিতে আরূঢ় হইতে পারিত।

এইভাবে জীবনে ভারতীয় আদর্শের প্রয়োগের ফলে তাহার সামগ্রিক সাধারণ প্রকৃতি সর্ববিষয়ে এই একপ্রকার বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিত, তাহা তাহার আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য মানবাত্মার পরম্পরাক্রমে সজ্জিত সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যে বিধৃত এক প্রস্তুতি হইয়া দাঁড়াইত। প্রথমতঃ তাহাতে থাকিত ধর্মের বিধান ও নৈতিক ধারণার অধীনে থাকিয়া মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রাথমিক সত্তার সুনিয়ন্ত্রিত পরিতর্পণের ব্যবস্থা, যাহা প্রতি মুহূর্তে ধর্মের ইঙ্গিত দ্বারা পূর্ণ থাকিত, সে ধর্ম প্রথমে অধিকতর বহির্মুখী অপরিণত মনের কাছে তাহার আবেদন উপস্থিত করিত, কিন্তু তাহার প্রত্যেক বাহ্য প্রতীক ও ঘটনার মধ্যে এক গভীরতর তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিত, এবং তাহার সমর্থন রূপে আধ্যাত্মিক ও অনবদ্য এক গভীরতম অর্থের ব্যঞ্জনায় সুসজ্জিত থাকিত। তাহার পর আসিত পরিণত বুদ্ধি এবং অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরবিজড়িত চৈত্য, নৈতিক ও চিত্তরঞ্জিনী শক্তিসমূহের সমবায়ে গঠিত উচ্চতর সোপানাবলি, আবার সে সমস্তও অনুরূপভাবে নিজদিগকে অতিক্রম করিয়া নিজেদেরই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ও সম্ভাবনার পরম উচ্চতার দিকে উন্মুখতার দ্বারা উন্নীত হইত। অবশেষে মানুষের মধ্যে স্থিত এই সমস্ত পরিণতিশীল শক্তির প্রত্যেকটিকে তাহার নিজস্ব ধারায় দিব্য অধ্যাত্ম সত্তায় পৌঁছিবার প্রবেশদ্বার করিয়া তোলা হইত। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই ভাবনাশীল বুদ্ধিমান মানুষের আত্মাতিক্রমের জন্য এক জ্ঞানযোগ, সক্রিয় শক্তিশালী নৈতিক ব্যক্তির আত্মাতিক্রমের জন্য এক কর্মযোগ, আবেগময় সৌন্দর্যানুরাগী রসিক ও সুখপ্রিয় মানুষের আত্মাতিক্রমের জন্য এক প্রেম ও ভক্তিযোগ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, যাহা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মা, অধ্যাত্ম সত্তা ও ভগবানের দিকে প্রসারিত তাহার নিজস্ব বিশেষ শক্তির মধ্য দিয়া সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারিত; তাহা ছাড়া আত্মাতিক্রম করিবার জন্য চৈত্য বা মনোময় সত্তার শক্তির মধ্য দিয়া এক যোগপন্থা, এমন কি দেহগত প্রাণ-শক্তির মধ্য দিয়া এক যোগপন্থাও আবিষ্কার করা হইয়াছিল—এই সমস্ত যোগের কোন একটিকে পৃথক করিয়া একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া অথবা একপ্রকারে তাহাদের সমন্বয়সাধন করিয়া সাধনা করা চলিত, কিন্তু আত্মাতিক্রমের এই সমস্ত পন্থাই এক উচ্চতম আত্মসম্ভূতিতে পৌঁছাইয়া দিত। বিশ্বপুরুষের এবং সর্বসত্তার সহিত এক হওয়া, আত্মা ও চিৎপুরুষের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করা, ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া—ইহাতেই মানুষের পরিণতি পূর্ণ হইত. ইহাই মানুষের আত্মোৎকর্ষের শেষ সোপান গঠন করিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

ভারতীয় ধর্মের তত্ত্ব, তাহার পরিণতির অর্থ ও সাধনপদ্ধতির উদ্দেশ্যের অর্থ একটু বিস্তৃতভাবেই—যদিও তবু তাহা অতি অপ্রচুরই রহিয়া গিয়াছে—আলোচনা করিয়াছি, কারণ এই বিষয়ের দফাওয়ারি বিচার, বিশেষ পরিণাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়া এ সংস্কৃতির সমর্থক ও আক্রমণকারী এ উভয় দলই যখন পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন তখন এই সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যান। তাঁহারা যাহা আলোচনা করেন সেই সমস্ত বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা কার্যতঃ সংস্কৃতিকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার ব্যাপারে ইহারা এক অংশ; কিন্তু সে কার্যের পশ্চাতে অবস্থিত উদ্দেশ্য যদি আমরা ধরিতে না পারি তবে ইহাদের প্রকৃত মূল্য ও উপযোগিতা বুঝিতে পারিব না। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে ভারতীয় সংস্কৃতির তত্ত্ব ও তাহার মূল লক্ষ্য ছিল অনন্য-সাধারণভাবে উচ্চ, অভ্যুদয়েচ্ছু ও মহান—মানবাত্মা যে সমস্ত আদর্শ ধারণা করিতে পারে তন্মধ্যে সর্বোচ্চ। কেননা যাহা তাহার বিশাল গোপন উচ্চ সম্ভাবনাসকলকে পরিণত করিয়া তোলে মানবজীবনের তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন্ আদর্শ থাকিতে পারে? যে সংস্কৃতি জীবনকে কালের ক্ষেত্রে শাশ্বতেরই এক গতিবৃত্তি বলিয়া ধারণা করে, ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্বপুরুষকে, সান্তের মধ্যে অনন্তকে, মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পায় অথবা যাহা এই মত পোষণ করে যে মানুষ যে শুধু নিত্য ও অনন্তবস্তু সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে তাহা নহে, পরন্তু তাহার শক্তির মধ্যে বাস করিতে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ও দৈবী প্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়া তুলিতে পারে, তদপেক্ষা উচ্চতর আর কোন্ সংস্কৃতি থাকিতে পারে? আন্তর ও বাহ্য অনুভূতির দ্বারা পরিণত হইয়া অবশেষে ভগবানের মধ্যে বাস করা, নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা, জ্ঞানে সংকল্পে এবং নিজের উচ্চতম সত্তার আনন্দে ভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত হওয়া অপেক্ষা মানবজীবনের মহত্তর আর কি লক্ষ্য থাকিতে পারে? আর ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনার সমগ্র তাৎপর্য।

এই সমস্ত ধারণা কাল্পনিক, আজগুবি এবং কার্যতঃ অসম্ভব বলা সহজ,

বলা সহজ যে চিৎপুরুষ, শাশ্বতবস্তু বা ভগবান বলিয়া কিছু নাই এবং মানুষের পক্ষে ধর্ম ও দর্শনের অনধিকার চর্চা না করাই ভাল বরং তাহার প্রাণ ও দেহের ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রতার যতটা সে সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এইভাবের অস্বীকৃতি প্রাণ ও দেহগত মনের পক্ষে বেশ স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ বর্তমানে যাহা আছে তাহাই তাহার পরিণতির সীমা; যাহাতে পরিণত হইয়া উঠাই মানুষের প্রকৃত করণীয় কাজ তেমন বৃহত্তর কিছু মানুষের মধ্যে নাই, এই কথা মানিয়া লওয়ার উপরই এ মনোভাব নির্ভর করে; এইরূপ অস্বীকৃতির কোন স্থায়ী মূল্য নাই। এক বৃহৎ সংস্কৃতির সমগ্র লক্ষ্য হইল প্রথমে মানুষ যাহা নয় এমন বৃহত্তর কিছুতে তাহাকে উন্নীত করা, তাহাকে জ্ঞানে লইয়া যাওয়া—যদিও অতলস্পর্শ অজ্ঞান হইতে তাহার যাত্রারম্ভ —তাহাকে জীবনের পথে যুক্তিবিচারের অনুগত হইয়া চলিবার শিক্ষা দেওয়া—যদিও আসলে সে অযৌক্তিকতার দ্বারা অধিকতর ভাবে পরিচালিত হয়; মঙ্গল ও একত্বের বিধানের অনুসরণ করা—যদিও বর্তমানে তাঁহার জীবন অশুভ ও বিরোধে ভরা রহিয়াছে, সৌন্দর্য ও সুসামঞ্জস্যের নিয়ম প্রতিপালন করা—যদিও তাহার বাস্তব জীবন কদাকারতা ও বিরোধশীল বর্বরতার এক জঘন্য বিশৃঙ্খলা, তাহার চিৎস্বরূপের কোন উচ্চতর বিধান অনুসারে চলা—যদিও এই-ক্ষণে সে তাহার অহংসর্বস্ব, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জড় সত্তার অভাব ও বাসনা দ্বারা পরিবৃত। যদি কোন সভ্যতার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষ্যের কোনটাই দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহার কোন সংস্কৃতি যে আছে একথা বলা চলে না, কোন অর্থেই সে-সংস্কৃতি মহৎ ও বৃহৎ একথা নিশ্চয়ই সত্য নহে। কিন্তু প্রাচীন ভারত এই সমস্ত লক্ষ্যের শেষটিকেই উচ্চতম বলিয়া ধারণা করিয়াছিল, কেননা এই লক্ষ্যের মধ্যে অন্য সকল লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত আছে অথচ তাহা সে সকলকে অতিক্রমও করিয়াছে। এই লক্ষ্যের দিকে পৌঁছিবার চেষ্টা করা অর্থই জাতীয় জীবনকে মহান করিয়া তোলা; এক্ষেত্রে আদৌ কোন চেষ্টা না করা অপেক্ষা চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হওয়াও শ্রেয়স্কর; এবিষয়ে আংশিক সফলতাও মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসকলকে ফুটাইয়া তুলিবার দিকে এক বৃহৎ অবদান।

ভারতীয় সংস্কৃতির পদ্ধতি অন্য এক বস্তু, যে কোন পদ্ধতি তাহার প্রকৃতি অনুসারেই যেমন একদিকে আত্মার পরিণামসাধক তেমনি অন্যদিকে এক সীমার বন্ধন; তথাপি আমাদের পক্ষে জীবনের এক বিজ্ঞান এক নীতি এক পদ্ধতি থাকা চাই। এইমাত্র প্রয়োজন যে এমন এক পদ্ধতি গঠন করিতে হইবে যাহার রূপরেখাগুলি যেন বৃহৎ ও মহৎ হয়, এরূপভাবে পরিণতির সামর্থ্য উহাতে যেন থাকে যাহাতে জীবনের ক্ষেত্রে আত্মা ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, আবার দৃঢ়তার মধ্যেও তাহাতে এমন নমনীয়তা থাকা চাই যাহাতে তাহা নিজের বিশিষ্ট একত্ব নষ্ট না করিয়া নূতন উপাদান গ্রহণ করিতে, নিজের

মধ্যে তাহাদিগকে সুসমঞ্জস করিয়া লইতে এবং এইভাবে নিজের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতির পদ্ধতির মধ্যে তত্ত্বতঃ ও একটা সময় পর্যন্ত কার্যতঃ এই সমস্তেরই অনেকটা ব্যবস্থাই ছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে অবশেষে সে সংস্কৃতিতে এক অবনতি দেখা গিয়াছিল এবং পরিণতি ও বৃদ্ধি একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে অবনতি চরম অবস্থায় পৌঁছে নাই, যদিও তাহা তাহার জীবন ও ভবিষ্যতের পক্ষে গুরুতর রূপেই বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং আমাদিগকে এখন খুঁজিয়া দেখিতে হইবে সে অবনতির কারণ কি, তাহা কি এ সংস্কৃতির প্রকৃতিতে অনুস্যূত কোন কিছুর জন্য ঘটিয়াছে, অথবা জীবনযাত্রার শক্তির কোন বিকৃতি অথবা সাময়িক অবসাদের জন্য আসিয়াছে, আর যদি তাহা শেষোক্ত কারণে আসিয়া থাকে তবে কিরূপে সে অবসাদ আসিল? বর্তমানে প্রসঙ্গতঃ আমি শুধু একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিব। ভারত যে সমস্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হইয়াছে তাহাদের কথা আমাদের সমালোচক বিরক্তিজনক ভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতে কখনও ক্লান্ত হন নাই, আর আমাদের সংস্কৃতির অসংশোধনীয় নিকৃষ্টতা, প্রকৃত ও সুস্থ কোন সংস্কৃতির একান্ত অভাবই তাহাদের প্রত্যেকটিরই কারণ বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, দুর্ভাগ্যই সংস্কৃতির অভাব প্রমাণিত করে না তেমনি সৌভাগ্যই মুক্তির চিহ্ন নয়। গ্রীস দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়াছিল ভারতের মতই গ্রীসও আভ্যন্তরীণ কলহ ও অন্তর্বিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, অবশেষে সে তাহার একত্ব ফিরিয়া পাওয়ার বা তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল; তথাপি গ্রীসের, এই কলহকারী নগণ্য ক্ষুদ্র জাতির নিকট ইউরোপ তাহার সংস্কৃতির অর্ধেকটার জন্য ঋণী। ইটালি যুক্তিযুক্তরূপেই যথেষ্ট পরিমাণে দুর্দৈবের মধ্যে পড়িয়াছিল তথাপি ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অযোগ্য ও দুর্ভাগ্য ইটালির অবদান যতটা অন্য কোন জাতির ততটা নাই। ভারতের দুর্ভাগ্যরাজি অন্ততপক্ষে তাহাদের পরিণতিতে অনেক বেশী পরিমাণে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে, কিন্তু ধরা যাক তাহার অতি দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে এবং স্বীকার করা যাক যে ভারতের মত আর কোন দেশ এত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে নাই। যদি এই সমস্ত আমাদের সভ্যতার নিকৃষ্টতার জন্যই ঘটিয়া থাকে তবে প্রশ্ন করিতে পারা যায়, দুর্ভাগ্যের এই গুরুভার বহন করিয়া কিসের জোরে ভারত এবং তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতা আজিও নির্বন্ধশীলতার সহিত বাঁচিয়া আছে, অথবা ইউরোপ হইতে আগত যে প্রবল বন্যা অন্যান্য জাতিকে প্রায় ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার সমালোচকগণের বিষম ক্রোধের কারণ হইয়াও আজিও নিজেকে এবং নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিকে দৃঢ়রূপে খ্যাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে কোন্ শক্তি তাহাকে সমর্থ করিয়াছে? সংস্কৃতির অসম্পূর্ণতাই যদি তাহার দুর্ভাগ্য-

রাজির কারণ হয় তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তির বলে ইহা কি বলা চলে না যে তাহার এই অসাধারণ প্রাণশক্তির মূলে রহিয়াছে তাহার মধ্যের কোন প্রবল শক্তি, তাহার আত্মা বা প্রকৃতির সত্যের কোন স্থায়ী গুণ? যাহা শুধু একটা মিথ্যা একটা মতিবিভ্রম তাহা বাঁচিতে পারে না, তাহা যদি স্থায়ী হয় তবে বুঝিতে হইবে একটা রোগ আসিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে তাহার ফলে মৃত্যু ঘটিবে, তাহা অবিনাশী জীবনের উৎস হইতে পারে না। নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যের এক শক্তি, বাঁচাইবার এক সত্য আছে যাহা এই জাতিকে সজীব রাখিয়াছে এবং এখনও তাহার শির উন্নত করিয়া তাহার সম্ভূতির সংকল্প এবং তাহার জীবনব্রতে নিজের বিশ্বাস প্রবলভাবে খ্যাপন করিতে তাহাকে সমর্থ করিয়াছে।

কিন্তু অবশেষে আমাদিগকে সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তত্ত্ব, তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রসারতা শুধু দেখিলে চলিবে না কিন্তু তাহার বাস্তব ক্রিয়া-ধারা এবং জীবনের সকল বিষয়ের উপর তাহার কার্যকারিতা দেখিতে হইবে। এখানে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় সংস্কৃতিতেও বৃহৎ সীমার বন্ধন, বৃহৎ অপূর্ণতা ছিল। কিন্তু জগতে প্রাচীন কিম্বা আধুনিক এমন কোন সভ্যতা, এমন কোন সংস্কৃতি নাই যাহার পদ্ধতি মানুষের পূর্ণতা-সাধনের প্রয়োজনে পরিপূর্ণরূপে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে; এমন কোনটিই নাই যাহা কার্যক্ষেত্রে প্রভূত সীমার বন্ধন ও অপূর্ণতা দ্বারা বিরূপ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আবার সংস্কৃতির লক্ষ্য যত উচ্চ, সভ্যতার রূপ যত বৃহৎ ততই এই সমস্ত দোষত্রুটি অধিক পরিমাণে চক্ষুকে হয়ত অভিভূত করিবে। প্রথম দিকে প্রত্যেক সংস্কৃতিই তাহার গুণরাজির সীমার বন্ধন অথবা ন্যূনতা দ্বারা প্রপীড়িত হয়, এবং শেষের দিকে প্রায় অপরিহার্য ফলরূপে দেখা যায় যে সে সমস্ত গুণেরও অতিরঞ্জন আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক সংস্কৃতি কতকগুলি প্রধান ভাবধারার উপর নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিতে চায় এবং অন্য অনেক আদর্শকে দেখিতে পায় না অথবা তাহাদিগকে অযথাভাবে দমিত করিয়া রাখে; সাম্যের এই অভাব একদেশদর্শী মনোভাবসকল সৃষ্টি করে যাহাদিগকে দমন করা বা যথাস্থানে রক্ষা করা হয় না, একটা অস্বাস্থ্যকর অতিরঞ্জনে পর্যবসিত হইতে দেওয়া হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সভ্যতার প্রাণশক্তি সবল থাকে ততদিন তাহার জীবন নিজেকে অবস্থার উপযোগী করিয়া নেয়, প্রতিকারসমর্থ শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে, এবং স্খলন ও পতন, অশুভ ও বিপদ্‌পাত সত্ত্বেও কোন বৃহৎ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু অবনতির সময় দোষত্রুটি এবং বিশেষ গুণের অতিরঞ্জন জয়ী হইয়া এক প্রকার রোগে পরিণত হয় এবং সাধারণভাবে ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং যদি তাহার গতিরোধ না করা হয় তবে তাহা ক্ষয় ও মৃত্যুতে লইয়া যায়। আবার আদর্শ খুবই মহান

হইতে পারে, যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম যুগে ঘটিয়াছিল, যখন সাময়িকভাবে একপ্রকার পূর্ণতা লাভ হইয়াছিল, সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যের এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু আদর্শ এবং জীবনের বাস্তব অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা বৃহৎ ব্যবধান সর্বদাই থাকিয়া যায়। এই ব্যবধানের উপর সেতুবন্ধন করা অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহাকে যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিয়া তোলা, মানুষের সাধনার অতিদুরূহ অংশ। অবশেষে দীর্ঘ যুগ যুগান্তের পরপারে দাঁড়াইয়া দেখিলে এই জাতির পরিণতিকে অতি বিস্ময়জনক মনে হয় বটে, কিন্তু সব কিছু বলা সত্ত্বেও বলিতে হইবে তাহা ছিল এক মন্থর ও ভারগ্রস্ত প্রগতি। প্রত্যেক যুগকে প্রত্যেক সভ্যতাকে মানুষের নানা দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতার গুরুভার বহন করিতে হয়, পরবর্তী প্রত্যেক যুগ সে ভারের কিছুটা ফেলিয়া দেয় বটে, কিন্তু অতীতের কোন কোন গুণ হারাইয়া ফেলে, আবার অন্য ছিদ্র সৃষ্টি করে, নূতন পদস্খলনের দ্বারা নিজেকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন সংস্কৃতিকে বিচার করিতে গেলে তাহার ভাল ও মন্দ উভয় দিক তুলনা করিয়া দেখিয়া কোন্ দিক ভারি তাহা ঠিক করিতে হয়, তাহার এক অংশ না দেখিয়া তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, তাহা কোন্ দিকে মানুষকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয় এবং এজন্য বৃহৎভাবে এক ব্যবহারিক দৃষ্টি ব্যবহার প্রয়োজন; ইহা না করিলে কোন জাতির নিয়তিতে স্থির বিশ্বাস রক্ষা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা সবদিক দেখিলে বলিতে হয় যে, কোন সভ্যতার সর্বোত্তম যুগেও আমরা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছি প্রধানতঃ তাহা যুক্তিবিচার, কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার যৎকিঞ্চিৎ দ্বারা বর্বরতার অতিবৃহৎ স্তূপের একটু সামান্য পরিমাণে উপশম বা অপসারণ ছাড়া আর কিছু নয়। আজিও মানবজাতি অর্ধবর্বরতার উপরে উঠিতে পারে নাই, এবং মানবের বর্তমান যুগের ইতিহাসে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে কোন দিনই মানুষ ইহা ছাড়া অধিক কিছু হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সুতরাং প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে ভাল মন্দের মিশ্রণ আছে, প্রত্যেকের মধ্যে যথেষ্ট অব্যবস্থা দেখা যায়, আর শত্রুভাবপ্রণোদিত বা সহানুভূতিশূন্য পর্যবেক্ষক তাহার দোষত্রুটিগুলিই লক্ষ্য করে, এবং সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখে, তাহার খাঁটি প্রকৃতি এবং গুণগুলিকে উপেক্ষা করে, তাহার মধ্যে যে আলোক আছে তাহা দেখিতে পায় না এবং যে অন্ধকার আছে তাহাকে বড় করিয়া দেখে, প্রায় অপ্রশমিত অন্ধকার ও বিফলতার এক ছবি আঁকে এবং তাহার ফলে সে সভ্যতাকে বর্বরতার এক স্তূপ মনে করে, আর পক্ষান্তরে যে সমস্ত লোকের নিকট সে সভ্যতার প্রণোদক শক্তিসমূহের বৃহৎ ও যথার্থ মূল্য আছে, তাহারা সে ছবি দেখিয়া ন্যায্যভাবেই বিস্ময়াবিষ্ট ও ক্ষুণ্ণ বা ক্রুদ্ধ হয়। কারণ প্রত্যেক সভ্যতাই তাহার সংস্কৃতি ও সাধারণ কর্মের মধ্যে, সমগ্র মানবজাতির

পক্ষে যাহার বিশিষ্ট কোন মূল্য আছে এমন কিছু লাভ করিয়াছে, আমাদের প্রকৃতির কোন অব্যক্ত সম্ভূতিবীর্যকে (potentiality) অনেকটা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ পূর্ণতার জন্য প্রাথমিকভাবে বৃহৎ এক দাঁড়াইবার স্থান দিয়াছে। গ্রীস বিচারবুদ্ধি এবং রূপ ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্যের বোধকে বৃহৎভাবে গঠিত ও পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল, রোম শক্তি ও বীর্য, স্বদেশানুরাগ ও নিয়মশৃঙ্খলাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছিল, বর্তমান ইউরোপ ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞান, কর্মশক্তি এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে অতিমাত্রায় উন্নত করিয়া তুলিয়াছে; ভারতবর্ষ মানুষের অন্য সকল শক্তির উপর ক্রিয়াশীল অধ্যাত্ম মনকে গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং সে-সকল শক্তি অতিক্রম করিয়া বোধিভাবিত বিচারবুদ্ধির পরিণতি সাধন করিয়াছিল, আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত দর্শন দ্বারা পরিচালিত ধর্মের মধ্যে এক সামঞ্জস্য ও সুষমা আনয়ন করিয়াছিল; শাশ্বত ও অনন্তের বোধ জাতির জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। ভবিষ্যতে এই সমস্ত বস্তুকে আরও বৃহৎ ও পূর্ণ রূপে অধিকতর ব্যাপকভাবে পরিণত করিতে এবং নবতর শক্তিরাজিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, কিন্তু অতীতকে নিন্দা করিয়া অথবা উদ্ধত অসহিষ্ণুভাবে আমাদের নিজের ছাড়া অন্য সংস্কৃতিকে অসার বলিয়া ধিক্কৃত করিয়া তাহা ঠিকভাবে করিতে পারিব না। স্থিরভাবে বিচার ও নিরপেক্ষভাবে সমালোচনার মনোভাব লইয়া চলা প্রয়োজন তো বটেই, উপরন্তু আমাদিগের এমন এক সহানুভূতিশীল বোধি থাকা চাই, যাহাতে অতীত হইতে এবং মানবজাতির বর্তমান প্রচেষ্টা হইতে যে কোন উত্তম বস্তু নিষ্কর্ষিত করিতে পারা যায় তাহা করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ প্রগতির কার্যে যতটা সম্ভব ব্যবহার করিতে হইবে।

এই কথা স্বীকার করিয়া যদি আমাদের সমালোচক ভারতের 'অতীত সংস্কৃতি অর্ধবর্বর প্রকৃতির' একথা বলিবার জন্য জেদ করেন, তবে আমি তাহাতে আপত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির উপর তিনি যে ইউরোপীয় ভাবের সংস্কৃতিকে চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাহার সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবের সমালোচনা—তা সে সমস্তই সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক—করিবার অধিকার আমার আছে, ইহা স্বীকার করেন। এইরূপ প্রতিশোধমূলক বক্রোক্তিদ্বারা আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট অবকাশ ইউরোপীয় সভ্যতাতে যে আছে মিঃ আর্চার তাহা বুঝেন, সেই জন্য তিনি কাতরকণ্ঠেই বলিয়াছেন যে সেরূপ আক্রমণ উচিত হইবে না, এবিষয়ে তিনি প্রাচীন সেই নৈতিক বচনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, যাহা বলে 'তুমিও এরূপ কর' ইহা এক যুক্তি নহে। আমিও বলি যে এরূপ বক্রোক্তি নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রযোজ্য হইত যদি তাহার ভারতীয় সংস্কৃতির সমালোচনা বিদ্বেষবর্জিত হইত, যদি তাহাতে উদ্ধতভাবে তুলনা এবং অপমানজনক অছিলা না থাকিত।

যখন এই সমালোচক পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠতরতার নামে ভারতীয় ভাবধারা ও তাহার সভ্যতার সকল দাবি পদদলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন এরূপ উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক ও ফলপ্রসূ যুক্তিরূপে গৃহীত হইতে পারে। ভারতবর্ষ সংস্কৃতিগত পূর্ণতা লাভ করিতে বা উৎকৃষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ হইয়াছে, এই যুক্তি দেখাইয়া যখন তিনি আমাদের নিজের সত্তা ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করিয়া বশংবদ শিষ্যের মত পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করিবার জন্য জিদ করিতেছেন, তখন ইউরোপও ঠিক তেমনি মৌলিক কারণে অন্ততঃপক্ষে তেমনি ভীষণভাবে এক বিফলতার মধ্যে পড়িয়াছে, ইহা দেখাইয়া দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের এই প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে, যে বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি ও কার্যকুশলতা এবং অসংযতভাবে অর্থকরী উৎপাদন, যাহা মানুষকে তাহার দেহ ও প্রাণের ক্রীতদাস, এক বিরাট যন্ত্রের চাকা ও স্প্রিং অথবা এক অর্থনৈতিক জীবনের কোষাণুমাত্রে পরিণত করে, যাহা পিপীলিকা এবং মধুমক্ষিকার আদর্শে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, সত্য সত্য তাহারাই কি আমাদের সত্তার সমগ্র সত্য এবং সভ্যতার উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ আদর্শ? পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই আদর্শকে—যাহার পক্ষেও বহু বাধা ও বিপত্তি আছে—কোনক্রমেই অতিরিক্ত পরিমাণে উন্নত লক্ষ্যাভিমুখী বলা চলে না, আর ইহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া প্রাচীন ভারতের দুরূহ আধ্যাত্মিক আদর্শ অপেক্ষা অনেক সহজ হইবারই তো কথা। কিন্তু ইউরোপীয় মন ও প্রাণের কতটা পর্যন্ত আসলে যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, আর অবশেষে এই ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি ও কর্মকুশলতা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? ইহা মানুষের আত্মা ও মনপ্রাণে কতটা পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছে? আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আক্রমণশীল বিভৎসতা, তাহার দার্শনিক বিচারবুদ্ধির, সৌন্দর্য ও রসবোধের এবং ধর্মের প্রতি আস্পৃহার ন্যূনতা, তাহার নিরবচ্ছিন্ন চঞ্চলতা, তাহার রূঢ় ও অত্যাচারী যান্ত্রিকতার গুরুভার, তাহার আত্মার স্বাধীনতার অভাব, আধুনিক কালের বিরাট ও নিদারুণ পরিণাম, ভীষণ শ্রেণীগত সংঘর্ষ—এ সমস্তই এমন বস্তু যাহার হিসাব লওয়ার অধিকার আমাদের আছে। অবশ্য একথা বলি মিঃ আর্চারের সঙ্গে সুর মিলাইয়া—শুধু এই সমস্ত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অবতারণা এবং আধুনিক জীবনের উজ্জ্বলতর দিকগুলিকে উপেক্ষা করিলে, নিশ্চয়ই অন্যায় করা হইবে। বস্তুতঃ বহু বৎসর পূর্বে এমন এক সময় ছিল, যখন ইউরোপের অতীত সাংস্কৃতিক সম্পদকে প্রশংসা করিলেও আমার নিকট বোধ হইত যে, কৃষি শিল্প প্রভৃতি ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার বর্তমান সমাজব্যবস্থা এক বুদ্ধিভাবিত বিরাট বর্বরতা, এবং অতিপ্রশংসিত জার্মান জাতি তাহার সিদ্ধকাম নেতা ও নায়ক। জগতের মধ্যে চিৎপুরুষের প্রকাশ-

ধারার এক উদারতর দৃষ্টি আমার এই ধারণার মধ্যস্থিত একদেশদর্শিতা সংশোধিত করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে এক সত্য আছে যাহা ইউরোপ তাহার বিষম বিপদ ও মর্মান্তিক যন্ত্রণার দিনে স্বীকার করিয়াছিল, যদিও বোধ হইতেছে যে সাময়িকভাবে এ-বিষয়ে সে যে জ্ঞানালোক পাইয়াছিল, বর্তমানে তাহা অতি সহজেই ভুলিয়া যাইতেছে। মিঃ আর্চারের যুক্তি এই যে অন্ততঃপক্ষে পাশ্চাত্য দেশ তাহার বর্বরতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষ সন্তুষ্টচিত্তে তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা-সকলের মধ্যে গতিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অতি নিকট অতীতের পক্ষে একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তাহার পরের কথা কি? তবুও প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে যে ইউরোপ যে পথে চলিতেছে, মানুষের সাধন ও প্রচেষ্টার পক্ষে যে সমস্ত পথ উন্মুক্ত আছে তন্মধ্যে সেইটিই কি একমাত্র পরিপূর্ণ অথবা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা? আর ভারতবর্ষের পক্ষে যথার্থ পথ কি এই নয় যে, ইউরোপকে অনুকরণ না করিয়া—যদিও পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা হইতে সে অনেক কিছু শিখিতে পারে—তাহার নিজস্ব প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যাহা সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সারবস্তু তাহারই পরিণতিসাধন করিয়া সে তাহার রুদ্ধ গতিকে মুক্ত করিতে পারিবে?

এই দিকেই এত সুস্পষ্টভাবে ভারতের যথার্থ ও স্বাভাবিক প্রগতির পথ রহিয়াছে যে তাহা নষ্ট করিবার জন্য সয়তানের উকিলের স্বনির্বাচিত ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া মিঃ আর্চার-কে প্রতি পদে সত্যকে ধোঁকা দিতে হইয়াছে, আর সম্মোহন প্রেরণার যে যাদুমন্ত্র দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদিগকে ও আমাদের অতীতকে সমগ্রভাবে দোষী সাব্যস্ত করিতে, সংস্কৃতির স্থাপয়িতা ইংরাজের সূত্রে ধৃত অনুকরণকারী বানর হইয়া দাঁড়াইতে হইবে ইহা কল্পনা করিতে এবং তাহারই স্থূল বাদ্যযন্ত্রের সুরে নৃত্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল—কিন্তু বর্তমানে যাহার প্রভাব চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেই মন্ত্রকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাকে বৃথায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দাবির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ ও মৌলিকভাবে দাঁড়াইতে গেলে, তাহার মূল ধারণার মূল্য এবং তাহার আদর্শ, মেজাজ ও জগতের দিকে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে সমস্ত উচ্চবস্তু আছে তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধেই আপত্তি তুলিতে হয়। এজন্য তাহার আধ্যাত্মিকতার, শাশ্বত ও অনন্তের বোধের, আন্তর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার, দার্শনিক মন ও প্রকৃতির, ধর্মের লক্ষ্য ও অনুভূতির, বোধদীপ্ত বিচারবুদ্ধির, সার্বভৌম ও চিন্ময় একত্বের ধারণার সত্য ও মূল্যকে অস্বীকার করাই হইল একটি উপায় বা কৌশল; এবং ইহাই যে আমাদের সমালোচকের খাঁটি মনোভাব তাহা তাঁহার ভর্ৎসনার মধ্য দিয়া নিয়তই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তিনি সঙ্গতভাবে তাহার সে উদ্দেশ্য সাধন

করিতে পারেন না, কেননা ইহা করিতে গেলে এমন সকল আদর্শ ও ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয় যাহা মানব মন হইতে উন্মূলিত করা যায় না, আর সাময়িক অন্ধকারাচ্ছন্নতার পর বর্তমানে ইউরোপও যাহা অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্য চাতুরীপূর্বক এ বিষয় এড়াইয়া গিয়া বরং তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহার অতীত গৌরবময় এমন কি তাহার সর্বোত্তম যুগেও ভারতে কোন আধ্যাত্মিকতা, কোন প্রকৃত দর্শন, কোন সত্য ও উচ্চ ধর্মানুভূতি, বোধিভাবিত বিচারবুদ্ধির কোন আলোক, যাহার প্রতি সে প্রবল আস্পৃহা পোষণ করিয়াছে এমন কোন বৃহৎ বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহা অতি অযৌক্তিক স্ববিরোধী এক উক্তি; এই সমস্ত বিষয়ে প্রামাণিক অভিমত দিতে যাহারা সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহাদের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যে আমরা ইহার বিপরীত কথাই পাই। এইজন্য তিনি দুইটি অসমঞ্জস ও পরস্পর-বিরোধী উক্তিকে একত্র করিয়া তৃতীয় এক দিক হইতে আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ বলিয়াছেন, এই সমস্ত বৃহত্তর বস্তু দ্বারা গঠিত উচ্চতর হিন্দুত্ব ভারতবাসীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে আবার বলিয়াছেন যে, অতি ব্যাপকভাবে ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা দারুণ দুর্দৈবপূর্ণ ও আড়ষ্টকর, আত্মঘাতী ও প্রাণনাশক। এই সমস্ত পরস্পরের সহিত সঙ্গতিশূন্য আক্রমণের ধারাগুলিকে বিপুলভাবে একত্র করিয়া এবং তাহাদের সকলগুলিকে, ভারতের সংস্কৃতি তাঁহার মতবাদে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, মূল্যহীন এবং মানবজীবনযাত্রার প্রকৃত লক্ষ্যের অনিষ্টসাধক, এই একমাত্র সিদ্ধান্তের পরিপোষক করিয়া তুলিয়া, এ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগগুলি কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মিঃ আর্চার এই অবশেষে যাহা বলিয়াছেন আমরা শুধু তাহারই আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিতেছি, কেননা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারণাগুলির মূল্য নষ্ট বা তাহাদিগকে অস্বীকার করা যায় না। সে ধারণাগুলি মানবের সত্তা ও প্রকৃতির উচ্চতম ও গভীরতম গতিবৃত্তির মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে কোনরূপে হউক সর্বত্রই বিদ্যমান আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব শুধু এই বিভেদের মধ্যে রহিয়াছে যে, প্রায় অন্য সকল সংস্কৃতিতে যাহা অস্পষ্ট বা বিশৃঙ্খল অথবা অপূর্ণভাবে প্রকাশিত, ভারত বরং তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে, তাহার সকল সম্ভাবনা পরিমাপ করিতে, তাহার বিভিন্ন ধারা ও বিভাবকে নির্দিষ্ট করিতে এবং তাহাকে জাতির পক্ষে সত্য, সঠিক, বৃহৎ, সাধ্যায়ত্ব ও ব্যবহার্য করিয়া তুলিবার কঠোর প্রয়াস পাইয়াছে। এ সংস্কৃতির রূপায়ণগুলি একেবারে পরিপূর্ণ না হইতে পারে; তাহাদিগকে হয়ত আরও বর্ধিত, আরও উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, হয়ত অন্যভাবে স্থাপিত করিতে হইবে, যাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছে তেমন কিছুকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, রেখা ও রূপের কিছু

পরিবর্তন করিতে, কোন কোন বস্তুর প্রতি ঝোঁক কমাইতে ও দিক্‌ভুল সংশোধন করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শুধু উপপত্তি বা সিদ্ধান্তে নহে কিন্তু অখণ্ড ব্যবহার ও আচরণে এক দৃঢ় ও বৃহৎ ভিত্তিই স্থাপিত হইয়াছে। যদি প্রকৃত-পক্ষে জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিফলতা আসিয়া থাকে—এই বিষয়টি শুধু আলোচনা হইতে বাদ পড়িয়াছে—তাহা হইলে তাহা দুইটি কারণের কোন একটির জন্য ঘটিয়াছে; জীবন যেরূপভাবে বর্তমান আছে তাহার তথ্যাবলিতে আদর্শের প্রয়োগ হয়ত কোথাও আনাড়ীর মত কদর্যভাবে করা হইয়াছে, নতুবা জীবনের তথ্যাবলিকে মানিয়া লইতে আদৌ অস্বীকার করা হইয়াছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমরা যে অবস্থায় আছি প্রথমতঃ তাহার যতদূর সম্ভব সদ্‌ব্যবহার করিবার পূর্বেই হয়ত আমাদের সত্তার দূরাধিগম্য কোন উচ্চতায় অসময়ে পৌঁছিবার জন্য বিশেষ জিদ্‌ করা হইয়াছে। সান্তের মধ্যে গঠিত ও পরিণত হইবার পরই শুধু আমরা অনন্তে পৌঁছিতে পারি, যে মানুষ কালের ক্ষেত্রে বর্ধিত ও প্রসারিত হইয়াছে শুধু সে-ই শাশ্বতকে ধরিতে পারে, প্রথমে দেহ প্রাণ ও মনে উৎকর্ষ লাভ করিবার পরই কেবল আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অধিগত হইতে পারে। যদি সেই প্রাথমিক প্রয়োজনকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচালনা ও ধারণায় বৃহৎ, অকার্যকর (impracticable) ও অমার্জনীয় এক ভুল আছে ইহা কেহ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে ভারতীয় সভ্যতায় সেরূপ কোন ভুল করা হয় নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির লক্ষ্য ও ধারণা ও পদ্ধতি কি তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং তাহা হইতে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইবে যে, জীবন ও তাহার শিক্ষা অনুশীলনের মূল্যে সে পদ্ধতিতে যথেষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং সংস্কৃতির মধ্যে তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপিত করা হইয়াছে। এমন কি বৌদ্ধমত ও মায়াবাদের মত অত্যন্ত চরমপন্থী দর্শন ও ধর্ম, যাহা জীবনকে অনিত্য বা অবিদ্যা বলিয়া মনে করিয়াছে এবং তাহাকে অতিক্রম ও বর্জন করিতে হইবে এই মতবাদ পোষণ করিয়াছে, তাহারও এ সত্যের প্রতি দৃষ্টি হারায় নাই যে, যেখানে কালগত সত্তা অস্বীকৃত হইয়া যায় সেই জ্ঞানে ও নিত্যে পৌঁছিবার পূর্বে এই অবিদ্যা ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে থাকিয়া তাহারই বিধানানুসারে মানুষের নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বৌদ্ধমত কেবল নির্বাণ, শূন্য, বিলয় ও কর্মের পীড়াদায়ক নিষ্ফলতার এক মেঘময় রাজ্যে উন্নয়ন নহে: পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য ইহা এক বৃহৎ ও শক্তিশালী সাধনার ধারা দিয়াছে। সামাজিক ও নৈতিক জীবনের উপর ইহার যে বিশাল কার্যকরী প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, শিল্প ও ভাবনার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে এবং একটু ন্যূনতর মাত্রায় সাহিত্যে ইহা যে সৃষ্টিশীল আবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা তাহার সাধনার ধারায় প্রবল প্রাণশক্তির প্রচুর প্রমাণ দেয়। জগৎকে যাহা

অস্বীকার করিতে চায় এরূপ চরমপন্থী দর্শনের মধ্যেও যদি এরূপ সৃষ্টি-শীল কার্যকরী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির সমগ্রতার মধ্যে ইহা যে বৃহত্তরভাবে বর্তমান ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় মনে, বৌদ্ধমত এবং মায়াবাদ যেদিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই অতি উচ্চ ও কঠোর এক অতিরঞ্জনের দিকে চলিবার একটা ঝোঁক ছিল, তাহার জীবনবীণায় সে দিকের একটা সুর বাজিয়াছিল। আজ পর্যন্ত মানুষের মন যাহা রহিয়াছে তাহাতে এরূপ মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া অপরিহার্য; এমন কি তাহার মূল্য ও প্রয়োজন আছে। আমাদের মন সহজে এবং একবারের সর্বতোমুখী চেষ্টায় সত্যের সমগ্রতাতে পেঁাছিতে পারে না; কঠোর ও অতন্দ্রিতভাবে অন্বেষণই সত্যকে লাভ করিবার উপায়। মানুষের মন সত্যের বিভিন্ন দিক পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, প্রত্যেক দিকের চরম সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুসরণ করে, এমন কি কিছু সময় পর্যন্ত সেই একটিকেই একমাত্র সত্যরূপে ব্যবহার করে, তারপর আবার অপূর্ণ আপোষ করে, আঁধারে হাতড়াইয়া নানাভাবে নিষ্পত্তি করিয়া ক্রমে সত্যসম্বন্ধের নিকটে পেঁাছে। ভারতীয় মন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল; যতদূর পারিয়াছিল সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া এবং প্রত্যেক অবস্থায় দাঁড়াইয়া চেষ্টা করিয়াছিল, সকল প্রকার দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যকে দেখিয়াছিল, অনেক চরম পন্থায় চলিবার এবং অনেক প্রকার সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচক সাধারণতঃ মনে করে যে জীবনকে অস্বীকৃতির দিকের এই অতিরঞ্জন বাস্তবিকই ভারতীয় চিন্তা ও মনোবৃত্তির সমগ্রতা, অথবা ইহাই একমাত্র ধারণা যাহা তাহার সংস্কৃতিকে নির্বিরোধে শাসিত ও পরিচালিত করিয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষা মিথ্যা ও ভ্রমপূর্ণ আর কিছু হইতে পারে না। আদিযুগের বৈদিকধর্ম জীবনকে অস্বীকার করে নাই, বরং তাহার উপর পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিল, উপনিষদগুলিও জীবনকে অস্বীকার করে নাই, তাহাদের মতে জগৎ শাশ্বতের, ব্রহ্মের এক প্রকাশ; এখানকার সবকিছুই ব্রহ্ম, চিদাত্মায় সর্ববস্তু এবং সর্ববস্তুতে চিদাত্মা বর্তমান, স্বয়ম্ভু চিদ্‌বস্তুই সর্ববস্তু ও সর্বপ্রাণী হইয়াছেন; প্রাণও ব্রহ্ম, প্রাণশক্তিই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি, প্রাণের দেবতা বায়ুই অভিব্যক্ত শাশ্বত বস্তু, 'প্রত্যক্ষংব্রহ্ম'। কিন্তু উপনিষদ ইহাও বলিয়াছে যে মানুষের বর্তমান জীবনধারা তাহার উচ্চতম বা সমগ্র জীবন নহে; তাহার বাহ্য মন ও প্রাণ তাহার সমগ্র সত্তা নহে; পূর্ণ ও সার্থক হইতে হইলে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া তাহাকে বাহ্য ও মনোময় অবিদ্যা হইতে আধ্যাত্মিক আত্মজ্ঞানে পেঁাছিতে হইবে।

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম আসিয়া এই প্রাচীন শিক্ষার এক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং জীবনের অনিত্যতা ও শাশ্বতের নিত্যতার মধ্যে বুদ্ধি ও

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এক তীব্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং এই ধারণাকে প্রবল করিয়া তুলিয়া অতিমাত্রায় তপশ্চর্যার এক শুভবার্তা প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুর সমন্বয়শীল মন এই নৈতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল এবং অবশেষে বৌদ্ধধর্মকে দূর করিয়া দিয়াছিল, যদিও এই দিকের একটা প্রবণতা তাহার চরিত্রে সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই। শঙ্করের দর্শনে তাঁহার মায়াবাদে এই প্রবণতা উচ্চতায় পেঁাছিল, এবং ভারতীয় মনের উপর এই মত গভীর ছাপ অঙ্কিত করিল, আবার সে সময় এ জাতির পূর্ণ প্রাণশক্তি ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলিয়াছিল, এইজন্য কিছুকালের জন্য নৈরাশ্যবাদ ও পার্থিব জীবনের অস্বীকৃতিবাদ দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং ভারতীয় বৃহত্তর আদর্শকে বিকৃত করিয়া দিল। কিন্তু শঙ্করের মতবাদ কোনমতেই বেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থসকল, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নয় এবং অন্য বৈদান্তিক দর্শন ও ধর্মগুলি এই সকল গ্রন্থ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে অনেক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পেঁাছিয়াছিল এবং তাহারা মায়াবাদের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান কালে শাঙ্কর দর্শন সাময়িকভাবে গৌরবময় স্থানে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের ভাবনা ও ধর্মের প্রধান প্রধান সজীব ধারাসকল আবার আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সেই সমন্বয় সাধনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, যাহা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের এক মৌলিক অংশ ছিল। সুতরাং, মিঃ আর্চার বলিয়াছেন যে জীবন এবং সৃষ্টি ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভারত যাহা কিছু লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার সংস্কৃতির পরিচালক আদর্শ ও ধারণার বিরোধ সত্ত্বেই করিতে হইয়াছে, কেননা সে আদর্শ অনুসারে তাহার পক্ষে জীবন, সৃষ্টি ও কর্ম ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাঁহার এ ধারণা যেমন ভ্রান্তিপূর্ণ তেমনি অস্বাভাবিক এবং হাস্যোদ্দীপকভাবে বিকৃত। মানুষের বুদ্ধিকে, ক্রিয়া ও সংকল্পের শক্তিকে, তাহার রসবোধকে, তাহার নৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ—তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও অন্ততঃপক্ষে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও মুক্তির পক্ষে প্রাথমিক বিষয় রূপে এ সমস্ত অপরিহার্য-রূপে প্রয়োজনীয় ছিল। চিন্তা শিল্প সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে ভারতের সমস্ত বৃহৎ অবদান তাহার ধর্ম ও দর্শনপ্রধান সংস্কৃতির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম।

কিন্তু তথাপি এই যুক্তি দেখান হইতে পারে যে, মতবাদে যাহাই থাকুক না কেন, কার্যতঃ অতিরঞ্জন ছিল এবং জীবন ও কর্মকে নিরুৎসাহিত করা হইত। অন্য সব মিথ্যা উক্তি অপসারিত করিলে অবশেষে মিঃ আর্চারের সমালোচনা তাহাই হইয়া দাঁড়ায়; এখানে আত্মা, শাশ্বতবস্তু, সার্বভৌমতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও অনন্তের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহাতে তাঁহার মতে প্রাণ সংকল্প ব্যক্তিত্ব ও মানুষের কর্মকে ভগ্নোৎসাহিত করা হইয়াছে এবং

তাহা প্রাণধ্বংসকর এক মিথ্যা তপশ্চর্যা ও কঠোরতার দিকে মানুষকে লইয়া গিয়াছে। ভারত কখনও বড় কিছু লাভ করে নাই, কোন বৃহৎ ব্যক্তিত্বকে জন্ম দেয় নাই, সংকল্প ও অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে বিকলাঙ্গ ও শক্তিহীন রহিয়া গিয়াছে, তাহার শিল্প ও সাহিত্যে শুধু বর্বরতা ও বিকৃত অকৃতকার্যতার সন্ধান মিলে, তাহা ইউরোপের তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প ও সাহিত্যেরও সমতুল্য নয়। তাহার সুদীর্ঘ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনেতিহাস শুধু অসামর্থ্য ও বিফলতার বিবরণে পূর্ণ। অল্প বা বিস্তর অসঙ্গতিপূর্ণ উক্তি ব্যবহার করিতে এ সমালোচকের কোন দ্বিধা নাই, তিনি একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে সর্বদাই অবসন্ন ও জরাগ্রস্ত, বন্ধ্যা অথবা শুধু অপুষ্টাঙ্গ বিকৃত বস্তুর জননীরূপে দেখিয়াছেন তেমনি প্রায় একই নিঃশ্বাসে বলিয়াছেন যে ভারত জগতের মধ্যে একটি অতি মনোরম আশ্চর্য দেশ, তাহার শিল্প মন্ত্রশক্তির মত প্রবলরূপে আকর্ষণ করে, তাহার মধ্যে অগণিত স্থানে নানা সৌন্দর্যের সমাবেশ রহিয়াছে, তাহার বর্বরতা পর্যন্ত চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক; আবার সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হই যখন দেখি তিনি বলিতেছেন যে এখানে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাদের আভিজাত্যপূর্ণ প্রাচীন সূক্ষ্ম ও সুন্দর সভ্যতার আবাসভূমিতে গিয়া কোন ইউরোপীয় তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে মনে হইবে যে, যেন একজন অর্ধবর্বর কেহ আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে! কিন্তু মিঃ আর্চারের রোষকষায়িত ও অন্ধকারময় মনোভাবের মধ্যে এই যে মাধুর্যের চিহ্ন মধ্যে মধ্যে কেবল একটু চমকিয়া উঠে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার আর প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে দেখিতে হইবে তাঁহার সমালোচনার সারভাগের কতটা ভিত্তি আছে। ভারতের জীবন, সংকল্প, ব্যক্তিত্ব, অবদান, সৃষ্টির—যে সমস্ত বস্তু সে নিজে তাহার গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করে কিন্তু তাহার সমালোচক তাহাকে বলিতেছেন সে সমস্ত তাহার কলঙ্করূপে দেখিয়া বরং তাহার থরথরি কম্পমান হওয়া উচিত—প্রকৃত মূল্য কি ছিল তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। এই একমাত্র অত্যাবশ্যক বিষয় বিচার করিতে বাকি আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তব পরিণাম বিষয়ে যে অতি সাধারণ অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা খণ্ডন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। যে সমালোচকের সমালোচনায় আমি ব্যাপৃত আছি বস্তুতঃ তিনি পাগলের মত অতিরঞ্জনের বৃত্তি লইয়া লিখিয়া তাঁহার মামলা নিজেই মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় জীবনে বৃহৎ অথবা প্রবল কোন কর্ম দেখা যায় নাই, শুধু ইতিবৃত্তকথায় প্রাপ্ত বুদ্ধ এবং হীন-প্রভ অশোক ছাড়া ভারতে আর কোন বৃহৎ ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারত কখনই ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেয় নাই, কোন মহান কিছু সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই, এ সমস্ত কথা ঐতিহাসিক সত্যের এত বিরোধী যে, কেবল একজন শয়তানের উকিল তাহার মকর্দমা সাজাইবার জন্য এ সমস্ত কথা আদৌ ব্যবহার করিতে, এবং এরূপ স্থূলভাবে এত তীব্রতার সহিত উপস্থাপিত করিতে পারে। যে কেহ তাহার চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে মতই পোষণ করুক না কেন, ইহা সত্য যে ভারত বরাবরই এবং মহৎভাবেই বাঁচিয়া আছে। মোটের উপর প্রশ্ন এই যে জীবন বলিতে কি বুঝায় এবং কখন্ আমরা পূর্ণ এবং মহৎ জীবনযাপন করি? মানুষের আত্মার, তাহার শক্তি-সামর্থ্যের এবং যে ইচ্ছা কোন কিছু হইয়া উঠিতে বা কিছু গড়িয়া তুলিতে, চিন্তা ও কর্ম করিতে, ভালবাসিতে ও সিদ্ধিলাভ করিতে চায়, সেই ইচ্ছার সৃষ্টি এবং সক্রিয় আত্মপ্রকাশ ছাড়া জীবন নিশ্চয়ই অন্য কিছু নহে। যখন সে প্রকাশের অভাব ঘটে অথবা তাহার একান্ত অভাব অসম্ভব বলিয়া যখন বাহ্য বা আন্তর কোন কারণে তাহা খর্বিত, দমিত, নিরুৎসাহিত বা জড় ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমরা বলি জীবন বা জীবনী শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। বৃহত্তম অর্থে শক্তির লীলায়, কর্মের খেলায় আমাদের অন্তর ও বাহ্য সর্বত্র যে বিরাট ক্রিয়াজাল বয়ন করা হইতেছে তাহার সমগ্রতাই জীবন; ধর্ম ও দর্শন, ভাবনা ও বিজ্ঞান, কাব্য ও শিল্প, নাটক ও গান, নৃত্য ও খেলা, রাষ্ট্র ও সমাজনীতি, শ্রমশিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য, বিপদসঙ্কুল কর্ম ও ভ্রমণ, যুদ্ধ ও শান্তি, বিরোধ ও মিলন, জয় ও পরাজয়, আস্পৃহা ও ভাগ্য-

বিপর্যয়, ভাবনা, আবেগ, বাক্য, কার্য, সুখ ও দুঃখ—এ সমস্ত দিয়া মানবজীবন গঠিত। সংকীর্ণতর এক অর্থে কখনও কখনও অধিকতর প্রত্যক্ষগোচর এবং বাহ্য প্রাণ-ক্রিয়াকেই জীবন বলা হয়; সে জীবন মাথাভারি মননশীলতা অথবা তপশ্চর্যারত আধ্যাত্মিকতা দ্বারা খর্ব, চিন্তায় মলিন অথবা জগতের উপর বিরক্তির মলিনতর ছাঁচে ঢালা হইয়া পীড়িত ও অবসন্ন হইতে অথবা আচার-প্রধান, গতানুগতিক বা অতি কঠোর সমাজবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া নিস্তেজ, স্বাদহীন ও নীরস হইয়া পড়িতে পারে। আবার কোন সমাজের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত কোন অংশের মধ্যে জীবন খুবই সক্রিয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু সাধারণ লোকের জীবন নির্জীব শূন্যতায় ভরা এবং দুঃখময় হইতে পারে। অথবা অবশেষে এমনও হইতে পারে, কোন সমাজে কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপযোগী সাধারণ সমস্ত উপাদান এবং পরিবেশ আছে, কিন্তু তথায় মহৎ আশা, অভীপ্সা এবং আদর্শ দ্বারা জীবন উন্নীত হয় নাই; তাহা হইলে আমরা বেশ বলিতে পারি যে সে সমাজ প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া নাই, মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য যে মহত্ত্ব তাহাই তথায় অসম্পূর্ণ।

যে সমস্ত উপাদান দ্বারা মানবজীবনের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী ক্রিয়াধারা গঠিত হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। বরঞ্চ তাহা অসাধারণভাবে নানা বর্ণাঢ্য ও সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ ছিল। এ দেশ প্রধানতঃ কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা পরিচালিত হইত এবং জগৎ মিথ্যা এই মতবাদে শুধু বিশ্বাস করিত, মিঃ আর্চার এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন, আর এই ধারণা হইতে যুক্তি দ্বারা যে সমস্ত সম্পূর্ণ কল্পনাময় সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় তাহা দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞানে ভরা সমালোচনা তিনি গঠিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত তথ্যের সন্ধান যাহারা পাইয়াছে তাহাদের কেহই তাহা সমর্থন করে না, সমর্থন করিতে পারে না। এ কথা সত্য যে ইউরোপীয় লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশ এবং এ দেশ-বাসীর ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে বর্তমান যুগের পূর্ববর্তী ভারতীয় জীবনের সজীবতা, মনোরম পূর্ণতা, বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন,—দুঃখের বিষয় আজ ইতিহাস এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এবং অতীতের ভগ্ন বা ক্ষয়শীল কোন কোন অংশ ছাড়া আর তাহা বর্তমান নাই—আর যাঁহারা শুধু দূর হইতে দেখিয়াছেন অথবা কেবল কোন একটি বিভাগের উপর দৃষ্টি দিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় ইহাকে দর্শন ও তত্ত্বালোচনার, স্বপ্ন ও বিষাদময় কল্পনার দেশ বলেন, আবার সেই জাতীয় কোন কোন শিল্পী এবং লেখক এরূপ সুরে বর্ণনা করিয়াছেন যেন ইহা আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত একটি আজগুবি দেশ, তাঁহারা এখানে শুধু অস্বাভাবিক বর্ণ-বৈচিত্র্যের, নানা-প্রকার কল্পনার এবং অলৌকিক ব্যাপারের বাহ্য চকমকি শুধু দেখিতে

পাইয়াছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে, সভ্যতার অন্য যে কোন বৃহৎ কেন্দ্রের মত ভারতবর্ষ গুরুত্বপূর্ণ ও ঘনীভূত বাস্তবতার আবাসভূমি ছিল, এখানে চিন্তা এবং প্রাণের সমস্যাসকলের মীমাংসার প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল, সুনিয়ন্ত্রিত এবং জ্ঞানগর্ভ সমাজব্যবস্থা এবং বৃহৎ কর্মের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে এই যে সমস্ত অতি বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার জীবনের বহুমুখী দীপ্তি এবং পূর্ণতারই পরিচয় দেয়। তাহার রসানুভূতির দিক বহুবর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল; তাহার মধ্যে মহৎ স্বপ্ন এবং বৃহৎ ও উজ্জ্বল কল্পনার নানা খেলা চলিত, কেননা আমাদের জীবনের পূর্ণতার জন্য তাহাদেরও প্রয়োজন আছে; এ সমস্ত ছাড়া তাহার মধ্যে ছিল গভীর দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা, জীবনের বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মানুসন্ধানী সমালোচনা, একটা বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা, নৈতিক জীবনের অতি উচ্চ সুর এবং ব্যক্তিগত ও সংঘগত জীবনযাপনে অটল ও স্থায়ী সজীবতা। এই যে নানাভাবের সমাবেশ ইহার অর্থই সব দিক দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতা; যদিও দু চারটি অসাধারণ উদাহরণ ছাড়া প্রবল ভাবের অহংকারময় বিকৃতি এবং অতিরঞ্জনের দিকে ইহার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইতে পারে, কোন কোন লোকের ধারণায় সেই বস্তুই জীবনের পূর্ণতম সজীবতার প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়।

এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে বস্তুতঃ যেখানে ভারত বৃহৎ ও বিস্তৃতভাবে এবং তথাপি প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর মনোযোগ দিয়া এবং তাহাও পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে নাই, এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে যাহা লইয়া সে সাধনা করে নাই, সিদ্ধিলাভ করে নাই বা সেখানে কিছু সৃষ্টি করে নাই? তাহার আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক অবদানের সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পৃথিবীর বুকে হিমালয় যেরূপ দাঁড়াইয়া আছে তাহা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি "পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ", পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে তাহা অবস্থিত আছে, স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সীমাকে মাপিয়া দেখিয়াছে, অসীমের বহুদূর পর্যন্ত জানিতে ও বুঝিতে চাহিয়াছে, অতিচেতনার এবং অধিচেতনার, (superconscient and subliminal) আধ্যাত্মিক সত্তার এবং প্রাকৃত সত্তার উচ্চতর এবং নিম্নতর সমুদ্রের মধ্যে দুই বিপরীত প্রান্ত হইতে অবগাহন করিয়াছে। কিন্তু তাহার দর্শনসমূহ, ধর্মের সাধনাসকল, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের মনীষী-প্রতিষ্ঠাতা, সাধুসন্ত ও মহান ব্যক্তিসকলের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়, এ সমস্ত তাহার প্রকৃতি এবং আদর্শের জন্য স্বভাবতঃই তাহার প্রধানতম গৌরবের বস্তু হইলেও একমাত্র ইহারাই তাহার গর্বের বিষয় ছিল না, ইহাদের প্রাধান্য দ্বারা অন্য ক্ষেত্রের গৌরব খর্বীভূত হয় নাই। ইহা এখন

প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্তমান যুগের পূর্বে বিজ্ঞানেও ভারত সকল দেশের অগ্রগামী ছিল, এমন কি ইউরোপও জড় বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থার জন্য গ্রীসের মত সমভাবেই ভারতের কাছে ঋণী, যদিও তাহারা সাক্ষাৎভাবে ভারতের নিকট তাহা পায় নাই, পাইয়াছে আরবগণের মধ্য দিয়া। যদি সে এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়া থাকে তবে এই প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যে বলিষ্ঠ মননশীল জীবন ছিল তাহা প্রচুরভাবে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা প্রধান রূপে আলোচিত হইত বিশেষ করিয়া সেই গণিত বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রে সে অনেক কিছু আবিষ্কার এবং সুন্দর রূপে বিধিবন্ধ করিয়াছিল, এবং যুক্তি অথবা পরীক্ষা দ্বারা এমন কোন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং ধারণার পূর্ব সিদ্ধান্ত বা পূর্বাভাষ দিয়াছিল, যাহার প্রথম আবিষ্কার ইউরোপ অনেক পরে করিয়াছে এবং তাহা নূতন এবং পূর্ণতর উপায়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। শল্যশাস্ত্রে (surgery) ভারত প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং তাহার চিকিৎসাবিদ্যা আয়ুর্বেদ এখনও বাঁচিয়া আছে এবং আজিও তাহার মূল্য আছে, যদিও মধ্যযুগে তাহার সে জ্ঞান হ্রাস পাইয়াছিল এবং বর্তমানে সে তাহার প্রাণশক্তি পুনরায় লাভ করিতেছে।

সাহিত্যে, মনের জীবনে ভারত মহৎভাবে বাস এবং মহৎভাবে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার যে কেবল বেদ উপনিষদ ও গীতা আছে তাহা নহে, সেক্ষেত্রে ততটা প্রধান না হইলেও অন্য যে সমস্ত শক্তিশালী এবং সুন্দর কীর্তি, ধার্মিক ও দার্শনিক কবিতার যে অতুলনীয় নিদর্শনসকল আছে, যেরূপ ধরনের মূল্যবান মহৎ বস্তু ইউরোপ কখনই বিশেষ সফলতার সহিত গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে এখানে শুধু মহাভারত ও রামায়ণের কথা উল্লেখ করিব, মহাভারতকে এ জাতির এক বিরাট সৌধ বলিতে পারি, যাহার কাব্য সাহিত্যের আবেষ্টনের মধ্যে এ জাতির এক দীর্ঘ গঠনশীল যুগের জীবনকে এমন পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের মধ্যে একটা প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে "যাহা নাই ভারতে (মহাভারতে) তাহা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)"। বিষয়বস্তুর উপযোগী এই ক্ষুদ্র সরল বাক্যে যদি বা কিছু অতিরঞ্জন থাকে তবু তাহাতে যাথার্থ্যও আছে; তাহার পর, যাহা তদ্‌জাতীয় কাব্য সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং অনন্যসাধারণ সেই রামায়ণের কথা বলা যাইতে পারে, অতি গৌরবান্বিত অশেষ সৌন্দর্য-বিভূষিত নৈতিক আদর্শ এবং প্রায় দিব্যভাবে বিভাবিত এক মানবজীবনের বীরত্বগাথাপূর্ণ এই মহাকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে চমকপ্রদ সমৃদ্ধি, পূর্ণ ও নানা বর্ণোপেত কাব্যরস, উচ্চ এবং সংস্কৃত চিন্তাধারা, ইন্দ্রিয়ের ভোগ, কল্পনা, নানা ক্রিয়া ও বিপৎসঙ্কুল অভিযানের আখ্যায়িকা;—যে সমস্ত উপাদানে তাহার

শ্রেষ্ঠযুগের রোমান্টিক কথাসাহিত্য গঠিত হইয়াছিল তাহার সমস্তই রামায়ণে আছে। আবার সংস্কৃত ভাষার জীবনীশক্তি হ্রাস হইবার সঙ্গে এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী সৃষ্টিসামর্থ্য লোপ পায় নাই, এবং প্রথমে পালি এবং প্রাকৃত—দুঃখের বিষয় এই ভাষার অনেক কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে*—এবং তামিল এবং পরে হিন্দী, বাঙলা, মারাঠী এবং অন্যান্য ভাষাগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং মহান ও সুন্দর গ্রন্থসকল বহুল পরিমাণে রচনা করিয়াছে। ভারতের চিত্রশিল্প স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য বহু শতাব্দীব্যাপী ঝটিকাসঙ্কুল ধ্বংসের পরেও নিজের পরিচয় নিজে দিতে সমর্থ; রসবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের যে সমস্ত লোকের দৃষ্টি সংকীর্ণ তাহাদের বিচারফল যাহাই হউক না কেন—অন্ততঃপক্ষে ইহাদের সূক্ষ্ম কার্য এবং নৈপুণ্য অথবা তাহাতে ভারতীয় মনকে প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি অস্বীকৃত হইতে পারে না —তবুও ইহার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টিশীল ক্রিয়াশীলতা যে আছে ইহা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এবং সৃষ্টিই প্রাণের এবং মহৎ সৃষ্টি বৃহৎ প্রাণের প্রমাণ দেয়।

কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে এ সমস্ত মনের বস্তু; ভারত বুদ্ধি, কল্পনা এবং রসবোধের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে কিন্তু তথাপি তাহার বাহ্য জীবন অবসন্ন, জড়তাগ্রস্ত, দরিদ্র এবং তপশ্চর্যার কঠোরতার রঙে রঞ্জিত হইয়া বিষাদাচ্ছন্ন ছিল, তাহার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিত্ববোধ ছিল না, তাহার জীবন ছিল কার্যকরীশক্তিহীন, ব্যর্থ। এ সিদ্ধান্ত হজম করা কঠিন, কেননা যেখানে জীবন শূন্যতায় ভরা সেখানে সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞান গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রকৃত তথ্য কি? ভারতের শ্রেষ্ঠ লোকের তালিকার মধ্যে যেমন আছে তাহার মহান সাধু, সন্ত, মনীষী, ধর্মপ্রবর্তক, কবি, স্রষ্টা, বৈজ্ঞানিক, বিদ্বান, আইন-প্রণেতা বা সংহিতাকারগণের নাম, তেমনি আছে তাহার মহান শাসনকর্তা, রাষ্ট্রনেতা, সৈনিক, বিজয়ী বীরগণের উল্লেখ, যাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবল ও সক্রিয়, মন ছিল যেমন পরিকল্পনা করিতে সমর্থ তেমনি জ্ঞানগর্ভ গঠনশীল শক্তিতে বিভূষিত। ভারত যুদ্ধ ও শাসন করিয়াছে, বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহার সভ্যতার বিস্তারসাধন করিয়াছে, রাষ্ট্রনীতি এবং সঙ্ঘ ও সমাজ জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে—কোন মহান জাতির যে সমস্ত বাহ্য ক্রিয়াধারা থাকে তাহার সমস্তই তাহাতে ছিল। তাহার প্রকৃতির পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং তাহার প্রধান ভাবধারা যাহাতে প্রকাশ পায় এমন ধরনের সুস্পষ্ট ক্রিয়ার দিকেই প্রত্যেক জাতি ঝুঁকিয়া পড়ে, তাই যেমন এক-

*উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, পৈশাচী ভাষার সেই একদা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কথা—কথাসরিৎসাগর যাহার নিম্নস্তরের অনুবাদ।

সময় রোম তাহার সৈনিক এবং রাষ্ট্রনেতা ও শাসনকর্তাদের মধ্যেই প্রধানতঃ বাঁচিয়া ছিল, তেমনিভাবে ভারতের শীর্ষস্থানে মহান সাধু সন্ত এবং ধর্ম-বীরগণ দেখা দিয়াছিলেন এবং এই মহত্ত্বের তালিকায় অবিচ্ছিন্নরূপে তাঁহাদের এত নাম রহিয়াছে যাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন কালে স্পষ্ট দৃশ্যমান প্রধান মূর্তি ছিল ঋষির এবং তাহার ঠিক পশ্চাতে ছিল বীরপুরুষ, পরবর্তী যুগের অতি বিস্ময়কর প্রধান বিশেষত্ব এই যে তথায় বুদ্ধ ও মহাবীর হইতে রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতিতে এবং তৎপরে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দে ইঁহাদের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নির্ণয়যোগ্য ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ঊষা হইতে চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোক, গুপ্তসম্রাটগণের বিস্ময়কর মূর্তি এবং তারপর মধ্যযুগের বহু প্রসিদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্য দিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রনেতা ও শাসনকর্তাদের আশ্চর্যজনক কীর্তিকাহিনীরও সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র এবং মুখ্যতন্ত্র (republic, democracy and oligarchy) প্রভৃতি শাসনতন্ত্র ছিল এবং অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল যাহাদের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এখন আর পাওয়া যায় না। তাহার পর সাম্রাজ্য গঠনের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা চলে, সিংহল এবং ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, পাঠান এবং মোগল বংশীয়গণের উত্থান-পতনের বিপুল সংগ্রাম চলে, দক্ষিণে হিন্দুর পুনরুজ্জীবনের সংগ্রাম দেখা দেয়, রাজপুত জাতির বীরত্বের বিস্ময়কর বিবরণ নয়নপথবর্তী হয়, মহারাষ্ট্র দেশে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত মহান জাতীয় জাগরণ যেন বিস্ফোরণের আকারে আসিয়া পড়ে এবং অবশেষে শিখ খালসা জাতির উত্থান হয়। ভারতের এই বহির্জীবনের চিত্র যথাযথভাবে এখনও অঙ্কিত হয় নাই, একবার হইলে তখন অনেক কল্পিত কাহিনী লোপ পাইবে। যাহাদের মন, সংকল্প ও প্রাণের শক্তি ছিল না, বিষাদময় এবং সর্ববিধ্বংসী তপশ্চর্যার কঠোরতার গুরুভারে যাহাদের সতেজ মনুষ্যত্ব চূর্ণীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যত্বের তেমন ক্ষীণ ছায়ামাত্র দ্বারা এই পুঞ্জীভূত ক্রিয়াবলি নিশ্চয়ই সংসাধিত হয় নাই; অথবা এ সমস্ত জীবন ও কর্মে বিতৃষ্ণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণশীল কেবল তত্ত্বচিন্তা-পরায়ণ লোকের কীর্তিচিহ্ন বলিয়াও বোধ হয় না। যে মানুষ কুশপুত্তলিকা অথবা প্রাণশূন্য ইচ্ছাশক্তিবর্জিত সাক্ষীগোপালমাত্র অথবা শক্তিশূন্য কেবল স্বপ্নশীল, সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে এরূপভাবে কর্ম করা, পরিকল্পনা স্থির করা, বিজয়সাধন করা সম্ভব নয়, সেরূপ লোকে এরূপ বৃহৎ শাসনতন্ত্র গড়িতে, রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে, কাব্য শিল্প এবং স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হইতে অথবা পরবর্তী যুগে বীরত্বের সহিত একচ্ছত্র রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে এবং সমাজ কিম্বা জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে সমর্থ

হইত না। একথাও সত্য নহে যে ভারতে এক প্রাণশক্তিহীন জাতিই নিজের জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে, অথবা অবিচ্ছিন্ন বিপৎপাতে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যেও সর্বদাই নূতনভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের সমালোচকগণের নিকট যাহা বিরক্তিকর ও দুঃখদায়ক, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতে সেই পুনরুজ্জীবন, যাহাকে এখন সময় সময় ভারতের রেঁনেসাস বা নবজাগরণ নামে বর্ণিত করা হয় তাহা, যে ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের সহস্র বৎসরব্যাপী জীবনে সর্বদা ঘটিয়াছে, পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে তাহারই নব রূপ গ্রহণ; অবশ্য গণ-আন্দোলন এবার পূর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট হইলেও ব্যাপকতায় বৃহত্তরভাবে দেখা দিয়াছে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এই সংস্কৃতি এবং তাহার পদ্ধতির বলে ভারতে সমগ্র জাতিই সাধারণ জীবনে অংশগ্রহণ করিত। সকল দেশেই অতীতে জনসাধারণ উচ্চপদ বা পদবীতে অধিষ্ঠিত কতিপয় লোক অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে সক্রিয় ও সতেজ জীবন যাপন করিয়াছে, সময় সময় কোনমতে জীবন ধারণের উপযোগী উপাদান লইয়া তৃপ্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, সম্পন্ন জীবনের সূচনাও তাহাদের জীবনে দেখা দেয় নাই—বর্তমান সভ্যতাও এই বৈষম্যকে দূর করিতে পারে নাই, যদিও তাহা অধিকসংখ্যক লোকের জীবন, চিন্তা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা আনিয়াছে অথবা অন্ততঃ-পক্ষে তাহার জন্য প্রাথমিক উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা জীবনের শক্তি ও সম্পদের বৃহত্তর অংশকে পরিচালনা করিত বা অধিকৃত রাখিয়াছিল, তবুও জনসাধারণও বহু পরবর্তী সময় পর্যন্ত সতেজভাবেই বাস করিত, যদিও তাহা পরিমাণে অল্পতর ছিল এবং যদিও তাহাদের মধ্যে শক্তি তেমন ঘনীভূত আকারে না থাকিয়া সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া বর্তমান ছিল। অন্য সকল দেশবাসী অপেক্ষা তাহাদের ধর্মজীবন অধিকতর সতেজ ছিল; বিস্ময়কর দক্ষতার সহিত তাহারা দার্শনিকের চিন্তাধারা এবং সাধু-সজ্জনের প্রভাব গ্রহণ করিত; তাহারা বুদ্ধ এবং তাঁহার পরে যে বহু মহাপুরুষ আসিয়াছেন তাঁহাদের কথা শুনিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে; তাহারা সন্ন্যাসীগণের দ্বারা শিক্ষিত হইত এবং ভক্ত ও বাউলগণের গান গাহিত, এই ভাবে ভারত সমগ্র জগতের ইতিহাসে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে সূক্ষ্মতম, মধুরতম, এবং সুন্দরতম এক কাব্য-সাহিত্যের অধিকারী হইয়াছে; আমাদের ধর্মের অনেক বৃহত্তম ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়াছেন, অন্ত্যজ জাতির মধ্যেও এমন সকল সাধু জন্মিয়াছেন, সমস্ত সমাজ যাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়াছে। প্রাচীন কালের হিন্দুদের সময়ে রাষ্ট্রিক জীবনে ও শক্তিতেও তাহাদের অংশ ছিল; এই জনসাধারণ বেদে 'বিশঃ' নামে পরিচিত ছিল। রাজগণ তাহাদের নেতা থাকিতেন, ইহাদের এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

বংশেই ঋষিরা জন্মিয়াছিলেন; তাহারা তাহাদের গ্রামকে স্বায়ত্তশাসনশীল ক্ষুদ্র গণতন্ত্র রূপে শাসন করিত; যখন বৃহৎ রাজ্য এবং সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল তখন স্বায়ত্ত শাসন সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিটিতে অথবা পৌরসভার (urban council) তাহারাই সভ্য হইত; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাই যে অধিকাংশ আদর্শসূচক রাজকীয় সমিতি এই জনসাধারণ বা বৈশ্যগণ দ্বারা গঠিত হইত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অভিজাত বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা নহে; বহুদিন পর্যন্ত তাহারা দীর্ঘ সংগ্রাম বা সংঘর্ষ ব্যতীত তাহাদের অসন্তোষের একবার বহিঃপ্রকাশ মাত্র দ্বারা, রাজার উপরে তাহাদের সংকল্প চাপাইয়া দিতে পারিত। যতদিন পর্যন্ত হিন্দু রাজত্ব ছিল ততদিন পর্যন্ত এ সমস্তের কতকটা বিদ্যমান ছিল, এমন কি যখন মধ্য এসিয়া হইতে পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচারশাসন-তন্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইল—যে ভাবের বস্তু কখনও ভারতে জাত হয় নাই—তখনও এ প্রাচীন ধর্মের কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল। শিল্প এবং কবিতায়ও জনসাধারণের অংশ ছিল, প্রাচীন কালে ভারতীয় সংস্কৃতির তত্ত্বসকল জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে ব্যবস্থা (যাত্রা নামধেয়) একপ্রকার জনপ্রিয় নাটকাভিনয়, দেশের কোন কোন অংশে এ ব্যবস্থা এই সেদিন পর্যন্তও বর্তমান ছিল; এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া অনেক শিল্পী ও রচয়িতার এবং প্রচলিত ভাষাসমূহের অনেক প্রসিদ্ধ কবির সৃষ্টি হইয়াছিল; এই সমস্ত শিল্পী এবং কবিগণ তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী অতীত সংস্কৃতির বলে জনসাধারণের মনে স্বাভাবিক রসবোধ এবং রসানুভূতিবৃত্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ভারতের কারু-শিল্পীদের কর্মেও এ রসবোধের আশ্চর্য পরিচয় সর্বদাই পাওয়া যাইত, অবশেষে বর্তমান সভ্যতার এক ফল রূপে রসবোধ স্থূলতা প্রাপ্ত বা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে সে সমস্ত ধ্বংস বা অধঃপতিত হইয়াছে। আমাদের সমালোচকের অতিরিক্ত যুক্তিশীল মন ভারতীয় জীবনকে কঠোর বিষণ্ন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিবে বলিয়া আশা করে, বস্তুতঃ তাহা অন্যরূপ ছিল। অন্য দেশবাসী অপেক্ষা ভারতবাসী বাহিরে বেশী শান্ত, বিদেশীর নিকট তাহারা কতকটা গম্ভীর ও সংযতবাক, এই জন্য বৈদেশিক পর্যবেক্ষক অনেক সময় তাহাদের ভুল বুঝে, বর্তমান কালে কঠোরতা দারিদ্র্য এবং নিয়মপরায়ণতার আধিক্যের দিকে ঝোঁকের কিছু ফল অবশ্য তথায় দেখা দিয়াছে; কিন্তু সাহিত্যে যে জীবন অঙ্কিত দেখিতে পাই তাহা ছিল সুখী এবং সতেজ, এমন কি বর্তমানেও অবসাদজনক বহু শক্তির ক্রিয়া সত্ত্বেও কোন কোন প্রকৃতির লোকের কথা বাদ দিলে সে জীবন মানুষকে সহজেই হাসিকৌতুকের দিকেই লইয়া যায়; ভারতীয় চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার জীবনে ধৃষ্টতাশূন্য স্ফূর্তি আছে অথচ ভাগ্য-বিপর্যয়ে সে নির্বিকার থাকিতে পারে।

তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃতির ফলে ভারতের অধিবাসীগণের সজীবতা সংকল্প ও কর্মের অভাব ঘটিয়াছিল, এই সমগ্র মতবাদ একটা উপকথা মাত্র। পরবর্তী কালে যে পরিবেশে ইহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় তাহার কথা আমি যথাস্থানে বলিব; কিন্তু তাহা অবনতির দিকের একটা বিশেষত্ব এবং তখনও অনেক সীমার মধ্যে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার মহত্ত্বের অতি বৃহত্তর যুগের ইতিহাস আমাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেরই পরিচয় দেয়। সে ইতিহাস ইউরোপীয় পদ্ধতিতে রচিত হয় নাই, কেননা ইতিহাস ও জীবনী রচনার কলাকৌশল যদিও একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই তবুও ভারতে কোনদিন তাহার পূর্ণতা সাধন হয় নাই, প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের সাহিত্য লিখিত হয় নাই, এবং একমাত্র কাশ্মিরের ইতিবৃত্ত ছাড়া মুসলমান অধিকারের যুগের পূর্ববর্তীকালীন রাজা, মহৎ ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের কর্মের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই ইহা একটা ত্রুটি, জাতির জীবনে যাহা এক গুরুতর ফাঁক রাখিয়া গিয়াছে। ভারত গভীর ভাবে এবং সতেজে বাস করিয়াছে কিন্তু তাহার জীবনের ইতিহাস লিখিতে সে বসে নাই। তাহার আত্মা এবং মন তাহাদের মহান স্মৃতিচিহ্নসকল রাখিয়া গিয়াছে এবং যতদূর আমরা জানি অন্য সমস্ত বিষয়, আরও বাহিরের বস্তুসকলের—এবং সবদিকে দেখিলে তাহাও অল্প নহে—যতটুকু শুধু বর্তমান আছে অথবা তাহার অবহেলা সত্ত্বেও বর্তমানে তাহার যতটা অধুনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই শুধু জানিয়াছি; যেটুকু সঠিক বিবরণ ছিল তাহার স্মৃতিও ধীরে ধীরে মলিন, বিস্মৃত বা বিলুপ্ত হইতে দেওয়া হইয়াছে। মিঃ আর্চার যখন আমাদিগকে বলেন, আমাদের জাতির ইতিহাসে কোন মহৎ ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় না, তখন হয়ত তিনি খাঁটি এই অর্থে বলেন যে তাঁহাদের কথা তাঁহার মনে পৌঁছায় নাই, কেননা তাঁহাদের কর্ম ও বাক্যসকল পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হয় নাই; তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, সংকল্পশক্তি ও সৃষ্টিসামর্থ্য কেবল তাঁহাদের কর্মে অথবা অভিব্যঞ্জক কোন জনশ্রুতি বা আখ্যায়িকা অথবা অপূর্ণ বিবৃতি রূপে শুধু প্রকাশ পাইয়াছে। অত্যন্ত আশ্চর্য এবং অপরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে যে তপশ্চর্যার প্রভাবে জীবনের উপর অনুরাগ না থাকিবার জন্যই এই অঙ্গহীনতা দেখা দিয়াছে; ইহা মনে করা হইয়াছে ভারত শাশ্বতে এত বেশী অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে ইচ্ছাপূর্বক কালকে বা কালের ক্ষেত্রের সবকিছুকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করিয়াছে, তপশ্চর্যাময়, উদ্বিগ্ন ও বিষাদজনক চিন্তাধারা এবং নিশ্চলতাপূর্ণ শান্তির অনুসরণে সে এমন গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া ছিল যে কর্মের স্মৃতিকে ঘৃণা করিয়াছে এবং তাহাতে কোন প্রকার মনোযোগ দেয় নাই। ইহা আর একটা উপকথা। অন্য অনেক প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেও তেমনি ধারাবাহিক এবং সুচিন্তিত বিবরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহাতে কেহও

এরূপ ইঙ্গিত করে না যে অনুরূপ কারণে ঈজিপ্ট, এসিরিয়া বা পারস্যকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দ্বারা পুনর্গঠিত করিতে হইবে। গ্রীসের প্রতিভা ইতিহাস বিদ্যাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু কেবল তাহার কর্মজীবনের শেষভাগে; আর ইউরোপ এ বিদ্যাকে পুষ্ট এবং রক্ষা করিয়াছে; ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা এ বিদ্যাকে গড়িয়া তোলে নাই অথবা ইহার পূর্ণ পরিণতি উপেক্ষা করিয়াছে। ইহা একটা ত্রুটি বা দোষ বটে কিন্তু এই একটি মাত্র কারণে কেন আমরা ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য আরোপ করিব অথবা জীবনে তাহাদের কোন অনুরাগ ছিল না ইহা বলিব? এই ত্রুটি সত্ত্বেও যতই আমরা অতীতের মধ্যে অনুসন্ধান চালাই ততই বিপুল পরিমাণে তেমন উপাদানের সাক্ষাৎ আজিও পাই, যাহাতে স্পষ্টরূপে ভারতের অতীত জীবনের মহত্ত্ব ও ক্রিয়াশীলতার আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

কিন্তু তথাপি আমাদের সমালোচক বলিতে চাহেন যে ভারত এত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কোনক্রমে বাঁচিয়া আছে এবং এই সমস্ত অতিবহুল ক্রিয়ার মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির ক্ষীণতা এবং মহান ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের অভাবের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যে সমস্ত উপায়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে নিরপেক্ষ সমালোচকের মনোভাব হইতে সাংবাদিকের অথবা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া কুৎসাকারীর বিপুলতর পরিচয়ই অধিক পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় ভারত শুধু একটি, বড়জোর দুইটি নাম দিয়াছে। অবশ্য এখানে সে তালিকার অর্থ ইউরোপীয় তালিকা এবং ইউরোপীয় মন দ্বারা প্রস্তুত বিশ্ব তালিকা, যে তালিকা ইউরোপের ইতিহাস এবং অবদান হইতে তাহার নিকটে অবস্থিত এবং পরিচিত মূর্তিসকল দিয়া ঠাসিয়া ভর্তি করা হইয়াছে, এবং দূর প্রাচ্য হইতে অধিকতর প্রবল প্রকৃতি বিশিষ্ট কতিপয় নাম মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত নাম শুধু নেওয়া হইয়াছে যাহাদিগকে উপেক্ষা করা অতি দুরূহ বলিয়া বোধ করিয়াছে। মনে পড়ে এক বড় ফরাসী কবি সমস্ত জগতের সাহিত্যিকগণের তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া ফরাসী সাহিত্যিকগণের নামে তালিকাটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; সে তালিকায় ফরাসী নামের সংখ্যা সমস্ত ইউরোপের সকল দেশের নামের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। যদি কোন ভারতীয় ঠিক একই রকম মনোবৃত্তি লইয়া এই কষ্ট করিতে বসে তবে সে ঠিক সেইরূপ অফুরন্ত ভারতীয় নাম দিয়া তালিকা পূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহার মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা, আরব ও পারস্য, চীন ও জাপান হইতে কেবল কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির নাম ভারতীয় বৃহৎ দেহের পশ্চাতে ক্ষুদ্র লাঙ্গুলের মত শুধু জুড়িয়া দিবে। পক্ষপাতদুষ্ট এই মননের এ সমস্ত ব্যায়াম কৌশলের কোন মূল্য নাই। মিঃ আর্চার যখন

কেবল তিন চারিজন ভারতীয়কে তাঁহার তালিকায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকেও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এমন কি তাঁহাদের অনুরূপ ইউরোপীয় অমরগণের তুলনায় তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ভারতের অন্য সকল মহৎ ব্যক্তির নাম বাদ দিয়াছেন, তখন তিনি কোন্ মানদণ্ড দিয়া মূল্য বিচার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। সতেজ এবং মনোরম জীবন ও প্রকৃতি লইয়া যিনি কেবল মাত্র রাজ্য স্থাপন করেন নাই কিন্তু একটা জাতিকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই শিবাজি কিসে ক্রমওয়েল (Cromwell) অপেক্ষা হীনতর ছিলেন, অথবা যাঁহার মহান আত্মা তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী মর্তজীবনে বিজয়ী বীরের মত সমস্ত ভারতে বিচরণ করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর ধর্মজীবন পুনর্গঠিত করিয়াছিল সেই শঙ্করের ব্যক্তিত্ব লুথার (Luther) অপেক্ষা কিসে হীনতর ছিল? যাঁহারা ভারতে সাম্রাজ্য গঠন পদ্ধতিকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং নানা পরিবর্তনের—অনেক সময় ভীষণ ও বিপদজনক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত যাঁহাদের বৃহৎ রাজ্য শাসন পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে সেই চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যকে ইউরোপীয় ইতিহাসের শাসনকর্তা এবং রাজনীতিবিদ-গণের অপেক্ষা নিম্নতর পুরুষ কেন ধরা হইল? মিঃ আর্চার যাহার কথা তুলিয়া তুলনা করিয়াছেন সেই এথেন্স-এ (Athens) অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যেরূপ বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল ভারতের জীবনে তেমন কোন সময়ের লিখিত বিবরণ না থাকিতে পারে; নবজাগরণ (Renaissance)-এর যুগে ইটালির সহরগুলিতে যেরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে বহু শক্তিশালী মূর্তির সমাগম হইয়াছিল—অবশ্য তাহাদের মধ্যে অনেক ছিল যাহাদের সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছে, অনেক ছিল যাহারা বিক্ষোভকারী, এমন কি অনেক ছিল যাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ঘৃণ্য—ভারতে তাহার অনুরূপ কিছু না থাকিতে পারে, যদিও তাহার জীবনে এমন সময় গিয়াছে যখন অন্য-ভাবের মহান ব্যক্তির মূর্তিরাজিতে তাহা ভরপুর হইয়াছে। কিন্তু ভারতে অনেক রাজা বা শাসনকর্তা, রাজনীতিবিদ্ এবং শিল্পের উৎসাহদাতা জন্মিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের ভাবে পেরিক্লেস (Pericles) অথবা লোরেঞ্জো ডি মেডিসির (Lorenzo di Medici) মতই মহৎ ছিলেন; তাহার প্রসিদ্ধ কবিগণের ব্যক্তিত্ব কালের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অস্পষ্টভাবে প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহাদের উচ্চতর সত্তায় এবং মানবতায় তাঁহারা ইস্কাইলাস (Aeschylus) অথবা ইউরিপাইডিস (Euripides) এর মতই মহান অথবা তাঁহাদের জীবনকথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইটালির কবিদের মতই মানবীয় গুণসম্পন্ন এবং মনোরম ছিল। মিঃ আর্চারের জিদ অনুসারে এই একটি দেশকে সমগ্র ইউরোপের সহিত তুলনা

করিতে গেলে—তাঁহার জিদের প্রধান কারণ, ভারতবাসী নিজেরাও যখন তাহাদের দেশের আকারের, তাহার মধ্যে বহু উপজাতির (Races) এবং ভারতের একত্ব বিধানের যে সমস্ত বাধা তাহারা এতদিন রোধ করিয়াছে তাহার কথা বলে, তখন সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে—ইহা হইতে পারে যে রাজনীতি এবং সামরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নামের সংখ্যা বেশী, কিন্তু ভারত যাহাতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ লোকের যে অসাধারণ প্রাচুর্য এখানে দেখা দিয়াছিল যাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই—এ কথার উত্তর কি? আবার সৃষ্টিশীল ভারতীয় মন হইতে তাহার সাহিত্য এবং নাটকসকলের যে সমস্ত সার্থক মূর্তি জাত হইয়াছে মিঃ আর্চার ঔদ্ধত্য সহকারে তাহাদের সম্বন্ধেও নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। এখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করা অথবা তাঁহার বিচারের মানদণ্ড স্বীকার করা কঠিন। অন্ততঃ প্রাচ্য মনের পক্ষে 'রাম ও রাবণের' চরিত্র হোমার এবং সেক্সপিয়ারের সৃষ্ট ব্যক্তিগণের মত সতেজ, মহৎ ও সত্য, সীতা এবং দ্রৌপদী হেলেন (Helen) অথবা ক্লিওপেট্রা (Cleopetra) হইতে নিশ্চয়ই কম সজীব, দময়ন্তী এবং শকুন্তলা এবং অন্যান্য স্ত্রীচরিত্র এলসেস্ (Alecestis) এবং ডেসডিমোনা (Desdemona) হইতে কম মহীয়সী কম মনোজ্ঞ বা কম জীবন্ত নহে। এখানে আমি কোন শ্রেষ্ঠতার কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই সমালোচক যে অতল বৈষম্য এবং হীনতার কথা বলেন তাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহা শুধু তাহার কল্পনাতে বা তাহার দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান আছে।

এই সমস্ত তুলনার মূলে মনের যে পার্থক্যের ভাব রহিয়াছে তাহাই হয়ত একমাত্র বস্তু যাহা আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, কেবল তাহারই তাৎপর্য অনুভব করিতে হইবে। বস্তুতঃ ভারতের জীবন, শক্তি অথবা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াশীল সংকল্পের মধ্যে কোন হীনতা ছিল না, কিন্তু মানব প্রকৃতির সমতা, আদর্শ, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বে যতটা পার্থক্য রাখিতে দেয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে তাহা রহিয়াছে; বলিতে পারি উভয়ে বিভিন্ন এবং প্রায় বিপরীত দিকে জোর দিয়াছে। ভারতে ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের অভাব নাই, কিন্তু শ্রেয়স্কর বলিয়া যেদিকে তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে আদর্শকে ভারত গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহা অন্যবিধ। অহংগত যে ইচ্ছা জোরের বা সাহসের সহিত, আক্রমণশীল ভাবে, এমন কি সময় সময় ভীষণ নির্বন্ধাতিশয় সহকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, নিজের বিষয়েই জেদ করে, সাধারণ ইউরোপীয় মন সেই ইচ্ছাকেই মূল্য দিতে অথবা অন্ততপক্ষে তাহাতে অধিকতর অনুরাগী হইতে উৎসুক; ভারতীয় মন নৈতিক দৃষ্টিরই যে কেবল অধিকতর মূল্য দেয় তাহা নহে—সর্বত্রই তাহা দেখা যায়—কিন্তু আত্ম সংযমশীল এমন কি

নিজেকে মুছিয়া ফেলিতে উৎসুক ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সে অধিকতর সজীব ভাবে অনুরাগী; কেননা তাহার কাছে অহংকে মুছিয়া ফেলা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করা নহে, তাহা খাঁটি ব্যক্তির এবং তাহার মহত্ত্বের মূল্য ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। মিঃ আর্চার অশোককে ম্লান এবং বৈশিষ্ট্যশূন্য রূপে দেখিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় মনের নিকট তিনি অতি মাত্রায় সজীব ও চিত্তাকর্ষক; কিন্তু সার্লামেন (Charlemagne) অথবা ধরা যাউক কনষ্ট্যানটাইনের (Constantine) সঙ্গে তুলনায় অশোককে কেন ম্লান বলা হইবে? বহু রক্তপাতের পর তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন, পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি এরূপ কার্য হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মিঃ আর্চার অশোকের এই অনুতাপের কথা বলিবার জন্য তাঁহার কার্যাবলি হইতে শুধু কলিঙ্গ বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইলে এই অনুতাপ এবং সেরূপ পথে ফিরিয়া না যাওয়ার সংকল্পই কি অশোকের হীনতার কারণ? কিন্তু অশোকের এই ধরনের মনোবৃত্তির কথা, সার্লামেন যখন উত্তম খৃষ্টানে পরিণত করিবার জন্য স্যাক্সন জাতির বহু লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তিনি অথবা যে পোপ তাঁহাকে তৈল মর্দনের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কনস্ট্যানটাইন খৃষ্ট ধর্মকে জয়ী করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বে খৃষ্ট ধর্মের কিছুই ছিল না; অশোক বৌদ্ধধর্মকে শুধু রাজসিংহাসনে বসান নাই, কিন্তু পূর্ণ সফলতার সহিত না হইলেও তিনি বুদ্ধপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর ভারতীয় মন, কনষ্ট্যানটাইন বা সার্লামেন অপেক্ষা অশোকের সংকল্প মহত্তর ছিল শুধু ইহাই বোধ করে না, কিন্তু অশোকের ব্যক্তিত্বকেও মহত্তর, অধিকতর মনোহারী মনে করে। চাণক্য তাহার কাছে চিত্তাকর্ষক কিন্তু চৈতন্য অনেক বেশী মনোহর।

যেমন বাস্তব জীবনে তেমনি সাহিত্যেও তাঁহার একই মনোগতি রহিয়াছে। আমাদের সমালোচকের এই ইউরোপীয় মন রাম এবং সীতার মধ্যে কোন মাধুর্য দেখে না, তাঁহারা তাঁহার কাছে নীরস এবং অবাস্তব, কেননা তাঁহারা বড় বেশী ধর্মপরায়ণ, বড় বেশী আদর্শ স্থানীয়, অতি বেশী শুভ্র ও পবিত্র; কিন্তু ধর্মভাবের সকল মনোবৃত্তির কথা বাদ দিলেও আমাদের ভারতীয় মনের কাছে তাঁহারা গভীর ভাবে সত্য এবং সে সত্য আমাদের সত্তার অন্তরতম তন্ত্রীকে স্পর্শ করে। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত মহাভারতের সমালোচনা করিতে গিয়া এই বৃহৎ মহাকাব্যের মধ্যে একমাত্র বলবান এবং উগ্রপ্রকৃতি বিশিষ্ট ভীমের চরিত্রকে শুধু বাস্তব বলিয়া মনে করিয়াছেন; পক্ষান্তরে ভারতীয় মন অর্জুনের ধীর প্রশান্ত বীরত্বে, যুধিষ্ঠিরের মনোহর নৈতিক প্রকৃতিতে এবং যিনি নিজের জন্য কর্ম করেন না, ন্যায় ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য শুধু

সচেষ্ট সেই দিব্যসারথির মধ্যে মহত্তর চরিত্রের এবং অধিকতর মর্মস্পর্শী মনোজ্ঞতার সাক্ষাৎ পায়। যে সমস্ত চরিত্র প্রচণ্ড বা আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ অথবা যাহারা কামনা বা আবেগের প্রবল ঝটিকাবর্তে চালিত হয়, তাহারাই ইউরোপের মহাকাব্য ও নাটকে প্রধান চিত্তাকর্ষক বস্তু হইয়া উঠে; ভারতে তেমন চরিত্র গৌণ চরিত্র রূপেই চিত্রিত হয় অথবা যদি কোথাও বৃহত্তর ভাবে বর্ণিত হয় তাহা উচ্চতর ধরনের ব্যক্তির মহত্ত্বকে বিপরীত ভাবের চিত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, যেমন রাবণের বিপরীত চরিত্রের তুলনায় রামের চরিত্রের মহত্ত্ব ফুটিয়াছে। জীবনের রসানুভূতির দিক দিয়া দেখিলে এক ধরনের মনন বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় অন্য ধরনের মনন প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে। অথবা ভারতীয় মন এ বিষয়ে যে ভেদ দেখিয়াছে সেই ভাবে বলিতে গেলে, এক মনন অধিকতর রাজসিক ভাবে অভিনিবিষ্ট হয়, অন্য মনন সাত্ত্বিক সংকল্প এবং প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে।

এই পার্থক্য ভারতীয় জীবন ও তাহার সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহার সৌন্দর্য-বোধের উপর কোন হীনতার আরোপ করে কিনা তাহা প্রত্যেককে নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে ভারতীয় ধারণাই অধিকতর বিকশিত এবং অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন। ভারতীয় মন বিশ্বাস করে যে রাজসিক বা অধিকতর বৈচিত্র্যময় অহংগত প্রকৃতি হইতে সাত্ত্বিক এবং সত্তার আলোকোজ্জ্বল ভূমিতে উঠিয়া গেলে ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের খর্বতা ঘটে না বরং উপচিত হইয়া উঠে। মোটের উপর ইহাই কি সত্য নহে যে প্রশান্তি, আত্মজয়, এক উচ্চ সাম্যভাব কেবল শক্তি ও সংকল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা কামনা বাসনার প্রবলাবেগের তাড়না হইতে বৃহত্তর এবং অধিকতর-বাস্তব চরিত্রশক্তির চিহ্ন? এ সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী যে ন্যূনতর শক্তির সহিত কার্য করিবে এমন কোন কথা নাই, বরং আরও উপযুক্ত, স্থির এবং সমতা গুণযুক্ত ইচ্ছাশক্তি লইয়া কার্য করিতে সমর্থ। তপশ্চর্যা খাঁটি ভাবে বুঝিলে এবং যথাযথ ভাবে অভ্যাস করিলে যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি মুছিয়া যায় এ ধারণা ভুল; বরং ইহাতে ইচ্ছাশক্তি আরও বৃহত্তর ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাই হইল ভারতীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা এবং মহাকাব্যসমূহে বর্ণিত বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকার তাৎপর্য; কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে ভাব বা ধারণা আছে তাহা ভুল বুঝিয়া ইহাতে মিঃ আর্চার ভীষণ আপত্তি তুলিয়াছেন। বলা হইয়াছে কঠোর আত্মজয় বা তপশ্চর্যার ফলে—যখন তাহার অপব্যবহার হয় তখনও—প্রবল শক্তিলাভ হয়। ভারতীয় মন বিশ্বাস করিয়াছে এবং আজিও বিশ্বাস করে যে অধিকতর ভাবে বহির্মুখ এবং গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তি বৃহত্তর বস্তু, তাহা ইচ্ছার এক অধিকতর শক্তিশালী কেন্দ্র হইতে কার্য করে এবং বৃহত্তর পরিণাম আনয়ন করে। কিন্তু ইহা বলা হইবে যে ভারতবর্ষ নৈর্ব্যক্তিকতার অধিকতর

মূল্য দিয়াছে এবং তাহা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বকে নিরুৎসাহিত করে। সমাধি বা শাশ্বতের নীরবতার মধ্যে আত্মবিলয়ের নেতিবাচক আদর্শ—যাহা এখানে মূল বিষয় নহে—ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেও এ ধারণার মধ্যে ভুল আছে। যতই স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হউক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে-জন নিজের সত্তা ও কর্মের পশ্চাতে অবস্থিত নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত এক বস্তুকে স্বীকার করে এবং তাহার সহিত এক হইতে চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত ভাবে বৃহত্তম মহত্ত্ব ও শক্তির অধিকারী হয়। কেননা এই নৈর্ব্যক্তিকতা একটা শূন্যতা নহে কিন্তু সত্তার পূর্ণতার এক সমুদ্র। পূর্ণ মানব, সিদ্ধ বা বুদ্ধ, সার্বজনীন হইয়া যান, মৈত্রী এবং একত্ববোধে সকল সত্তাকে আলিঙ্গন করেন, যেমন নিজের মধ্যে তেমনি অপরের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান এবং ইহা করিতে গিয়া সেই সঙ্গে বিশ্বশক্তির অনন্ত বীর্যের কিছুটা নিজের মধ্যে টানিয়া আনেন। ইহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিবাচক আদর্শ। যাঁহারা এই "সূক্ষ্ম ও সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ" সংস্কৃতি হইতে জাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতার সন্ধান দেখাইতে যখন এই বিরোধী সমালোচক বাধ্য হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজসিক হইতে সাত্ত্বিকতার কোন কোন অধিকতর বাঞ্ছিত ফলকে, সীমিত অহংগত ব্যক্তি হইতে সার্বজনীন ভাবে বিভাবিত পুরুষকে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ লোকের মত অর্থাৎ স্থূল প্রাকৃত অর্ধপক্ক মানুষের মত হইবে না, ইহাই ছিল এই প্রাচীন সাধনার তাৎপর্য, এবং সেই অর্থেই ইহাকে আভিজাত্যপূর্ণ সভ্যতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের আত্মসংযমের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ বাহ্য স্থূল মহত্ত্ব নহে আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব লাভ। এই আলোক লইয়া ভারতীয় জীবন, ব্যক্তিত্ব, শিল্পকলা ও সাহিত্যকে বিচার করিতে হইবে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে প্রকৃত ভাবে বুঝিয়া তাহার যথার্থ তাৎপর্য অবগত হইয়া তাহার গুণ বা দোষের বিচার করিতে হইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় শিল্প

অতীতে পাশ্চাত্যে ভারতীয় সভ্যতার রসানুভূতি এবং সৌন্দর্যবোধের বিরুদ্ধে সহানুভূতিশূন্য বা বিরুদ্ধ ভাবের বহু সমালোচনা হইয়াছে, তাহাতে চিত্রশিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিতকলার প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা বা অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। মিঃ আর্চার যে অবিবেকীর মত ভারতের মহান সাহিত্যের সমগ্র ভাবে নিন্দা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সমালোচকগণের মধ্যেও তিনি তাহার বিশেষ সমর্থন অধিক পাইবেন না, অবশ্য তাঁহাদের মধ্যেও কিন্তু সোজাসুজিভাবে আক্রমণ ততটা নাই তথাপি বুঝিবার ভুল যথেষ্ট আছে; কিন্তু ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে মিঃ আর্চারের আক্রমণ সর্বশেষ, এবং বহু বিরোধী কণ্ঠের মধ্যে তাঁহার স্বরই সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও কর্কশ। যে কোন জাতির সংস্কৃতিতে এই সৌন্দর্য ও রসানুভূতির দিকের মূল্য খুব বেশী; এই দিকটাও নিজে দাবি করে যে, সে-জাতির দর্শন ধর্ম ও কেন্দ্রগত সৃষ্টিক্ষম ভাবধারাগুলির সহিত প্রায় সমভাবে সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও বিচার করিয়া তাহার নিজেরও মূল্য অবধারিত হউক; আর এই সমস্তই ভারতীয় জীবনের ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার শিল্প ও সাহিত্যের অধিকাংশের মধ্যে ইহাদের সুন্দর ও সার্থক রূপের সচেতন ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য অনেক কিছু ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে, এবং কেবল তাহাতেই যদি কাজ হইত, তবে আমি মিঃ হ্যাভেল (Havell) অথবা ডাঃ কুমারস্বামীর রচনাবলীর কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইতাম, অথবা প্রাচ্য শিল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা প্রাগানুকূল মত যাঁহারা পোষণ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইতে পারেন না এবং যাঁহারা ততটা পূর্ণরূপে না জানিলেও এবং ততটা গভীর ভাবে না বুঝিলেও অনেকটা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সমালোচনার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রেরণা ও অভিপ্রায়ের সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে প্রধান প্রধান মৌলিক তত্ত্বসকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আরও বিস্তৃত ভাবে করা প্রয়োজন। আমি প্রধানতঃ ভারতের সেই নূতন মনের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি, যাহা বিজাতীয় শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রভাবের দ্বারা দীর্ঘকাল বিপথে চলিবার পর ভারতের অতীত ও ভবিষ্যতের সঠিক ও গভীর ভাবধারার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে প্রত্যাবর্তন যেরূপ ব্যাপক, পূর্ণ বা আলোকোজ্জ্বল হওয়া উচিত আজিও তাহা হইতে বহু দূরে রহিয়াছে। সুতরাং আমি প্রথমে ভুল বুঝিবার কারণগুলির আলোচনার মধ্যে নিজেকে নিবন্ধ রাখিব এবং তথা হইতে ভারতের রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টির খাঁটি সংস্কৃতিগত তাৎপর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইব।

মিঃ আর্চার সব কিছু সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিবার কৌশলটি তাঁহার নিজস্বভাবে অনুসরণ করিয়া এই বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন, অধ্যায়টিতে ব্যাপক ভাবে গালিবর্ষণের দীর্ঘ বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার আক্রমণকে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা মনে করিয়া বিস্তীর্ণ ভাবে উত্তর দিতে গেলে বৃথা সময় নষ্ট করা হইবে; ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থক এবং প্রশংসাকারীগণের তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পল্লবগ্রাহিতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; তাহার মধ্যে যে যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা প্রধানত ক্ষুদ্র ক্ষীণ এবং সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক, তাহার অধিকাংশ তীক্ষ্ম বাক্যবাণ এবং অর্থহীন দৃঢ় উক্তিতে পূর্ণ; বাকী অংশ দার্শনিক তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির অর্থ ভুল বুঝিয়া বা বুঝিতে পূর্ণ রূপে অসমর্থ হইয়া যে ধারণা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—যাহা তাঁহার মধ্যে ধর্মবোধ এবং দার্শনিক মনের একান্ত অভাব প্রকাশ করে—তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া সব কিছু বলিয়াছেন। মিঃ আর্চার অবশ্য নিজে যুক্তিবাদী, তিনি দর্শন শাস্ত্রকে ঘৃণা করেন, সুতরাং এ সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির অধিকারী হইবার উপযুক্ত; কিন্তু সে ক্ষেত্রে যাহার অর্থের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে অসমর্থ তাহা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া অন্ধ ব্যক্তির বর্ণবৈচিত্রের উপর বক্তৃতা দেওয়ার দৃশ্য দেখাইতে যান কেন? আমি দু'একটি উদাহরণ দিব, তাহাতেই তাঁহার সমালোচনার প্রকৃতি বুঝা যাইবে, যে সমস্ত কথা বলিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন তাহাতে বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের মনোবৃত্তির দিকে আলোক-পাত ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মূল্য যে কেন দিতে চাহি না তাহারও যথেষ্ট সমর্থন মিলিবে।

আমি প্রথমেই তাঁহার সমালোচনার অসঙ্গতির এক বিস্ময়কর উদাহরণ দিতেছি। ভারতে পুরুষের আদর্শ মূর্তিতে অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়,—স্কন্ধদেশের প্রশস্ততা এবং কটির ক্ষীণতা। কিন্তু কটির পরিধির বিস্তারের এবং উদরের স্থূলতার বিরুদ্ধে আপত্তি—যেখানে উপযোগী যেমন গণেশের বা যক্ষের মূর্তিতে সেখানে ভারতেও সে অঙ্গের স্থূলতা দেখান হয়—শুধু ভারতীয় সৌন্দর্যবোধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

নয়; সৌন্দর্যবোধের ঐতিহ্যে তাহার বিপরীত ভাবের উপর জোর এমন কি বেশী জোর দেওয়াও নিশ্চিতই বুঝা যায়, যদিও কেহ কেহ মানবমূর্তির আরও নিসর্গনিষ্ঠ বা বাস্তব এবং সমৃদ্ধ অঙ্কনই পছন্দ করেন। অবশ্য ভারতীয় কবি ও প্রামাণিক শিল্পাচার্যগণ এই প্রসঙ্গে সিংহের উপমা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার আলোচনা করিতে গিয়া যখন মিঃ আর্চার ইহাকে ভারতবাসীগণ অর্ধ-বর্বর অবস্থা হইতে কেবল মাত্র বাহির হইতেছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া গম্ভীরভাবে উল্লেখ করেন, তখন আমাদের আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাঁহার মতে ইহা হইতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবাসীরা স্বাভাবিক অবস্থায় অরণ্যে বাস করিত, এবং বন্য জন্তুর পূজা করিত আর তথা হইতে তাহারা বীরত্বপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি তামিল কবি কাম্বান্ যেখানে সীতার চক্ষুর বর্ণ এবং গভীরতার সহিত সমুদ্রের তুলনা দিয়াছেন তাহা দেখিলে একই সূত্র বা বিধান অনুসারে তেমনি হতবুদ্ধিকর নিপুণতার সহিত তিনি বলিতে পারিতেন যে, এই উপমা এ-জাতির আরও আদিম বর্বরতা এবং অচেতন প্রকৃতির বর্বরোচিত পূজার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়; অথবা বাল্মীকি যেখানে তাঁহার কাব্যের নায়িকার বর্ণনা দিতে গিয়া তাঁহাকে 'মদিরেক্ষণা' বা মদ্যের ন্যায় চক্ষুর কথা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় কবিরা পানদোষে চিরাভ্যস্ত ছিলেন এবং অর্ধমত্ততা হইতে তাঁহাদের কাব্যের প্রেরণা লাভ করিতেন, তাহার প্রমাণও তিনি পাইবেন। মিঃ আর্চার যে সমস্ত প্রবল কারণ দেখাইয়াছেন এটি তাহার একটিমাত্র উদাহরণ। এটি চরম মাত্রায় পৌঁছিলেও এবং ইহাতে তাঁহার বিশেষ যুক্তির অসঙ্গতি, তাঁহার সমালোচনার ধারার অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও, নমুনার অনুরূপ বস্তু যে তাঁহার ভাণ্ডারে আর নাই তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বাঙ্গলার চিত্রশিল্পীগণ সরু সরু হস্ত পদ আঁকিতে ভালবাসেন বলিয়া একটি সাধারণ আপত্তি আছে, তাহাই তাহাদের অঙ্কিত ছবির বিপুল নিন্দার কারণ বলিয়া যে সময় সময় উপস্থিত করা হইয়াছে, মিঃ আর্চারের এই সমালোচনা তাহারই সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় মূঢ়তা ক্ষমার যোগ্য, কেননা বর্তমান সংস্কৃতির উচ্চ ব্যবস্থার ফলে শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানালোকিত যুক্তিযুক্ত ধারণা তাহার নিকট আশা করা যায় না—সৌন্দর্যানু-ভবের তাহার যে সহজাত শক্তি ছিল ইতিপূর্বেই তাহাকে নিরাপদে হত্যা করিয়া সমাধিস্থ করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি নিজেকে সমালোচক বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন তিনি যদি এই প্রকার অর্থ দিবার জন্য গভীরতর প্রেরণা ও উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করিয়া তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়াই থাকেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কি বলিব?

কিন্তু মিঃ আর্চারের এই সমালোচনার মধ্যে আরও গভীর এবং গুরুতর

আপত্তির কারণ আছে, কেননা তিনি শিল্পের মধ্যে স্থিত দর্শনের কথাও তুলিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পসৃষ্টি পূর্ণরূপে এবং সাক্ষাৎভাবে আধ্যাত্মিকতা এবং বোধি চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণ সচেতনভাবেই ইহা করা হইয়াছে, শিল্পের বিধানাবলিতেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। মিঃ হ্যাভেল (Havell) এই মূল বৈশিষ্ট্যের উপর সঙ্গতভাবেই খুব জোর দিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে বুদ্ধি অপেক্ষা সাক্ষাৎ অনুভূতির এই ধারা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠতর; এরূপ উক্তি স্বভাবতই যুক্তিবাদীর মনঃপীড়াদায়ক, যদিও প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য মনীষীগণও একথা ক্রমশঃ বেশী করিয়া এখন স্বীকার করিতেছেন। ইহা শুনিবামাত্র তাঁহার অতি ভোঁতা যুদ্ধতরবারি লইয়া মিঃ আর্চার এ উক্তিকে খণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই গুরুতর বিষয় লইয়া তিনি কি ভাবে আলোচনা করিয়াছেন? একভাবে দেখিলে তিনি মূল বিষয় সমগ্ররূপে হারাইয়া বসিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত শিল্পগত দর্শনের কোন সম্পর্ক নাই। মিঃ হ্যাভেল বুদ্ধের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত নিউটনের বৃহৎ অন্তর্দৃষ্টিকে একসঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন; মিঃ আর্চার সে উক্তি সাগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। উভয়কে অনুরূপ বলায় আপত্তি করিয়াছেন, কেননা তিনি বলেন এই উভয়ের আবিষ্কার জ্ঞানের দুইটি বিভিন্ন বিভাব লইয়া,—একটি বৈজ্ঞানিক ও জড়গত, অপরটি মনোময় অথবা চৈত্য, আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক। তিনি তাঁহার আস্তাবল হইতে বিরুদ্ধ যুক্তির সেই পুরাতন ঘোড়াটিকে বাহির করিয়া দৌড় করাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে নিউটনের অন্তর্দৃষ্টি দীর্ঘ মানসিক চিন্তাধারার শুধু শেষ সোপান; কিন্তু এই জড়বাদী মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং দর্শন সমালোচকের মতে বুদ্ধ বা অন্যান্য ভারতীয় জ্ঞানীর অন্তদৃষ্টির পশ্চাতে কোন প্রকার মানসিক চিন্তা-ধারা অথবা সমর্থনযোগ্য কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তি ছিল না। পক্ষান্তরে যাহারা এ বিষয় কিছু খবর রাখে তাহাদের সকলের জানা সরল তথ্য এই যে, বুদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তগুলি (এখানে আমি উপনিষদের অনুপ্রেরণালব্ধ জ্ঞানের কথা বলিতেছি না, সে জ্ঞান খাঁটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-জাত এবং বোধি ও পরা বিজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ছিল) গ্রহণের পূর্বে প্রাসঙ্গিক সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অতি গভীররূপে পরীক্ষা ও আলোচনা করা হইয়াছিল, অবশ্য সে আলোচনার ধারা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের অনুরূপ ছিল না, তবু তাহা অন্য সকল চিন্তাধারা অপেক্ষা কম যুক্তিসঙ্গত নহে। এই জ্ঞানগর্ভ (!) মন্তব্য দ্বারা তিনি তাঁহার খণ্ডনকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, এই সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি, যাহাদিগকে তিনি উৎকট কল্পনা আখ্যা দিয়াছেন, পরস্পরের বিরোধী, সুতরাং মনে হয় যে অধ্যাত্ম দর্শনের বৃথা সূক্ষ্ম নিপুণতা দেখানো ছাড়া তাহাদের কোন প্রকার মূল্য নাই। তাঁহার এই মত

অনুসারে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করিব যে ধৈর্যসহকারে বাহ্য ঘটনার আলোচনা, সতর্ক এবং কঠোরভাবে পরীক্ষার উপযোগী মানসিক যুক্তিবিচার এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের মধ্যে কোন সংঘর্ষ অথবা পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় নাই? তাঁহার এই পদ্ধতি অনুসারে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, যে বংশানুক্রম বিজ্ঞান (Science of heredity) পরস্পরবিরোধী "উৎকট কল্পনা" দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইবে অথবা দেশ (space) এবং দেশের উপর মাধ্যাকর্ষণের ফল সম্বন্ধে নিউটনের "উৎকট কল্পনা", ঠিক সেই বিষয়ে, বর্তমানে আইনস্টাইনের "উৎকট কল্পনা" দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। অবশ্য ইহা একটা গৌণ ব্যাপার যে মিঃ আর্চার বুদ্ধের অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে ভুল করিয়া বলিয়াছেন তিনি কোন কোন বৈদান্তিক অন্তর্দৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, কেননা বুদ্ধ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কিছুই করেন নাই, চরম কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুধু অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বোধিদৃষ্টি শুধু দুঃখের কারণ ও সর্ববস্তুর অনিত্যতার এবং অহমিকা বাসনা ও সংস্কারের নির্বাণ দ্বারা মুক্তিলাভের বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল, এবং তিনি যতদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন, নির্বাণের এই তাঁহার বোধিদৃষ্টি এবং বেদান্তের পরম একত্বের বোধিদৃষ্টি, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার একই সত্য দর্শন করিয়াছিল, অবশ্য উভয়ের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন ছিল এবং মননের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষায় তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বোধিদৃষ্টির বিষয়বস্তু উভয়ের একই। কঠোরভাবে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া বাকি সর্বকিছু বুদ্ধের নিকট অপ্রাসঙ্গিক ছিল। এ সমস্ত আমাদের মূল বিষয় হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়, কিন্তু আমাদের সমালোচকের বিশৃঙ্খলতা-ভরা এমন এক মন আছে যে তাহাকে অনুসরণ করিতে গেলে এই রূপ বিষয়ান্তরে না গিয়া গত্যন্তর নাই।

এই পর্যন্ত মিঃ আর্চার বোধিদৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার আলোচনা চলিল। তাহার আলোচনায়, শিল্পের প্রাথমিক তত্ত্বসকলের মধ্যে তিনি যে ভাবে পর্যটন করিয়াছেন তাহার প্রকৃতি এইরূপ। বস্তুতঃ ইহা দেখাইয়া দেওয়া কি প্রকৃতই প্রয়োজনীয় যে, মনের বা আত্মার শক্তি এক হইলেও তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে? অথবা ইহাও কি বলা প্রয়োজন যে, এক প্রকার বোধিদৃষ্টি লাভের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করিতে মানসিক চিন্তাধারাকে দীর্ঘকাল বসিয়া গঠিত ও শিক্ষিত করিয়া লইতে হইতে পারে? কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে বোধিদৃষ্টি মানসিক চিন্তাধারার শেষ সোপান- যেমন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পরে যখন বিচার শক্তি দেখা দেয় তখন বলা চলে না যে বিচার শক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই শেষ স্তর; বিচারশক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং আমাদিগকে সত্যের সূক্ষ্মতর অন্য

ক্ষেত্রে লইয়া যায়; বোধিদৃষ্টি বা বোধিজাত জ্ঞান তেমনিভাবে বিচার শক্তিকেও অতিক্রম করিয়া যায়, এবং সত্যের আরও জ্যোতির্ময় শক্তির মধ্যে আমাদিগকে সাক্ষাৎভাবে লইয়া যায়। কিন্তু ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যেভাবে বোধিদৃষ্টির ব্যবহার করেন, শিল্পী এবং কবি ঠিক সেইভাবে করিতে পারেন না। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির (Leonardo Da Vinci) আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বোধিদৃষ্টি এবং ললিতকলার ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল বোধিদৃষ্টি একই শক্তি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিবেশ বা মনের গৌণ ক্রিয়ায় উভয়ের প্রকৃতি এবং বর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। ললিতকলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকারের বোধিদৃষ্টি আছে; সেকস্‌পিয়ার যেভাবে জীবনকে দেখিয়াছেন তাহার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য, বালজাক (Balzac) বা ইবসেন (Ibsen) যেভাবে দেখিয়াছেন তাহা হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াধারার সেই মূল অংশ, যাহা ইহাকে বোধিদৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে তাহা তাঁহাদের সকলের পক্ষে এক। শিল্পের সৃষ্টির জন্য সমান শক্তিশালীভাবে বুদ্ধের হউক অথবা বেদান্তের হউক যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কার্যারম্ভ করা যাইতে পারে, ফলে একজন হয়ত বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্তি অপরে হয়ত শিবের আনন্দময় নটরাজ মূর্তি অথবা তাঁহার মহিমান্বিত ধীর স্থির মূর্তি গড়িয়া তুলিতে পারে; তত্ত্ববিদ্যাবিদ্‌গণ যুক্তি-বিচারে ইহাদের কাহারও প্রাধান্য দিতে পারেন, কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনে শিল্পীর তাহাতে কিছুই যায় আসে না। এই সমস্ত প্রাথমিক ধারণা যে অগ্রাহ্য করে সে যে ভারতীয় শিল্পের সূক্ষ্ম এবং প্রবল সৃষ্টিকে ভুল বুঝিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

মিঃ আর্চারের আক্রমণের দুর্বলতা, তাঁহার শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং দৌরাত্ম্য, তাঁহার আলোচনায় সারমর্মের অপ্রাচুর্য যেন আমাদিগকে তেমন অন্ধ করিয়া না দেয়, যাহাতে যে দৃষ্টি হইতে ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার এই বিদ্বেষ জাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা দেখিবার ও বুঝিবার অসামর্থ্য আসিয়া পড়ে। কেননা যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিদ্বেষ জাত হইয়াছে তাহার মূল ইহাদের অপেক্ষা গভীরতর কিছুর মধ্যে রহিয়াছে, রহিয়াছে সংস্কৃতিগত সমগ্র শিক্ষার মধ্যে, স্বাভাবিক বা অর্জিত স্বভাবে এবং জীবনের সম্বন্ধে মৌলিক মানসিক ভাবের মধ্যে; বর্তমান সময়ের কিছু পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মনের বিশেষতঃ ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে সমুদ্রব্যবধান ছিল, এই মূলের জ্ঞানই তাহার বিস্তার পরিমাপ করিতে পারে—অবশ্য যাহা অমেয় তাহাকে যদি পরিমাপ করা যায়। ভারতীয় শিল্পের উদ্দেশ্য বা প্রেরণা ও পদ্ধতি বুঝিতে অসমর্থ হওয়া, তাহাকে ঘৃণা করা বা তাহা হইতে প্রতিহত হওয়া, এই সেদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় মনের পক্ষে প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে প্রচলিত প্রাথমিক সংস্কারে বা ধারণায় বদ্ধ

মাঝারি গোছের মানুষ এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতি বুঝিবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সুযোগ্য সমালোচকের মধ্যে কোন বিশেষ ভেদ ছিল না। এই বিপুল ব্যবধানের বিস্তার এত অধিক ছিল যে, তখনকার দিনে গঠিত কোন সংস্কৃতির পক্ষে উভয়ের মধ্যে কোন সেতুবন্ধন অসম্ভব ছিল। ইউরোপীয় মনের কাছে ভারতীয় শিল্প বর্বরোচিত, অপরিণত ও বিকৃত, মানবজাতির আদিম অসভ্যতার কালে, তাহার অক্ষম শৈশবে যে অবস্থা ছিল ভারতীয় শিল্পের পুষ্টি ও পরিণতি গতিরুদ্ধ হইয়া সেই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। বর্তমানে যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ আশ্চর্যরূপে হঠাৎ ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিক-চক্রবাল ও দৃষ্টিশক্তি এক্ষণে প্রসারিত হইয়াছে, এমন কি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে সে সবকিছু দেখিত ও দৃষ্ট বিষয়ের বিচার করিতে অভ্যস্ত ছিল অংশত তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে। শিল্পের বিষয়ে পাশ্চাত্য মন, পরবর্তী মননধারা দ্বারা কিছু পরিবর্তিত গ্রীক এবং রেনেসাঁস বা ইউরোপের নব জাগরণের যুগের ঐতিহ্যের কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী ছিল, সে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সে মাত্র দুইটি পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহার একটি রোমাণ্টিক বা রমন্যাসী শিল্প (Romantic art—মানবচিত্তের সুকুমার ভাবসকল হইতে যাহার অনুপ্রেরণা আসে) অপরটি নিসর্গনিষ্ঠ শিল্প (Realistic art—বাস্তবের যথাযথ অনুকরণই যাহার কার্য) কিন্তু এ দুইটিও সেই একই অট্টালিকার পার্শ্বগৃহ মাত্র, কেননা তাহাদের ভিত্তি ছিল এক, এবং একই সাধারণ মৌলিক বিধি ব্যবস্থা তাহাদের বৈচিত্র্যকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিত। প্রকৃতির অনুকরণ করাই শিল্পের প্রথম এবং সীমাপ্রদ বিধান, এই প্রচলিত প্রথাসম্মত কুসংস্কার শিল্পের স্বাধীনতম সৃষ্টিকেও নিয়ন্ত্রিত করিত এবং শিল্প সমালোচনার বুদ্ধি ও বিচারও এই বিধানের সহিত এক সুরে গাঁথা ছিল। শিল্প সৃষ্টির পাশ্চাত্য বিধানই একমাত্র প্রামাণিক আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইত এবং অন্য সব কিছুকে আদিম কালোচিত এবং অর্ধবিকশিত অথবা অদ্ভুত ও উৎকট কল্পনার বস্তু মনে করা হইত, কৌতূহলের বস্তুরূপে তাহা কেবল মনোরম হইতে পারিত। কিন্তু তথায় প্রণিধানযোগ্য এক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, যদিও প্রাচীন ধারণাগুলি এখনও তাহাকে প্রধানরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কারাগার ভাঙ্গিয়া না পড়িলেও অন্ততঃ তাহাতে বিস্তৃত রন্ধ্র দেখা দিয়াছে; প্রাচীন বদ্ধমূল মনোভাবের উপর আরও নমনীয় দৃষ্টি এবং আরও গভীর কল্পনা আরোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ফলে, এবং এই পরিবর্তনের আংশিকভাবে সহায়কর প্রভাবে প্রাচ্যের অন্ততঃপক্ষে চীন ও জাপানের শিল্প কতকটা যথোচিতরূপে স্বীকৃত হইতেছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন এখনও এত অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই যাহাতে ভারতীয় শিল্পের গভীরতম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকৃতি ও প্রেরণা বুঝা

যাইবে। মিঃ হ্যাভেল (Havell)-এর মত দৃষ্টি বা প্রচেষ্টা এখনও দুর্লভ। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনাও শিল্পশাস্ত্রানুমোদিত গঠনরীতির গুণগ্রহণ এবং কল্পনামূলক সেই সহানুভূতি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া যায় যাহা শুধু বাহির হইতেই দেখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করে, অথবা অধিকতর কৃতবিদ্য এবং নমনীয় বিচারশীল মননের পক্ষে যে নূতন বৃহত্তর দৃষ্টিলাভ সম্ভব হইয়াছে তাহা দ্বারা কোন শিল্পের ব্যঞ্জনার যেটুকু তৎক্ষণাৎ ধরা যায় ততটুকু মাত্র ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু পাশ্চাত্য মন যে ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস বা তাহার আধ্যাত্মিক উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, এমন কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। তাই ইউরোপ ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধানের গভীরতা এবং তাহার কারণ নির্ণয় করিবার উপযোগিতা এখনও রহিয়াছে। ভারতীয় মনের জন্যই ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেননা বিরোধী দৃষ্টি দ্বারা প্রদীপ্ত গুণগ্রহণশক্তির বলে ইহা নিজেকে অধিকতর ভালোভাবে বুঝিতে পারিবে এবং বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পের পক্ষে যাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে এমন মৌলিক বস্তু কি তাহা জানা, এবং যাহা আকস্মিক অথবা পরিণতির পথে একটা অবান্তর অবস্থা, সুতরাং নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইবার সময় যাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহা ধরা সম্ভব হইবে। ইহা যথার্থভাবে তাহাদেরই যোগ্য কার্য যাহারা নিজেরা একসঙ্গে সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টি, শিল্পশাস্ত্রসম্মত গঠন ও বিচার-সামর্থ্য এবং দৃষ্টিসমর্থ সমালোচনা শক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাহার মধ্যে কিছু পরিমাণে ভারতীয় প্রকৃতি এবং অনুভূতি আছে সে অন্ততঃপক্ষে প্রধান ও মূলগত সেই ভাবের কিছু পরিচয় দিতে পারিবে যাহার জন্য ভারতীয় চিত্র স্থাপত্য বা ভাস্কর্য তাহার কাছে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমি কেবল তাহাই চেষ্টা করিব, কেননা শিল্পের সৌন্দর্য ও রসবোধের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে তাহাই হইবে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম রক্ষণ ও সমর্থন।

যে প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং মূল প্রেরণা হইতে কোন বিশেষ ধরণের শিল্পসৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিয়া যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রকৃতি উদ্দেশ্য এবং প্রেরণার দিক হইতে শুধু তাহার বাহ্য বিস্তারের বিচার করা হয়, তবে যে সমালোচনার উদ্ভব হয় তাহা অসার এবং প্রাণশূন্য বস্তুমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। একবার যদি আমরা মূল বস্তুকে বুঝিতে এবং তাহার প্রকৃতি ও ধারার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি এবং অন্তরের সেই কেন্দ্র হইতে সে শিল্পের রূপ ও তাহার সম্পাদনের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হই তাহা হইলে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে তুলনাপরায়ণ মনের আলোক লইয়া কি ভাবে সে শিল্পকে দেখিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারি। তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আমরা পূর্বে যদি সে শিল্পের মৌলিক

ভাব বুঝিতে পারি কেবল তাহা হইলেই সে সমালোচনার কোন প্রকৃত মূল্য থাকিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের অধিকতর বিস্তৃত এবং নমনীয় ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও, আমি মনে করি যে অন্য শিল্পসকলের বেলায় যেখানে প্রকৃতিগত পার্থক্য গভীরতর, এইভাবে তুলনামূলক সমালোচনা করা অনেক বেশী দুরূহ; কেননা এ ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের জন্য বাক্য ব্যবহার করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পের বিশিষ্ট ভাব ও প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে রেখায় ও রূপে অভিব্যক্তির প্রয়োজনে সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সম্পাদনের চাপকে বিশেষ-ভাবে তীব্র করিয়া তুলিতে এবং সেইজন্য ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে হয়। প্রেরণার যে তীব্রতার বলে শিল্পের সৃষ্টিকার্য চলে তাহাকে আরও সুস্পষ্ট শক্তির সহিত বাহির করিয়া আনিতে হয়, এই শক্তির চাপে এবং সাক্ষাৎভাবে প্রকাশের তাগিদে তাহার মধ্যে অন্য প্রকৃতির শিল্পের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিবার অথবা অন্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া তাহার আবেদনের বৈচিত্র্য আনিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। শিল্পের মধ্যে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্য থাকে এবং সে জন্য যে রূপকে সৃষ্টি করা হয় তাহা আত্মার মধ্যে অথবা কল্পনাশীল মনের গভীরে গিয়া আবেদন জানায়, কিন্তু বহিস্তলে শুধু অল্পস্থান ব্যাপিয়া তাহার সংযোগ থাকে, অধিকসংখ্যক বিন্দুকে স্পর্শ করে না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক ভিন্ন ধরণের মনের পক্ষে শিল্পের রসবোধ তত সহজ নহে।

যেমন সাধারণ ইউরোপীয় মনের পক্ষে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের প্রকৃতি বোঝা অতি দুরূহ, তাহার নিজের স্বাভাবিক স্থিতিতে (poise) অবস্থিত ভারতীয় মনের পক্ষেও প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে ইউরোপীয় শিল্পের রসবোধ প্রায় তেমনিভাবে বা যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বোধ্য। একটি ভারতীয় নারী অপরটি গ্রীক এফ্রোডাইট*, এ উভয় মূর্তির তুলনামূলক এক সমালোচনা আমি দেখিয়াছি, যাহাতে বুঝিবার এই দুরূহতা চূড়ান্তভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সমালোচক সেখানে বলিতেছেন যে ভারতীয় মূর্তিটি প্রবল আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর—এখানে ভক্তি, অনির্বচনীয় ভক্তি যেন মূর্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা সত্য, প্রগাঢ় ভক্তির ইঙ্গিত অথবা এমন কি বিচিত্র প্রকাশ যেন বাহ্য রূপের উপর নির্ভর না করিয়া বরং তাহা হইতে ফুটিয়া বাহির বা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু গ্রীক মূর্তিটি কেবল পরিশোধিত কামজ বা ইন্দ্রিয়জ এক সুখই শুধু জাগাইয়া তুলিতে পারে। গ্রীক স্থাপত্যের আন্তর তাৎপর্যের মধ্যে কতকটা প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি দেখিতেছি যে সমালোচক এখানে ভুল বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ভারতীয় মূর্তির প্রকৃত

*প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। (অনুবাদক)

তাৎপর্য দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু গ্রীক সৃষ্টির খাঁটি ভাব বা প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; তজ্জন্য সেই মুহূর্ত হইতে তাহার তুলনামূলক তাৎপর্যাবধারণের সকল মূল্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রীক মূর্তিতে দেহের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা সৌন্দর্যের এক দিব্যশক্তি প্রকাশ করিতে চায় সুতরাং যাহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়জ রসবোধ ও সুখ অপেক্ষা অনেক বড় একটা কিছু জাগাইয়া তুলিতে পারে, কল্পনাময় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন তেমন এক অনুপ্রেরণার নিকটই এ মূর্তির মধ্য দিয়া এক আবেদন রহিয়াছে। শিল্পী ইহা যদি পূর্ণতার সহিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং তাঁহার সৃষ্টি অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকার্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইয়াছে। ভারতীয় ভাস্কর বাহ্য রূপের পশ্চাতে অবস্থিত কিছুর, বাহ্যকল্পনা হইতে দূরে কিন্তু আত্মার আরও নিকটস্থ কিছুর উপর জোর দেন এবং বাহ্য রূপকে তাহার অধীন ও অনুগত করিয়া তোলেন। যদি তিনি কেবল আংশিকভাবে সফল হইয়া থাকেন অথবা তাঁহার সৃষ্টিতে শক্তির প্রকাশ থাকিলেও যদি সম্পাদনের ত্রুটি থাকে তবে তাঁহার সৃষ্টি তত মহান হইবে না -যদিও তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে বৃহত্তর ভাব ও বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে; কিন্তু যখন তিনি পূর্ণরূপে সফলকাম হন, তখন তাঁহার সৃষ্টি অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকার্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি আমাদের প্রধান দাবি থাকে শিল্প হইতে আধ্যাত্মিক বা উচ্চতর বোধিজাত অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া, তবে তাঁহার সৃষ্টি আমাদের প্রকৃত বিবেকবুদ্ধি অনুসারেই অধিকতরভাবে পছন্দ করিব। অবশ্য ইহাতে উভয় প্রকার শিল্পের প্রত্যেকের নিজস্ব তাৎপর্য উপলব্ধির কোন বাধা হইবে না।

কিন্তু আমি জানি অত্যুচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত অন্য অনেক ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি আমার নিজের আধ্যাত্মিক সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হই নাই। উদাহরণ স্বরূপ টিন্‌টোরেটোর (Tintoretto) অতি প্রশংসিত কয়েকখানি ছবির কথা উল্লেখ করিতে পারি,—তাঁহার জীবন্ত ব্যক্তির আলেখ্যগুলির (portraits) কথা বলিতেছি না, কেননা তাহাদের মধ্যে আত্মার দেখা পাওয়া যায়, যদিও তাহা মানুষের সক্রিয় বা মানবস্বভাবগ্রস্ত আত্মা—কিন্তু অন্য কয়েকখানি ছবির কথা বলিতেছি যেমন, আদম ও ইভের ছবি, যাহাতে সেন্ট জর্জ ড্রাগনকে* হত্যা করিতেছেন সেই ছবি, অথবা ভেনিসের (Venice) পৌর পরিষদের সম্মুখে বিচারার্থ নীত যিশুখৃষ্টের ছবি; আমি জানি এই সমস্ত ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের মহত্ত্ব বোধ করিতে আমি অসমর্থ হইয়াছি, আমার সত্তার মধ্যে কোথাও যেন সাড়া দিতে অক্ষম এক শূন্যতা দেখা

* Dragon—অগ্নিউদ্‌গীরণকারী পক্ষ ও পদযুক্ত পৌরাণিক সর্পের মূর্তি। (অনুবাদক)

দিয়াছে; আমি তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্য ও পরিকল্পনার সমৃদ্ধি ও শক্তি দেখিতে পাইয়াছি, যে কল্পনাকে বাহিরে মূর্ত করা হইয়াছে তাহার সবলতা অথবা যেরূপ জোরে নাটকীয় ভাবে তাহা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু বহিঃস্তরের নিম্নস্থিত কোন তাৎপর্য অথবা আকারের মহত্ত্বের উপযোগী কোন মহৎ ভাব দেখিবার চেষ্টায় কৃতকার্য হই নাই, হয়ত এখানে সেখানে তাহার গৌণ ভাবের আনুষঙ্গিক কোন ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু তাহা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন এ সমস্ত ছবির রসবোধে আমার অসামর্থ্যের কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমি প্রথমেই এমন কতকগুলি ধারণাকে দেখিতে পাই যাহা আমি দেখিতে এবং যে ভাবে দেখিতে চাই তাহার বিরোধী। মাংসপেশীবহুল এই আদম এবং ইভের ইন্দ্রিয়রাগসূচক এই সৌন্দর্য আমার মনে মানবজাতির আদি পিতা বা মাতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় নাই; ড্রাগনের এই ছবি আমার কাছে অশিষ্ট, অশুভসংশী, হত হওয়ার মহা বিপদে পতিত এক পশু রূপে মাত্র দেখা দিয়াছে, সৃষ্টিসমর্থ বিকটাকার মূর্তিমান সয়তান রূপে ফুটিয়া উঠে নাই, এই খৃষ্ট তাহার বিশাল দেহ এবং সদয় ও দার্শনিক মুখশ্রী লইয়া আমার প্রায় বিরক্তির কারণ হইয়াছে, অন্ততঃপক্ষে আমি যে খৃষ্টকে জানি ইহা তাঁহার মূর্তি নয়। মোটের উপর এ সমস্ত আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে শুধু আসিয়া পড়িল, বাস্তবিক ব্যাপার এই যে পূর্ব হইতেই যে ভাবের দৃষ্টি কল্পনা আবেগ ও তাৎপর্যের দাবি লইয়া আমি এ ছবিগুলির নিকট আসিয়াছিলাম ইহারা তাহা দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যাহা শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও শিল্পীগণের উচ্ছল প্রশংসা পাইয়াছে তাহার মধ্যে মহান কিছু নাই এমন বিশ্বাস করিবার মত আত্মবিশ্বাস না থাকাতে, মিঃ আর্চার কোন কোন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে যেমন সমালোচনা করিয়াছেন সমালোচনার সেই রূপ ধারা গ্রহণ করিয়া 'এ সমস্ত চিত্রে কেবল বাহ্য রূপায়ণ সুন্দর বা চমৎকার হইয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন কল্পনা নাই, বাহ্যভাবে যাহা দেখা যায় তাহার পশ্চাতে তদতিরিক্ত কিছু নাই' এরূপ কথা বলিতে গিয়া আমি থামিয়া গিয়াছি। ইহা বুঝিতে পারি এ ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য এই যে আমি যে জাতীয় কল্পনা ইহাদের মধ্যে দেখিতে চাই, তাহা তথায় নাই; যদিও আমার সংস্কৃতিলব্ধ মন ইহার এই ব্যাখ্যা দেয় এবং যদিও বুদ্ধির দ্বারা ইহাদের মধ্যের আরও কিছু আমি অনুভব করিতে পারি, তবুও তাহাতে আমার প্রকৃতিগত সত্ত্বা তুষ্ট হয় না; প্রাণ ও দেহের এই বিজয়, প্রাণের এই চাঞ্চল্য ও শক্তি আমাকে ঊর্ধ্বে তোলে না বরং এক প্রকার পীড়া দেয়; অবশ্য ইহা বলিব যে আমি যে গভীরতর বস্তু দেখিতে চাই ইহাদের পশ্চাতে অন্ততঃপক্ষে তাহার কিছু যদি থাকে, তবে এ সমস্ত থাকিলেও অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূত এমন কি ইন্দ্রিয়পরবশ বিষয়সমূহের উপর অত্যন্ত জোর দিলেও--ভারতীয় শিল্পে তেমন উপাদানসকলের একান্ত

অভাব আছে তাহাও সত্য নহে—আমি আপত্তি করি না; এখানে আমি দেখিতে পাইতেছি যে আমার মন ইটালী দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চিত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া তথাকথিত 'বর্বর' কোন ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যকে, ধীর স্থির অমেয় কোন বুদ্ধ, পিত্তলনির্মিত কোন শিব অথবা অষ্টাদশভুজা অসুর নিধনরতা কোন দুর্গাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইটালীয় শিল্পের রসবোধে আমার অক্ষমতার কারণ, সে সৃষ্টিতে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই এবং বিশেষত্বদ্যোতক সে সৃষ্টিতে আমার যাহা আশা করা উচিত নয় তেমন কিছু আমি সেখানে খুঁজিয়াছি। আমি যেমন মূল গ্রীকশিল্পের রসে সিক্ত হইয়াছি, যদি রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগের মানসিক ভাব তেমনি গ্রহণ করিতে পারিতাম তবে আমার আন্তর অনুভূতিতে নূতন কিছু ধরিতে এবং উদারতর ও সর্বজনীন রসবোধ অধিকতরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতাম।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই ভ্রমাত্মক অর্থগ্রহণ অথবা বুঝিবার শক্তির এই অভাবের কথা আমি জোরে বলিতে চাই, কেননা ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প-সমূহের প্রতি ইউরোপীয় মনের যে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহার ব্যাখ্যা ইহাতে পাই, আর ইহাতে ভারতীয় শিল্পের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারা যায়। এই পাশ্চাত্য মন ভারতীয় শিল্পের মধ্যে যাহা ইউরোপীয় শিল্পের সমজাতীয় তাহাই শুধু ধরে বা বোঝে এবং স্বভাবতঃ এবং তাহাদের দিক হইতে ঠিক ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাহা নিম্নশ্রেণীর মনে করে, কেননা পাশ্চাত্য শিল্পে এই একই বস্তু, শক্তির আরও স্বাভাবিক উৎস হইতে আরও সহজভাবে আরও পূর্ণরূপে গড়িয়া তোলা হয়। ইহা হইতে মিঃ আর্চার অপেক্ষা যাঁহারা অধিক জানেন এবং বুঝেন এমন ইউরোপীয় সমালোচকেরা, যাহার মধ্যে মৌলিকতা ও সত্য একত্রে মিলিত হইয়াছে সেই মহৎ ও প্রকৃত ভারতীয় ভাস্কর্য অপেক্ষা দোআঁশলা গান্ধার ভাস্কর্যকে কেন এরূপ বিস্ময়বিহ্বল ভাবে পছন্দ করেন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে—এই গান্ধার ভাস্কর্যের মধ্যে দুইটি বিসদৃশ প্রেরণার অতৃপ্তিকর এবং প্রায় শক্তিহীন একটা মিশ্রণ রহিয়াছে, যে মিশ্রণ অন্ততঃ ততদিন বিসদৃশ থাকিয়া যায় যতদিন সে দুই-এর কোন একটি অপরের মধ্যে একেবারে গলিয়া মিশিয়া না যায়। এই জাতীয় সমালোচকেরা মহৎ ও গভীর ভাবব্যঞ্জক কিন্তু তাঁহাদের ধারণার পক্ষে অজানা অন্য মূর্তি ছাড়িয়া কোন কোন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর সৃষ্টিকে কেন প্রশংসা করেন তাহার কারণও ইহাতে পাওয়া যাইবে, কেননা ইহা ছাড়া এ প্রশংসার অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও দেখিতে পাই এ-জাতীয় মন ভারতীয় ও মধ্যযুগের আরব দেশের মুসলমানগণের মিলিত সৃষ্টিকে (Indo-Saracenic creations) প্রশংসার চোখে দেখে—কিন্তু সে প্রশংসা কি সত্যই পূর্ণ ও

গভীরভাবে বুঝিয়া করা হয়? যদিও তাহা কোনমতেই পাশ্চাত্য শিল্পের সমজাতীয় নহে তথাপি কোন কোন বিষয়ে সৌন্দর্যের পাশ্চাত্য ধারণার গণ্ডির উপকণ্ঠে পৌঁছিবার শক্তি তাহার আছে। এমন কি এরূপ মন তাজমহল দেখিয়া এত বেশী অভিভূত হয় যে তাহা কোন ইটালীয় ভাস্করের কীর্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করে, যে ভাস্করের প্রতিভা নিঃসন্দেহ অতি বিস্ময়কর, আর যে এই একমাত্র মহাকীর্তি স্থাপনের সময়ে অলৌকিক উপায়ে নিজেকে ভারতীয় করিয়া তুলিয়াছিল—কেননা ভারতবর্ষ অলৌকিক ঘটনাবলিরই দেশ—এবং হয়ত সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কেননা প্রশংসা করিবার মত আর কোন কীর্তি সে রাখিয়া যায় নাই। আবার এ মন অন্ততঃপক্ষে মিঃ আর্চারের মধ্য দিয়া তাহার মানবীয় ভাবের জন্য জাভার শিল্পকে প্রশংসা করে এমন কি তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে যে সে শিল্প ভারতীয় নহে। তাহার প্রকাশের রীতি-বৈচিত্র্যের পশ্চাতে ভারতীয় শিল্পের সহিত জাভার শিল্পের মৌলিক যে একত্ব আছে এ ধরণের মন তাহা দেখিতে পায় না, কেননা ভারতীয় শিল্পের মূল ভাব ও অন্তরের অর্থ বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি তাহার নাই, তাই জাভার শিল্পের মধ্যে সে ভারতীয় রূপ ও মূল অর্থের সাঙ্কেতিক চিহ্নসকল শুধু দেখে, সুতরাং তাহা সে বুঝিতে পারে না এবং পছন্দ করে না; এইরূপ যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া একজন ঠিকই বলিতে পারে গীতা যখন দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয় তখন তাহা বর্বরোচিত অর্থশূন্য কিম্ভূতকিমাকার এক বস্তু, অথচ তাহাই যখন আধুনিক কোন প্রকার হস্তাক্ষরে লিখিত হয় তৎক্ষণাৎ তাহা অভারতীয় হইয়া দাঁড়ায়, কেননা তাহা যে মানবীয় বুদ্ধিগম্য হইয়া উঠিল!

কিন্তু সাধারণতঃ এই মনের সম্মুখে প্রাচীন কালের হিন্দু, বৌদ্ধ বা বেদান্তের ভাববিশেষের অভিব্যঞ্জক কোন শিল্প উপস্থিত হইলে ইহা হয় শূন্যতা অথবা এক ক্রুদ্ধ অপরিজ্ঞেয়তার ভাব লইয়াই তাহা দেখে। সে মন যখন ইহার অর্থবোধ করিতে চায় তখন কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না, কেননা তাহার নিজের সে অভিজ্ঞতা নাই, এবং এ শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য কি, ইহা কি প্রকাশ করিতেছে তাহা উপলব্ধি করা দূরের কথা তদুপযোগী কল্পনাকে জাগাইয়া তোলাও তাহার পক্ষে অতি দুরূহ; অথবা তাহার স্বদেশে শিল্পের ক্ষেত্রে যাহা দেখিতে সে অভ্যস্ত এখানেও তাহাই দেখিতে চায়, কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া তাহার প্রতীতি জন্মে যে এই শিল্পের মধ্যে দেখিবার মত কিছু নাই, অথবা ইহার কোন মূল্য নাই। অথবা যদি তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সে বুঝিতে পারিত তাহাও সে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, কেননা তাহা ভারতীয় রূপে এবং ভারতীয় ধরণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার রূপ ও ধারার দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পায় ইহা তাহার অপরিচিত, তাহার নিজ

দেশের শিল্পের অনুশাসনের বিরোধী, তাই সে মন বিদ্রোহী হয় ও অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠে, প্রতিহত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে সৃষ্টিছাড়া বিকৃত বর্বরোচিত কুৎসিৎ বা এমন-কিছু-নয় বলিয়া মত প্রকাশ করে এবং গভীর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়; অথবা যাহা বিশ্লেষণ করিতে পারে না মহত্ত্ব ও শক্তির তেমন কোন সৌন্দর্যের দ্বারা যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনও তাহাকে সমৃদ্ধ বর্বরতা বলিয়া আখ্যা দেয়। অনুভবশক্তির এই শূন্যতার আলোকপ্রদ একটি উদাহরণ কি শুনিতে চাও? ধ্যানী বুদ্ধের যে মূর্তিতে অপরিমেয় অনন্ত আধ্যাত্মিক পরম প্রশান্তি ফুটিয়াছে, প্রাচ্যের যে কোন সুসংস্কৃত মন যাহা দেখিবামাত্র অনুভব করিতে এবং নিজ সত্তার গভীর হইতে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারে তাহা দেখিয়া মিঃ আর্চার তাঁহার মধ্যে যে কোন কিছু আছে তাহা অস্বীকার করিয়াছেন, বলিয়াছেন তাহাতে শুধু নিমীলিত নেত্রপল্লব, এক অচল স্থিতি এবং নির্জীব একখানি মুখ মাত্র রহিয়াছে —আমার মনে হয় তিনি তাঁহার আবেগপরিশূন্য প্রশান্ত মুখ দেখিয়াই নির্জীব এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন*। সান্ত্বনা পাইবার জন্য তিনি এরূপ বুদ্ধ মূর্তি অপেক্ষা গান্ধার শিল্পের পদ্ধতিতে গঠিত বুদ্ধ মূর্তিতে যে গ্রীক ভাবের মহত্ত্ব ফুটিয়াছে তাহার অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন্ত মূর্তির প্রশংসা করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে পেশোয়ার হইতে কামাকুরা পর্যন্ত যত বুদ্ধ মূর্তি আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে; এরূপ তুলনা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইহা তুলনার অপব্যবহার, আমার বিশ্বাস মহাকবি নিজেই ইহার প্রথম ও প্রধান প্রতিবাদকারী হইবেন। এখানে আমরা অনুভব শক্তির একান্ত অভাব দেখিতে পাই, দেখিতে পাই তাঁহার মনের দ্বার রুদ্ধ, তাঁহার মনের জানালার কপাটও বন্ধ; এবং এখানেই ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও প্রেরণা যাহা দিতে চায় তাহা গ্রহণ না করিয়া, তাহার নিকট স্বভাবসিদ্ধ পাশ্চাত্য মন অন্য কিছু কেন দাবি করে এবং সেই দাবির পর কেন যে অন্য ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, অন্য জাতীয় সৃষ্টিশীল দৃষ্টির প্রসার ও কল্পনার শক্তি এবং আত্মপ্রকাশের ধারার মধ্যে প্রবেশ করিতে চায় না তাহার কারণ বুঝিতে পারি।

*মিঃ আর্চার একটি টীকায় এই সমস্ত বুদ্ধমূর্তির এক অযৌক্তিক সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যে তাহার কোন মূল্য দেন নাই তাহা ঠিকই করিয়াছেন, সে সমর্থন হইল এই যে এ সমস্ত বিসৃষ্টির মধ্যে কোন মহত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা নাই; তাহা শুধু শিল্পীর ভক্তিতেই আছে! যদি কোন শিল্পী তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহার নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহার রূপ দিতে না পারেন—বর্তমান ক্ষেত্রে যাহা রূপায়িত হইয়াছে তাহা তো ভক্তি নহে—তবে তাহা গর্ভস্রাবের মতই নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহার সৃষ্টিতে যদি তাহা প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে মন সে সৃষ্টি দেখে তাহার মধ্যেও তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে।

এই কথা একবার বুঝিবার পর শিল্পসৃষ্টির প্রকৃতি এবং পদ্ধতিতে যে পার্থক্যের জন্য পরস্পরকে বুঝিবার বাধা জাত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে চাই, কেননা তাহাতে এ ব্যাপারের বাস্তব দিকটা আমরা অবগত হইতে পারিব। সমস্ত মহৎ শিল্পসৃষ্টিই বোধিচেতনার ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়, বস্তুতঃ কোন মানসিক ধারণা বা সমৃদ্ধ কল্পনা হইতে নয়,—এ সমস্ত শুধু মনের ক্ষেত্রে বোধির ক্রিয়ার অনুবাদ—কিন্তু ইহা বোধিচেতনার মধ্য দিয়া জীবনের বা সত্তার কোন সত্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ, সেই সত্যের কোন সার্থক রূপ, মানুষী মনে সে সত্যের এক পরিণতি। এ পর্যন্ত ইউরোপের এবং ভারতের মহৎ শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাহা হইলে এ উভয় শিল্পের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান তাহার আরম্ভ কোথা হইতে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে এই মূল উৎস ভিন্ন অন্য সব কিছুতেই ভেদ রহিয়াছে, বোধিদৃষ্টির বিষয়ে ও ক্ষেত্রে ভেদ আছে, সেই দৃষ্টি বা ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিবার পদ্ধতিতে ভেদ আছে, ফুটাইয়া তুলিবার ক্রিয়াতে বাহ্য রূপ ও গঠনরীতির যে অংশ আছে তাহাতে ভেদ আছে, মানুষের মনের কাছে তাহা অভিব্যক্ত করিবার সমগ্র পন্থায় ভেদ আছে, এমন কি আমাদের সত্তার যে কেন্দ্রে সে শিল্পের আবেদন পেঁৗছিবে তাহাতেও ভেদ আছে। ইউরোপীয় শিল্পী প্রাণ ও প্রকৃতির প্রতীয়মান বাহ্য রূপের কোন ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত হইতে তাহার প্রেরণা লাভ করে, অথবা তাহার নিজের আত্মার মধ্যের কোন কিছু হইতে যদি তাহার সূত্রপাত হয় তবে তাহা তাহার আশ্রয়স্থান রূপে কোন বাহ্যরূপের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যুক্ত করে। সে তাহার বোধি ও তার প্রেরণাকে তাহার মনের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে নামাইয়া আনে এবং তাহাকে মনোময় উপাদানে সজ্জিত করিবার জন্য বুদ্ধিগত ধারণা ও কল্পনাকে জাগাইয়া তোলে, যাহার ফলে মুগ্ধ আবেগ বিচার ও সৌন্দর্যবোধের এক রূপে সেই বোধিভাবের এক অনুবাদ দেখা দেয়। তাহার পর তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে জীবন ও প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যময় "অনুকরণ" হইতে যাহার আরম্ভ সেই ভাষার মধ্য দিয়া কার্য আরম্ভ করিতে চক্ষু ও হস্তকে নিয়োগ করে, সাধারণ শিল্পীর হাতে অনেক সময় তাহা অনুকরণ মাত্রই থাকিয়া যায়, কিন্তু, প্রকৃত শিল্পী তাহা হইতে এক তাৎপর্য পাইতে চায় যাহা তাহার বিসৃষ্টিকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের সত্তার বা বিশ্বসত্তার মধ্যে বাহ্যতঃ নাই এমন কিছুর প্রতিরূপে রূপান্তরিত করিবে, আর এই কিছুই ছিল বোধিদৃষ্ট প্রকৃত বস্তু। আর এইজন্য এ শিল্পকে দেখিবার ও বুঝিবার জন্য বর্ণ, রেখা ও তাহাদের সন্নিবেশ-প্রণালীর আর যাহা কিছু বাহ্য উপায়ের অংশ হইতে পারে তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের মনোময় ব্যঞ্জনায়—আবার তাহার মধ্য দিয়া সমস্ত ব্যাপারের মূল সত্তায় বা আত্মায় পেঁৗছিতে হয়। এ শিল্পের আবেদন সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তরস্থ গভীরতম আত্মা এবং চিৎপুরুষের চক্ষুর

নিকটে নয় কিন্তু ইহার আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাণ আবেগ বুদ্ধি ও কল্পনার খেলাকে প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিয়া আমাদের বহিশ্চর আত্মার নিকট পর্যন্ত পেঁছাইয়া দেয়, আর আধ্যাত্মিকতার সাক্ষাৎ ইহার মধ্যে তত বেশী বা তত অল্প পরিমাণে পাই, তাহা নিজেকে বাহ্য প্রাকৃত মানুষের মধ্য দিয়া যতটা সংগতিবিশিষ্ট করিতে এবং নিজেকে তাহার মধ্যে যতটা প্রকাশ করিতে পারে। এ শিল্প প্রাণ ক্রিয়া বাসনা আবেগ মনের ধারণা ও প্রকৃতিকে তাহাদের নিজের জন্য দেখিতে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া রসবোধের আনন্দলাভ করিতে চায়, ইহারাই তাহার অনুপ্রেরণাজাত শিল্পসৃষ্টির বিষয় ও ক্ষেত্র। ভারতীয় মন ইহাদের পশ্চাতে স্থিত আর যে কিছুকে জানে তাহার অভিব্যক্তি এ শিল্পে হয় না, যদি কিছু হয় তাহাও হয় অনেক আবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। শিল্পের আরও মহত্ত্বর মহত্ত্ব ও উচ্চতম পূর্ণতার জন্য অনন্তের এবং তাহার দৈবী ভাবসকলের সাক্ষাৎ এবং অনাবৃত অভিব্যক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা হয় না বা তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করাও হয় না।

প্রাচীন ভারতের মহত্তম শিল্পের সিদ্ধান্ত অন্য ধরনের, আর কোন দেশের মহত্তম শিল্পসৃষ্টিই তথাকার বাকি সকল শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিধান করে, তাহাদের উপর নিজের কিছু প্রভাব বিস্তার করে, নিজের কিছু ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। ভারতীয় শিল্পের উচ্চতম কার্য ছিল অভিব্যক্ত রূপের মধ্য দিয়া জীবাত্মার দৃষ্টির সম্মুখে পরমাত্মার, অনন্তের, ভগবানের কিছুকে খুলিয়া ধরা; আত্মাকে তাহার অভিব্যক্তির, অনন্তকে তাহার জীবন্ত সান্ত প্রতীকের, ভগবানকে তাহার সক্রিয় শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা; অথবা আত্মার বোধে বা অনুভূতিতে অথবা তাহার ভক্তিতে কিম্বা অন্ততঃপক্ষে তাহার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় রসানুভূতির বা আবেগের মধ্যে দৈবী ভাবসমূহকে ফুটাইয়া তোলা, আলোকোজ্জ্বল ভাবে তাহাদের ব্যাখ্যা বা কোন না কোন উপায়ে তাহাদের আভাস বা ইঙ্গিত দেওয়া। যখন দৈবীভাবাপন্ন এই শিল্প এই সমস্ত উচ্চশিখর হইতে আমাদের এ জগতের পশ্চাতে অবস্থিত মধ্যবর্তী কোন জগতের ক্ষুদ্রতর দেবতা বা অপদেবতাগণের ক্ষেত্রে নামিয়া আসে, তখনও তাহাদের মধ্যে উপরের কিছু শক্তি অথবা কোন আভাস বা ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। এবং যখন সে শিল্প জড়জগতে মানুষের জীবন এবং বাহ্য প্রাকৃতিক বস্তুর ক্ষেত্রে অবতরণ করে, তখনও তাহার বৃহত্তর দর্শন, দৈবীভাবের ছাপ, অধ্যাত্মদৃষ্টি পূর্ণরূপে হারাইয়া বসে না এবং অধিকাংশ উৎকৃষ্ট শিল্পের মধ্যে সর্বদা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিরূপসকল যেন এক অপ্রাকৃত আকাশমণ্ডলে ভাসিতে থাকে—অবশ্য অবসরকাল বিনোদনের বা হাস্যরস উদ্দীপনের অথবা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর কোন কিছুর খেলা উজ্জ্বলভাবে দেখাইবার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতে পারে। এখানে জীবনকে আত্মার অথবা অনন্ত বা জড়াতীত কিছুর কোন

ব্যঞ্জনার মধ্যে দেখা হয়, অথবা অন্ততঃপক্ষে এই সমস্তের একটা স্পর্শ ও প্রভাব থাকে যাহা রূপ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। সকল ভারতীয় শিল্প যে এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা নহে; তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহ এমন অনেক শিল্প আছে যাহা এ আদর্শে পৌঁছিতে পারে নাই, নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, ব্যর্থ এমন কি বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই যাহা অত্যুত্তম এবং বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক তাহার দ্বারাই শিল্পের ধারা বা ধরণ নির্ণীত হয় এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগকে সে শিল্পের বিচার করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও তত্ত্বে ভারতীয় শিল্প ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য অঙ্গসকলের সঙ্গে একীভূত।

এই জন্য ভারতীয় শিল্পীর শিল্পপদ্ধতি হইল প্রথমে আত্মাতেই দেখা এবং তাহাই তাহার উপর ভারতীয় শিল্পের অনুশাসনেরও সাক্ষাৎ নির্দেশ। যাহা তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার সত্য তাহার নিজের অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে দেখিতে হইবে, তাহার রূপ তাহার বোধিমানসে গঠিত ও প্রকাশিত করিয়া তুলিতে হইবে; তাহার আদর্শ, তাহার প্রামাণিকতা, তাহার বিধান, তাহার শিক্ষক, তাহার পরিকল্পনা বা প্রেরণার মূল উৎসের জন্য বাহ্য জীবন ও প্রকৃতির দিকে প্রথমেই দৃষ্টিপাত করিতে এবং তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে সে বাধ্য নহে। যাহা সে ফুটাইয়া তুলিতে চায় তাহা যখন এমন কিছু যাহা সম্পূর্ণ অন্তরের বস্তু তখন ইহা সে কেন করিতে যাইবে? উদ্দীপনার জন্য বুদ্ধির, মনোময় কল্পনার অথবা বাহির হইতে আগত কোন আবেগ বা উত্তেজনার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না, তাহার নির্ভরতা আত্মার বা অন্তরপুরুষের কোন ধারণা প্রতিবিম্ব অথবা আবেগের উপর, আর মনোময় প্রতিরূপাবলি সে-উদ্দীপনা তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে শুধু গৌণভাবে সাহায্য করে এবং তাহার রূপ ও বর্ণবিন্যাসের একটা অংশ শুধু দান করে। সে যাহা প্রকাশ করিতে চায় বাহ্যরূপ বর্ণ রেখা ও পরিকল্পনা তাহার স্থূল ও জড় উপায় মাত্র, তাই এ সমস্ত ব্যবহার করিতে গিয়া সে প্রকৃতির অবিকল অনুকরণ করিতে বাধ্য নয়, তাহার উদ্দেশ্য বাহ্যরূপ ও অন্য সব কিছুকে তাহার অন্তর্দৃষ্টির মর্মার্থ-প্রকাশক করিয়া তোলা; সুতরাং বাহ্য প্রকৃতিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না এমন কোন পরিবর্তন কোন ভঙ্গি কোন বিশেষ ভাবের তুলিকাপাত অথবা প্রতীকের কোন বৈচিত্র্য দ্বারাই যদি শুধু তাহা করা যায় অথবা সুষ্ঠুরূপে করা যায়, তবে তাহা করিবার পূর্ণ অধিকার তাহার আছে, কেননা তাহার কাজ কেবল তাহার অন্তরে অনুভূত সত্যের পরিস্ফুরণ, অন্তরে যাহা দেখিতেছে এবং বাহিরে যাহা ফুটাইয়া তুলিতেছে এ উভয়ের ঐক্যসাধন। রেখা বর্ণ ও এই জাতীয় অন্য সব কিছু তাহার অভিনিবেশের প্রথম বা প্রধান বিষয় নহে, সর্বশেষে দেখিবার বিষয় মাত্র,

কেননা যাহা তাহার মনে পূর্বেই অধ্যাত্মরূপ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনেক কিছুকে এ সমস্তের মধ্য দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। উদাহরণ, বুদ্ধের মানুষী মুখ বা দেহকে অথবা তাহার জীবনের কোন এক বিশেষ আবেগ বা ঘটনাকে পুনরায় মূর্ত করিয়া তোলাই তাহার কাজ নহে কিন্তু বুদ্ধমূর্তির মধ্য দিয়া তাহাকে নির্বাণের পরিপূর্ণ প্রশান্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সেইজন্যে খুঁটিনাটি প্রতিটি বস্তু প্রতিটি আনুষঙ্গিক বিষয়কে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বা সহায় করিয়া তুলিতে হইবে। এমন কি ভারতীয় শিল্পী যখন কোন বিশিষ্ট মানুষী-আবেগ বা ঘটনার ছবি আঁকিতে বসে তখনও সাধারণত তাহাকে শুধু তাহাই আঁকিলে চলে না, তাহা আত্মার মধ্যস্থ আর যাহাকে নির্দেশ করে অথবা যাহা হইতে তাহার যাত্রারম্ভ হইয়াছে এমন অন্য কিছুকেও আঁকিতে হয়, হয়ত বা সেই অন্য কিছুকেই অধিকতর রূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, অথবা ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থিত কোন শক্তিকে তাহার পরিকল্পনার বিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে এবং তাহাকেও ফুটাইয়া তুলিতে হয় এবং অনেক সময় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আবার যে চক্ষু শিল্পীর সৃষ্ট বস্তু দেখে তাহার মধ্য দিয়া তাহার আবেদন শুধু বহিশ্চর আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিলেই তাহার কার্যসাধন হইল না, আবেদন তাহার অন্তরের সত্তায় তাহার অন্তরাত্মায়ও পেঁছা চাই। বেশ বলা যাইতে পারে যে ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ তাৎপর্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সকল শিল্পসৌন্দর্য আস্বাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সাধারণ সহজাত রসচেতনা আছে কেবলমাত্র তাহার অনুশীলন করিলে চলিবে না, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বা সংস্কৃতি আছে তাহা লাভ করিতে হইবে; তাহা না হইলে আমরা শিল্পের বাহ্য দিকটাই শুধু দেখিতে পাইব, বড়জোর বহিঃস্তলের ঠিক নিম্নে অবস্থিত অংশটা মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে, গভীরতর প্রদেশে অবস্থিত রসঘন অংশ দেখিতে পাইব না। মনে রাখিতে হইবে যে ইহা বোধিচেতনাজাত এক আধ্যাত্মিক শিল্প এবং বোধিচেতনা ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত চক্ষু দিয়াই ইহা দেখিতে হয়।

ইহাই ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য, যাহা অপর সকল শিল্প হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিলে আমরা ভারতীয় শিল্পকে হয় একেবারেই বুঝিতে পারিব না অথবা বহুল পরিমাণে ভুল বুঝিব। ভারতের স্থাপত্য চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য তাহাদের অনুপ্রেরণায় ভারতের কেন্দ্রগত সারবস্তু দর্শন ধর্ম যোগ ও সংস্কৃতির সহিত যে কেবল অন্তরঙ্গ-ভাবে একীভূত হইয়া আছে তাহা নহে, এ সমস্ত তাহাদেরই তাৎপর্যের গভীর ও বিশেষ প্রকাশ। এ দেশের সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহার অনেকটা রসাস্বাদন এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ না করিয়াও

চলিতে পারে, কিন্তু হিন্দু বা বৌদ্ধদের অন্যান্য শিল্পের অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকে যাহার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। এই সমস্ত শিল্প প্রধানতঃ ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যান এবং ধর্মীয় অনুভূতি হইতে জাত রসসমৃদ্ধ দৈবীভাবাপন্ন ভাষায় লিখিত।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় শিল্প

স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যা এই তিন প্রধান শিল্প চক্ষুর মধ্য দিয়া আত্মার কাছে রসের আবেদন জানায় বলিয়া এ সমস্তের মধ্যে রূপ এবং অরূপের (অথবা দৃশ্য এবং অদৃশ্যের) এক পরম মিলন ঘটে, যাহাতে এ দুইএর প্রত্যেকের উপরই অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়, অথচ প্রত্যেকের পক্ষে অপরটি অতি প্রয়োজনীয়। এখানে রূপের পক্ষে নির্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহার আয়তন ও অনুপাতের, রেখা ও বর্ণের সমর্থন ও সার্থকতা কেবল তখনই হয় যখন তাহারা অস্পর্শ্য ইন্দ্রিয়াতীত কিছুকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারে; অন্তরাত্মাকেও চক্ষুর মধ্য দিয়া নিজের কাছে নিজেকে প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত করিবার জন্য জড়-দেহের যতটা সাহায্য নেওয়া সম্ভব তাহার সবটাই নিতে হয়, অথচ সে ইহাও চায় যে তাহার নিজের মহত্তর তাৎপর্য বা সার্থকতার পক্ষে সে-দেহ যতটা সম্ভব স্বচ্ছ আবরণ হইতে পারে তাহা হউক। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের শিল্প সাধারণভাবে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের কথা,—বলিতে গেলে যাহাতে অবশ্য সর্বদাই ব্যতিক্রম থাকিয়া যাইবে—পরস্পরানুবিদ্ধ এই দুই শক্তির সমস্যার কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রতীচ্য-মন রূপেই আকৃষ্ট এবং নিবদ্ধ হয়, রূপের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিতে চায়, তাহার মাধুর্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চায় না, তাহার নিজের সৌন্দর্যের জন্যই রূপকে সে ভালবাসে, তাহার অতি পরিদৃশ্যমান ভাষা (বা প্রকাশ) হইতে সাক্ষাৎভাবে ভাবাবেগ, ভাবনা এবং রসের যে সমস্ত ইঙ্গিত বা আভাস ফুটিয়া উঠে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার বাহিরে যাইতে চায় না; সে আত্মাকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে; প্রায় বলা যাইতে পারে যে এই মনের কাছে, রূপই আত্মা বা চিদ্বস্তুর স্রষ্টা, তাহার অস্তিত্বের জন্য এবং যাহা কিছু সে বলিতে বা করিতে চায় তাহার জন্য, তাহাকে রূপের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই মনোভাবের বিপরীত মেরুপ্রান্তে অবস্থিত। ভারতীয় মনের কাছে আত্মার সৃষ্টবস্তু হওয়া ছাড়া রূপের কোন অস্তিত্বই নাই, রূপ তাহার সকল অর্থ সকল মূল্য চিদ্বস্তু হইতেই লাভ করে। এ মনের

পক্ষে প্রত্যেক রেখা, অঙ্গবিন্যাস, বর্ণ, আকৃতি, ভঙ্গী, দেহগত প্রত্যেক আভাস —পরিমাণে যতই বহুল, যতই ঘন সন্নিবিষ্ট, যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ইঙ্গিত, একটা চিহ্ন বা দ্যোতনা, অনেক সময় একটা প্রতীক মাত্র, যাহার প্রধান কাজ হইতেছে কোন আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ, ধারণা বা প্রতিরূপের আশ্রয় হওয়া; আবার এই সকল আবেগ ধারণা ও প্রতিরূপ নিজেদিগকে অতিক্রম করিয়া যাহার সংজ্ঞা দেওয়া আরও কঠিন সেই চিদ্বস্তুর আরও গভীর ভাবে অনুভবযোগ্য সত্যে লইয়া যায়, আর সেই সত্যই সৌন্দর্য-রসিক চিত্তে এই সমস্ত গতিবৃত্তি জাগাইয়া তোলে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া গিয়া সার্থক আকার গ্রহণ করে।

আমাদের মতে শিল্পপ্রেরণা সম্বন্ধে অনুধ্যানপরায়ণ ও সৃজনশীল ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্যসূচক এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, তাহার সৃষ্টি-বিচারের সময় শিল্পী যে সত্যকে প্রকাশ করিতেছে, বাহ্য ভাবকে অতিক্রম করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরলোকে, তাহার আন্তর প্রকৃতির মধ্যে প্রথমেই প্রবেশ করিয়া তথা হইতে সে শিল্পকে দেখিতে হইবে, বাহির হইতে নয়। আমার মনে হয় প্রথমে বাহ্য আকারের প্রতি অঙ্গ খুঁটিনাটি ভাবে দেখিতে আরম্ভ ও তাহার পরে সকল অঙ্গের সমন্বয় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতিতে দেখা হইবে। মনে হয় পশ্চিমের প্রচলিত সমালোচনা পদ্ধতি এই যে তাহা কোন ললিতকলার 'আঙ্গিক' বা সম্পাদন রীতিতে, তাহার রূপে, তাহার আকারের স্পষ্ট বক্তব্যে অবস্থিত থাকিয়া, সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাহার পরে সে শিল্প যে সুন্দর বা হৃদয়গ্রাহী ভাবাবেগ এবং ধারণা জাগাইয়া তুলিতে চায়, তাহার কোন প্রকার মূল্যাবধারনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। এ ধরনের সমালোচনা সাধারণতঃ যতদূর পৌঁছে তদপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, শুধু অধিকতর সংবেদনশীল ও তীক্ষ্ণ এবং গভীরে প্রবেশ করিতে অভ্যস্ত কতিপয় মনই। কিন্তু ভারতীয় শিল্পকলাতে এই ধরনের সমালোচনা প্রয়োগ করিলে মনে হইবে যে, ভারত কোন বড় শিল্প সৃষ্টি করিতে পারে নাই অথবা যাহা করিয়াছে তাহার সার্থকতা অতি সামান্য। ভারতীয় শিল্পের রসবোধের মধ্যে প্রবেশের একমাত্র খাঁটি পথ হইল, পূর্ণরূপে বোধি বা উপলব্ধিজাত ধারণা বা সংস্কার লইয়া অথবা ভারতীয় পরিভাষা যাহাকে ধ্যান বলে তাহার সাহায্যে সমগ্রতার উপর অভিনিবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক অর্থ এবং পরিবেশের মধ্যে একেবারে ঢুকিয়া পড়া, তাহার সহিত নিজদিগকে যত পূর্ণরূপে সম্ভব এক করিয়া তোলা; কেবল তাহা হইলেই বাকী সকলের উপযোগী অর্থ এবং মূল্য পূর্ণ ও আত্মপ্রকাশক শক্তির সঙ্গে প্রকাশ পাইবে। কেননা এখানে চিদ্বস্তুই রূপকে ধারণ ও বহন করে, পক্ষান্তরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিল্পে রূপই

চিদ্বস্তুকে যতটুকু পারে ধারণ ও বহন করে। এই সম্পর্কে এপিকটেটাস (Epictatus)-এর সেই বিস্ময়কর উক্তি বারবার মনে পড়ে, যেখানে তিনি মানুষকে এক মৃতদেহ বহনকারী ক্ষুদ্র আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণ পাশ্চাত্য দৃষ্টি অধিকতর রূপে সজীব জড়বস্তুর উপর ন্যস্ত, সেই জড়ময় জীবনের মধ্যে আত্মার যৎসামান্য পরিচয়মাত্র পায়। কিন্তু ভারতীয় মন এবং ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টির বিষয় এক 'মহান আত্মা' এক অসীম চিদ্বস্তু যাহা তাহার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের মহাসমুদ্রমধ্যে নিজেরই এক সজীব আকার বা রূপ আমাদের নিকট বহন করিয়া আনে, নিজের আনন্ত্যের সঙ্গে তুলনায় সে রূপ অতি ক্ষুদ্র তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি রূপের এই প্রতীকের মধ্যে এমন শক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে, যাহা অনন্তের আত্মপ্রকাশের কোন বিভাব বা বিভূতির আশ্রয়স্থল হইতে পারে। সুতরাং মূলকথা এই দাঁড়াইল যে এখানে যুক্তিবিচার এবং রসবোধ-বিভাবিত কল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত চর্মচক্ষু দ্বারা মাত্র দেখিলে চলিবে না, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিকে পথ রূপে ব্যবহার করিয়া অন্তরের অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে খুলিয়া দিতে হইবে, আত্মার সহিত মর্মস্পর্শী যোগ স্থাপন করিতে হইবে। যে জন শুধু রসবোধজাত ঔৎসুক্য অথবা বিচার ও ভাবনাশীল সমালোচনাপরায়ণ বহির্মুখী মন লইয়া প্রাচ্যের কোন মহান শিল্পবস্তুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহার কাছে সে শিল্প নিজের গোপন রহস্য সহজে প্রকাশ করে না, অপরিচিত বৈদেশিক পরিবেশের মধ্যে ভ্রমণকারী পরিমার্জিত ও স্বার্থজড়িত পর্যটকের পক্ষে, সে রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যে আরও দুরূহ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই; কিন্তু এই মহান্ শিল্পের রহস্য বুঝিতে হইলে, যখন মানুষ দীর্ঘ এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারে, যখন জড়-জীবনের প্রচলিত প্রথা বা লোকব্যবহারের ভার যথা-সম্ভব লঘু করিতে সমর্থ হয়, তেমন সময় একাকী, আত্মার নিঃসঙ্গতার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। এই জন্য এই বিষয়ে এক সূক্ষ্ম এবং সুকুমার বোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া জাপানীরা তাহাদের মন্দির এবং বুদ্ধ-মূর্তিসকল যতদূর পারিয়াছে, পর্বতশীর্ষে অথবা প্রকৃতির সুদূর ও বিজন দৃশ্যাবলির মধ্যে স্থাপিত করিয়াছে, এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্থূল পরিবেশের মধ্যে তাহার মহান শিল্পবস্তুসকলের সঙ্গে একত্রে বাস বর্জন করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাই পছন্দ করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এমনভাবে রাখিয়াছে যে জীবনের বাহ্য ঘটনাবলী হইতে আত্মা যখন বিশ্রাম নিতে পারে, তখন অধিকতর সুন্দর ও প্রীতিপদ মুহূর্তে অথবা পৃথক ভাবে তথায় তাহারা গমন করিতে এবং তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি সমাহিত করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের ঐ ব্যঞ্জনা নির্বিবাদে মনে বসিয়া যাইতে এবং তাহাদের গোপন রহস্যের সম্পদ অন্তরে সঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু বর্তমান ইউরোপ

তাহার চিত্রপ্রদর্শনীগৃহ ঠাসিয়া ভরিয়াছে, তাহার দেওয়াল অতি ঘন সন্নিবিষ্ট ছবিতে সজ্জিত করিয়াছে, যাহার প্রচণ্ড আক্রমণ তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় সূক্ষ্মবোধ পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, যদিও হয়ত একথা বলিয়া আমি ভুল করিলাম, কেননা ইউরোপীয় চিত্রপ্রদর্শনীর ইহাই বোধহয় খাঁটি উপায় ও পদ্ধতি। কিন্তু জাপানী প্রথার একটা বিশেষ মূল্য আছে, কেননা তাহা প্রাচ্য শিল্পের আবেদনের প্রকৃতি সর্বোত্তমরূপে নির্দেশ করে এবং শিল্পের মহান সৃষ্টিসকল দেখিবার প্রকৃত উপায় এবং মনোভাব কি হওয়া উচিত তাহা বুঝাইয়া দেয়।

ভারতীয় স্থাপত্য আমাদের নিকট এই ভাবের অন্তর্দর্শন এবং ইহার গভীরতম তাৎপর্যের সহিত চিন্ময়ভাবে বিভাবিত এই একাত্মবোধ বিশেষ ভাবে দাবি করে, অন্যথায় তাহা আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিবে না। প্রাচীন ভারতের সাধারণ আবাসভূমিরাজি, তাহার রাজপ্রাসাদ, জনসভাগৃহ এবং নাগরিকগণের হর্ম্যমালা, যাহাদিগকে অনাধ্যাত্মিক বা ঐহিক (secular) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারা কালের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার অধিকাংশ বৃহৎ পর্বতশিখরে বা গুহামধ্যে যে সমস্ত মন্দির ছিল তাহার কিয়দংশ; তাহা ছাড়া সমভূমিতে অবস্থিত প্রাচীন সহরের কোন কোন মন্দিরও আজ পর্যন্ত রক্ষা পাইয়াছে; আর বাকি যাহা আছে তাহা পরবর্তী সময়ের দেবালয় ও মন্দিরসমূহ যাহাদের কতকগুলি মন্দির-কেন্দ্রিক সহরে (Temple City) এবং কতকগুলি শ্রীরঙ্গম বা রামেশ্বরম প্রভৃতি তীর্থস্থানে; আবার কোন কোনটি বা আছে মাদুরার মত একদা রাজকীয় নগরে অবস্থিত, যখন মন্দিরই জীবনের কেন্দ্র ছিল সেই সময় তাহারা স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এ শিল্পের যে ধ্বংসাবশেষ আজ আমরা পাই, তাহাতে পবিত্র এবং দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত শিল্পের পবিত্রতা ও উৎসর্গের দিকই বিশেষ রূপায়িত করা হইয়াছে; এই সমস্ত পবিত্র দেবায়তনগুলি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাপ্রধান এক সংস্কৃতির চিহ্ন, স্থাপত্যশিল্পে সেই সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ। তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে ব্যঞ্জনা, ধর্মের যে তাৎপর্য আছে তাহা যদি জানা না থাকে, তাহার প্রতীক ও রূপরেখা যে অর্থ নির্দেশ করে তাহা বুঝিবার শক্তির যদি অভাব থাকে, তবে শুধু যুক্তি-বিচার এবং প্রাকৃত ভাবের রসগ্রাহী মনকে লইয়া দেখিলে, এই শিল্পের খাঁটি এবং জ্ঞানোজ্জ্বল মূল্যাবধারণে যে সমর্থ হইব এ আশা করা বৃথা। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এখানে যে ধর্মভাব ব্যক্ত হইতেছে তাহা ইউরোপীয় ধর্মবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু; এমন কি মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম পূর্ব-দেশজ হওয়া এবং তদ্দেশীয় ধর্মের সঙ্গে তাহার অনেক বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ কোন খাঁটি সাহায্য করিতে পারিবে না,—বিশেষতঃ যে

খৃষ্টধর্মকে বর্তমানে যেভাবে দেখা হয় সেই ইউরোপীয় মনের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি দেখা হয়, সেই মনের দৃষ্টিভঙ্গীতে, যে মন দুইটি সংকটকালের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার একটি রেনেসাঁস বা গ্রীক ও রোমান প্রভাবে ইউরোপের নব-জাগরণ, অপরটি অধুনাতন কালের ঐহিকতা। ভারতীয় মন্দিরের শিল্প-সৌন্দর্য দেখিতে গিয়া পাশ্চাত্য দেশের স্মৃতি লইয়া আসিলে, অথবা গ্রীসে অবস্থিত এথেনি দেবীর মন্দির (Parthenon) বা ইটালীর গীর্জা বা গম্বুজ বা ঘণ্টামণ্ডপ (Duomo or Campanile) অথবা এমন কি মধ্যযুগে ফ্রান্সে গথিক রীতিতে গঠিত মহামন্দিরসমূহের—যদিও ইহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ভারতীয় মননধারার অনেকটা নিকটের বস্তু—সহিত তুলনা করিলে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে যাহা মারাত্মক বিদেশী এবং বিক্ষোভকারী এমন উপাদান বা আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং ভারতীয় শিল্পের মৌলিক ভাব ধরিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইবে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় মন অল্প বা বেশী পরিমাণে হয় সচেতনভাবে নয় অবচেতনভাবে তাহাই করিয়া বসে—কিন্তু এখানে ইহা একটা ক্ষতিকর সংমিশ্রণ, কেননা তাহাতে অমেয়কে যাহা দেখিতে পাইয়াছিল এমন এক দিব্যদৃষ্টিজাত শিল্পকে কেবল সীমিত, পরিমিত বস্তু দেখিতে অভ্যস্ত চক্ষুর পরীক্ষাধীন করা হইবে।

ভারতের পবিত্র স্থাপত্যের ধারা, যে কোন সময়ের যে কোন ধরনের বা যে কোন দেবতাকে উৎসর্গিত হউক না কেন, অনাদি অতীতের সুপ্রাচীন কিছুর সহিত আজিও যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, যে-কিছুকে ভারত ব্যতীত অপর সকল দেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা অতীতের গৌরব ছিল; তবু সংস্কৃতির ধারা সম্মুখে সেই কিছুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর তাহা ভবিষ্যতে আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে, এমন কি এখনই ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই হইবে ভবিষ্যতের পরম সম্পদ, যদিও যুক্তিবাদী মন একথা সহজে স্বীকার করিবে না। যে কোন দেবতার জন্য প্রস্তুত হউক না কেন, ভারতের কোন মন্দির তাহার অন্তরতম সত্যে পরম দেবতার জন্য স্থাপিত একটা বেদী, বিশ্বপুরুষের একটি বাসগৃহ, অনন্তের দিকে একটা আবেদন ও আস্পৃহা। তাহাকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং সেই দৃষ্টির আলোক ও ধারণার সাহায্যে বুঝিতে হইবে, অন্য সব কিছুকেও সেই দৃষ্টির পরিবেশে ও সেই আলোকে দেখিতে হইবে, আর কেবল তাহা হইলেই প্রকৃতভাবে বুঝা সম্ভব হইবে। শিল্প-সৌন্দর্য-বিচারক কোন চক্ষু যতই সতর্ক এবং সংবেদনশীল, শিল্পরসিক কোন মন যতই পূর্ণ এবং সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন হউক না কেন, শিল্প সম্বন্ধে যদি তাহা যুক্তিচালিত সৌন্দর্যের গ্রীক ধারণায় আসক্ত থাকে, অথবা নিজেকে যদি জড় বা বুদ্ধিগত ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, এবং বিশ্বচেতনার কিছুটা সংস্পর্শে,

চিন্ময় চেতনার কিছুটা দিব্য প্রকাশে, অনন্তের কিছু ইঙ্গিতে অন্তরঙ্গভাবে সাড়া দেওয়ার ফলে যে বৃহৎ বস্তু এখানে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার দিকে যদি নিজেকে খুলিয়া ধরিতে না পারে, তবে তাহা এ শিল্পকে তেমন সত্য বা পূর্ণ-ভাবে বুঝিতে পারিবে না। চিন্ময় আত্মা বিশ্বপুরুষ অনন্ত—এই সমস্ত বস্তু যুক্তিবিচারের মধ্যে ধরা পড়ে না, তাহারা যুক্তিবিচারের ঊর্ধ্বলোকে নিত্য বর্তমান, কিন্তু বুদ্ধির কাছে এ সমস্ত শব্দ মাত্র, কেবল আমাদের অন্তরতম আত্মার বোধি বা দিব্যানুভূতির আলোকে তাহারা আমাদের নিকট দর্শনীয় ও বোধগম্য হইতে পারে। যে শিল্প এই সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা লইয়া আরম্ভ হয় কেবল তাহাই আমাদের, আমাদের সত্তার, আমাদের আত্মার মধ্যস্থিত, সাড়া দিতে সমর্থ বোধি-চেতনা ও দিব্যোপলব্ধি-শক্তির কিছুটার মধ্য দিয়া তাহার যাহা দেওয়ার আছে সেই সমস্ত বস্তু, তাহাদের সংস্পর্শ, তাহাদের সান্নিধ্য আমাদিগকে দিতে পারে, তাহাদের আত্মপ্রকাশ আমাদের কাছে বোধগম্য করিতে পারে। ইহা পাইবার জন্যই এ শিল্পের কাছে আসিতে হইবে, ইহার নিকট সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অন্য কোন আকাঙিখত বস্তুপ্রাপ্তি-জনিত পরিতৃপ্তির অথবা অন্য কোন ভিন্ন ভাবের কল্পনা এবং আরও সীমিত বাহ্য তাৎপর্যের দাবি করিলে চলিবে না।

ভারতীয় স্থাপত্য এবং তাহার তাৎপর্যের ইহাই প্রথম সত্য, এ সত্যকে বিশেষ জোর দিয়াই বলিতে হইবে, এ স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সাধারণ ভুল ধারণা এবং আপত্তির উত্তর ইহা হইতে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাইবে। সকল শিল্পের আশ্রয়স্থল কোন প্রকারের একটা একত্ববোধ, তাহার মধ্যস্থিত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল খুঁটিনাটি—অল্প এবং বিরলভাবে সন্নিবিষ্ট অথবা বহু ঘন সন্নিবিষ্ট এবং পরিপূর্ণ যাহাই হউক না কেন—সেই একত্বে লইয়া যাইবে এবং তাহার তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে, অন্যথায় তাহা শিল্প বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এখন আমাদের পশ্চিমদেশীয় সমালোচককে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতে শুনি যে ভারতীয় শিল্পের মধ্যে একত্ব নাই; কত স্বাভাবিকভাবে যে এ বোধ তাহার মধ্যে জাগিতে পারে তাহা যদি না জানিতাম তবে আমরা একথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম; এ উক্তির অর্থ বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায় যে, এ দেশে কোন মহৎ শিল্প কখনও গড়িয়া উঠে নাই, শিল্প নামে যাহা পরিচিত তাহার মধ্যে আছে শুধু ঘন সন্নিবিষ্ট এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধশূন্য সুকৌশলে বিন্যস্ত বিবরণ ও খুঁটিনাটি। এমন কি অন্যহিসাবে যাহারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তেমন বিচারকগণও বলেন ভারতীয় শিল্পে অলঙ্কার এবং খুঁটিনাটির অতিপ্রাচুর্য আছে, সেগুলি নিজেরা যতই মনোহর এবং সমৃদ্ধ হউক না কেন, একত্ববোধের পক্ষে বাধা জন্মায়—এখানে প্রত্যেক ফাঁক খনিজ মূল্যবান পদার্থে ভর্তি করা হইয়াছে,

একটা শান্ত ভাবের অভাব রহিয়াছে, শূন্য কোন স্থান নাই, চক্ষু যাহাতে বিশ্রাম বা স্বস্তি পায় এমন কিছু নাই। মিঃ আর্চার তাহার প্রকৃতিসিদ্ধভাবে অতি উঁচু গলায় গলাবাজি করিয়া এই বিরুদ্ধ সমালোচনা চরমভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, আক্রমণের জন্য ঘনভাবে গুলিভরা বাক্যে সর্বদা এই এক প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ মন্দিরসমূহ বিশাল ও অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে তাহাদের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই, স্থাপত্যে বিশালতা বা ভাস্কর্যে পুঞ্জীভূত বিপুলতার প্রতি তাঁহার যেন একটা বদ্ধমূল আপত্তি আছে, যদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীকার করেন যে, এই শিল্পে এতটুকু আছে, আর তাহা আমাদের মনে একপ্রকার অতি বিশালতার আসুরিক এক গভীর ভাবের উদ্দীপনা করে, কিন্তু একত্ব, স্বচ্ছতা এবং মহত্ত্বের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। আমার বিচারে তাহার এ সমস্ত উক্তির মধ্যে প্রচুর রূপে স্ববিরোধ রহিয়াছে, কেননা আমি বুঝি না কোন প্রকার একত্বপরিশূন্য ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্থাপত্য কি করিয়া অত্যাশ্চর্য হইতে পারে, আর তাঁহার বোধে এখানে একত্বের লেশ মাত্র নাই; —অথবা কি করিয়া তাহা গভীর ভাবোদ্দীপক হইতে পারে যদি তাহাতে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব না থাকে—না হয় ধরিয়াই লইলাম যে এ শিল্পের মহত্ত্ব দিব্য নয়, দানবীয়। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এ স্থাপত্যে সব কিছুকে গুরুভার, অতি বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত অলঙ্কারে প্রপীড়িত করা হইয়াছে, তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাতে শিল্পে যাহাদের কোন অর্থ নাই এমন বিকৃত হাত পা বাঁকানো অর্ধমনুষ্যসকলের মূর্তি ঝাঁকে ঝাঁকে আমদানী করা হইয়াছে, আর স্থাপত্যে এতদপেক্ষা অর্থহীন আর কিছু হইতে পারে না। এখানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে কি করিয়া তিনি জানিলেন যে এ সমস্ত অর্থশূন্য, যখন তিনি কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে এ সমস্তের কোন অর্থ আছে কিনা তাহা জানিবার চেষ্টা করেন নাই? তিনি তো তাঁহার স্বীকৃত অজ্ঞতা এবং বোধের অক্ষমতা হইতে জাত আত্মতৃপ্ত অহংকারের প্রাচুর্যবশতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাহাদের কোন অর্থ নাই, তিনি সমস্ত কিছুকে রাক্ষস দৈত্য বা দানব নির্মিত বিকৃতদর্শন কাল্পনিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ সমস্ত কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিকে বর্বরতার চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। উত্তর ভারতের হর্ম্যরাজি তাঁহার নিকট এতটা অনাদর লাভ করে নাই, কিন্তু শেষপর্যন্ত পার্থক্য অতি সামান্য, নাই বলিলেই চলে। তিনি মনে করেন সেখানেও সেইরূপ গুরুভার চাপিয়া রহিয়াছে, লঘুতা এবং সৌন্দর্য ও সুষমার তেমনি অভাব রহিয়াছে, এমন কি খোদিত অলঙ্কারসমূহের অতি-প্রাচুর্য আরও বেশী; এ সমস্তও বর্বরোচিত সৃষ্টি। তাঁহার এই সার্বভৌম

নিন্দার হাত হইতে কেবল ইন্ডো-সারাসেন* নামে পরিচিত মুসলমান স্থাপত্য নিস্তার পাইয়াছে।

এখানে এই প্রাথমিক দৃষ্টিশক্তিহীনতা স্বাভাবিক হইলেও সব দিক দেখিলে একথা বলিতে হয় যে ইহা একটু বিস্ময়জনক, কেননা এই সমস্ত অতি কঠোর বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা যখন নিশ্চয়ই জানিতেন যে একত্ব ছাড়া কোন শিল্পকলা, কোন কার্যকরী বিসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না, তখন তাঁহাদের পক্ষে একবারও একটু থামিয়া নিজেদিগকেই জিজ্ঞাসা করা কি উচিত ছিল না যে, সব দিক দিয়া দেখিলে কোন একটা একত্ব-তত্ত্বের সাক্ষাৎ এখানে মিলিতে পারে কিনা, তাঁহাদের কি ভাবিয়া দেখা কর্তব্য ছিল না যে, হয়ত যে বিদেশীয় ভাবধারা লইয়া ভুল দিক হইতে শুধু দেখিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সে একত্বের সন্ধান পায় নাই; তাই ফৌজদারী বিচারকের মত উদ্ধতভাবে রায় প্রকাশ করিবার পূর্বে আরও অনাসক্তভাবে তাঁহাদের সম্মুখে যাহা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও গ্রহণশীল মন লইয়া, কোন গোপন একত্বের তত্ত্ব উন্মিষিত হইয়া উঠে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা কি উচিত ছিল না? কিন্তু যাঁহারা তেমন উগ্র নহেন, অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন তেমন সমালোচককে একটা সহজ ও সাক্ষাৎ উত্তর দেওয়া চলে। ইহা অবশ্য সহজে স্বীকার করা যায় যে এই স্থাপত্যের মধ্যে যে একত্ব রহিয়াছে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে দেখিতে অসমর্থ হওয়া ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেননা পাশ্চাত্য ভাবধারা যে ভাবে যে অর্থে একত্ব দেখিতে চায়,—উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, গ্রীক শিল্প পদ্ধতিতে উপভূষা বা অলঙ্কার বা খুঁটিনাটি বিবরণ বা ঘটনা খুব পরিমিতভাবে ব্যবহার করিয়া, অথবা গথিক শিল্পরীতিতে সব কিছুকে কোন একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অভীপ্সার ছাঁচে ঢালিয়া, একত্বকে ফুটাইয়া তোলা হয়—ভারতীয় শিল্পে তাহা তেমনভাবে করা হয় না। যদি চক্ষু শুধু শিল্পের রূপ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার অলঙ্কার এবং অন্যান্য খুঁটিনাটিতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাস করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে প্রকৃতই যে বৃহত্তর একত্ব রহিয়াছে তাহাতে কখনই পৌঁছিতে পারে না; কেননা চক্ষু এই সমস্ত দ্বারাই আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে একত্ব রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে, এই সমস্ত বস্তু তাহাদের সমগ্রতাতেও সে-একত্বকে ততটা প্রকাশ করিতে পারে না; বরং সেই একত্বই ইহার মধ্য হইতে যাহা কিছু বাহির হইয়া আসে তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া রাখে, এককে বহুর মধ্যে প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ একত্বের একটানা ভাবকে যেন মুক্তি দেয়। এই শিল্প এক আদি একত্ব হইতেই যাত্রারম্ভ করে—সংযোজিত সমন্বিত বা সংগঠিত একত্ব হইতে

* Indo Saracen—ভারত ও মধ্যযুগের আরব দেশীয় মুসলমানের মিলিত রীতি।

নহে, এবং যখন গঠনকার্য শেষ হইয়া যায়, তখন সেই আদি একত্বের মধ্যেই তাহা ফিরিয়া যায়, অথবা বরং যেন নিজের আত্মা এবং স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই রহিয়াছে এরূপভাবে তাহার মধ্যে বাস করে। ভারতের পবিত্র স্থাপত্য জগৎ পরিকল্পনার বিশাল বিস্তারের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের বহুবিচিত্র বৈশিষ্ট্যের—যাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 'লক্ষণ' বলা হয়—মধ্য দিয়া আত্মার, বিশ্বের বা অনন্তের বৃহত্তম একত্বকে প্রকাশ করে (তথাপি সে একত্ব তাহাদের সমগ্রতা হইতে বৃহত্তর এবং স্বতন্ত্র এবং মূলতঃ অনির্দেশ্য); বেশ বলা চলে যে এ স্থাপত্য অনন্তেরই এক মহাকাব্য বা খণ্ড গীতিকাব্য—কেননা ক্ষুদ্রাকারে গঠিত এমন স্থাপত্যও ইহার মধ্যে আছে যাহাকে গীতিকাব্য বলা যায়; ইহার বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের মধ্যে একত্বের প্রথম পরিকল্পনার যে যাত্রাবিন্দু, ইহার কলাকৌশল এবং উপাদানের যে বিপুলতা, সার্থক অলঙ্কার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও খুঁটিনাটির যে অতিপ্রাচুর্য এবং মূল একত্বে প্রত্যাবর্তনের দিকে ইহার যে গতি আছে, সে সমস্তকে এই কাব্যের প্রয়োজনীয় উপাদান ও পরিবেশ রূপে শুধু দেখিলেই তাহাদের অর্থ আমাদের নিকট বোধগম্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য মননের কতকাংশের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী আসিতেছে অথবা বরং ফিরিয়া আসিতেছে, —কেননা এক সময়ে ইউরোপের মধ্যে তাহার নিজস্ব ভাবে হইলেও এই মতের কিছুটা ছিল,—ইহারা ছাড়া অন্যান্য ইউরোপবাসীর পক্ষে এইভাবের শিল্পের —যাহা অস্তিত্বের পূর্ণ রূপ দিতে চায়, কোন খণ্ডিত রূপ নয়—সত্য এবং তাৎপর্য বুঝা অতি কঠিন হইতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত ভারতবাসী এইরূপ সমালোচনায় ব্যথিত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অংশতঃ বা সাময়িকভাবে অভিভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই ভাবধারার আলোক লইয়া ভারতীয় স্থাপত্যকে দেখিতে আমি আহ্বান করি; আমি আশা করি যে সে-ভাবে দেখিলে যে মুহূর্তে ইহার মধ্যস্থ প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইবে, তখনই কিছু কিছু গৌণ এবং সামান্য আপত্তি ছাড়া এ স্থাপত্যের বিরুদ্ধে অন্য যাহা বলা হয়, তাহা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; এবং ভারতীয় স্থপতিগণের বৃহত্তর কীর্তিসকলের সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হইলে যে এক অনির্দেশ্য হৃদয়গ্রাহী ভাব ও আবেগ আমরা অনুভব করি, তাহা মূর্ত হইয়া উঠিবে।

ভারতীয় স্থাপত্যের এই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যময় সত্যের মূল্যাবধারণকল্পে, বর্তমানে প্রায়ই যাহা মূল মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই প্রকার পরিবেশের জটিলতার ভিতর দিয়া না দেখিয়া, এমন কি যে সকল সহর মন্দিরকে অবলম্বন করিয়া তাহার চারিপাশে গড়িয়া উঠিয়াছিল, যেখানে আজিও পবিত্র প্রেরণার প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহারও বাহিরে গিয়া বরং যেখানে প্রকৃতির স্বাধীন পটভূমিকা রহিয়াছে তেমন কোন স্থানে পৌঁছিয়া, প্রথমে কোন

স্থাপত্যকীর্তিকে দেখিলে বুঝিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে। আমার সম্মুখে যে দুইটি মন্দিরের মুদ্রিত ছবি রহিয়াছে তাহা এ কার্যসাধনের বিশেষ উপযোগী, ইহার একটি কালহস্তীর অপরটি সিংহাচলমের মন্দির, এ দুইটির গঠন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের, কিন্তু উভয়ের ভিত্তিভূমি এবং প্রেরণা এক,—সে প্রেরণা ভারতের সকল মন্দিরের পক্ষেই অভিন্ন। ইহার সত্য উপলব্ধির সরল পথ, তাহার বাহ্য পরিবেশ হইতে পৃথক না করিয়া বরং তাহার সহিত এক করিয়া মন্দিরটিকে দেখা—আকাশ এবং অনুচ্চ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অথবা আকাশ এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের সহিত মিলাইয়া এক করিয়া দেখা, এবং উভয়ের মধ্যে যাহা সাধারণ, মন্দিরের গঠন এবং পরিবেশ এ দুই-এর মধ্যে যাহার প্রকাশ, প্রকৃতির ও শিল্পকার্যের মধ্যস্থিত সেই একই সত্যকে অনুভব করা। একদিকে তাহার অচেতন আত্মবিসৃষ্টিতে এই প্রকৃতি এক একত্বের দিকে আকূতি পোষণ করে, এবং তাহার মধ্যে সে বাস করে, অপরদিকে মানুষের আত্মা তাহার সচেতন আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বাভিমুখী সৃষ্টিতে এক একত্বের দিকে নিজেকে তুলিয়া ধরে; তাহার সেই আকূতির সাধনা এখানে প্রস্তরের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করে, এবং এইভাবে ঊর্ধ্বাভিমুখী যাহা সে গড়িয়া তোলে তাহার মধ্যে সে নিজে এবং তাহার কার্য বর্তমান থাকে; এই দুই একত্ব একই বস্তু, উভয়ত্রই আত্মার প্রেরণাও একই। এইভাবে দেখিলে মানুষের এই সৃষ্টি বোধ হইবে এমন কিছু, যাহা প্রাকৃত জগতের শক্তি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া যেন তাহারই সম্মুখে নিজেকে পৃথক করিয়া ধরিয়াছে, অথচ তাহা আবার এমন একটা কিছু, যাহা উভয়েরই অন্তরে নিজের অনন্ত সত্তার দিকে যে একই আকূতি রহিয়াছে তাহাকেই মূর্ত করিয়া তুলিতেছে—উভয়কে একত্র দেখিলে দেখি যে নিশ্চেতনা ঊর্ধ্বমুখে যেন কাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মানুষের আত্মসচেতন প্রচেষ্টার একমাত্র এক সবল মূর্তি, যাহা আকাঙ্খিত সেই বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার সফল আনন্দরেখায় সমুজ্জ্বল। এই দুই মন্দিরের একটি নির্ভীকভাবে যেন উপরে উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে ইহার গাত্র হইতে বৃহদংশসকল বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সবল কিন্তু নিশ্চিত ঊর্ধ্বারোহণের পথে এগুলি বিশালভাবে পর পর সজ্জিত রহিয়াছে, ইহার আয়তন এবং রূপরেখা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; অপর মন্দিরটি তাহার ভিত্তিভূমির শক্তি হইতেই যেন ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইয়াছে, তাহার বিশাল ও ঘন বক্র রেখাসমূহে মাধুর্য এবং আবেগ ছড়াইয়া গোলাকার চূড়ায় গিয়া শেষ হইয়াছে, এবং সেখানে গিয়া সে প্রতীকের এক মুকুট ধারণ করিয়াছে। উভয় মন্দিরে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্টরূপে আয়তন কমিয়া আসিয়াছে, উভয়ত্রই প্রতি স্তরে একই রূপের পুনরাবৃত্তি

চলিয়াছে, একই বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতেছে, একইভাবে খোদিত মূর্তি ও কারুকার্যসকল ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে সর্বস্থান ভরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু একটি মন্দিরে বৈচিত্র্য প্রকাশের এই চেষ্টা এবং ইঙ্গিত শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা হইয়াছে, অপরটি একটিমাত্র চিহ্নে গিয়া শেষ হইয়াছে। এ স্থাপত্যের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, এই প্রকৃতি এবং এই শিল্প অনন্তের যে একত্বের মধ্যে বাস করে সেই একত্বকে প্রথমে অনুভব করিতে হইবে; তাহার পর যে অনন্ত বহুত্ব এই একত্বকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, এ সমস্ত ঘনসন্নিবিষ্ট মূর্তিসকলকে তাহারই প্রকাশ তাহারই চিহ্নরূপে দেখিতে হইবে, মন্দিরের আয়তন যে তাহার ঊর্ধ্বগতির সহিত নিয়মিতভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে তাহার পার্থিব ভিত্তি হইতে তাহা যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরভাবে আদি একত্বের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই দেখিতে হইবে, এবং অবশেষে শিখর-দেশে প্রতীকরূপে যাহার ইঙ্গিত আছে তাহাকে ধরিতে হইবে। এইভাবে দেখিলে একত্বের অভাব নয়, বরং এক অতি প্রবল একত্ব প্রকাশ পাইবে। এই যে প্রতিরূপ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক আত্মসত্তা ও বিশ্বাত্মার ভাষায় অন্তরঙ্গভাবে তাহা পুনরায় ব্যাখ্যা করিয়া দেখিলে, এই সমস্ত মহাস্থপতি নিজেদের মধ্যে কি দেখিয়াছিলেন, এবং প্রস্তরে তাহার কি রূপ দিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিব। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় এই একত্বে একবার পেঁাছিলে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কি তাহা আত্মপ্রকাশ করে, বিরুদ্ধ সকল আপত্তি খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং বুঝা যায় যে তাহারা শক্তিহীন, ভ্রান্ত, অপ্রচুর উপলব্ধি বা দেখিবার পূর্ণ অক্ষমতা হইতে জাত উক্তি বা কুতর্ক। ভারতীয় স্থাপত্যে সমগ্রতাকে এইভাবে দেখিলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি এবং অলঙ্কারসকলের অর্থ জানা এবং বুঝা সহজ হয়, অন্যভাবে তাহা বুঝা অসম্ভব।

গঠিত বস্তু এবং গঠন-পদ্ধতি যতই বিভিন্ন হউক না কেন, সকল দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে এইভাবের ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য, একথা যে কেবল প্রথিতযশা বৃহৎ মন্দিরসকল সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে, কিন্তু ছোট সহরে অবস্থিত পথিপার্শ্বস্থ অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র দেবগৃহ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, সেখানেও বিষয়বস্তু একই, যদিও তাহা ক্ষুদ্রাকারে গঠিত, সেখানকার ব্যঞ্জনাও সন্তোষজনক, কিন্তু বৃহত্তর মন্দিরসমূহে সে আকৃতি বিশালভাবে পূর্ণতার সহিত ফুটিয়া উঠে। উত্তর ভারতের স্থাপত্যের ভাষা অন্যরূপ, সেখানে মূল প্রকাশরীতি ভিন্ন প্রকারের; কিন্তু তথায়ও সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, সেইরূপ ধ্যানপরায়ণ বোধিজাত দৃষ্টি লইয়া দেখিতে হইবে, এবং আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে পেঁাছিব: দেখিব সেখানেও স্থাপত্যে সেই একই আধ্যাত্মিক অনুভূতির সরস ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, যে অনুভূতি তাহার

সকল বৈচিত্র্য এবং সকল জটিলতার মধ্যে এক, সেখানেও দেখিব যে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মানুভূতির অনন্ত বৈচিত্র্যে মানবাত্মার সহিত ভগবানের সিদ্ধ মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই একত্বই দেবকার্যে উৎসর্গীকৃত সকল শিল্পের মধ্যে রহিয়াছে, স্থাপত্যের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রেরণা বিভিন্ন পথে সেই একই একত্বে পেঁৗছে অথবা সেই একই একত্বকে প্রকাশ করে। ঘনসন্নিবিষ্ট খুঁটিনাটি এবং কারুকার্য বা অলঙ্কারের অতিপ্রাচুর্য একত্বকে ঢাকিয়া ফেলে, ক্ষুণ্ণ করে, অথবা ভঙ্গ করে, এই যে আপত্তি তোলা হয় তাহার একমাত্র কারণ এই যে এই মূল আধ্যাত্মিক একত্বের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হইয়া চক্ষু প্রথমেই কেবল অলঙ্কার এবং খুঁটিনাটি দেখিতে গিয়া ভুল করিয়া বসে; খাঁটিভাবে দেখিতে গেলে প্রথমেই অন্তরঙ্গভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি এবং একত্ববোধ লইয়া চক্ষুকে দর্শন কার্যে নিযুক্ত করিতে এবং তাহার পর সেই দৃষ্টি এবং অনুভূতি লইয়া অন্যসব কিছু দেখিতে হইবে। আমরা জাগতিক বহুত্বের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের চক্ষুতে শুধু এক বিপুল ঘনসন্নিবিষ্ট বহুত্বই প্রথমে দেখা দেয়, তখন একত্বে পেঁৗছিতে হইলে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাকে ত্যাগ করিতে বা দমিত রাখিতে হয়, অথবা তাহাদের মধ্য হইতে অল্প কিছু বস্তু, অল্প কিছু ইঙ্গিত বাছিয়া লইতে হয়, অথবা বিবিক্ত এবং বিশিষ্ট ধারণা অনুভূতি বা কল্পনার একটা বা অন্যটার মধ্যগত একত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু যাহা অনন্ত হইয়াও এক, আমাদের সেই আত্মাকে আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ যদি হই, এবং তাহার পর যদি জগতের বহুত্বের দিকে দৃষ্টি দেই, তখন দেখিতে পাই যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তু ও ঘটনা যতই আমরা একত্রে সমাবেশ করি না কেন, যে একত্ব তাহার সকলকেই ধারণ করিতে পারে, তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত অমেয় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বা তাহার বহুগুণিত আত্মপ্রকাশের দ্বারা সে একত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। আমরা এই স্থাপত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সেই একই ব্যাপার দেখিতে পাই। ভারতীয় মন্দিরসকলের কারুকার্য অলঙ্কার ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিপুল সমাবেশ জগৎসকলের—কেবল আমাদের এ জগৎ নয়, কিন্তু সকল ভূমি বা সকল লোকের—বৈচিত্র্য এবং পুনরাবৃত্তির প্রতিনিধির কাজ করে, অনন্ত একত্বের অনন্ত বহুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। স্থাপত্যের গঠনকার্যে কতটা বর্জন বা কতটা গ্রহণ করিব, কত বেশী বা কত অল্প প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব, অথবা দ্রাবিড়ীয় রীতির মত বহুবিচিত্র অফুরন্ত সম্পদের ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিব কিনা, তাহা আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টির পরিপূর্ণতার উপর নির্ভর করে। এই একত্বের বিশালতাই সেই ভিত্তি এবং আধার যাহার উপর যে কোন অট্টালিকা গড়িয়া তোলা যায়, যে কোন বহুত্বের স্থান হইতে পারে।

এই প্রাচুর্যকে বর্বরতার চিহ্ন বলিয়া গালি দেওয়ার অর্থ বিদেশী আদর্শের মাপকাঠি গ্রহণ করা। সবকথা বিবেচনা করিতে গেলে কোথায় ইহার ছেদরেখা টানিব তাহা নির্ণয় করা যায় না। ঠিক অনুরূপ কারণে এক সময় তখনকার উচ্চ সাহিত্যের মার্জিত রুচিতে সেক্‌স্‌পিয়রকেও মহৎ কিন্তু বর্বর বলিয়া বিবেচিত হইতে হইয়াছে—মনে পড়ে ফ্রান্সে বিবরণ বাহির হইয়াছিল যে তিনি সুরাপানোন্মত্ত মনীষা সম্পন্ন একজন বর্বর—বলা হইত যে তাঁহার কলা-কুশলতার মধ্যে একত্ব নাই অথবা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদ জীবনের প্রাচুর্যের মত তাহাতে ঘটনা এবং চরিত্রের অতিপ্রচুর সমাবেশ থাকিবার ফলে একত্ব ক্ষুণ্ন বা ব্যাহত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে উগ্র, অতিরঞ্জিত, সময় সময় অদ্ভুত, কিম্ভূত-কিমাকার অগণিত কল্পনারাজি স্থান পাইয়াছে। পক্ষান্তরে সেই ক্লাসিক সাহিত্যিকগণের প্রিয় অন্য অনেক গুণ যথা সুসঙ্গতি, মাত্রাজ্ঞান, সুস্পষ্ট একত্ব, লঘুতা, সুকুমার সৌন্দর্য প্রভৃতির অভাব রহিয়া গিয়াছে। সেই জাতীয় মন সেক্‌স্‌পিয়ারের রচনাবলী সম্বন্ধে ঠিক মিঃ আর্চারের ভাষায়ই বলিতে পারিত যে, বস্তুতঃ এখানে আসুরিক প্রতিভার, এক স্তূপীকৃত শক্তিধারার সাক্ষাৎ মিলে কিন্তু একত্ব, প্রসাদ গুণ ও ক্লাসিক মহত্ত্বের লেশমাত্র নাই, বরং স্বচ্ছ মাধুর্য, লঘু গতি এবং সংযমের একান্ত অভাব রহিয়াছে, কেবল অতিপ্রচুর পরিমাণে আছে বন্য অলঙ্কার, বিধান এবং মাত্রাজ্ঞানশূন্য কল্পনার তাণ্ডবলীলা, বিকৃত মূর্তি, অস্বাভাবিক অঙ্গ ও মুখভঙ্গী, যাহার মধ্যে সম্ভ্রম নাই; নাই এমন কোন ক্লাসিক গতি ও ভঙ্গী যাহা সূক্ষ্ম, যথাযথ, যুক্তিযুক্তভাবে স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু বর্তমানে কঠোরতম রূপে ল্যাটিন ভাবে আবিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত সেক্‌স্‌পিয়ারের মধ্যে "জমকালো বর্বরতা" রহিয়াছে এই আপত্তি আর পোষণ করেন না, তাঁহারা এখন বুঝিতে পারেন যে এখানে জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে তাহা পূর্ণতর, ক্ষীণ ও দুর্বল নহে; প্রাচীনকালে ক্লাসিক রস ও সৌন্দর্যবোধ যে সমস্ত বহিরঙ্গ একত্ব দেখিতে পাইত তদপেক্ষা বৃহত্তর বোধিজাত একত্বের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টি সেক্‌স্‌পিয়ারের দৃষ্টি অপেক্ষাও বিশালতর এবং পূর্ণতর ছিল, কেননা সে দৃষ্টির প্রসারতার মধ্যে কেবল যে জীবন ছিল তাহা নহে, ছিল সমগ্র সত্তা, কেবল যে মানুষ ছিল তাহা নহে, ছিল সমস্ত জগৎ, সমগ্র প্রকৃতি, ছিল বিপুল বিশ্ব। ব্যক্তিবিশেষকে বাদ দিলে বলা যায় যে ইউরোপীয় মন অনন্ত আত্মার একত্বের বা অনন্ত বহুত্ব দ্বারা অধ্যুষিত বিশ্বচেতনার কোন নিকট সাক্ষাৎ, দৃঢ় ও স্থায়ী উপলব্ধি লাভ করে নাই। তাই তাহারা এ সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিবার প্রেরণাও পায় নাই, আর প্রাচ্য শিল্প, ভাষা বা রচনা পদ্ধতিতে যখন এ সমস্তের প্রকাশ দেখিতে পায়, তখন তাহাদিগকে না পারে বুঝিতে অথবা না পারে গ্রহণ করিতে; এই জন্যই যেমন ল্যাটিন ভাবাবিষ্ট মন

এক সময় সেক্‌স্‌পিয়ারের সম্বন্ধে নানা আপত্তি তুলিয়াছিল ইহারাও তেমনি আপত্তি তোলে। হয়ত সে দিন খুব দূরে নয় যে দিন তাহারাও এ সমস্ত দেখিবে এবং বুঝিবে, এমন কি অন্য ভাষায় নিজেরাও এই সমস্ত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে।

ভারতীয় স্থাপত্যে মূর্তি, কারুকার্য বা অলঙ্কারের ঘন সন্নিবেশ প্রশান্তি আনে না, চক্ষুকে বিরাম বা বিশ্রাম স্থান দেয় না, এই আপত্তিও একই পর্যায়ে পড়ে, ইহাও একই মূল হইতে জাত, ভারতীয় অভিজ্ঞতায় যাহার যাথার্থ্য নাই সেই ধরনের অন্য প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার উৎপত্তি। কেননা এই একত্ব সব কিছুকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখে এবং ইহা নিজের মধ্যেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনন্ত ব্যাপ্তি ও প্রশান্তি বহন করে, তাই নিম্নতর এবং অধিকতর বাহ্যভাবের অন্য কোন ফাঁকা স্থান অথবা শান্ত প্রদেশ রাখিবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এখানে চক্ষু কেবল আত্মাতে প্রবেশ করিবার একটা পথ বা একটা দ্বার। তাই শিল্পের আবেদন সেই আত্মার কাছে, এবং আত্মা এই উপলব্ধির মধ্যে অথবা এই রসানুভূতির প্রভাবে বাস করিয়া যদি কোন বিরাম খোঁজে তবে তাহা জীবন ও রূপের সংস্পর্শ হইতে বিরাম নহে; সে চায় অনন্তের সেই বিশালতা এবং শান্ত নৈঃশব্দের সেই বিপুলতার সংস্পর্শ হইতেই বিরাম, আর তাহা কেবল তাহার বিপরীত বস্তু, রূপ, কারুকার্য, অলঙ্কার এবং জীবনের প্রাচুর্যই দিতে পারে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য অতি বিশাল এবং তাহার গঠন আসুরিক বা অতিমানুষিক বলিয়া যে আপত্তি তোলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বলা যায় যে, খাঁটি যে আধ্যাত্মিক ভাব দর্শকের হৃদয়ে জাগাইয়া তোলা এ শিল্পের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু দ্বারা তাহা সফল করা যাইত না, কেননা অনন্তকে, বিশ্বকে তাহার বিপুল প্রকাশের সমগ্রতার মধ্যে দেখিলে তাহা আসুরিক বা অতিমানুষিক হইয়া পড়ে, উপাদান ও শক্তিতে তাহা বিরাট। ইহা সত্য এই অতিমানুষিক বিশালতা ছাড়া তাহাতে সম্পূর্ণ অন্য বস্তুসকলও থাকা চাই, কিন্তু ভারতীয় শিল্পবিসৃষ্টিতে তাহাদের কোনটারই অভাব নাই। উত্তর ভারতের মন্দিরসমূহের বিরুদ্ধে মিঃ আর্চারের দেওয়া রায় সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে একটা অনন্যসাধারণ শক্তির ছন্দ ও মাধুর্য; যাহা বিপুলতা এবং বীর্যবত্তার অনুভূতিজনিত অবসাদ হইতে মুক্তি দিতে পারে, তাহাতে রহিয়াছে তেমন প্রোজ্জ্বল ও সুচারু লঘুতা এবং অলঙ্কারপ্রাচুর্যকে ভরিয়া রাখিয়াছে সৌন্দর্যের এক মনোহর লাবণ্য। অবশ্য ইহা গ্রীক শিল্পের লঘুতা সুস্পষ্টতা অথবা উলঙ্গ মহত্ত্ব নহে, অথবা সে সমস্ত একান্ত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু ভারতের ধর্ম, দর্শন এবং রসিক মনের স্বাভাবিক বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার মধ্যে বিরোধী বস্তু ও ভাবের সুচারু মিলন ও সমন্বয় আছে। দ্রাবিড়ীয় পদ্ধতিতে গঠিত অনেক স্থাপত্যে

যে এ সমস্তের অভাব রহিয়াছে তাহা নহে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ভীক-ভাবে তাহাদিগকে বর্জন করা হইয়াছে অথবা গৌণ ব্যাপার রূপে রাখা হইয়াছে—এই ভাবের একটা উদাহরণ পাইয়া মিঃ আর্চার এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই একবার মাত্র শক্তি এবং বিশালতার অবোধ্য স্তূপপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে একটি শ্যামল মরূদ্যানের (Oasis) দেখা মিলিল; কিন্তু সেখানেও গুরুগম্ভীর ও ধীর প্রশান্ত ভাবের পূর্ণতাকে পূর্ণ এবং অক্ষুন্নরূপে ফুটাইতে গিয়াই সে সমস্তকে দমন বা বর্জন করা হইয়াছে।

যাহার সম্বন্ধে আমি বেশী আলোচনা করিতে চাই না এরূপ আরও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে, তবে সে সমস্ত অনেক অকিঞ্চিৎকর বস্তু লইয়া—উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ভারতীয় পদ্ধতিতে গঠিত খিলান এবং গম্বুজ অপছন্দ করা হইয়াছে, কেননা সেগুলি অন্য রীতিতে গঠিত বিকীর্ণ (radiating) খিলান এবং গম্বুজের অনুরূপ নয়। ইহা কেবল অনভ্যস্ত আকারের মধ্যে সৌন্দর্য দেখিতে অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির ফল। যাহাতে আমাদের মন ও প্রকৃতি শিক্ষিত হইয়াছে এরূপ নিজস্ব বস্তু ও ভাবকে বেশী পছন্দ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য শিল্প বা তাহার সাধনা সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব ফুটাইতে বা আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া যদি তাহার নিজস্ব পথ বাছিয়া নেয়, তবে তাহাতে নিন্দা করা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, আরও উদার সংস্কৃতির পরিপুষ্টি করিয়া এ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করাই উচিত। কিন্তু দ্রাবিড়ীয় রীতিতে গঠিত মন্দির সম্বন্ধে আর একটা মন্তব্যের সাক্ষাৎ পাই যাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, কেননা তাহা মিঃ আর্চার বা তজ্জাতীয় লোক হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মুখেও উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। অধ্যাপক গেডিস্-এর (Geddes) মত সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিও এই সমস্ত বিরাট সৌধের মধ্যে ভীতি ও বিষণ্ণতার একটা বিকট ছাপ দেখিয়া অভিভূত হইয়াছেন। এরূপ কথা ভারতীয় মনের পক্ষে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়, কেননা তাহার ধর্ম, শিল্প বা সাহিত্য যে সমস্ত অনুভূতি জাগাইয়া তোলে তাহার মধ্যে ভীতি এবং বিষাদের স্থান একেবারেই নাই। ধর্মে এই দুই ভাব কদাচিৎ জাগে, যদিই বা কখনও জাগান হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মূলোৎপাটনের জন্য, এমনকি যখন তাহারা আসিয়া পড়ে তখনই এক আশ্রয়দাতা এবং চির সহায় কিছুর অধিষ্ঠান ও সান্নিধ্য, পশ্চাতে অবস্থিত এক শাশ্বত মহত্ত্ব ও শান্তি এবং প্রেম বা আনন্দ সর্বদা আমাদিগকে ধারণ ও রক্ষা করিতেছে, এ বোধ সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আসে; ধ্বংসের যিনি দেবী তিনি আবার সেই সঙ্গেই করুণায় ভরা প্রেমময়ী মাতা; কঠোর মহেশ্বর যিনি রুদ্র তিনিই শিব শুভদ আশুতোষ. মানুষের পরম আশ্রয়। বিশ্বের বিস্ময়কর ও প্রচন্ড দৃশ্যরাজির মধ্যে যাহা কিছু তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভারতীয় ভাবনা এবং ধর্ম, একত্ব ও তাদাত্ম্য

জ্ঞান লাভের বহু যুগব্যাপী সাধনাজাত বোধশক্তির বলে তাহার দিকে শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করে, সঙ্কুচিত বা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে না। এমন কি যখন কেহ কঠোরতা এবং তপশ্চর্যায় রত হয়, জগৎ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তখন ভয় বা বিপদ তাহার কারণ নহে, কারণ জগতের অসারতা বোধ এবং ক্লান্তি অথবা জীবন অপেক্ষা উচ্চতর, সত্যতর ও অধিকতর সুখকর কিছু প্রাপ্তির আশা, যাহা শীঘ্রই নৈরাশ্যবাদীর বিষাদময় জীবন পূর্ণরূপে পার হইয়া শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের পরম উল্লাসের মধ্যে প্রবেশ করে। ভারতের লৌকিক কাব্য এবং নাটকও সর্বক্ষেত্রে প্রাণধর্মী সমৃদ্ধ আমোদজনক ও সুখদায়ক; ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে শোকাবহ ব্যাপার, ভীতি ও দুঃখ এবং বিষাদের ঘনসন্নিবিষ্ট চিত্রাবলি যতটা দেখিতে পাওয়া যায়—সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের বিশালতার মধ্যে ততটা নাই। আমার মনে হয় না যে ভারতীয় শিল্প এ বিষয়ে তাহার ধর্ম ও সাহিত্য হইতে আদৌ কোনরূপে বিভিন্ন। এখানে পাশ্চাত্য মন তাহার পরিচিত জগতের অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া এ দেশীয় ধারণার মধ্যে জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিতে চাহিতেছে, অথচ ইহা তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই জাতীয় মন অদ্ভুতভাবে ভুল করিয়া শিবের নৃত্য, মৃত্যু বা ধ্বংসের নৃত্য বলিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে নটরাজ শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে তাহার নিকট প্রতিভাত হওয়া উচিত যে পক্ষান্তরে এ মূর্তি পশ্চাতে অবস্থিত নিশ্চল শাশ্বত এবং অনন্ত আনন্দের সকল গভীরতা লইয়া বিশ্বনৃত্যের আনন্দোল্লাস ফুটাইয়া তুলিতেছে। ঠিক তেমনিভাবে যে কালী মূর্তি ইউরোপীয় দৃষ্টিতে এত ভীষণা, আমরা জানি যে সে কালী জগন্মাতা, অসুরগণকে বা মানুষ এবং জগতের মধ্যস্থিত অশিব ও অনর্থজনক শক্তিসমূহকে সংহার করিবার জন্য ধ্বংসের এই ভীষণ রুদ্র রূপ ধারণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনের এইরূপ অনুভূতির আরও কয়েকটি সূত্র আছে, মানুষের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু অধিক উপরে উঠিয়া যায়, তাহার প্রতি এ মনের যে একটা স্বাভাবিক বিরাগ আছে তাহা হইতেই এ অনুভূতি জাত হইয়াছে, কারণ গ্রীক্ মন যে সীমার মধ্যে ছিল, পাশ্চাত্য মনের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে তাহা আজিও বর্তমান রহিয়াছে, সে সীমা এই যে, জাগতিক বিষয়ে বদ্ধদৃষ্টি হর্ষোৎফুল্ল গ্রীক মন সাধারণতঃ যাহা কিছু জগদতীত, অসীম অজ্ঞাত, তাহার ধারণা ভয় বিষাদ এবং বিতৃষ্ণার সহিতই গ্রহণ করিত; কিন্তু ভারতীয় মননে এ ভাবের প্রতিক্রিয়ার কোন স্থান নাই। ভারতীয় স্থাপত্যের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, যাহা মানুষের মূর্তি নয় এমন কতকগুলি অদ্ভুত এবং ভীষণ ভাবের আকার অথবা যাহাদের দেখিলে রাক্ষস বা দৈত্যের ধারণা জন্মে এমন কতকগুলি মূর্তি এই সমস্ত স্থাপত্যের অঙ্গে খোদিত দেখা যায়; ইহার উত্তরে বলা যায় যে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের

রসিক চিত্ত শুধু স্থূল জগৎ লইয়া কারবার করে না; যে চৈত্যভূমিসকলে এ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকেও সে ব্যবহার করে, এবং তাহাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অথচ তাহাদের দ্বারা বিজিত এবং অভিভূত হইয়া পড়ে না, কেননা আত্মা বা ঈশ্বরের শক্তি এবং সর্বব্যাপিত্বের দৃঢ়বিশ্বাসের ছাপ সে সর্বদাই বহন করিয়া লইয়া চলে।

আমি হিন্দু বিশেষতঃ দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিয়াছি, কেননা শেষোক্ত শিল্পপদ্ধতি ইউরোপীয় রুচির পক্ষে আপোষ-বিরোধীরূপে বিজাতীয় বলিয়া অতি ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান (Indo-Muslim) স্থাপত্য সম্বন্ধেও কিছু বলা যাইতে পারে। ইহার বৈশিষ্ট্য যে খাঁটিভাবে এ দেশে জাত সে দাবি সমর্থন করিবার জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত নহি। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মন আরব ও পারস্যের কল্পনাসম্পদ হইতে অনেক কিছু লইয়াছে, কোন কোন মসজিদ এবং সমাধিস্থান দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, সেখানে সবল ও সাহসী আফগান এবং মোগল চরিত্রের বিশিষ্ট ছাপ রহিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর স্পষ্টতঃ তথায় বিশিষ্ট ভারতীয় অবদানের সহিত ভারতীয় ধরনের বিসৃষ্টিই দেখা যায়। বিপুলতা এবং কল্পনাকুশলতার সঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য এখানে অন্য ধরনের শিল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কৌশল এবং নৈপুণ্য উত্তর ভারতের হিন্দু মন্দিরে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহার সহিত এক; এই শিল্পের ভিত্তিতে, যতই প্রশমিত করিয়া আনা হউক না কেন, আমরা প্রাচীন মহাকাব্যধর্মী বিশালতা এবং শক্তির সন্ধান কোন কোন সময় কিছু পাই; তাহার চেয়ে অধিকরূপে দেখিতে পাই সেই গীতিকাব্যের সৌন্দর্য ও মাধুরী, যাহা মুসলমানগণের আগমনের পূর্বে এ দেশের স্থাপত্যে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—উদাহরণ স্বরূপ উত্তর-পূর্ব ভারত এবং যবদ্বীপের শিল্পরীতি উল্লেখ করা যাইতে পারে—আবার কোন কোন সময় এই দুই ভাবের মিশ্রণও দেখা যায়। এই পরিবর্তন এবং প্রশমন সাধারণ ইউরোপীয় মনে স্বস্তি আনিয়াছে এবং এই শিল্পরীতির স্বপক্ষে তাহাদের ভোট সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যস্থিত কোন্ বস্তুকে ইউরোপীয় মন এত প্রশংসা করে? মিঃ আর্চার আমাদিগকে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে প্রশংসার বস্তু ইহার যুক্তিযুক্ত সৌন্দর্য, মার্জিত রুচি এবং মাধুর্য যাহা স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং হিন্দু যোগীগণের চিত্তবিভ্রম এবং বিভীষিকার বিকৃত তান্ডবলীলার পরে শ্রান্তিহারক ও আরামদায়ক। গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার এ বিবরণ শোভন হইত কিন্তু আমার মনে হয় এখানে তাহা হাস্যোদ্দীপকভাবে অপ্রযোজ্য। ইহার ঠিক পরেই যাহা এ সুরের সঙ্গে একেবারেই মিলে না তেমন অন্য এক সুরে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা অতি মনোহর স্থাপত্যের এক পরীস্থান বা মায়া-

রাজ্য। একটা যুক্তিযুক্ত পরীস্থান বা মায়ারাজ্য নামক বিস্ময়কর বস্তুটি ভবিষ্যতে একদিন আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে হয়ত ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের মনের এক অত্যাশ্চর্য মিশ্রণ দেখা যাইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস পৃথিবী অথবা স্বর্গে কোথাও আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব নাই। এই সমস্ত বিসৃষ্টিতে যে অনির্বচনীয় মাধুর্য আছে তাহা যুক্তিচালিত বা যুক্তিযুক্ত সৌন্দর্য নহে, তাহা ঐন্দ্রজালিক মায়ারাজ্যেই সেই সুন্দর মধুর রূপ, যাহা যুক্তিবিচারের পরপারে আমাদের মধ্যে অতি গভীরে স্থিত কোন রসিক আত্মার কাছে তৃপ্তিদায়ক এবং মনোমোহন। কিন্তু তথাপি কোথায় এই মোহন যাদু আমাদের সমালোচককে স্পর্শ করিয়াছে? তাহার উত্তর তিনি সাংবাদিকের হঠোন্মত্ত ভাষায় দিয়াছেন। সে সব হইল পরম শোভাসম্পন্ন মার্বেল প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য, সুন্দর গম্বুজ, শোভাময় মসজিদের মিনার বা চূড়া, বিশাল সমাধি সৌধ, স্তম্ভরাজির উপর স্থাপিত চমকপ্রদ খিলান ও তোরণমণ্ডিত পথ, জাঁকজমকশালী সৌধতল এবং সভামণ্ড, মহিমাব্যঞ্জক প্রবেশদ্বার ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইহাই কি সব? কেবল কি স্থূল বিলাস এবং আড়ম্বরের বাহ্য মাধুর্য ও রমণীয়তা? হাঁ তাই, মিঃ আর্চার আবার বলিয়াছেন আমাদিগকে নীতি বা ধর্মভাব বিবর্জিত চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সৌন্দর্য লইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই ভাব তাঁহার ধ্বংসকারী গালিবর্ষণের পক্ষে সহায়ক, আর ভারতীয় কোন কিছুর কথা বলিতে গেলে এইরূপ গালিবর্ষণ না করিয়া যে তিনি সুখী হইতে পারেন না! সেইজন্য এই মুসলমান স্থাপত্যের কথা বলিতে গিয়া তিনি ইহাও বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের ইঙ্গিত যে আছে তাহা নয় তাহার মধ্যে স্ত্রী-জনোচিত বীর্যহীনতা এবং অধঃপতনের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে সে শিল্প যতই সুন্দর হউক না কেন, তাহার স্থান সম্পূর্ণরূপে শিল্পবিসৃষ্টির নিম্নতর ভূমিতে এবং হিন্দু স্থপতিরা পাথরে যে মহান আধ্যাত্মিক আকৃতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

আমি স্থাপত্য হইতে "নীতি বা ধর্মের ইঙ্গিত" দাবি করি না, কিন্তু এই সমস্ত ইন্দোমুসলিম স্থাপত্যে বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য এবং মাধুর্য-বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নাই ইহা কি সত্য? এই শিল্পের বৃহত্তর বিসৃষ্টি সম্বন্ধে একথা আদৌ সত্য নহে। তাজমহল কেবল এক রাজার প্রণয় ব্যাপারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটা স্মৃতিচিহ্নমাত্র নহে, অথবা তাহা চাঁদের উজ্জ্বল খনি হইতে কাটিয়া বাহির করা এক মায়ারাজ্যের সম্মোহন ইন্দ্রজালও নয়, কিন্তু যে প্রেম মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে তাহার শাশ্বত স্বপ্ন। বৃহৎ মসজিদগুলির মধ্যে কঠোর মহত্ত্বে উন্নীত ধর্মের এক অভীপ্সাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূর্ত করিয়া তোলা হইয়াছে, সে অভীপ্সা গৌণভাবে স্থাপিত অলঙ্কার এবং মাধুর্যকে

সমর্থন করে এবং তাহাদের দ্বারা ম্লান হয় না। সমাধিগুলি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য এবং আনন্দকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদসমূহ বীর্যহীন বিলাসমগ্ন অধঃপতনের স্মৃতিস্তম্ভ নয়—আকবরের সময়কার মননশক্তির পক্ষে ইহা এক অসম্ভব অর্থশূন্য বর্ণনা—কিন্তু তাহারা এক প্রকার মহত্ত্ব, শক্তি এবং সৌন্দর্যকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা পার্থিব বস্তুর উপর বলপূর্বক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু পার্থিব বিলাসপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পড়ে নাই। এখানে বস্তুতঃ আরও প্রাচীন কালের হিন্দুমনের বৃহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ নাই বটে, কিন্তু তবুও এখানে ভারতীয় মনই পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব স্বীকার করিয়া এই সমস্ত সুকুমার বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ইহার পূর্বে কালিদাসের কবিতা যেরূপ করিয়াছে তেমনিভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপর জোর দিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে একপ্রকার অপার্থিব মাধুর্যে উন্নীত করিয়াছে, অনেক সময় পৃথিবীকে পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিয়াও পার্থিব ভাবের উপরে উঠিয়াছে, মধ্যজগতের ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্যের ভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছে, এবং ধর্মবৃত্তিতেও প্রেমাঞ্জলিপূর্ণ হস্তে দিব্যের অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছে। সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতায় অভিভূত হওয়ার ভাব এখানে নাই, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি অন্য যে সমস্ত উপাদানকে অস্বীকার করে নাই এবং ক্লাসিক যুগের পরে যাহারা ক্রমশঃ কাছে আসিয়া পড়িতেছিল, তাহাদিগকে এখানে এক নূতন প্রভাবের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উচ্চতর এক জ্যোতি তাহাদের মধ্যে এখনও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং কিছু দীপ্তি বিকীরণ করিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় শিল্প

প্রাচ্যের ভাবনা এবং সৃষ্টির মূল্যের দিকে প্রতীচ্য মন যে দ্রুত সচেতন হইতেছে তাহা তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের একটা সার্থক চিহ্ন, যদিও সে পরিবর্তন এখনও তেমন অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই; এই পরিবর্তনের ফলে সম্প্রতি ইউরোপীয় সমালোচকগণের মধ্যস্থ সংস্কৃতিক্ষেত্রে অগ্রবর্তী অনেকের চক্ষুতে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যা অধুনা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এবং বিস্ময়কর রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতীচ্যেও মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতিযুক্ত এবং গভীরভাবে মৌলিক চিন্তাশীল এমন মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে, যাহারা অনুভব করিয়াছেন যে প্রাচ্য শিল্প বস্তুতন্ত্রবাদের অনুকরণ করিয়া শৃঙ্খলিত এবং অধঃপতিত হইতে চাহে নাই; প্রকৃত শিল্পের কাজ প্রকৃতির বাহ্য রূপের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে আত্মার গভীরতর যে সকল মূল্য নিহিত আছে, ঊর্ধ্ব হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া, এ শিল্প এই আদর্শে বিশ্বস্ত হইয়া রহিয়াছে ইহাও তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা বুঝিয়াছেন প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের অবিচলিত স্বাধীনতার মধ্যে ফিরিয়া যাওয়াই ইউরোপের রসাবিষ্ট এবং সৃষ্টিশীল মনের নবজীবন লাভ এবং মুক্তির প্রকৃত পন্থা। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে যদিও প্রতীচ্য শিল্পের প্রধান অংশ এখনও পুরাতন পথে চলিতেছে তথাপি তাহার আধুনিক মৌলিকতম সৃষ্টির অনেকগুলির মধ্যে এমন উপাদান আছে অথবা এমন দিকে তাহা লইয়া যাইতে চাহিতেছে যে, মনে হয় তাহা প্রাচ্য মনন এবং অনুভূতির নিকটে আসিয়াছে। তাহা হইলে ইহাকে এইভাবে রাখিয়া দিয়া এই নূতন দৃষ্টি গভীরতর হইবার এবং ভারতীয় শিল্পের সত্য ও মহত্ত্বকে সমর্থন ও প্রকাশ করিবার জন্য সময় দিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতাম।

কিন্তু ইউরোপীয়েরা আমাদের শিল্পের সমালোচনা করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করিবে ইহার জন্য আমরা ততটা ব্যস্ত নই, আমরা অধিকতররূপে চিন্তিত হইয়াছি এইজন্য যে আরও পূর্বোক্ত এই সমস্ত নিন্দাবাদ ভারতীয় মনকে বহুকাল পর্যন্ত তাহার প্রকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে; কেননা

এক বিদেশীয় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন শিক্ষাকে এখানে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার এই কুফল হইয়াছে যে ভারতীয় মন ইতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, মিথ্যা দ্বারা অভিভূত হইতে বসিয়াছে; উদ্বেগের কারণ এই যে এই ব্যবস্থা ভারতের শিল্পরুচি ও সংস্কৃতিকে সুস্থ ও সবলভাবে পুনরুজ্জীবিত হইতে বাধা দিতেছে এবং নূতন শিল্পসৃষ্টির যুগ আসিবার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যা অপুষ্ট এবং নিম্নশ্রেণীর শিল্প, অথবা এমনকি তাহার মধ্যে স্তূপীকৃত বিকৃতাঙ্গ ও কদাকার নিষ্ফল সৃষ্টি শুধু আছে, আমাদের শিল্প সম্বন্ধে ইংরেজ-কৃত বিচারের এই সাধারণ মত, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও শিক্ষিত ভারতবাসীর মন—শিক্ষিত কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃতির কণিকামাত্র বর্জিত—সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে, এবং যদিও সে মনোভাব চলিয়া গিয়াছে এবং একটা বৃহৎ পরিবর্তন আসিয়াছে, তথাপি অধিকাংশ লোকের মন অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য ধারণা দ্বারা গুরুভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিল্পরসরুচির* অপ্রখরতা অথবা একেবারেই অভাব ঘটিয়াছে, শিল্পরস বুঝিবার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, এবং আজিও সময় সময় এমন লোক চোখে পড়ে যাহাদের মুখে ইংরেজি ভাবাপন্ন সমালোচনার মূর্খতা ও কোলাহলপূর্ণ সুর শ্রবণ করা যায়, যে লোক যাহা কিছু ভারতীয় ভাবাপন্ন তাহার নিন্দা এবং যাহা কিছু পাশ্চাত্য বিধানসম্মত শুধু তাহার প্রশংসা করে। আমাদের কাছে ইউরোপীয় সমালোচনার প্রাচীন রীতির কিছু গুরুত্ব আজিও রহিয়াছে, কেননা আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পরসানুভবের শিক্ষা অথবা বস্তুতঃ প্রকৃত সংস্কৃতিগত কোন শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা নাই, ফলে আমরা নির্বোধের মত বিচারহীনভাবে যাহা শুনি তাহাই গ্রহণ করি। তাই দেখা যায় শ্রীওকাকুরা বা মিঃ লরেন্স বিনিয়ান (Lawrence Binyon) এর ন্যায় যথোচিত গুণ ও শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের সুবিবেচিত মতামত, এবং এই সমস্ত বিষয়ে কোন রুচি ও জ্ঞান নাই বলিয়া যাহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই মিঃ আর্চারের সমজাতীয় সাংবাদিকগণের যথেচ্ছ অপলিখন, এ উভয়কে আমরা তুল্য মূল্য দিই, এমনকি শেষোক্ত লেখার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হই। তাই একজন শিক্ষিত বা রসবোধযুক্ত সংবেদনশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে যাহা খুব স্পষ্ট তাহাও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হয়, কেননা যাহারা ভুল ওজনের বাটখারা বা মিথ্যা মূল্য বা তাৎপর্য লইয়া চলিতে অভ্যস্ত সেই সমস্ত সাধারণ অশিক্ষিত লোকের কাছে এ সমস্ত এখনও পরিচিত হইয়া উঠে নাই। আমাদের নিজেদের প্রকৃত

*উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এমন সমালোচনা আজিও পাওয়া যায় যাহা পড়িয়া হতাশ এবং স্তব্ধ হইয়া পড়িতে হয়, যাহাতে বলে রবি বর্মা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের রীতি পৃথক হইলেও প্রতিভা ও শক্তির হিসাবে উভয়ে সমান।

এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় পুনরায় লাভ করিবার কর্ম—আমাদের আত্মার অতীত এবং বর্তমান পরিচয় এবং তথা হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি আছে—আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে কেবল আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের অতীত যুগের শিল্পের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে চাহিলে আমাদিগকে সর্বপ্রকার বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং যেমন আমি পূর্বে স্থাপত্য সম্বন্ধে বলিয়াছি সেইভাবে আমাদের ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যাকেও তাহাদের নিজের গভীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাহাদের প্রকৃতির মহত্ত্বের আলোকে দেখিতে হইবে। যদি আমরা সেইভাবে দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য, শিল্পের অবদানের ক্ষেত্রে উচ্চতম স্তরে স্থান পাইবার দাবি রাখে। ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে ইহাপেক্ষা গভীরতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মহত্তর প্রকৃতি, বৃহত্তর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনকৌশল জগতে অন্য কোথাও যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমি জানি না। নিম্নতর শ্রেণীর শিল্প অনেক আছে বৈকি, যাহাদের মধ্যে শিল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই অথবা কেবল অংশত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্যকে সমগ্রভাবে দেখিলে, ইহার দীর্ঘকাল ব্যাপী অকুণ্ঠ পরমোৎকর্ষের কথা ভাবিলে, ইহার অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির সংখ্যার দিকে চাহিলে, একটা জাতির আত্মা ও মনকে প্রকাশ করিয়া দেখাইবার যে আশ্চর্য শক্তি ইহার আছে তাহা বিচার করিলে, আমরা অধিক দূর যাইতে প্রলুব্ধ হইব এবং ভারতীয় ভাস্কর্যকে জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান দিবার দাবি করিব। বস্তুতঃ ভাস্কর্য-বিদ্যা কেবল সেই সমস্ত প্রাচীন দেশে সতেজে বর্ধিত হইতে পারিয়াছে, যেখানে এক মহান স্থাপত্যের স্বাভাবিক পটভূমিকা এবং আশ্রয়ে ইহার জন্ম হইয়াছে। এই জাতীয় সৃষ্টিকার্যে ঈজিপ্ট গ্রীস এবং ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মধ্য এবং বর্তমান যুগের ইউরোপ তত প্রচুর, তত শক্তিশালী বা তেমন শ্রেষ্ঠ কোন ভাস্কর্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই, সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে, পক্ষান্তরে চিত্রবিদ্যায় এই শেষ যুগের ইউরোপ অনেক কিছু করিয়াছে, আর তাহা প্রচুর পরিমাণে এবং উত্তমরূপে করিয়াছে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিরতভাবে এ সমস্ত করিবার প্রেরণা নিত্য নূতনরূপে সে লাভ করিয়াছে। ভাস্কর্যে ভেদের কারণ এ দুই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মনন শক্তি ভিন্ন প্রকারের। যে উপাদান বা উপকরণকে আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হয়, তাহা আমাদের সৃষ্টিশীল প্রকৃতির উপর তাহার বিশিষ্ট দাবি আরোপিত এবং নিজের স্বাভাবিক বিধান নিরূপিত করে। ভিন্ন এক প্রসঙ্গে রাসকিনও (Ruskin) একথা বলিয়াছেন; যে ছাঁচের মন পাথর অথবা ব্রঞ্জ (bronze—তাম্র ও লৌহ নির্মিত ধাতু বিশেষ) লইয়া শিল্পকার্য করিতে পারে তাহা প্রাচীনগণের ছিল, আধুনিকগণের নাই, অথবা কেবল ক্বচিৎ ব্যক্তি

বিশেষের মধ্যে দেখা যায়; ভাস্কর্যে কৃতিত্ব লাভেচ্ছু ব্যক্তির এমন এক শিল্পীমন থাকিবে যাহা সহজে বিচলিত হয় না বা নিজেকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় না, নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আবেগের বশবর্তী হয় না, যাহা আসিয়া মানুষকে উত্তেজিত করিয়া পুনরায় চলিয়া যায় তেমন সংস্পর্শের অধীনতা স্বীকার করে না, বরং তাহার মূলে থাকিবে নিশ্চিত ভাবনা এবং দৃষ্টির কোন বিশাল ভিত্তি, যে লোকের প্রকৃতি হইবে অচঞ্চল, যাহা দৃঢ় এবং স্থায়ী এরূপ বস্তুতে নিবদ্ধ থাকিবে তাহার কল্পনা। এরূপ কঠোর উপাদান লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারে না, অথবা কেবল স্থূল মাধুর্য ও বাহ্য সৌন্দর্য ফুটাইবার জন্য বা অধিকতর বাহ্য চঞ্চল লঘু আকর্ষণের বস্তুকে রূপায়িত করিবার প্রেরণায় কেহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বা নিরাপদে ইহার ব্যবহারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। রসসৃষ্টি বিষয়ে রঙের আত্মধর্ম নিজের স্বরূপগত স্বভাবে শিল্পীকে যেরূপ আত্মপ্রশ্রয় দেয় অথবা এমনকি যে জাতীয় রসসৃষ্টিকার্যে আবাহন করে, তুলি লেখনী বা পেনসিল প্রাণের চঞ্চল খেলার আকর্ষণকে ফুটাইয়া তুলিবার কার্যে যে প্রসারতা বা স্বাধীনতা দিতে পারে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাহা নিষিদ্ধ, অথবা যদি এ সমস্ত দিকে সামান্য কিছুটা অগ্রসর হইতেও দেয় তবে তাহা সংযমের একটা রেখার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে, সে রেখা অতিক্রম করা সে শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক এবং শীঘ্রই প্রাণঘাতী হইয়া উঠিতে পারে। এখানে মহান এবং গভীর প্রেরণাকে, অল্প বা বেশী ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে এমন কোন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে অথবা শাশ্বত বস্তুর কোন অর্থ বা বোধকে শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিতে হয়। ভাস্কর্য শিল্প স্থিতিশীল, আত্মপ্রতিষ্ঠ, অবশ্যম্ভাবী রূপে দৃঢ়, মহৎ ও কঠোর এবং শিল্পীসত্তার মধ্যেও সেই জাতীয় রসগ্রহণক্ষম প্রকৃতি দাবি করে যাহার মধ্যে এই সকল গুণ আছে। জীবনের কিছু সক্রিয়তা, হৃদয়গ্রাহী মাধুর্যের কিছু রূপরেখা এই ভিত্তির উপর স্থান পাইতে পারে, কিন্তু তাহাই যদি উপাদানের মূল ধর্মের স্থান পূর্ণরূপে অধিকার করে, তবে তাহার অর্থ হইবে এই যে ক্ষুদ্র মূর্তির ধর্ম বা প্রকৃতি প্রস্তর বা ধাতু নির্মিত মহান মূর্তিতে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তখন আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, সে শিল্পের অধঃপতন ঘনাইয়া আসিতেছে। গ্রীক ভাস্কর্য এই ধারা অনুসরণ করিয়া ফিডিয়াসের (Phidias) মহত্ত্ব হইতে প্রাক্সিটেলিস (Praxiteles) এর কোমল আত্ম-প্রশ্রয়ের মধ্য দিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। একজন এনজেলো (Angelo) বা একজন রডিন (Rodin) এর মত ব্যক্তিবিশেষের কিছু কিছু মহান সৃষ্টি সত্ত্বেও পরবর্তী যুগের ইউরোপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাস্কর্য শিল্পে কৃতকার্যতা দেখাইতে পারে নাই, কেননা সে প্রস্তর এবং ব্রঞ্জ লইয়া বাহ্যভাবে খেলা করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রাণের প্রতিরূপ প্রদর্শনের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা আধ্যাত্মিক

প্রেরণার কোন প্রশস্ত ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ঈজিপ্ট এবং ভারত বহু মহান যুগ ব্যাপিয়া ভাস্কর্যে সফল সৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিয়াছে। ভারতের আদিতম যে সৃষ্টি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সময় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী, এই সৃষ্টি তখনই পূর্ণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে, এবং স্পষ্টতঃ বুঝা যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যসকল তাহার পশ্চাতে বর্তমান ছিল, এবং অনেকটা উচ্চ মূল্যের শেষ সৃষ্টির সময় আমাদের সময়ের কয়েক শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত ভাস্কর্য সৃষ্টির উৎকর্ষের এই নিশ্চিত ইতিহাস একটা জাতির জীবনে বিরল এবং সার্থক ঘটনা।

ভারতীয় ভাস্কর্যের দীর্ঘকাল ব্যাপী মহত্ত্বের মূলে রহিয়াছে ভারতবাসীর জীবনে ধর্ম ও দর্শনের সহিত তাহার রসভাবিত মনের নিকট সম্বন্ধ। এ ভাস্কর্যের পক্ষে আমাদের অনতিদূরবর্তী সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা যে সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ, সেই ধর্ম ও দর্শনের ছাঁচে-ঢালা এক প্রাচীন ধরনের মন ভারতে বাঁচিয়া ছিল,—সে মন শাশ্বত বস্তুসমূহের সঙ্গে পরিচিত এবং বিশ্ব-গতভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ ছিল, সে মনের ভাবনা এবং দৃষ্টির মূল ছিল আত্মার দূরবগাহ গভীরে, মানবাত্মার অতি অন্তরতম ও অর্থপূর্ণ স্থায়ী অভিজ্ঞতাসকলের মধ্যে। গ্রীক ভাস্কর্যে যে স্বচ্ছ মহত্ত্ব, দৈহিক মাধুর্য এবং সুকুমার প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখিতে পাই তাহা সীমার মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ, ভারতীয় ভাস্কর্যের এই মহত্ত্বের প্রকৃতি তাহার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। মিঃ আর্চার এবং তজ্জাতীয় সমালোচকগণের প্রিয় চাতুরী এই যে, তাঁহারা সর্বদা আমাদের সম্মুখে গ্রীক আদর্শ সজোরে উপস্থাপিত করেন এবং এরূপ-ভাবে করেন যে যাহাতে মনে হয় যে, সে আদর্শ দ্বারা ভাস্কর্যকে নিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে নৈলে তাহার কোন মূল্য থাকিবে না, এইজন্য এই বিভেদের অর্থ কি তাহা ভাল করিয়া দেখা প্রয়োজন। আরও পুরাকালে অধিকতর প্রাচীন ধরনের গ্রীক ভাস্কর্য রীতিতে বস্তুতঃ এমন কিছুর আভাস ছিল, যাহা যেন মনে করাইয়া দিত যে এ শিল্পের প্রথম সৃষ্টিশীল শক্তি ঈজিপ্ট এবং পূর্ব দেশ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু যে প্রধান ভাবধারা গ্রীকগণের রসবোধশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং যাহা পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় মনোভাব প্রধানতঃ প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা গ্রীক জাতির মধ্যে পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল—সে ভাবধারার মধ্যে দুইটি বস্তুকে মিলাইবার একটা সঙ্কল্প আছে, আন্তর সত্যের কোন এক প্রকার প্রকাশ, এবং বাহ্য প্রকৃতির ভাব ও আদর্শগত এক অনুকরণ। যে শিল্পসৃষ্টি তথায় হইয়াছিল তাহার দীপ্তি, সৌন্দর্য এবং মহত্ত্ব ছিল, তাহা অতি মহান এবং পূর্ণ বস্তু; কিন্তু এই গ্রীক রীতিই একমাত্র সম্ভাবনীয় রীতি অথবা তাহার বিধানই একমাত্র স্থায়ী এবং স্বাভাবিক বিধান, একথা বলিলে ভুল বলা হইবে। যাহা অতি সূক্ষ্ম, অতি সমৃদ্ধ বা অতি গভীর নয়, কিন্তু

মনোরম ও সুকুমার তেমন এক আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ও আভাস, এবং মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের মিলনে গঠিত এক বাহ্য দৈহিক সৌষম্য, এ উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সন্তোষজনক সাম্য যখন স্থাপিত ও সর্বদা রক্ষিত হইত, তখনই এ শিল্পের উচ্চতম মহত্ত্ব লাভ হইয়াছিল, এবং যতদিন সে সাম্য বজায় ছিল ততদিন সে মহত্ত্বও বর্তমান ছিল, কিন্তু কার্যতঃ তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী যুগে অল্পকাল স্থায়ী অত্যাশ্চর্য এক শিল্পসৃষ্টি দেখা দিয়াছিল, যাহার মধ্যে প্রাণের আভাস ও ইঙ্গিত এবং ইন্দ্রিয়ানুরাগসূচক দৈহিক সৌন্দর্য সাক্ষাৎ ভাবে মিলিত হইয়াছিল, আর সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ছাঁচে ঢালা সৌন্দর্যের আত্মাকে প্রকাশ করিবার একপ্রকার শক্তিও ছিল; কিন্তু একবার এ কার্য হইয়া গেলে আর কিছু দেখিবার বা সৃষ্টি করিবার ছিল না। কেননা বর্তমান কালে আধুনিক মন এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়াছে, যাহা মনে করে যে অতিরঞ্জিত বস্তুতান্ত্রিকতার মিথ্যা কল্পনার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে, অর্থাৎ বস্তুর বাহ্য রূপের উপর চাপ দিলে প্রাণ এবং জড়ের অন্তরস্থিত গোপন আত্মা প্রকাশ হইবে, কিন্তু প্রাচীন কালের উচ্চশ্রেণীর (classic) বুদ্ধি ও প্রকৃতির কাছে এ ধরনের দৃষ্টিধারা প্রকাশিত হয় নাই। নিশ্চয়ই সময় আসিয়াছে এবং বর্তমানে অনেকে তাহা স্বীকার করিতে আরম্ভও করিয়াছেন যে, নিজের ক্ষেত্রে গ্রীক শিল্পের মহত্ত্ব স্বীকার করিলেও সরলভাবে ইহা অনুভব করিবার কোন বাধা নাই যে গ্রীকগণের সেই নিজস্ব ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক ভাস্কর্য যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহা সুন্দর মাধুর্য ও মহত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু যাহা সে প্রকাশ করে নাই এবং তাহার শিল্পরীতির বিধি-বিধানের সীমাবদ্ধতার জন্য যাহা সে আশা করিতেও পারে নাই তাহার পরিমাণও অনেক বেশী, আর যাহা সে প্রকাশ করে নাই তাহার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল, ছিল আধ্যাত্মিকতার সেই গভীরতা এবং বিস্তার—মানুষের মনের বৃহত্তর এবং গভীরতর আত্মপ্রকাশের জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক। এবং ঠিক এইখানেই ভারতীয় ভাস্কর্যের মহত্ত্ব, গ্রীকগণের শিল্পরসিক মন যাহার ধারণা বা প্রকাশ করিতে পারে নাই, প্রস্তরে ও ধাতুতে ভারতীয় শিল্প তাহা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার প্রকৃত বিধান এবং স্বাভাবিক পূর্ণতা গভীরভাবে বুঝিয়া অতি সুন্দর রূপে তাহা মূর্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

উপনিষদে যে চিন্তাধারা বোধি এবং অনুপ্রেরণায় লব্ধ হইয়াছে এবং মহাভারত ও রামায়ণে সজীবভাবে জীবনের যে কথা চিত্রিত হইয়াছে, অধিকতর প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে পরিদৃশ্যমানভাবে তাহাই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্যের মত এই ভাস্কর্যও আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে জাত হইয়াছে; ইহার বৃহত্তম সৃষ্টিতে রূপের মধ্যে চিদ্বস্তু, দেহের মধ্যে আত্মা, দেবতা বা মানুষের মূর্তির মধ্যে কোন না কোন সজীব আত্মশক্তি দেখা

দিয়াছে, ব্যষ্টিরূপের মধ্যে বিশ্বগত এবং সার্বভৌম ভাবের এরূপ ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা ব্যষ্টিভাবের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই, নৈর্ব্যক্তিকতার আশ্রয়ে ব্যক্তিকতার অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছে কিন্তু ব্যক্তিভাব একান্ত হইয়া উঠে নাই; তাহার মধ্যে শাশ্বতের স্থায়ী মুহূর্তরাজি এবং ক্রিয়া বা সৃষ্টিকার্যরত চিৎ-পুরুষের সান্নিধ্য, ধারণা, শক্তি, শান্তি বা বীর্যবান আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই উদ্দেশ্য, এইভাব শিল্পসৃষ্টির প্রতি অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বর্তমান আছে, এমনকি যেখানে ভাস্করের মনে ইহার স্থান প্রধান নহে সেখানেও ইহার আভাস ও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্য যেমন ভারতীয় স্থাপত্য তেমনি তাহার ভাস্কর্যের নিকটও আমাদিগকে এক পৃথক মন লইয়া আসিতে হইবে। দেখিবার এবং সাড়া দিবার এক ভিন্ন প্রকারের সামর্থ্য ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাকে দেখিতে হইলে ইউরোপীয় শিল্পের অধিকতর বহির্মুখী কল্পনাশ্রয়ী সৃষ্টি দেখিতে যতটা প্রয়োজন, আমাদিগকে আমাদের অন্তরে তদপেক্ষা অনেক অধিক গভীরে যাইতে হইবে। ফিডিয়াসকৃত অলিম্পিয়াবাসী* দেবমূর্তিসকল মানুষেরই অতিবর্ধিত এবং উন্নীত সংস্করণ, মানুষী ভাবের অতিসঙ্কীর্ণতা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নৈর্ব্যক্তিকতার এক প্রকার দিব্যশান্তি বা সার্বভৌম দিব্য জাতীয় কোন গুণ তাহাতে ফুটান হইয়াছে। অন্য সকল শিল্প-কার্যে আমরা পাই বীর, কুশলী মল্ল, মূর্তিমতী সৌন্দর্য রূপিনী স্ত্রীমূর্তি, আদর্শ সৌন্দর্যমণ্ডিত মানবদেহে ভাব, ক্রিয়া বা আবেগের শান্ত এবং সংযত রূপায়ণ। ভারতীয় ভাস্কর্যের দেবতাগণ বিশ্বপুরুষেরই নানা মূর্তি, তাহাদের মধ্যে বৃহৎ কোন আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক ভাব এবং ক্রিয়া অন্তরতম চৈত্য-পুরুষের কোন তাৎপর্যকে রূপ দেওয়া হইয়াছে; তাহার মধ্যস্থিত মনুষ্য-মূর্তি আত্মাপুরুষের এই অর্থ প্রকাশের বাহন, তাহার আত্মপ্রকাশের বাহ্য উপায়; মূর্তির মধ্যে অন্য যাহা কিছু আছে, কোন কিছুকে প্রকাশ করিবার যে কোন সুযোগ পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি, তাহার মুখমণ্ডল, হস্ত, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান, দেহের গঠনভঙ্গী ও আবর্তন প্রতিটি আনু-ষঙ্গিক বিষয় আন্তর এক তাৎপর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আর তাহারা সেই তাৎপর্যকে প্রকট করিয়াছে, এবং সমগ্রতার পূর্ণ সুষমার ব্যঞ্জনার ছন্দ বহন করিতেছে, পক্ষান্তরে যাহা কিছু এই উদ্দেশ্য বিফল করিবে মনে হয় বিশেষতঃ মানুষের মূর্তির মধ্যে যাহা কিছুর অর্থ কেবলমাত্র দেহ ও প্রাণের, বাহ্য এবং স্পষ্ট প্রত্যক্ষের আভাস জাগাইবার দাবি করে তাহা গোপন করা এবং দমিত রাখা হইয়াছে। এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষের মূর্তিতে যতটা সম্ভব পরিপূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বা তাৎপর্যের অভিব্যক্তি, আদর্শ দৈহিক সৌন্দর্য অথবা আবেগময় জীবনের মাধুর্য প্রকাশ

* অলিম্পিয়া গ্রীক দেবতাগণের আবাসস্থল। (অনুবাদক)

নহে। এ শিল্পের ধারণা এবং নিগূঢ় রহস্য এই যে আমাদের অন্তরস্থিত দিব্য আত্মাই ইহার বিষয়, আর দেহের আধারে সেই আত্মাই রূপায়িত হইয়া উঠে। এইজন্য রসানুভবসমর্থ চক্ষু এবং কল্পনামাত্রকে সঙ্গে লইয়া এ শিল্পের সম্মুখীন হওয়া এবং ইহার আবেদনে সাড়া দিতে চেষ্টা করা যথেষ্ট নহে, কিন্তু রূপ যাহাকে বহন করিতেছে তাহার দিকেই আমাদিগকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, এমনকি রূপের মধ্য দিয়া তাহার পশ্চাতে অবস্থিত আপন অসীমতার অন্তর্নিহিত যাহা গভীর ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে তাহারই অনুধাবন করিতে হইবে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ধর্মানুগত বা দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত এই দিক ভারতীয় ধ্যান ধারণা এবং আরাধনার—আমাদের আত্মাকে আবিষ্কার করিবার উপযোগী এই সমস্ত গভীর বস্তুকে আমাদের এই সমালোচক ঘৃণাভরে যৌগিক বিভ্রান্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্বন্ধ; আত্মোপলব্ধিই এ সৃষ্টিপদ্ধতির মূলকথা, আত্মোপলব্ধিই এ সৃষ্টিকে বুঝিবার এবং ইহাতে সাড়া দিবার উপায় বা পন্থা। এমনকি মানুষের একক বা সংঘবদ্ধ মূর্তি গঠনেও অনুরূপ আন্তর উদ্দেশ্য ও অন্তর্দৃষ্টি ভাস্করের সৃষ্টিকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এ শিল্পে রাজা বা সাধুর প্রস্তরমূর্তির উদ্দেশ্য শুধু একজন রাজা বা একজন সাধুর ধারণাকে মূর্ত করিয়া তোলা নহে; কোন নাটকীয় ঘটনার প্রতিফলন অথবা প্রস্তরে বাস্তবানুগ কোন চরিত্র চিত্রনেই ভাস্করের কার্য যে শেষ হইল তাহা নহে, বরং বলিতে পারি যে ইহার উদ্দেশ্য আত্মার একটা অবস্থা, অথবা অভিজ্ঞতা অথবা আত্মার কোন গভীর গুণকে রূপায়িত করা; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপাস্য ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যে ভক্ত বা সাধুর বাহ্য আবেগ দেখানো ইহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সেই পূজ্য পরম দেবতার সান্নিধ্যে তাহার ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে যে দিব্যদৃষ্টি ফোটে, যে আত্মহারা পরমানন্দের উদয় হয়, তাহার অন্তরের বা আত্মার মধ্যস্থিত সেই দিক প্রদর্শিত করাই এ শিল্পের উদ্দেশ্য। ভারতীয় ভাস্কর যে গুরু কার্যভার তাহার সাধনার পুরোভাগে স্থাপন করে তাহার প্রকৃতি এইরূপ, তাহার সাধনায় সে কতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং এজন্য তাহাকে কিরূপ শ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার বিচার তাহার এই উদ্দেশ্যের সফলতার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে, তাহার মধ্যে অন্য কোন কিছুর অভাব আছে কিনা, অথবা তাহার মনের পক্ষে যাহা বৈদিশিক কিম্বা তাহার পরিকল্পনার যাহা বিরোধী তেমন কোন গুণ বা কোন অভিপ্রায় তাহার সৃষ্টিতে দেখা গিয়াছে কিনা, তাহার উপরে নহে।

একবার আমরা যদি এই আদর্শ স্বীকার বা এই মাপকাঠি গ্রহণ করি, তবে ভারতীয় ভাস্কর্য যেরূপ গভীর বুদ্ধির সহিত এ শিল্পের রীতি ও বিধান নির্ণয় এবং অবস্থার সমাবেশ, এবং যেরূপ নিপুণতার সহিত

তাহার কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল, অথবা তাহার শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিসকলে যেরূপ অত্যুত্তম মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, প্রশংসার কোন উচ্চভাষাই তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুদ্ধের মহান মূর্তিগুলি, গান্ধার যুগের মূর্তি নয়, কিন্তু পর্বতগুহা খোদিত করিয়া যে সমস্ত মন্দির ও ভজনালয় গঠিত হইয়াছে সেখানে রক্ষিত তাঁহার দিব্য একক বা দলবদ্ধ মূর্তিসকল, অথবা পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ভারতে ব্রঞ্জ ধাতু দ্বারা যে সমস্ত বুদ্ধ বিগ্রহ নির্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলি—এই বিষয়ে লিখিত শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির পুস্তকে তাহাদের অনেকগুলি চমৎকার আলোক-চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে—অথবা কালসংহার শিববিগ্রহ বা নটরাজ শিব-মূর্তিগুলি গ্রহণ কর। ইহাদের চেয়ে মহত্তর এবং সুন্দরতর মূর্তি কেহ ধারণা বা কল্পনা করে নাই, অথবা কোন মানুষের হস্ত গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, চিন্ময় রসভাবিত দিব্যদৃষ্টিজাত প্রেরণা ইহাদের মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। বুদ্ধ মূর্তিতে দেখিতে পাই সসীম এক বিগ্রহের মধ্যে অসীমের প্রকাশ; একটি বিগ্রহের মানুষী তনু ও মুখশ্রীতে নির্বাণের অমেয়প্রশান্তি ফুটাইয়া তোলা, নিশ্চয় সামান্য অবদান বা বর্বরোচিত সংসাধন নয়। কালসংহার শিবমূর্তিতে সত্তার মহিমা, শক্তি, প্রশান্ত বীর্যবান সংযম, মর্যাদা এবং রাজশ্রী শ্রেষ্ঠরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই মূর্তির সমগ্র প্রকৃতি এবং দেহভঙ্গিতে এ সমস্ত পরিদৃশ্যমানভাবে মূর্তিমন্ত হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র তাহাই নহে, এ সমস্ত এ মূর্তির সম্পদের অর্ধেক মাত্র অথবা অর্ধেকের চেয়েও কম, ইহাতে আরও অনেক বৃহৎ কিছু আছে; শিল্পী এ মূর্তির মধ্য দিয়া চিন্ময়ভাবে কাল এবং অস্তিত্বকে জয় করিবার এক ঘনীভূত দিব্য তীব্র আবেগ প্রকাশ করিয়াছে, মূর্তির চক্ষুতে ভ্রূযুগলে ললাটে মুখে এবং প্রতি বৈশিষ্ট্যে এ আবেগ রূপায়িত করিয়াছে, আর সূক্ষ্মভাবে সে আবেগের প্রকাশে সহায়তা করিবার জন্য দেবমূর্তির প্রতি অঙ্গের মধ্যে এক অপরূপ আভাস ও ইঙ্গিত ফুটাইয়াছে, যাহার প্রকৃতিতে মানসিক আবেগ বা হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস নাই, আছে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা, ফলে শিল্পের অর্থ ও উদ্দেশ্যের এক সার্থক ছন্দোময় প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহা এই সৃষ্টির সমগ্র একত্বের মধ্য দিয়া শিল্পী যেন প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। অথবা নটরাজ শিবের নৃত্যে বিশ্বের গতি ও বিশ্বের আনন্দ কি অপরূপ প্রতিভা এবং নিপুণতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে, কি আশ্চর্য সফলতার সহিত মূল তাৎপর্যের ছন্দ মূর্তির প্রতি অঙ্গে ফুটান হইয়াছে, গতির মধ্যে কি পরমানন্দময় তীব্রতা ও অনাড়ম্বরতা কত স্বচ্ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে অথচ গতির তীব্রতা যথাযথভাবে কি সুন্দর রূপে সংযত করা হইয়াছে; এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একমাত্র যে ভাব বিষয় রূপে এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা কিরূপ সজোরে মানুষের মন অধিকার করিতেছে, তাহার প্রতি অঙ্গে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য

কি চমৎকারভাবে হৃদয় ও মনকে বিমুগ্ধ করিতেছে! বৃহৎ মন্দিরসমূহে অথবা কালের ধ্বংসাবশেষে যে সমস্ত বিগ্রহ এখনও রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটির পর অন্যটি পরিচয় দেয় পরম্পরাগত সেই একই মহান শিল্প ও শিল্প-প্রতিভাকে, যাহা পরম্পরাগত সেই একই গভীর আধ্যাত্মিক ভাবকে বহু রীতিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে; এই সমস্ত বিগ্রহের প্রতি বক্রতা, প্রতি রূপরেখা, তাহার সমগ্রতা, তাহার হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহার অর্থপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী, তাহার ব্যঞ্জনাময় ছন্দ, এ সমস্তই সেই আধ্যাত্মিক ভাবকেই সুসঙ্গতভাবে ব্যক্ত করে, এমনভাবে ব্যক্ত করে যে দর্শক বুঝিতে পারে যে, শিল্পী তাহার মর্ম দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিয়াছে;—ইহা এমন এক শিল্প যাহা তাহার নিজস্ব প্রকৃতিতে বুঝিতে পারিলে, প্রাচীন বা আধুনিক, গ্রীস অথবা ঈজিপ্টজাত, নিকট ও সুদূর প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্ত্য কোন দেশের কোন সৃষ্টিশীল যুগের শিল্পের সঙ্গে তুলনায় এ শিল্পের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। এই ভাস্কর্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীনতর যুগে ইহা ছিল অনন্য-সাধারণ, মহান এবং মহাকাব্যের মত শক্তিশালী, যে ভাবধারা বেদ এবং বেদান্তের ঋষিগণ এবং মহাকবিগণের হৃদয়ে রাজত্ব করিত ইহা তাহা দ্বারা ঊর্ধ্বায়িত হইয়াছিল; পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ইহার গতিধারার মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য, আনন্দ এবং গীতিকাব্যোচিত হর্ষোল্লাসের ও গতিভঙ্গীর প্রাচুর্য দেখা দিয়াছিল, শেষ এক যুগ আসিল যখন ইহা দ্রুত অবনতির পথে চলিল তখন ইহার মধ্যে সারবস্তুর অভাব ঘটিল; কিন্তু মধ্যযুগের মধ্যেও বরাবর দেখিতে পাই যে, ভাস্কর্যের উদ্দেশ্যে সেই গভীরতা এবং মহত্ত্ব রহিয়াছে এবং শিল্প-সৃষ্টিকে প্রদীপ্ত এবং সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এমনকি অবনতির যুগের ক্ষয়প্রবণতার মুখেও এ ভাবের কিছুটা বর্তমান রহিয়াছে, যাহা এ শিল্পকে সম্পূর্ণ অধঃপাত, শূন্যগর্ভতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

তাহা হইলে এইবার ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রকৃতি এবং গঠনপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি তোলা হইয়াছে তাহার মূল্য কি দেখা যাউক। শয়তানের এই উকিলের ভর্ৎসনার মূল ধুয়া এই যে, আপনাতে নিবদ্ধ তাঁহার ইউরোপীয় মন এ শিল্পের সমস্তকেই বর্বরোচিত, অর্থশূন্য, শ্রীহীন, অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার মনে করে; বলে যে কুৎসিত শ্বাসরোধকারী অবাস্তবতার মধ্যে থাকিয়া এক বিকৃত কল্পনাই এ সমস্তকে গড়িয়াছে। একথা সত্য, যে সমস্ত শিল্পকার্য আজিও বাঁচিয়া আছে তাহার মধ্যে এমন শিল্পও আছে যাহা তেমন উচ্চ অনুপ্রেরণা পায় নাই, এমনকি এরূপ কিছুও আছে যাহা অপকৃষ্ট, বাহুল্য-দুষ্ট, কষ্টকল্পিত অথবা কুগঠিত; যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়ারত কারিগর দ্বারা গঠিত বস্তুর সঙ্গে নামগোত্রহীন মহান শিল্পিগণের দ্বারা প্রস্তুত অতি সুন্দর শিল্পকার্যসকল মিশিয়া রহিয়াছে, এবং যে চক্ষু এধরনের শিল্পের অর্থ ধরিতে

পারে না, তাহার প্রাথমিক বিধান জানে না, এ জাতীয় লোকের মনোভাব অথবা ইহাদের শিল্পরস-প্রকাশ-পদ্ধতি বুঝে না, তাহারা উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট অথবা অধঃপতিত শিল্প এবং মহান শিল্পী রচিত বা মহাযুগে কৃত শিল্পের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে সহজেই অকৃতকার্য হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র শিল্প বিচারে প্রযুক্ত হইলে এ সমালোচনা নিজেই বিকৃত এবং হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়ে; এবং ইহার অর্থ শুধু এই বলা যায় যে এখানে এমনসকল ধারণা এবং এমন এক গঠনক্ষম কল্পনাশক্তি আছে যাহা পাশ্চাত্য বুদ্ধির নিকট অপরিচিত। ভারতীয় রসবোধ শিল্পের যে রেখা ও রীতি, যে পদ্ধতি ও বিধান এবং তাহার ভাবের প্রবাহ যেদিকে প্রবণতা দাবি করে তাহা ইউরোপীয় দাবির সহিত এক নহে। কেবলমাত্র ভাস্কর্যে নয়, কিন্তু অন্য সকল সাবলীল শিল্পে ও সঙ্গীতে এমনকি কতকটা পরিমাণে সাহিত্যেও উভয় জাতির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা বহু সময় সাপেক্ষ, কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে ভারতীয় মন আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতা ও আত্মিক ব্যাপার সম্পর্কীয় কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার প্রণোদনায় পরিচালিত হয়, অপর পক্ষে ইউরোপীয় মন প্রকৃতির রস ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধান ও মনোভঙ্গী বিচারবুদ্ধিপ্রবণ, প্রাণগত আবেগময়, এবং সেই অর্থে কল্পনাকুশল; ইউরোপীয়ের চক্ষুতে ভারতীয় শিল্পে রূপরেখা, আয়তন, অলঙ্কার, মাত্রা ও ছন্দের ব্যবহার যে সম্পূর্ণরূপে অদ্ভুত বোধ হয়, এই পার্থক্যই তাহার প্রায় সমগ্র কারণ। এই দুই মন প্রায় পূর্ণরূপে বিভিন্ন জগতে বাস করে, হয় তাহারা একই বস্তু দেখে না, অথবা উভয়ের দৃষ্টি যখন একই বস্তুর উপর পড়ে তখন বিভিন্ন স্তর হইতে দেখে, বা বিভিন্ন পরিমন্ডল দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেখে, আর আমরা জানি দৃষ্টিভঙ্গী অথবা বিভিন্ন দৃষ্টির মাধ্যমতা কোন পদার্থকে রূপান্তরিত করিবার কি বৃহৎ শক্তি রাখে। আর অধিকাংশ ভারতীয় ভাস্কর্য যে বহিঃপ্রকৃতির বাস্তবতা অনুসরণ করিয়া চলে না, নিশ্চয়ই মিঃ আর্চারের এই অভিযোগের যথেষ্ট হেতু আছে। ইহার প্রেরণা এবং দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতঃ বস্তুতান্ত্রিক নহে, অর্থাৎ বাহ্য বা জাগতিক প্রকৃতিতে যাহা সুস্পষ্ট এবং প্রতীতিজননক্ষম ও সঠিক, যাহা সুন্দর মধুর বা সবল, তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ অথবা এমনকি ভাবে ও কল্পনায় তাহার অনুকরণ ইহার উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আধ্যাত্মিক ধারণা বা সংস্কারকে রূপায়িত করাতেই ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুরাগ, তাহাই তাহার কার্য, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহার বর্ণনা দেওয়া বা গৌরব করা তাহার কার্য নহে। দৈহিক ও পার্থিব বিষয়ের ব্যঞ্জনা হইতে সে কার্যারম্ভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরে বাহ্য ব্যাপারের নির্বন্ধাতিশয়তার দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অন্তরাত্মার স্মৃতির মধ্যে দেখিয়া, তাহাদিগকে নিজের মধ্যে এমনভাবে রূপান্তরিত করে যে, তাহাদের জড় সত্য অথবা প্রাণ ও বুদ্ধির

দেওয়া অর্থ হইতে ভিন্ন কিছু বাহির করিয়া আনিতে পারে, তাহার পর তাহার দ্বারাই সে গঠনকার্য সম্পন্ন করে। সে অন্তরের মধ্যস্থিত চৈত্যিক রূপরেখা এবং গঠনভঙ্গী দেখিতে পায় এবং বাস্তব রেখাবিন্যাসের শিল্প-কৌশলের স্থানে তাহাদের স্থান দেয়। যাহা উদার এবং সহানুভূতিসম্পন্ন সংস্কৃতি দ্বারা মুক্ত হয় নাই এমন সাধারণ পাশ্চাত্য মন ও চক্ষুর নিকট তাহাদের অপরিচিত এই শিল্পপদ্ধতি যে এইরূপ অদ্ভুত ফল উৎপাদন করিবে তাহা বিচিত্র নয়। আর যাহা আমাদের নিকট অপরিচিত, অন্যভাবে অভ্যস্ত আমাদের মনের কাছে স্বাভাবিকভাবেই তাহা প্রতিকূল, অন্যভাবে অভ্যস্ত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের কাছে তাহা কুৎসিৎ, এবং যে রসবোধের অনুশীলনে এবং কল্পনাপ্রবণ ঐতিহ্যে আমরা অভ্যস্ত, তাহার কাছে তাহা কিম্ভূতকিমাকার মনে হইতে পারে। আমাদের চক্ষুর নিকট যাহা পরিচিত এবং আমাদের কল্পনার কাছে যাহা সুস্পষ্ট তাহাই দেখিতে চাই, এবং যে বৃত্তের মধ্যে আমরা বাস করিতে ও সুখ পাইতে অভ্যস্ত তাহার বাহিরের কিছু ইহাতে আছে এবং এখানে বৃহত্তর কোন সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে একথা সহজে স্বীকার করিতে চাই না।

মনে হয় যেন মানুষের মূর্তিতে অন্তরাত্মার এই দৃষ্টি প্রয়োগ ভারতীয় ভাস্কর্যের এই সমস্ত সমালোচককে বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট করে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে পরিচিত অভিযোগ—যেমন ভারতীয় ভাস্কর্যে দেবদেবী-গণের মূর্তিতে ভুজ বা হস্তের সংখ্যাবৃদ্ধি, শিবের চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ বা দশভুজ কিম্বা দুর্গার অষ্টাদশভুজ—এই যে তাহাতে মূর্তি বিকটাকার হইয়া পড়ে, এমন কিছু হইয়া দাঁড়ায় যাহা প্রকৃতিতে নাই। ইহা খুবই সত্য কথা যে মানুষকে পুরুষ বা নারী মূর্তিতে গড়িবার ক্ষেত্রে এই ভাবের কল্পনার কোন স্থান নাই, কেননা তাহাতে শিল্পগত বা অন্য কোন তাৎপর্য নাই। কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীমূর্তিসমূহের মত বিশ্বসত্তাসমূহের প্রতিরূপে এ স্বাধীনতা কেন দেওয়া যাইতে পারে না তাহা আমি বুঝি না। সমগ্র প্রশ্নটিকে এই দুই দিক দিয়া দেখা উচিত, প্রথম কথা এই যে যাহা সমান সুন্দরভাবে বা সমান শক্তির সহিত অন্য কোন উপায়ে ফুটাইয়া তোলা যাইত না, এ শিল্প-কুশলতায় তেমন কোন বিশেষ তাৎপর্য এই উপায়ে যথাযোগ্যভাবে অভিব্যক্ত করা সম্ভব হইয়াছে কিনা, তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ার কার্যে এ ব্যবস্থার সামর্থ্য আছে কিনা, বাহ্য জড় প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণ না হইলেও ইহা শিল্পকলাসম্মত সত্য এবং একত্বের ছন্দের সঙ্গে মিলিতে পারে কিনা। যদি তাহা করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে তবে এ উপায়ে সৃষ্ট শিল্প কুরূপ এবং বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহারই হইবে। কিন্তু এই সমস্ত শর্ত বা বিধান যদি প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে উপায়টি সমর্থনযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়; এই জাতীয় কোন অনবদ্য সৃষ্টিকর্মের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ বিষয় লইয়া এরূপ বেসুরা কলরব তুলিবার কোন অধিকার আমাদের আছে বলিয়া আমি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। নৃত্যপরায়ণ শিবমূর্তিতে মিঃ আর্চারের মতে প্রয়োজনাতিরিক্ত এই সমস্ত অঙ্গ যেরূপ পূর্ণ দক্ষতা এবং নিপুণতার সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি নিজেও বিস্মিত হইয়াছেন, বস্তুতঃ এতটুকুও যে না দেখিতে পায় তাহার চক্ষু অবিশ্বাস্যরূপে অন্ধ বলিতে হইবে; কিন্তু শিল্পের যে তাৎপর্য প্রকাশের জন্য এই দক্ষতা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা অবশ্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু; আর যদি সে তাৎপর্য বুঝিতে পারি তবে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইব যে, যে বিশ্বনৃত্যের আধ্যাত্মিক ভাব ও আবেগ, আভাস ও ইঙ্গিত এই উপায়ে যেরূপ নিপুণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে দ্বিভুজ মূর্তি দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। দুর্গা যেখানে তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ দ্বারা অসুর সংহার করিতেছেন অথবা যেখানে মহান পল্লভ যুগে গঠিত নটরাজের যে বিগ্রহগুলিতে গীতিকাব্যের সুর বা লিরিক সৌন্দর্য ফুটে নাই, তাহার স্থানে মহাকাব্যের শোভা ও সমারোহের ছন্দোময় অভিব্যক্তি হইয়াছে, সেখানেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। শিল্প তাহার নিজের প্রযুক্ত উপায় নিজেই সমর্থন করে এবং এখানে সে কাজ পরম পূর্ণতার সহিতই নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন কোন মূর্তির অঙ্গবিন্যাস 'আকুঞ্চিত বা বিকৃত' এই যে অভিযোগ করা হইয়াছে সেখানেও সেই একই বিধান খাটে। অনেক সময় দেখা যায় ভারতীয় ভাস্কর্যে দেহের শরীর-সংস্থান-বিদ্যায় (anatomy) বর্ণিত সাধারণ অবস্থা হইতে কিছু ব্যতিক্রম করা হয়, অথবা —যদিও বিষয়টি ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে—সচরাচর যেরূপ দেখা যায় না তেমন কোন ভঙ্গীতে দেহ বা হস্তপদাদির বিন্যাস করিবার উপর অল্পবিস্তর জোর দেওয়া হয়; যেখানে এরূপ দেখা যায় সেখানে প্রশ্ন এই যে কোন উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যতীত ইহা করা হইয়াছে কিনা, ইহা কি গঠনপটুতার অভাব হইতে জাত কেবল কুৎসিৎ অতিরঞ্জন অথবা কোন তাৎপর্য প্রকাশে ইহা কি কাজে লাগে এবং প্রকৃতির সাধারণ স্থূল মাপকাঠির স্থানে, উদ্দেশ্যমূলক এবং সফল অন্য কোন শিল্পছন্দ প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ইহা সহায়ক কিনা। সব কথা ধরিলে বলিতে হয় যে সচরাচর যাহা দেখা যায় না সেরূপ বস্তু বা ভাবের ব্যবহার শিল্পের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, অথবা সাধারণ অবস্থার অদলবদল করা বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে অন্যায় নহে। একথা প্রায় বলা যাইতে পারে যে যখন হইতে শিল্প মানুষের কল্পনার খোরাক যোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে তাহা এতদপেক্ষা বেশী কিছু করে নাই—বৃহৎ মহাকাব্যসকলের অতিরঞ্জনের প্রথম কাল হইতে বর্তমানের রোমান্স বা রমন্যাস ও উপন্যাসের বা বস্তুতান্ত্রিক শিল্প ও সাহিত্যের প্রচণ্ডতার কাল পর্যন্ত, বাল্মীকি এবং হোমারের উচ্চ যুগ হইতে হিউগো এবং ইবসেনের যুগ পর্যন্ত

শিল্পের অন্য করণীয় তেমন কিছু ছিল না। রীতি বা উপায়ের মূল্য আছে বৈকি, কিন্তু সে মূল্য সৃষ্টবস্তু ও তাহার তাৎপর্য অপেক্ষা ন্যূন, যে শক্তি ও সৌন্দর্য লইয়া সে মানবাত্মার সত্য এবং স্বপ্নরাজি অভিব্যক্ত করে তদপেক্ষা স্বল্প।

ভারতীয় শিল্পী মনুষ্যমূর্তিতে কোন্ স্বভাব বা প্রকৃতি ফুটাইতে চাহিয়াছে সে প্রশ্ন সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে রসসৃষ্টি বিষয়ে তাহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা জানা প্রয়োজন। একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ একটা সাধারণ বিধিবিধান এবং মাপকাঠি লইয়া সে চলিয়াছে, অবশ্য তাহার ব্যাপকতার মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের স্থান দিয়াছে, স্থলবিশেষ তথা হইতে সুসঙ্গত ব্যতিক্রমও মঞ্জুর করিয়াছে। এইরূপ শিল্পের সহিত মিঃ আর্চারের কোন সহানুভূতি নাই, তাই তিনি এই অর্থপূর্ণ সুন্দর সুরস শিল্পের স্বাভাবিক রূপকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার বৈশিষ্ট্যকে নিন্দা করিতে গিয়া সাংবাদিকের ভাষায় যে সমস্ত শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অলীক ও অযৌক্তিক, কুতর্ক ও ছলনাপূর্ণ, অতিরঞ্জিত এবং কষ্টকল্পিত। বাজপক্ষীর মত মুখ, বোলতার মত ক্ষীণ কটি, সরু সরু পদযুগল এবং বদমেজাজী ও বিকৃত নানা ব্যঙ্গচিত্রের পুনরাবৃত্তি ছাড়া ইহার মধ্যে অন্য বস্তুও আছে। মিঃ হ্যাভেল বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পিগণের মানব-শরীর-সংস্থান-বিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তবে তাঁহারা তাঁহাদের নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাদের শিল্পে তাহার ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন; কিন্তু মিঃ আর্চার মিঃ হ্যাভেলের এই উক্তিতে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এরূপ ব্যতিক্রমে কিছু যায় আসে না, কেননা শিল্প এবং শরীর-সংস্থান-বিদ্যা এক বস্তু নহে, কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পবস্তুকে জড় বা দেহগত তথ্যের অবিকল প্রতিরূপ হইতে হইবে অথবা তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন পাঠের যে পুনরাবৃত্তি হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ভারতীয় শিল্পীরা মাংসপেশী, মস্তক ও হস্তপদাদিশূন্য নরদেহ প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, ইহা বলিলে দুঃখপ্রকাশ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না, কেননা এই সমস্ত দ্রব্যের নিজস্ব কোন মৌলিক শিল্প-মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একটি মাত্র যে কথা প্রয়োজনীয় তাহা হইল এই যে, ভারতীয় শিল্পীর মাত্রা এবং ছন্দের পূর্ণ ধারণা ছিল, এবং তাহাদের অনেক শিল্পধারার মধ্যে তাহা মহৎ এবং বীর্যবান ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যত্র যেমন যবদ্বীপের, গৌড়ের অথবা দক্ষিণ ভারতের ধাতুমূর্তির মধ্যে তাহা দেখা যায় বরং তথায় তাহার সঙ্গে পরিপূর্ণ লালিত্য এবং অনেক সময় গভীরভাবে সুমধুর গীতিকবিতার মত মাধুর্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রস্তরমূর্তিসকলের মধ্যে নরদেহের যে মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্য

ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অতুলনীয়, কিন্তু ভারতীয় শিল্পীরা বাহ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটাইতে চাহে নাই, চাহিয়াছে অন্তরাত্মার সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক মাধুর্যের অভিব্যক্তি এবং এ কার্যে তাহারা সফল হইয়াছে; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাস্কর বাধাদানকারী অনেক স্থূল উপভূষাকে গোপন বা বর্জন করিয়াছে, আর সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাহা করিয়াছে, এবং তৎপরিবর্তে সীমারেখার বিশুদ্ধি এবং মুখাবয়বের সৌকুমার্য রক্ষার দিকে বেশী নজর দিয়াছে। যেখানেই সে চাহিয়াছে এই সীমারেখা, এই বিশুদ্ধি, এই সৌকুমার্য সে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে প্রবলভাবে শক্তি ও মাধুর্যের কমনীয়তা সন্নিবেশিত করিয়াছে, যাহাতে কখনও বা স্থিতিশীল মহিমার কখনও বা অতি বীর্যবান অথচ সংযত গতিবৃত্তির প্রাবল্যের অথবা যাহা তাহার উদ্দেশ্যসাধনে বা তাৎপর্য প্রকাশে সহায়ক তাহাদের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সূক্ষ্ম দিব্যদেহ সৃষ্টিই তাঁহার আদর্শ; কিন্তু যে রুচি এবং কল্পনা এত স্থূল এবং বস্তু-তান্ত্রিক, যে এ আদর্শের সত্য এবং সৌন্দর্য বুঝিতে অক্ষম, তাঁহার কাছে এ আদর্শই মনে হইবে একটা প্রবল বাধা এবং বিরক্তির বস্তু। কিন্তু কোন শিল্পের বিজয় বাহ্য প্রাকৃতিকভাবে অভিভূত বস্তুতান্ত্রিক কোন লোকের সংকীর্ণ পূর্ব-সংস্কার এবং পক্ষপাত দ্বারা সীমিত হইতে পারে না; যদি কোন শিল্প আমাদের মধ্যে যাহা সর্বোত্তম তাহাতে আবেদন পৌঁছিয়া দিতে পারে, যদি তাহা 'সাধুসম্মতং' হয় তবে তাহা বিজয়লাভ করিবে এবং স্থায়ী হইবে; গভীরতম অনুভূতিসম্পন্ন আত্মা এবং অতি সংবেদনশীল চৈত্য কল্পনাকে যাহা তৃপ্ত করে তাহাই প্রগাঢ়তম এবং মহত্তম শিল্প।

শিল্পের প্রত্যেক রীতি বা ধারার নিজস্ব পৃথক আদর্শ, ঐতিহ্য, শিল্প-সম্মত-স্বীকৃত-প্রথা ও বিধিব্যবস্থা আছে, কেননা সৃষ্টিশীল শিল্পী-আত্মার ভাব ও রূপ বহু বৈচিত্র্যময়, যদিও সকলের চরম ভিত্তি এক। চীন এবং জাপানের শিল্পীগণের পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) এবং আন্তর দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপীয় শিল্পীগণের সহিত এক নহে, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট শিল্পের মধ্যে যে সৌন্দর্য এবং বিস্ময় রহিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে মিঃ আর্চার সমগ্র প্রাচ্য শিল্পের উপর একজন টার্নারের অথবা একজন কনষ্টেবলের ছবি বসাইয়া দিতে চাহেন, যেমন আমার নিজেকে যদি বাছিয়া লইতে দেওয়া হইত, তবে চীন অথবা জাপানী শিল্পীগণ যে নিসর্গচিত্র বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বিস্ময়কর রূপান্তরিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, অন্য সকলকে বাদ দিয়া, তাহাই গ্রহণ করিতাম; কিন্তু কে কাহাকে অধিক সমাদর করিবে তাহা ব্যক্তিগত জাতিগত বা মহাদেশগত প্রকৃতি ও রুচির বিষয়। আত্মা যে সত্য এবং সৌন্দর্য অনুভব করিয়াছে তাহার রূপ দেওয়াই হইল সমস্যার মূল কথা। ভারতীয় ভাস্কর্য, ভারতীয় শিল্প সাধারণতঃ নিজস্ব আদর্শ এবং

ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃতিতে ও গুণে এ সমস্ত অদ্বিতীয়। অশোকের পূর্ববর্তী অপূর্ব প্রাচীন যুগে, অশোকের যুগে অথবা শৌর্যবীর্যময় প্রাথমিক অশোকানন্তর যুগে, অথবা পর্বত গুহাভ্যন্তরস্থ ভজনগৃহের অপরূপ শিলামূর্তিতে, অথবা পল্লব যুগে, এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরে অথবা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরিয়া যেখানে সুমহান, সমৃদ্ধ এবং সুকুমার কল্পনার খেলা চলিয়াছিল সেই বঙ্গদেশ, নেপাল বা যবদ্বীপে নির্মিত সুচারু মূর্তিতে, অথবা দক্ষিণ ভারতে ধর্মের ক্ষেত্রে গঠিত সুনিপুণ কমনীয় অসাধারণ ধাতুমূর্তিতে, এইরূপে বহু শতাব্দীর সৃষ্টিশীল যুগসমূহের ভাস্কর্যে মোটের উপর শিল্পনিপুণতার প্রকাশ মহানভাবেই হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সর্বোত্তম শিল্পবস্তুসমূহে তাহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—সে প্রকাশ এক মহাজাতির একটা মহান সংস্কৃতির আত্মা এবং আদর্শের আত্মপ্রকাশ; সে জাতি তাহার গুণে ও মনের গঠনভঙ্গিতে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়, তাহার আধ্যাত্মিকসমৃদ্ধি, দর্শন ও ধর্মপ্রকৃতির গভীরতা, শিল্পে সুরুচি ও রসবোধ, কবিকল্পনায় ঐশ্বর্য ও সমারোহের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এক সময়ে সে জাতি, জীবন, সামাজিক প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দিক হইতেও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীনতর ছিল না। এই ভাস্কর্য অসাধারণ শক্তিশালী হইয়াছিল এবং এই জাতির অন্তরাত্মার তাৎপর্য অতি গভীর এবং মনোমুগ্ধকররূপে প্রস্তর এবং ধাতুর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছিল। যেমন ইতিপূর্বে অন্য অনেক জাতির পক্ষে ঘটিয়াছে এবং অন্য যে সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতি সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে দেখা যাইতেছে তাহাদেরও হয়ত যেমন একদিন পতন হইবে, তেমনি এ জাতি ও সংস্কৃতি প্রাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী মহত্ত্বের পরে সাময়িকভাবে অধঃপতিত হইয়াছে, এ জাতির মানসিক দৃষ্টিশক্তি গতিরুদ্ধ হইয়াছে, অন্য সকল শিল্পের মত এই শিল্পেরও অবসান অথবা অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু যে বস্তু হইতে ইহা জাত হইয়াছিল সেই অন্তরের আধ্যাত্মিক অগ্নি এখনও তাহার মধ্যে জ্বলিতেছে, এবং যে নবজাগরণ আসিতেছে তাহাতে হয়ত এ শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে, এই জাতীয় আধুনিক পাশ্চাত্ত্যসৃষ্টিকে যে গুরুতর সীমার বন্ধনে বাঁধা থাকিতে হইয়াছে তখন তাহা সেরূপভাবে ভারাক্রান্ত হইবে না, কিন্তু প্রাচীন আধ্যাত্মিক প্রেরণার নূতন শক্তি ও আবেগের মহত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সে নবজীবন লাভ করিবে। পুরাতন রূপের দ্বারা সীমিত বা বিজাতীয় মনের মিথ্যা দোষারোপে প্রতিরুদ্ধ না হইয়া এ শিল্প তাহার অতীতে যে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য এবং অন্তরের তাৎপর্য লাভ করিয়াছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হউক; কেননা তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাবাহিকতার মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের সর্বোচ্চ আশা নিহিত রহিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

নবম অধ্যায়

ভারতীয় শিল্প

কালের ধ্বংসের হস্ত হইতে প্রাচীন এবং তৎপরবর্তী যুগের ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার সৃষ্টিসকলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণেই আজ বাঁচিয়া আছে বলিয়া, তাহার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মত, তাহা আমাদের মনে তেমন গভীর রেখাপাত করে না, এমনকি ইহাও বলা হইয়াছে যে, এ শিল্প সতেজভাবে কেবল মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে, এবং অবশেষে অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাহার আর কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। পরে মুঘল এবং মুঘলগণের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু শিল্পীগণের দ্বারা ঘটিয়াছে তাহার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু এ মত বিশেষ বিবেচনা না করিয়া দ্রুত গঠিত করা হইয়াছে, কেননা আরও সতর্কভাবে যত্নের সহিত অন্বেষণ এবং লব্ধ ও অধিগম্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে এ মত টিকে না। পক্ষান্তরে স্পষ্ট বোধ হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি রসসৃষ্টির কার্যে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, বিভিন্ন বর্ণ ও রেখার ব্যবহার গভীরভাবে বুঝিয়াছিল, এবং সজ্ঞানে রসবোধ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য এ শিল্পশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, সমষ্টিগত মানবজীবনে যেমন সকল দেশেই আসিয়া থাকে, তেমনভাবে এখানেও মধ্যে মধ্যে অবনতির যুগও আসিয়াছে, আবার তাহার পরেই তাহার মধ্যে মৌলিকতা এবং জীবনীশক্তি সতেজভাবে পুনরায় নূতনরূপে দেখা দিয়াছে, এতৎসত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার পুষ্টি এবং মহত্ত্বের ইতিহাসে নিজের আত্মপ্রকাশের এই পদ্ধতি অতি অধ্যবসায় সহকারে বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্যবহার করিয়াছে। আর ইহা এখন বিশেষভাবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় মনের পক্ষে যাহা অতি স্বাভাবিক, রস ও সৌন্দর্যানুভূতির তেমন একটা মৌলিক প্রকৃতি এবং বিশিষ্ট ভঙ্গীর একটা নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে, যাহা অজন্তার প্রস্তর-খোদিত নির্জন গুহামধ্যস্থিত শিল্প-সম্পদের শীর্ষস্থানীয় প্রাচীনতম কীর্তির আজিও অবশিষ্টাংশের সহিত শেষের যুগের রাজপুত শিল্পের যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই চিত্রবিদ্যায় ব্যবহৃত উপাদানগুলি, রস ও সৌন্দর্যের

সৃষ্টিশীল আত্মপ্রকাশে অন্য যে সমস্ত বৃহত্তর উপায় আছে, তাহাদের উপাদান অপেক্ষা অনেক সহজে নষ্ট হইয়া যায়, এবং এ প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তি-গুলির মধ্যে কেবল অতি অল্প সংখ্যকমাত্র আজিও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তথাপি এই অল্পসংখ্যক যাহার ক্ষয়িষ্ণু অবশিষ্টাংশ, সেই শিল্পের গভীরতা ও ব্যাপ্তি যে কত বৃহৎ তাহার নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কথিত আছে অজন্তাতে ঊনত্রিশটি গুহা ছিল এবং তাহার প্রায় সকলগুলিরই দেওয়াল এক সময় চিত্রশোভিত ছিল, মাত্র চল্লিশ বৎসর পূর্বেও তাহাদের ষোলটির গায়ে মূল আদিম চিত্রাবলীর কিছুটা বর্তমান ছিল, আর আজ কেবল ছয়টি গুহা এই প্রাচীন শিল্পের মহত্ত্বের সাক্ষীরূপে বর্তমান আছে, যদিও তাহাও দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে আদিম সজীবতা, সৌন্দর্য এবং বর্ণগৌরব অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা এক সময় সমস্ত দেশে, মন্দির এবং বিহারে, সভ্য ও শিক্ষিত লোকের বাসভবনে, রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাসাদে এবং বিলাসগৃহে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমসাময়িক কালের অন্য সকল সজীব সৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে, এবং আমরা কেবল অল্পবিস্তর অজন্তার সমজাতীয় বাঘগুহায় উহার প্রচুর সমারোহপূর্ণ শোভাসম্পদের ক্ষয়শীল অংশগুলি এবং সিজিরিয়ার* পাহাড়ে খোদিত দুইটি গুহাভ্যন্তরে স্ত্রীমূর্তির কয়েকটি মনো-মোহন চিত্র দেখিতে পাই। শিল্পকীর্তির এই যে সমস্ত সৃষ্টি অবশিষ্ট আছে, তাহা ছয় কিম্বা সাত শত বৎসরব্যাপী শিল্পকর্মের নিদর্শন মাত্র রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে ফাঁক রহিয়াছে, এবং খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বের কোন চিত্র এখন আর পাওয়া যায় না, কেবল তাহারও একশত বৎসর পূর্বেকার কিছু দেওয়ালচিত্র আছে, যাহার সংস্কারকার্য আনাড়ির হাতে পড়াতে, একরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার পর সপ্তম শতাব্দীর পরে একটা শূন্যতা আসিয়াছে; যাহা প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় এ শিল্পের চরম অবনতি ঘটিয়াছে অথবা তাহা নষ্ট এবং তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এমন অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ এখন পাওয়া গিয়াছে যাহাতে, একপ্রান্তে এ শিল্পের ঐতিহ্য প্রাচীনকালের দিকে আরও অনেক শতাব্দি পূর্ব পর্যন্ত পেঁৗছে, আবার অন্যদিকে যে সকল ধ্বংসাবশেষ সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ভারতের বাহিরে এবং হিমালয়প্রদেশে যে অন্য এক জাতীয় শিল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে. তাহার ফলে বুঝা যায় খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এ শিল্প সতেজ ছিল, আর ইহাতে পরবর্তী যুগের রাজপুত চিত্র-শিল্পের সঙ্গেও তাহার যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। চিত্রবিদ্যার মধ্য দিয়া ভারতীয় মনের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, দুই

* পরে, ভাবে এবং রীতিতে অজন্তার সমজাতীয় অতি উচ্চদরের আরও অনেকগুলি চিত্র দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে।

সহস্র বৎসরব্যাপী কালে এ শিল্পের সৃষ্টি অল্পবিস্তর সতেজে চলিয়াছে এবং এ বিষয়ে তাহা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমপর্যায়ে স্থান পাইতে পারে।

প্রাচীন চিত্রবিদ্যার যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তাহা বৌদ্ধ শিল্পীগণকৃত, কিন্তু ভারতে এ বিদ্যার উৎপত্তি বুদ্ধেরও পূর্বে হইয়াছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন ভারতে সকলপ্রকার শিল্পকলার প্রচলন ছিল, এবং ক্রমাগত যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জড় হইতেছে তাহাও এই সিদ্ধান্তকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া সমর্থন করিতেছে। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দিতে, তাহারও পূর্বসময়ে জাত ললিতকলার মূল-সূত্রসকল ও সিদ্ধান্তাবলি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, যাহাতে শিল্পের ছয়টি মূল উপাদান বা 'ষড়ঙ্গের' স্বীকৃতি এবং বর্ণনা আছে, সেগুলি চীন দেশের ছয়টি শিল্পবিধানের অল্পবিস্তর অনুরূপ, যাহা তদপেক্ষা প্রায় এক হাজার বৎসর পরে তথায় প্রথম বর্ণিত হইয়াছে; আবার শিল্প সম্বন্ধে একখানি প্রাচীন গ্রন্থে—যে গ্রন্থ বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী সময় নির্দেশ করে—অনেকগুলি সাবধানে সম্পাদিত এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধান ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দেখিতে পাই, সেগুলি পুষ্ট হইয়া পরবর্তী কালে শিল্পসূত্র নামে ললিত-কলার সম্পাদনরীতি এবং পরম্পরাগত বিধানসম্বলিত বিস্তৃত বিজ্ঞানের শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ প্রকৃতির অনেক উল্লেখ দেখিতে পাই, যাহা অসম্ভব হইত যদি শিক্ষিত নর ও নারী এ উভয়ের মধ্যে বহুবিস্তৃত শিল্পচর্চা এবং শিল্পরসে রুচি না থাকিত; এই সমস্ত উল্লেখ এবং ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে প্রাচীনেরা চিত্রের এবং বর্ণসৌন্দর্যের আনন্দে প্রবল সাড়া দিত, তাহাদের মধ্যে শোভাসম্পদের বোধ এবং রসভাবিত আবেগ জাগিত, তাই এ সমস্তের দিকে আবেদন পরবর্তীযুগের কবি কালিদাস এবং ভবভূতির মধ্যে এবং অন্যান্য ক্লাসিক্যাল বা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের মধ্যে যে শুধু রহিয়াছে তাহা নহে, পূর্ববর্তী জনপ্রিয় কবি ভাসের নাটকে এবং আরও প্রাচীনকালের মহাকাব্য এবং বৌদ্ধগণের পবিত্র গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তাহাদের সাক্ষাৎ পাই। এই প্রাচীনতর যুগের কোন শিল্পসৃষ্টির বাস্তব অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকাতে, ইহা বলা কঠিন যে তাহাদের মৌলিক প্রকৃতি কি ছিল, অথবা তাহাদের মূল প্রেরণা কোন অন্তরঙ্গ বিষয় হইতে লাভ হইয়াছিল, তাহারা ধর্মানুগত এবং দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল কিম্বা কোন ঐহিক বিষয় হইতে জাত হইয়াছিল। কতকটা মাত্রাতিরিক্ত জোরের সহিত এই মত স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, রাজসভা হইতে এবং বিশুদ্ধ ঐহিক উদ্দেশ্য ও প্রেরণা লইয়াই এ শিল্প আরম্ভ হইয়াছে, এবং একথা সত্য যে বৌদ্ধশিল্পীগণের অঙ্কিত চিত্রের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা প্রধানতঃ ধর্মের বিষয় বা অন্ততঃপক্ষে জীবনের সেই সমস্ত সাধারণ দৃশ্যাবলি লইয়া অঙ্কিত, বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠান এবং

কিম্বদন্তির সঙ্গে তাহাদের যোগ রহিয়াছে; কিন্তু মহাকাব্য এবং নাটকগুলিতে যে সমস্ত চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদের প্রকৃতি আরও বিশুদ্ধ শিল্পরসাত্মক—তাহারা ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের চিত্র, জীবিত ব্যক্তি বা জড়ের প্রতিরূপ চিত্রণ, রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনের ঘটনা এবং দৃশ্যাবলীর আলেখ্য, অথবা রাজপ্রাসাদ এবং ব্যক্তি বা পৌরগৃহের প্রাচীরচিত্রের শোভা-সম্পদ। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ চিত্রগুলিতেও সমজাতীয় উপাদান দেখা যায়; উদাহরণস্বরূপ সিজিরিয়াতে রাজা কশ্যপের মহিষীদের চিত্রপট, পারস্যদেশীয় দূতের ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি, অথবা বিজয়সিংহের সিংহলে অবতরণের চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা বেশ ধরিয়া লইতে পারি যে, বৌদ্ধ অথবা হিন্দু এ উভয় চিত্রবিদ্যা বরাবর শেষ যুগের রাজপুত শিল্পের মত একই বিষয়সকল আরও বৃহৎভাবে ও আকারে অবলম্বন করিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে আরও পুরাতন প্রকৃতির মহত্ত্ব রহিয়াছে, এবং এ কলারীতি ব্যাপকভাবে দর্শন করিলে বলিতে পারি ইহার মধ্যে ভারতবাসীর সমগ্র ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জীবনের চিত্র ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। ইহাতে একটি যে প্রয়োজনীয় এবং গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক প্রত্যয় উন্মিষিত হইয়া উঠে তাহা হইল এই যে, নিজস্ব মূল প্রকৃতি এবং ঐতিহ্যে ভারতের সকল শিল্পের মধ্যে সর্বদা একটা একত্ব এবং একটা নিরবচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। এইভাবে দেখা যায় যে অজন্তার প্রাচীনতর যুগের শিল্প এবং বৌদ্ধগণের প্রথম যুগের ভাস্কর্য একই জাতীয়; আবার শেষযুগের চিত্রের সঙ্গে যবদ্বীপের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের তদ্রূপ নিকটসম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, রীতিপদ্ধতিতে সকল প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও অজন্তার চিত্রের মধ্যে যে প্রকৃতি এবং ঐতিহ্য সর্বদা প্রধানরূপে রহিয়াছে, তাহা বাঘ ও সিজিরিয়াতেও আছে, খোতানের দেওয়ালচিত্রেও বর্তমান, অনেক পরবর্তী কালে বৌদ্ধগণের হস্তলিখিত পুঁথিতে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত লেখাতেও তাহার সাক্ষাৎ পাই, এবং রূপ ও রীতির পরিবর্তন সত্ত্বেও রাজপুত চিত্রেও আধ্যাত্মিক দিকে তাহা একইভাবে আজিও রক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের মূল উদ্দেশ্য, অন্তরের গতি ও ভঙ্গী, আধ্যাত্মিক রীতি যাহা তাহাকে প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্প হইতে এবং পরে আরও নিকটবর্তী এবং অনেক বেশী স্বজাতীয় এশিয়ার অন্য দেশের শিল্প হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে এই একত্ব এবং ধারাবাহিকতা আমাদিগকে সক্ষম করে।

ধারণা এবং আদর্শের কেন্দ্রগত ভাবে এবং তাহার দৃষ্টির রূপসৃষ্টির শক্তিতে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার প্রকৃতি এবং লক্ষ্য ভারতীয় ভাস্কর্য যে উৎস হইতে তাহার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহার সহিত এক। রূপ এবং বাহ্য আকৃতির কোন গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিজের অন্তরে প্রবেশ করিলে এক গভীর আত্মদৃষ্টি লাভ হয়, তাহাকেই বাহিরে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইতে

ভারতীয় সকল শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে; ইহাতে নিজের গভীরতর আত্মার মধ্যে শিল্পের বিষয় আবিষ্কার করিতে এবং সেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাহার চৈত্য-রূপ বা আত্মরূপ (Soul form) দিতে এবং উপাদানগুলিকে ও স্বাভাবিক আকৃতিকে একটা নূতন ছাঁচে ঢালিতে হয়, যাহাতে যতটা সম্ভব সবল ও বিশুদ্ধ রেখাচিত্রে বা পরিলেখে (Outline) সমগ্র অবিভাজ্য শিল্পবস্তুটির প্রতি অঙ্গের তাৎপর্যের মধ্যাস্থিত একটা ঘনীভূত একত্বের ছন্দে, তাহার সেই অন্তর্দৃষ্টির মধ্যাস্থিত চৈত্য-সত্যের সম্ভবপর বৃহত্তম অভিব্যক্তি হইতে পারে। ভারতীয় চিত্রসম্পদের মধ্য হইতে যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে এই সমস্ত গুণ ও ধর্ম ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য আছে, এবং সমস্ত আভাস ও ইঙ্গিতের বিজয়ী সৌন্দর্যের মধ্য দিয়াই তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার নিজস্ব যে জাতীয় রসবোধ এবং সৌন্দর্যানুভূতি আছে, তাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য, তেমন ভঙ্গীতে প্রকাশের চেষ্টার জন্য শুধু ভারতের অন্য জাতীয় শিল্পের সঙ্গে ইহার ভেদ রহিয়াছে, অন্যান্য শিল্পে যেমন আত্মার স্থিতিশীল অবস্থার, তাহার শাশ্বত গুণ ও তত্ত্বসকলের মধ্যে প্রাণকে সমাহিত ও সংযত রাখা হইয়াছে, চিত্রশিল্পে ঠিক তেমন করা হয় নাই, আমরা যাহাদিগকে আত্মার স্থিতিশীল শাশ্বত বস্তু বলি তাহা অপেক্ষা যাহাকে তাহার নানা ভাবের গতিশীলতা বলা যায় তাহাতে, আন্তর চৈত্য জীবন এবং প্রাণময় সত্তার মাধুর্য এবং গতিবৃত্তিরাজির মধ্যে, আত্মাকে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে আদর করিয়া তাহার মধ্যে বাস করা এ শিল্পের বৈশিষ্ট্য—অবশ্য সকল শিল্পের পক্ষে যাহা অপরিহার্য সেই-রূপ নিয়ম সংযম এখানেও রক্ষা করিতে হয়; ভাস্কর্য এবং চিত্রবিদ্যাকে যে কর্ম করিতে দেওয়া হয়, তাহার মূল পার্থক্য হইতেই এ উভয় শিল্পের পার্থক্য জাত হয়, তাহাদের স্বাভাবিক লক্ষ্য ও প্রসার, দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাহাদের যন্ত্র ও উপাদানের ভিন্ন প্রকারের সম্ভাবনাই এ পার্থক্য তাহাদের উপর আরোপ করে। ভাস্করকে সর্বদা স্থিতিশীল রূপকেই প্রকাশ করিতে হয়; আত্মার কোন ভাব, তাহাকে আয়তন (mass) মাত্রা এবং রেখার মধ্য দিয়া কাটিয়া বাহির করিতে হয়, যাহাতে স্থায়ীভাবে সে ভাবের স্থিতিশীল বিভাব অভিব্যক্ত হইতে পারে, স্থিতিশীল ভাবের এ স্থায়িত্বের ভার সে কতকটা লঘু করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বাদ দিতে বা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে না; তাহার কাছে শাশ্বতবস্তু নিজ আকারের মধ্যে কালকে ধারণ এবং পাথর বা ধাতুর এই অত্যাশ্চর্য নিদর্শনসকলের প্রকৃতির মধ্যে তাহাকে গতিরুদ্ধ করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে চিত্রকর, রঙের লীলার মধ্যে তাহার আত্মাকে ঢালিয়া দেয়, তাহার রূপের মধ্যে একটা তরলতা ও গতিশীলতার ভাব, যে রূপ-রেখা সে ব্যবহার করে তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম মাধুর্যের একটা প্রবাহ আছে, যাহার ফলে

তাহার আত্মপ্রকাশে গতিশীলতা এবং আবেগময়তার অধিক অভিব্যক্তি হয়। যতই সে বর্ণ এবং পরিবর্তনশীল রূপ এবং আত্মার জীবনের আবেগাবলি তাহার চিত্রের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করে, ততই তাহার সৃষ্টি সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, ততই তাহা অন্তরের রসবোধের অধিকারী হইতে থাকে, এবং এই রসবোধ সে, আত্মার গতির সেই আনন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত রাখে, যে আনন্দ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুভূত ইন্দ্রিয়জ হর্ষোল্লাসে উদ্ভাসিত বহুবর্ণাঢ্য জ্যোতির্ময় সুন্দর আকৃতিগুলির মধ্য দিয়া বিকীর্ণ ও অভিব্যক্ত হয়,—আর এই ভাবের অভিব্যক্তি অন্য সকল শিল্প অপেক্ষা চিত্রবিদ্যার দ্বারাই সুন্দরতর রূপে ঘটিতে পারে। অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা চিত্রবিদ্যা স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়রাগাত্মক, চিত্রবিদ্যার পক্ষে ইহার উচ্চতম মহত্ত্বলাভ তখনই সম্ভব হয়, যখন চিত্রকর ইন্দ্রিয়ের দিকের এই আবেদনকে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন করিতে পারে। তাহা করিতে হইলে অতি সুস্পষ্ট বাহ্য সৌন্দর্যকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক আবেগের এমন এক প্রকাশক্ষেত্র করিতে হয়, যাহাতে আত্মা ও ইন্দ্রিয়—এই উভয়ের গভীরতম এবং সুন্দরতম সম্পদের মধ্যে উভয়ে পরস্পরের সহিত সমন্বিত হয়, এবং উভয়ের পরিতৃপ্ত মিলিত ও সুসঙ্গত সুর জীবন এবং বস্তুর আন্তর অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করে। চিত্রকরের শিল্প-রীতিতে তপস্যার উগ্রতা আপেক্ষিকভাবে অল্প, শাশ্বত বস্তুরাজিকে এবং বস্তুরূপে পশ্চাতেস্থিত মৌলিক সত্যসকলকে রূপায়িত করিবার জন্য সংযম তত কঠিন ও কঠোর নহে, কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহার মধ্যে প্রকাশ হয়, অন্তরাত্মার মনোহর সম্পদরাজি অথবা প্রাণের হৃদয়ভরা ব্যঞ্জনাসমূহ, কালের ক্ষণাবলীর মধ্যে শাশ্বতের খেলাতে উচ্ছলিত সৌন্দর্যের অতি প্রচুর আনন্দ; চিত্রকর এই সমস্ত আমাদের জন্য ধরিয়া রাখেন এবং আত্মার জীবনের ক্ষণসমূহ প্রতিফলিত করেন মানুষের বা প্রাণীর বা ঘটনার বা দৃশ্যের বা প্রকৃতির কোন রূপের মধ্যে, আর এমনভাবে তাহা করেন যাহাতে আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টির কাছে এ সমস্তও স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠে। চিদাত্মা যাহা নিজেই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত বা গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, সেই সার্বভৌম আনন্দের গভীর বিশুদ্ধ অর্থকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহারই ধর্ম; চিত্রকরের শিল্প, ইন্দ্রিয়ের অন্বেষণ আত্মার এই অন্বেষণের সহিত এক করিয়া দিয়া পরিদৃশ্যমান উপায়ে ইন্দ্রিয়ের আনন্দলাভের অন্বেষণকে চিৎসত্তার কাছে সমর্থিত করে; এইভাবে রূপের ও রঙের পূর্ণতাকে চক্ষুর কামনার বিষয়রূপে প্রশ্রয়দানক্রিয়া একপ্রকার আধ্যাত্মিক রসবোধযুক্ত আনন্দময় শক্তির মধ্য দিয়া অন্তরসত্তাকে আলোকিত করিবার উপায়ে পরিণত হয়।

ভারতীয় চিত্রকর এক অনুপ্রেরণার যে আলোকের মধ্যে বাস করিয়াছে, তাহাই তাহার শিল্পসাধনার উপর এই মহত্তর লক্ষ্য আরোপ করিয়াছে, প্রেরণার

এই উৎস হইতে তাহার শিল্পরীতি জাত হইয়াছে, এবং অধিকতরভাবে পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা বাহ্যকল্পনার রসাবেগে পরিপ্লুত অন্যসবকে বাদ দিয়া একান্তভাবে এই লক্ষ্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। রূপরেখা এবং বর্ণবিন্যাস লইয়া যাহাকেই কাজ করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধেই তাহার শিল্পের "ষড়ঙ্গ"-এর কথা প্রযোজ্য; তাহারা চিত্রের অপরিহার্য উপাদান, এবং সকল মহৎ শিল্পের এই উপাদান সর্বত্রই এক; এই ষড়ঙ্গ হইল ঃ—চিত্রের এক রূপ হইতে অন্য রূপের পার্থক্য বা "রূপভেদ"; মাত্রা, রেখা এবং আকারের বিন্যাস, পরিকল্পনা, সামঞ্জস্য, পরিপ্রেক্ষিত বা "প্রমাণ"; রূপদ্বারা প্রকাশিত আবেগ ও রসানুভূতি বা "ভাব"; রসভাবিত অন্তরপুরুষের তৃপ্তির জন্য সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের অন্বেষণ বা "লাবণ্য"; রূপের সত্য এবং তাহার ব্যঞ্জনা বা "সাদৃশ্য"; বর্ণ-বিন্যাসের ভঙ্গী, বিভিন্ন বর্ণের মিলন ও তাহাদের সমাবেশ এবং সামঞ্জস্য বা "বর্ণিকাভঙ্গ"। ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক সফল চিত্র-বিদ্যাকে এই ছয়টি অঙ্গে বা মূল উপাদানে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত অঙ্গের প্রত্যেকটি যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়, তাহাই এক চিত্র হইতে অন্য চিত্রের সম্পাদনরীতির লক্ষ্যে এবং ফলে পার্থক্য আনিয়া দেয়, যে অন্তর্দৃষ্টি শিল্পস্রষ্টার হস্তকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার মূল উৎস এবং প্রকৃতি মিলিতভাবে উভয়ে চিত্রের আধ্যাত্মিক মূল্যের তারতম্য ঘটায়; ভারতীয় শিল্পের অনন্য-সাধারণ প্রকৃতি, অজন্তার চিত্রশিল্পের অপরূপ আবেদন, এক অত্যাশ্চর্য আন্তর, আধ্যাত্মিক চৈত্যভঙ্গী হইতে জাত হইয়াছে এবং এই সমস্ত চিত্রে সর্বত্র অনুস্যূত ভারতীয় সংস্কৃতির মনীষাই শিল্পে ভাব ও ধারণার এবং তাহার সম্পাদনরীতিতে এই ভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য আনিয়া দিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভার সর্বগ্রাসী প্রেরণা ও লক্ষ্যের, তাহার রূপান্তরকারী পরিমণ্ডলের, যাহা সূক্ষ্ম এবং আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই মনের সাক্ষাৎ ও সূক্ষ্ম আবেগের হাত ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মত তাহার চিত্রবিদ্যাও এড়াইতে পারে নাই; যাহা অপরের মত শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষিত হয় নাই, পরন্তু মনের অতীত যে আত্মার নিকটে বাহ্যরূপ কেবল একটা স্বচ্ছ আবরণ, অথবা নিজের বৃহত্তর সম্পদের একটা ক্ষুদ্র নিদর্শন মাত্র, সেই আত্মার মনোময় অংশ-গুলির এবং অন্তর্দৃষ্টির সহিত সর্বদা এই চিত্রবিদ্যার একটা যোগ আছে। এই চিত্রের বাহ্য সৌন্দর্য ও বীর্য, অঙ্কনের মাহাত্ম্য, বর্ণবিন্যাসের ঐশ্বর্য এবং রস-মাধুর্য এত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী যে তাহা অস্বীকার করা যায় না; আমাদের অন্তরে ইহার যে আবেদন তাহাতে সাধারণতঃ এমন কিছু আছে, যাহার জন্য ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত এবং সংবেদনশীল মানুষের মনে একটা সাড়া জাগায়; ইহাতে স্বাভাবিক আকারের ব্যতিক্রম ভাস্কর্যের মত ততটা প্রবল ও উগ্র নহে, বাহ্য সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের প্রতি ইহার ঘৃণা বা বিদ্বেষও ভাস্কর্য অপেক্ষা

অনেক কম—এবং এ শিল্পের স্বাভাবিক প্রকৃতিতে তাহাই হওয়া উচিত; এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক সহজে পাশ্চাত্য সমালোচকগণের নিকট ইহা কতকদূর পর্যন্ত প্রশংসা পাইয়াছে, এমনকি যখন ইহার গুণ সাগ্রহে গৃহীত হয় নাই, তখন ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি মৃদুভাবে তোলা হইয়াছে। ভাস্কর্যের মত একেবারে পূর্ণরূপে বুঝা যায় নাই ইহা বলা হয় নাই, অথবা ভুল এবং বিদ্বেষ তেমন তীব্র আকার ধারণ করে নাই; তথাপি আমরা সেই সঙ্গেই দেখিতে পাই যে এমন একটু কিছু আছে যাহার মূল্য তাহারা ধরিতে পারে নাই, অথবা অতি অপূর্ণভাবে শুধু ধরিতে সমর্থ হইয়াছে, আর এই কিছুই হইল সেই গভীরতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, ভাব বা প্রেরণা; চক্ষু এবং রসবোধ অবিলম্বে যাহা ধরে তাহা সেই গভীর বস্তুতে পৌঁছিবার মধ্যস্থ বা মধ্যবর্তী বিষয় মাত্র। ইহা হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় চিত্রের মধ্যে যে সমস্তগুলি পরিদৃশ্যমানভাবে শক্তিশালী নয়, যেন অনেকটা শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই কেন সমালোচকেরা এই মন্তব্য করেন যে, তাহাদের মধ্যে প্রেরণা এবং কল্পনার ন্যূনতা আছে অথবা সেগুলি গতানুগতিক শিল্পমাত্র; যখন জোর করিয়া নিজেকে আরোপ না করে, তখন ইহাদের খাঁটি প্রকৃতি তাহারা দেখিতে পায় না, এমনকি যেখানে প্রকাশের মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা এত বৃহৎ এবং প্রত্যক্ষ যে তাহাকে অস্বীকার করা যায় না, সেখানেও খাঁটি প্রকৃতি তাহারা পূর্ণভাবে ধরিতে পারে না। ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মত ভারতীয় চিত্রশিল্পও স্থূল এবং আন্তর রূপের মধ্য দিয়া অন্য এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কাছে তাহার আবেদন উপস্থিত করে, যে দৃষ্টি হইতে শিল্পী তাহার কার্য আরম্ভ করিয়াছে, এবং যতদিন আমাদের মধ্যে রসবোধের মত সমপরিমাণে সে দৃষ্টি জাগ্রত না হয়, ততদিন এ শিল্পের অর্থের সমগ্র গভীরতা অনুধাবন করিবার শক্তি আমাদের লাভ হয় না।

একনিষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য শিল্পী সজ্ঞানে অতি কঠোরভাবে বাহ্যপ্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপই অঙ্কিত করিতে চাহেন; বাহ্যপ্রকৃতিই তাহার আদর্শ (মডেল), তাহাকেই সর্বদা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে হইবে এবং তাহা হইতে মূলতঃ সরিয়া যাওয়ার প্রবণতা হইতে তাঁহাকে সর্বদাই আত্মরক্ষা করিতে হইবে, সূক্ষ্মতর বস্তু বা প্রকৃতির কাছে তাঁহার প্রথম আনুগত্য স্বীকার করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার প্রবৃত্তিকে তিনি কিছুতেই প্রশ্রয় দিবেন না। এমন কি যখন তাঁহার কল্পনা এরূপ ভাব ও ধারণা লইয়া আসিবে যাহা খাঁটিভাবে অন্য কোন রাজ্যের বস্তু, তখনও সে কল্পনাকে জড় প্রকৃতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, জড় জগতের চাপ সর্বদা তাহার উপর থাকিবে; এ-মতে সূক্ষ্ম বস্তু বা ভাবের দ্রষ্টা, মনোময় রূপের স্রষ্টা, অন্তর শিল্পী, বৃহত্তর চৈত্য রাজ্যের উদারচক্ষু-যাত্রী, ইহাদের প্রত্যেকের আত্মপ্রেরণা, বাহ্য বস্তুর দ্রষ্টার

বিধানের কাছে, জাগতিক জীবন এবং জড় বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে যাহা মূর্ত বা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের সেই বহিঃপ্রবণতার নিকটে, বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। সাধারণতঃ তাঁহার শিল্পপদ্ধতি যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা হইল ভাবময় কল্পনামূলক বস্তুতান্ত্রিকতা, তখন তিনি অন্তর দৃষ্টিতে প্রতিভাত সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা বহিরঙ্গ রূপকেই পূর্ণ করিয়া তুলিবেন। এবং যখন এই নিয়মের বন্ধনের প্রতি তিনি বিরক্ত বা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন, তখন তিনি সীমার বন্ধন একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া মন বা কল্পনার আতিশয্য বা উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে প্রলুব্ধ হন, রূপভেদ বা রূপের যথাযথ পার্থক্যের সার্বভৌম বিধান লঙ্ঘন করেন এবং শুধু কোন মধ্য জগতের নিরঙ্কুশ কল্পনায় যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন কিছু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হন। পাশ্চাত্য চিত্রকর মাত্রা, বিন্যাস এবং পরিপ্রেক্ষিতের এরূপ বিধান আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে বাহ্য প্রকৃতির মিথ্যা প্রত্যয় রক্ষিত হয়, তিনি তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনা প্রকৃতির পরিকল্পনার সঙ্গে বিশ্বস্ত আনুগত্য এবং বশ্যতার সহিত যথাযথভাবে যুক্ত করিয়া তুলিতে চান। তাঁহার কল্পনা প্রকৃতির কল্পনারই ভৃত্য বা ব্যাখ্যাতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার্বভৌম বিধান পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার শিল্পের একত্ব এবং সামঞ্জস্যের গোপন রহস্য নির্ণয় করেন; সৃষ্টিশীল প্রকৃতি বস্তুর যে বাহ্য রূপ দিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবে তাহার মধ্যে বাস করিয়া—তাহার শিল্পীসত্তার অন্তর্মুখী চেতনা সেই জড় প্রকৃতির প্রবণতার মধ্য হইতে, নিজেকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। অন্তরঙ্গভাবে অন্তর্মুখীনতার পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে গিয়া এ শিল্প দূরতম যে স্থানে পৌঁছিয়াছে, সেখানকার শিল্পপদ্ধতির নাম ইম্প্রেসানিজম (impressionism), যাহাতে খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া স্পষ্ট বা সাদাসিধাভাবে চিত্রাঙ্কন করা হয়। কিন্তু তথায়ও শিল্পী কোন কিছুকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্ত নিবন্ধ করেন, তাহার পর সেই আদর্শেরই কোন প্রাথমিক বা মৌলিক ভাবের ছাপ আন্তর বোধের উপর আরোপের চেষ্টা করেন, এবং তাহার মধ্য দিয়া অন্তরলোকের কোন ভাবকে আরও কিছুটা জোরের সহিত ফুটাইয়া তোলেন—কিন্তু প্রাচ্য শিল্পীগণের মত স্বাধীনতরভাবে ভিতরে গিয়া পূর্ণরূপে তথা হইতে বাহিরে ক্রিয়া করেন না। তাঁহার আবেগ এবং শিল্পানুভূতি এই রূপের মধ্যে বিচরণ করে এবং শিল্প-সম্বন্ধীয় এই প্রথার মধ্যে তাহারা সীমাবদ্ধ, তাহারা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বা চৈত্য সত্তাগত আবেগ বা অনুভূতি নহে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন এবং বাহ্য বস্তুর আভাস ও ইঙ্গিত হইতে জাত ভাবকে কল্পনার সাহায্যে ঊর্ধ্বায়িত করিয়া, তাহার সঙ্গে কোন চৈত্য উপাদান অথবা বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ হইতে প্রবর্তিত এবং তাহা দ্বারা শাসিত কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি যোগ করিয়া,

এই আবেগ ও অনুভূতি গঠিত হয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়াশীল ভাব ও কল্পনার শক্তি দ্বারা জাগ্রত এক সৌন্দর্যবোধ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিকট স্বীয় আবেদন জানায়, এই সৌন্দর্যবোধকে বিশোধিত এবং উন্নীত করিয়াই পাশ্চাত্য শিল্পী তাহার মাধুর্য সৃষ্টি করেন এবং শিল্প-কাঠামোর মধ্যে অন্য সৌন্দর্য শুধু ভাব-সাহচর্য দ্বারাই আনীত হয়। যাহার উপর শিল্পী নির্ভর করেন সেই ভাব-সাহচর্য হইতে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা আসে বাহ্য প্রকৃতির সৃষ্টি এবং তাহাদের মানসিক আবেগময় বা রসবিষয়ক তাৎপর্যের অনুরূপতা হইতে; রূপরেখা এবং বর্ণতরঙ্গ লইয়া শিল্পীর কর্মের উদ্দেশ্য এইভাবে লব্ধ দৃষ্টির প্রবাহকে রূপায়িত করা। রসভাবিত মন উপাদানগুলির যতটুকু পরিবর্তন অপরিহার্য মনে করে, শুধু তাহাই করিয়া সর্বদা পরিদৃশ্যমান জগতের নকল করা বা প্রতিরূপ গ্রহণ করাই এ শিল্পের রীতি। এ শিল্পের নিম্নতম স্তরের কার্য শুধু প্রাণ ও বাহ্য প্রকৃতিকে মনের নিকট সুস্পষ্ট এবং সুখবোধ্য করা; আর যে চিৎসত্তা প্রাণ ও প্রকৃতির রূপের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজেকে তাহাদের অনুগত বা প্রতিরূপ করিয়া তুলিয়াছে "প্রবিশ্য যঃ প্রতিরূপো বভূব", তাহার গৌণ সংস্পর্শের মধ্য দিয়া গভীরতর বস্তুর সহিত মনকে একীভূত করিয়া, সেই প্রাণ ও প্রকৃতির মনোময় ব্যাখ্যা দেওয়াই তাহার উচ্চতম স্তরের কার্য, তাহাই তাহার নিয়ামক তত্ত্ব।*

সার্থক অনুভূতির যে মূল্যক্রম আছে তাহার সেই অপর প্রান্ত হইতে ভারতীয় শিল্পীর যাত্রারম্ভ, যাহা প্রাণ ও আত্মার সংযোগ সাধন করে। এ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক এবং চৈত্যিক দৃষ্টি হইতে সমগ্র সৃষ্টিশক্তি আসে, বাহ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাবের উপর জোর দেওয়া এখানে গৌণ ব্যাপার, অন্য সকলকে অভিভূত করিয়া আধ্যাত্মিক এবং চৈত্যিক ছাপকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সর্বদা বাহ্য ভাবকে ইচ্ছাপূর্বক লঘু করিয়া দেখান হয়, যাহা কিছু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করে না অথবা যাহা কিছু এই উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা হইতে মনকে অন্য দিকে সরাইয়া নিতে পারে, তাহা দমিত রাখা হয়। এই চিত্রবিদ্যা প্রাণের মধ্য দিয়া আত্মাকে অভিব্যক্ত করে, কিন্তু প্রাণ চিন্ময় আত্মপ্রকাশের এক নিমিত্ত মাত্র এবং তাহার বাহ্য প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলা ইহার প্রধান বস্তু বা সাক্ষাৎ অভিপ্রায় নহে। প্রাণের প্রতিরূপ অতি সুস্পষ্টভাবে সত্যরূপে এ শিল্প ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু সে প্রাণ বাহ্যপ্রাণ যতটা তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে অন্তরগত চৈত্য প্রাণ। একজন অতি বিখ্যাত সমালোচক একটি প্রসিদ্ধ জাপানী চিত্রে ভারতীয় প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত এই মহীয়ান মূর্তিগুলি দেখিলে প্রাণ ও চরিত্রের যে অনুভূতি জাগিয়া উঠে

* অতি আধুনিক কালে ইউরোপে শিল্পের যে পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার অধিকতর সমুন্নত ধারার অনেক বিষয় সম্বন্ধে এ সমস্ত কথা এখন আর সত্য নহে।

তাহা অজন্তার দেওয়াল-চিত্রকে মনে করাইয়া দেয় এবং এ সমস্ত ভারতীয় প্রকৃতির চিহ্ন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জীবনের এই অনুভূতির প্রকৃতি এবং বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত মূর্তির মূল উৎস ও উদ্দেশ্য, আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এখানে জীবন ও চরিত্রের এই অনুভূতি, ইটালীর কোন চিত্রশিল্পে, মাইকেল এনজেলোর (Michel Angelo) কোন দেওয়াল-চিত্রে, অথবা টিশিয়ান (Titian) বা টিন্‌টরেট্টোর (Tintoretto) অঙ্কিত কোন প্রতিকৃতিতে, যে প্রাণশক্তির সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য পাওয়া বা চরিত্রের যে বীর্য ও সামর্থ্য দেখা যায়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। চিত্রবিদ্যার প্রাথমিক বা আদিকালীন উদ্দেশ্য প্রাণ ও প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট-ভাবে অভিব্যক্ত করা, এবং নিম্নতম স্তরে ইহা অল্পবিস্তর শক্তিশালী ও মৌলিক অথবা গতানুগতিক ধারার বিশ্বস্ত অনুকরণ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু শক্তিশালী শিল্পীর হাতে পড়িলে, ইহা উন্নীত হইয়া জীবনের ইন্দ্রিয়জ আবেদনের গৌরব এবং সৌন্দর্যকে অথবা চরিত্র, আবেগ এবং কর্মের নাটকীয় কোন শক্তি বা মনোরম কোন লক্ষ্যকে অভিব্যক্ত করে। ইউরোপে রস শিল্পের ইহাই সাধারণ রূপ; কিন্তু ইহা কখনও ভারতীয় শিল্পের নিয়ামক লক্ষ্য নহে। এখানেও ইন্দ্রিয়ের নিকট আবেদন আছে, কিন্তু তাহা পরিশুদ্ধ এবং যাহা ভারতীয় শিল্পীর নিকট খাঁটি সৌন্দর্য বা "লাবণ্য" নামে পরিচিত অন্তরাত্মার সেই সমৃদ্ধ চৈত্য-সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বহুর মধ্যে শুধু এক উপাদানে—এবং তাহাও শ্রেষ্ঠ উপাদান নহে—পরিণত করা হয়; নাটকীয় আবেদন বা তদ্দ্বারা হৃদয় মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যকে এখানে নিম্নস্থান দেওয়া হয়, তাহাকে কেবল বিশুদ্ধ গৌণ উপাদান রূপে রাখা হয়, গভীরতর আধ্যাত্মিক এবং চৈত্য অনুভূতি বা "ভাবকে" প্রকাশ করিতে, চরিত্র ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রয়োজন, কেবল ততটুকু ফুটাইয়া তোলা হয়; বাহ্যভাবে সক্রিয় বস্তুর এই সমস্ত অতি প্রাধান্য ও দাবিকে বর্জন করা হয়, কেননা তাহাতে আধ্যাত্মিক আবেগকে বড় বেশী স্থূল করিয়া ফেলা হয়, এবং মন যাহার উপর গুরুত্ব অর্পণ করে সেই সক্রিয় বাহ্য প্রকৃতির চাপের স্থূলতর তীব্রতায় আধ্যাত্মিক আবেগের প্রগাঢ় বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করে। এখানে যে জীবনকে চিত্রিত করা হয় তাহা আত্মার জীবন, প্রাণময় সত্তা বা দেহের জীবন নয়, তাহা কেবল বাহ্য রূপ এবং সহায়ক আভাস ও ইঙ্গিত রূপে উপস্থিত করা হয়। কেননা শিল্পের অপর এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য হইল প্রাণ ও প্রকৃতির রূপরাজির মধ্য দিয়া সত্তার ব্যাখ্যা বা বোধিভাবিত অভিব্যক্তি, এবং ইহা হইতেই ভারতীয় শিল্পপ্রেরণার যাত্রারম্ভ হয়। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি পূর্ব হইতেই যে সমস্ত রূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, এবং রূপ দ্বারা একটা ভাবকে, আত্মার একটা সত্যকে উদ্রিক্ত

করিতে বা টানিয়া বাহির করিয়া আনিতে চেষ্টা করিতে পারে, যে ভাব বা সত্য রূপ হইতে আভাস বা ইঙ্গিত রূপে যাত্রারম্ভ করিয়া নিজের আশ্রয়ের জন্য রূপের কাছেই ফিরিয়া আসে; তখন শুধু বাহ্য চক্ষুর নিকট যাহা প্রতিভাত হয়, সেই রূপকে তদ্বারা বহিঃপ্রকাশিত সত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, আর সে চেষ্টা বাহ্য আকার যে সীমা নির্দেশ করে তাহার মধ্যে থাকিয়াই করা হয়। যাহা সাক্ষাৎভাবে বাহ্য প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবার জন্য সতত উৎসুক সেই পাশ্চাত্য শিল্পের সাধারণ ধারা এইরূপ; এই ব্যবস্থায় অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে অঙ্কনের বস্তুর খাঁটি অনুরূপতা বা সাদৃশ্য রক্ষিত হয় ইহাই তাহার বিশ্বাস; কিন্তু ভারতীয় শিল্পী এ মনোভাবকে বর্জন করে। সে ভিতর হইতে আরম্ভ করে, যে বস্তু সে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করিতে চায়, তাহাকে নিজ আত্মার মধ্যে দর্শন এবং তাহার বোধিজাত এই ভাবকে মূর্ত করিবার জন্য যথোপযুক্ত রূপরেখা, বর্ণ এবং পরিকল্পনা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে, আর, যখন তাহা চিত্রের মধ্যে স্থূলে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহা বাহ্য প্রকৃতির রূপরেখা বর্ণ ও পরিকল্পনার স্মৃতিবহ যথাযথ প্রতিরূপ আর থাকে না, বরং প্রাকৃত মূর্তিকে চৈত্যভাবে বা আন্তর আলেখ্যে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, ইহাই বেশী মনে হয়। বস্তুতঃ যে মূর্তিকে সে চিত্রিত করে তাহা চৈত্যভূমির অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট বস্তুরূপ; এগুলি আত্মমূর্তি (soul figures) বাহ্য জড় বস্তু ইহাদের স্থূল প্রতিরূপ মাত্র, তাই স্থূল রূপের মধ্যে যাহা ঢাকা পড়িয়াছিল ভারতীয় চিত্রে তাহাই বিশুদ্ধভাবে নৈপুণ্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করা হয়। এ শিল্পের ঈপ্সিত রূপরেখা ও বর্ণ আন্তরলোকের নিজস্ব রেখা ও বর্ণ, শিল্পী যাহাদিগকে আবিষ্কার করিবার জন্য ডুব দেন নিজেরই গভীরে।

ইহাই হইল শিল্প শাস্ত্রের সমগ্র নিয়ামক তত্ত্ব, এবং ভারতীয় চিত্রবিদ্যার সর্বাঙ্গে ইহার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা তাহার শিল্প বিধানের ছয়টি অঙ্গেরই ব্যবহার রূপান্তরিত করে। রূপের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য খুব বিশ্বস্ততার সহিতই রক্ষিত হয়, কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, যে জগতে আমরা বাস করি তাহার বাহ্য আকারসকলের খাঁটি প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বাহ্য নৈসর্গিক চেহারার প্রতি অটুটভাবে বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে। যাহা আমাদের চক্ষু কোথায়ও দেখিয়াছে, অথবা যাহা তথায় দেখিতে পাইত—যথা একটা দৃশ্য, কোন কিছুর অভ্যন্তর ভাগ, সজীব প্রাণবন্ত মনুষ্য-মূর্তি—তাহা ঠিকভাবে মনে আনা ও চিত্রিত করা এবং তাহা দ্বারা রসবোধ ও মনের আবেগ জাগান এ শিল্পের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় শিল্পে অসাধারণ উজ্জ্বলতা, স্বাভাবিকতা, এবং বাস্তবতা আছে, কিন্তু ইহার বাস্তবতা জড়ীয় বাস্তবতা হইতে আরও বেশী কিছু, এ বাস্তবতাকে আত্মা তৎক্ষণাৎ নিজ

রাজ্যের বস্তু বলিয়া চিনিয়া লয়, ইহার মধ্যে চৈত্য-সত্যের উজ্জ্বল স্বাভাবিকতা রহিয়াছে, ইহার রূপের প্রতীতি-জননক্ষম প্রকৃতির সম্বন্ধে আত্মাই সাক্ষ্য দিতে পারে, ইহা রূপের মধ্যস্থিত সেই বাহ্য স্বাভাবিকতা নহে, বাহ্য চক্ষু কেবল যাহার সাক্ষ্য দেয়। রূপের সত্য তাহার ঠিক অনুরূপতা বা "সাদৃশ্য" সেখানে আছে, কিন্তু তাহা রূপের মূলগত সত্য, যে বস্তুর সঙ্গে তাহার আত্মার ঐক্য ও সাদৃশ্য, বাহ্য জড়মূর্তির যাহা ভিত্তি, সেই সূক্ষ্ম মূর্তিই ইহাতে অঙ্কিত হয়; যাহাতে বস্তুর নিজ প্রকৃতি বা "স্বভাবের" অভিব্যক্তি আছে, তাহার সেই বিশুদ্ধতর এবং সূক্ষ্মতর মূর্তির প্রতিকৃতির সাক্ষাৎ এ শিল্পে পাওয়া যায়। যে উপায়ে এই ফল দেখা যায়, তাহা ভারতীয় মনের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ এবং বীর্যবান রেখাচিত্রের মধ্যে একটা নির্ভীক ও সুদৃঢ় সনির্বন্ধতা আনিয়া এ কার্য সমাধা করা হয়, এবং যাহা কিছু এই নির্ভীকতা, বীর্য এবং বিশুদ্ধতাতে হস্তক্ষেপ করিতে বা যাহা কিছু রূপরেখার গভীর তাৎপর্যকে অস্পষ্ট বা তরল করিতে চায়, তাহা পূর্ণরূপে দমন বা বর্জন করা হয়। মানুষের মূর্তি অঙ্কন কালে মাংস, মাংসপেশী বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খাঁটি চিত্র আঁকিয়া সীমা-রেখার মধ্যস্থিত অবয়বকে যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিবার ব্যগ্রতাকে যতটা সম্ভব কমাইয়া দেওয়া অথবা উপেক্ষা করা হয়; যে সকল সবল সূক্ষ্ম রূপ-রেখা এবং বিশুদ্ধ আকার মানব রূপের মধ্যে মানবতাকে ফুটাইয়া তোলে কেবল সেইগুলিকেই প্রকট করিয়া তোলা হয়; সেখানে আছে মানুষের সমগ্র স্বরূপ মূর্তি, চক্ষুর নিকট আত্মার এই যে পরিচ্ছদে দিব্য সত্তাই দেখা দিয়াছেন তাহাই পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু দৈহিকতার যে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভার মানুষ বহন করিয়া চলে তাহা নাই। এখানে পুরুষ বা স্ত্রীর আদর্শ চৈত্য আকার এবং দেহ তাহার সকল সৌন্দর্য এবং মাধুর্য লইয়া বর্তমান আছে। রেখাচিত্রের মধ্যগত অংশ অন্য এক ভাবে পূরণ করা হয়; বিশুদ্ধ আয়তন পরিকল্পনা এবং নানাবর্ণে রঞ্জিত দৈহিক তরঙ্গপ্রবাহের যথাযথ বিন্যাস করিয়া—শিল্প-শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে 'ভঙ্গ' বলা হয়—ইহা সাধিত করা হয়; চিত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসকলকে এইভাবে সরল করিবার ফলে চিত্রকর তাঁহার চিত্রের সমগ্র অংশ যাহা দ্বারা ভরিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়া উঠেন, তাহা হইল যাহা তিনি প্রকাশ করিতে চাহেন তাহার সেই একমাত্র আধ্যাত্মিক আবেগ, অনুভূতি ও ব্যঞ্জনার তাৎপর্য, আত্মার যে মূল উপাদান তাহার বোধিতে ফুটিয়াছে, নিজের মধ্যে সজীবভাবে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার অভিব্যক্তি। সব কিছুই এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে তাহা এবং কেবলমাত্র তাহাই প্রকাশ হইতে পারে। প্রায় অলৌকিক, সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণভাবে চৈত্য ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলা ভারতীয় চিত্রশিল্পের একটি সাধারণ এবং সুবিদিত বৈশিষ্ট্য; শিল্পীর

হাতে যে ভাবে চক্ষু এবং মুখের পরম সূক্ষ্ম এই ব্যঞ্জনা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত বা অনুপূরিত হয় তাহা সর্বদা প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে: কিন্তু যেমন আমরা দেখিতে থাকি তখন ক্রমশঃ বুঝিতে পারি দেহের প্রতিটি বিন্যাস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গী, আয়তনের মধ্যস্থ সব কিছুর সম্বন্ধ এবং পরিকল্পনা সেই একই চৈত্য অনুভূতিতে সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সমজাতীয় ব্যঞ্জনা দ্বারা এই মূল ভাব প্রকাশে সাহায্য করে, অথবা তাহার আশ্রয় হইয়া অথবা বৈচিত্র্য বা প্রসারতা বৃদ্ধি করিয়া কিম্বা বৈষম্য দ্বারা স্পষ্টতা সৃষ্টি করিয়া, মূল উদ্দেশ্যের সহায় হয়। জন্তু, গৃহ, বৃক্ষ বা অন্য কোন বস্তুর চিত্রেও অর্থসূচক রূপরেখা অঙ্কনে এবং বিক্ষেপকর বিষয়-সকল দমনে সেই একই বিধান প্রয়োগ করা হয়। সমস্ত শিল্পের ভাব বা প্রেরণা, শিল্প প্রণালী এবং অভিব্যক্তির মধ্যে অনুপ্রেরণাজাত একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ বা বর্ণবিন্যাসও আধ্যাত্মিক এবং চৈত্য উদ্দেশ্যের উপায় রূপে ব্যবহৃত হয়, যদি আমরা নানাবর্ণচ্ছটামণ্ডিত ক্ষুদ্রায়তন বৌদ্ধ চিত্রের বর্ণের ব্যঞ্জনা এবং তাৎপর্য আলোচনা করি তবে এ বিষয় বেশ ভালভাবে বুঝিতে পারিব। ভাবপ্রকাশক পরিলেখের অন্তর্ভাগ এইভাবে বীর্যবন্ত রূপ-রেখা এবং সূক্ষ্ম চৈত্য ব্যঞ্জনা দ্বারা পূর্ণ করিবার ফলেই চিত্রে মহত্ত্ব এবং হৃদয়গ্রাহী মাধুর্যের এরূপ আশ্চর্য মিলন হইয়াছে, যাহার ছাপ আমরা অজন্তার সমগ্র চিত্রাবলির মধ্যে দেখিতে পাই, এবং যাহার ধারা পরবর্তী কালের রাজপুত চিত্র পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, যদিও সেখানে মাধুর্যের মধ্যে প্রাচীনতর কালের মাহাত্ম্য হারাইয়া গিয়াছে, এবং তথায় তাহার স্থান প্রগাঢ় এবং অভি-ব্যঞ্জক রূপরেখার লাবণ্যময় প্রবল এক শক্তি অধিকার করিয়াছে, অথচ সে শক্তির মধ্যে পূর্বকালের নির্ভীকতা এবং নিশ্চয়াত্মকতার অভাব ঘটে নাই। ভারতের খাঁটি স্বদেশজাত সকল চিত্রে এই সাধারণ প্রকৃতি এবং ঐতিহ্যের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের নিন্দা অথবা প্রশংসা করিবার পূর্বে, ইহার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিব তখন প্রধানতঃ এই সমস্ত কথা ভালভাবে বুঝিয়া এবং মনে রাখিয়া ইহার প্রকৃত ভাব-তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সকল দেশের সকল শিল্পে যাহা সাধারণ তাহা লইয়া আলোচনা করা ভাল কথা, কিন্তু যাহা ভারতের বৈশিষ্ট্য সেখানেই তাহার খাঁটি মূল ভাব খুঁজিতে হইবে। এবং সেখানেও শুধু কলাশাস্ত্রসম্মত সম্পাদন রীতি এবং ধর্মানুভূতির আগ্রহ দেখাই যথেষ্ট নহে, যদি আমরা চিত্রকরের সমগ্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজদিগকে এক করিয়া দেখিতে চাই, তবে সম্পাদনরীতি যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ফুটাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে, রূপ, রেখা এবং বর্ণের চৈত্যতাৎপর্য বুঝিতে হইবে, ধর্মের আবেগ যে মহত্তর বস্তুর ফল তাহা

অনুভব করিতে হইবে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। গভীরতা, সৌকুমার্য এবং মহত্ত্বের বিপুল অভিব্যক্তির দিক দিয়া দেখিলে, যে চিত্র অজন্তার চিত্র-সকলের মধ্যে যেগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের অন্যতম, বুদ্ধের সম্মুখে প্রেমভরা উপাসনায় রত মাতাপুত্রের সেই চিত্রখানির দিকে নিবিষ্টচিত্তে একটু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইব যে, সে চিত্র আমাদের মধ্যে আবেগের যে ব্যাপক ধারণা জাগায় তাহার মধ্যে ভক্তিজাত তীব্র ধর্মানুভূতির ছাপ কেবল একটা অতিবাহ্য সাধারণ স্পর্শমাত্র। যে কারুণ্যামৃত পরিপ্লাবিত প্রশান্ত অনির্বচনীয় সত্তা বুদ্ধের সর্বভূতে করুণা ও মৈত্রীর মধ্য দিয়া নিজেকে বোধগম্য এবং মানুষিভাবাপন্ন করিয়াছে, তাঁহার দিকে প্রেমভরে মানবাত্মার ফিরিবার ভাবই এই চিত্রকে গভীরতর তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে; আত্মার যে বিশেষ মুহূর্ত চিত্রে মূর্ত করিয়া তোলা হইয়াছে তাহার প্রেরণার অর্থ হইল এই যে, সন্তানের বা আগামী জাগরণোন্মুখ আসন্ন নবীন মানবতার মনকে তাঁহার নিকট সমর্পণ, মাতার আত্মা যাঁহার মধ্যে পূর্বেই তাহার আধ্যাত্মিক আনন্দের উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং নিজের চিত্ত অর্পণ করিয়াছে। এই নারীর চক্ষু, ললাট, ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল, মস্তকের ভঙ্গী সমস্তই যাহার মধ্যে অন্তরাত্মার মুক্তির স্মৃতি ও প্রাপ্তির স্বাক্ষর সদা বর্তমান সেইরূপ এক আধ্যাত্মিক আবেগে পরিপূর্ণ; হৃদয়ের স্থির প্রশান্ত অভিজ্ঞতা অনির্বচনীয় প্রেমপূর্ণ এক কোমলতায় ভরা, তাহার মধ্যে এমন পরিচিত গভীরতা আছে যাহা এখনও বিস্ময়ে অভিভূত এবং আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং যাহা অনন্ত তেমন কিছুর আরও আবেদন যেন সর্বদা জানাইতেছে, দেহ এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এই আবেগ ও অনুভূতির গুরুগম্ভীর আয়তন, তাহাদের ভঙ্গীতে সে আবেগ যেন মৌলিকভাবে মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছে; নিজ সন্তানকে অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিতে গিয়া তাহার প্রসারিত হস্তদ্বয় যেন শাশ্বত সত্তাকে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে। ক্ষুদ্রতর মূর্তিটিতেও মানুষের সহিত শাশ্বতের সংস্পর্শে পুনরায় ফুটানো হইয়াছে—কিন্তু সূক্ষ্ম এবং একটু পরিবর্তিত ভাবে; সে পরিবর্তনও বেশ জোরের সহিত কিছু নির্দেশ করিতেছে; কিন্তু শিশুসুলভ আনন্দময় উন্মেষের হাস্যের মধ্যে, যে গভীরতা এখনও লাভ হয় নাই কিন্তু একদিন হইবে তাহার প্রতিশ্রুতি মূর্তিমন্ত হইয়াছে, হস্তদ্বয় তাহা গ্রহণ এবং রক্ষা করিবার জন্য যথাযোগ্যভাবে স্থাপিত হইয়াছে, দেহ তাহার শিথিলতর বক্ররেখায় এবং তরঙ্গে সেই তাৎপর্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। উভয়ে যাহাকে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পূজা এবং ধ্যান করিতেছে তাহার মধ্যে তাহারা উভয়েই আত্মবিস্মৃত হইয়াছে; একে যেন অপরকেও ভুলিয়া গিয়াছে অথবা এককে অন্য মনে করিতেছে এবং তথাপি উৎসর্গকারী হস্তগুলি, তাহাদের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত মাতার অধিকার এবং আধ্যাত্মিক সমর্পণ-

সূচক হাব-ভাব বা অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মাতা পুত্রকে একই কর্ম এবং একই অনুভূতির মধ্যে মিলিত করিতেছে। প্রতি বিন্দুতে দুই মূর্তির মধ্যে একই ছন্দ রহিয়াছে কিন্তু তাহার সঙ্গে সার্থক পার্থক্যের একটা অভিব্যক্তিও আছে। এই চিত্রে কোথাও কিছু সংযত করিয়া, কিছু বা দমিত বা রোধ করিয়া, কিছু কেন্দ্রীভূত করিয়া মহত্ত্ব এবং শক্তির যে সরলতা, অভিব্যক্তির যে পূর্ণতা লাভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভারতীয় শিল্পের প্রথম শ্রেণীর পূর্ণ সম্পাদনপ্রণালীর পরিচয় প্রদান করে। আর এই পূর্ণতা দ্বারা বৌদ্ধ শিল্প কেবল যে ধর্মকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, তাহার ভাবনা এবং ধর্মানুভূতি, তাহার ইতিহাস ও উপাখ্যান বা পুরাকাহিনীকে অভিব্যক্ত করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভারতের আত্মার কাছে বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বোধকে অতিসুন্দর রূপে উদ্ঘাটিত, ব্যাখ্যাত এবং তাহার গভীরতর অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

একথা বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সর্বদা প্রধানত এইরূপ গভীরতর উদ্দেশ্য বা প্রেরণা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে—পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় শিল্পে জীবনের যে উদ্দেশ্য বা প্রেরণা ফুটাইতে চাহে তাহার পার্থক্য ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। ইউরোপের কোন বড় চিত্রশিল্পী কোন ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার চরিত্র, তাহার সক্রিয় গুণাবলি, তাহার প্রশাসক শক্তি এবং আবেগ, তাহার প্রধান অনুভূতি এবং মেজাজ, এক কথায় সক্রিয় মন-প্রাণময় ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া তাহার আত্মাকে অতি প্রবলভাবে অভিব্যক্ত করিবেন; একজন ভারতীয় শিল্পী সে ব্যক্তির বহির্মুখী সক্রিয় নিদর্শনগুলির সুর নামাইয়া বা পরিমিত করিয়া তাহাদের ততটুকুই প্রকাশ করেন যাহাতে সূক্ষ্ম আত্মার আরও মর্মমূলে অবস্থিত অধিকতর ধ্রুব বা স্থিতিশীল ও নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছুকে, ব্যক্তিত্ব যাহার আবরক ও একই সঙ্গে নির্দেশক তেমন কিছুকে বাহিরে আনিতে ও সুসমঞ্জসভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারেন। উচ্চতম ধরনের ভারতীয় ব্যক্তিচিত্রে আত্মার এমন এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষাৎ মিলে, যেখানে অন্তরাত্মার অতি সূক্ষ্ম কোন গুণ বিশুদ্ধ এবং স্থায়ীভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। অধিকতর সর্বজনীনভাবে চরিত্রের যে অনুভূতি অজন্তার চিত্রাবলির এক বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই একই জাতীয়। ভারতীয় কোন চিত্রে কোন বিশেষ ঘটনার অনুভূতিকে—যেমন ধরা যাউক কোন সার্থক ঘটনায় কেন্দ্রীভূত ধর্মানুভূতিকে—রূপ দিতে হইলে, চিত্রমধ্যস্থ প্রত্যেক মূর্তিকে এমন একভাবে একটু বিশেষত্ব দিতে হইবে যাহাতে ব্যাপক-ভাবে প্রত্যেকের মধ্য দিয়া, প্রত্যেক আত্মার মূল আদর্শ দ্বারা পরিবর্তিত আধ্যাত্মিক আবেগের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হইবে, মনে হইবে যেন মূর্তিগুলি একই সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ; চমকপ্রদ সকল জটিলতা প্রকাশের আগ্রহকে

বর্জন করা হইবে এবং প্রত্যেক মূর্তির ব্যষ্টি-অনুভবের বৈশিষ্ট্যের উপর কেবল ততটুকু জোর দেওয়া হইবে, যাহাতে মূল আবেগের একত্বকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রত্যেকের ভিতর তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আনা যায়। এই সমস্ত চিত্রে এমনভাবে জীবনের উজ্জ্বলতা ও সজীবতা অঙ্কিত করিতে হইবে যাহাতে ইহারা যাহার পটভূমিকা সেই গভীরতর উদ্দেশ্য যেন ম্লান হইয়া না যায়; এ কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যখন আমরা পরবর্তী যুগের শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করি, যে শিল্পে পূর্ববর্তী যুগের উচ্চ শ্রেণীর ক্লাসিক চিত্রোপযোগী মহত্ত্ব নাই, যে শিল্প সে যুগের গাম্ভীর্য এবং উচ্চতা তত বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারে নাই; পরন্তু প্রীতিমধুর খন্ড-কাব্যোপযোগী আবেগ, জীবনের ক্ষুদ্র গতির উজ্জ্বলতা, সাধারণ লোকের আরও বেশী স্বাভাবিক অনুভূতিসকলকে রূপ দিবার দিকে যাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে প্রেরণা, ভাবনা এবং অনুভূতির নিশ্চিত শক্তি ও সৃষ্টিশীল কল্পনার মৌলিকতা বুঝি পরবর্তী কালের এ শিল্পে নাই; কিন্তু অজন্তার শিল্প হইতে ইহার প্রকৃত পার্থক্য এই যে, অন্তরতম প্রেরণা ও জীবনের গতিবৃত্তির মধ্যস্থিত চৈত্য-সংক্রমণ তেমন স্পষ্ট বা তেমন শক্তিশালীভাবে প্রকটিত হয় নাই; চৈত্য ভাবনা ও অনুভূতি তথায় আছে কিন্তু তাহা বাহ্য গতিবৃত্তিতে অধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আত্মাতে ততটা রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি আত্মার প্রেরণা কেবল যে আছে তাহা নহে, তাহাই প্রকৃত পরিমন্ডল সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমরা যদি তাহা না দেখিতে পাই তবে চিত্রের প্রকৃত তাৎপর্যও দেখিতে পাইব না। যেখানে ধর্ম হইতে প্রেরণা আসিয়াছে সেখানে অধিকতর স্পষ্ট হইলেও ঐহিক বিষয়েও যে ইহা নাই তাহা নহে। এখানেও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অথবা চৈত্য ভাবের ব্যঞ্জনাই চিত্রের প্রধান বস্তু। অজন্তা চিত্রের তাহাই একমাত্র মর্ম ও অভিপ্রায় এবং তাহা আদৌ যদি দৃষ্টিপথবর্তী না হয়, তাহা হইলে চিত্রের ব্যাখ্যা বা মূল্যাবধারণে গুরুতর ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে। এইজন্য একজন অতি সুযোগ্য এবং প্রবল সহানুভূতিসম্পন্ন সমালোচক বুদ্ধের মহানিষ্ক্রমণের চিত্র দেখিয়া সত্যই বলিয়াছেন যে, দুঃখ এবং করুণার গভীর অনুভূতির অত্যুত্তম অভিব্যক্তি এ চিত্রকে মহান করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তারপর পাশ্চাত্য কল্পনা এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে যাহা অঙ্কিত করিত তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আরও বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে গৃহত্যাগের বিষাদজনক সংকল্পের গুরুভার এবং সুখময়-জীবন-সন্ন্যাসের তিক্ততার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুখের আকুতি মিশিয়া রহিয়াছে, কিন্তু এখানে ভারতীয় মনের যে প্রকৃতির জন্য তাহা ক্ষণিক হইতে নিত্য বস্তুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় তাহা তিনি একেবারেই ধরিতে পারেন নাই, ভারতীয় শিল্পপ্রেরণাকে ভুল বুঝিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক আবেগের স্থানে

এক প্রাণময় আবেগ দেখিতে পাইয়াছেন। এখানে বুদ্ধের চক্ষু এবং ওষ্ঠে যাহা ঘনীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখ নহে, সমস্ত জগতের দুঃখভার, তাহা আত্ম-মমতা নহে, সমস্ত জগতের উপর বর্ষিত মহাকরুণা, গৃহসুখময় জীবনের জন্য অনুশোচনা নহে, তাহা মানুষের সুখের অবাস্তবতার ক্লেশদায়ক অনুভূতি, আর সেখানে যে আকৃতি রহিয়াছে তাহা অবশ্যই ভবিষ্যৎ জাগতিক সুখ চাহে না, চাহে তাহা হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তি; মুক্তি পাইতে উৎসুক বেদনাপূর্ণ এই অনুসন্ধান যাহা তাঁহার অন্তরাত্মা পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছে এমন কিছুকেই চাহিতেছে; এবং এইজন্য যে বিশাল শান্তি এবং সংযম নির্বাণের প্রকৃত আনন্দের মধ্যে দুঃখকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাও চিত্রে ফুটিয়াছে। একদিকে মনোময় প্রাণধর্মী এবং দেহগত ভাবের উপর জোর দেওয়া পাশ্চাত্য শিল্প, অন্যদিকে যাহা তেমন জোরের সহিত সুস্পষ্টভাবে ধরা যায় না সেই ভারতীয় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শিল্প ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে দুই ভিন্ন জাতীয় কল্পনা রহিয়াছে তাহাদের সমগ্র পার্থক্য এখানে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের স্বদেশজাত শিল্পের চিরন্তন প্রকৃতি এবং ঐতিহ্য এইরূপ বটে, কিন্তু মুঘল চিত্রকে স্বদেশী বলা যায় কিনা, এ ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, বরং তাহা পারস্য দেশ হইতে আমদানি বিদেশী বস্তু কিনা এইরূপ সন্দেহ তোলা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত প্রাচ্য দেশের শিল্প এই বিষয়ে সমজাতীয় যে, তাহাদের মধ্যে চৈত্য ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্য দৃষ্টির উপর তাহার সূক্ষ্মতর বিধানের আরোপ করিয়াছে, চৈত্য ভাব-ব্যঞ্জক রূপরেখা এবং তাৎপর্য তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাই শোভাসাধক নৈপুণ্যের এবং উচ্চতর শিল্পের প্রধান প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পারস্যের চৈত্যভাব মধ্যজগৎসকলের যাদুবিদ্যায় ভরপুর এবং ভারতের চৈত্য-ভাব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসঞ্চারের একটি উপায় মাত্র। স্পষ্টতঃ ভারতীয়-পারসিক (Indo-Persian) শিল্পরীতি পূর্বোক্ত জাতীয় এবং খাঁটি ভারতজাত বস্তু নহে। তথাপি মুঘল শিল্পকে একেবারে বিদেশী বস্তু বলিতে পারি না, বরং তাহাতে দুই জাতীয় মননশক্তির মিলন ঘটিয়াছে; একদিকে তাহার মধ্যে স্থূলতত্ত্বের দিকে একপ্রকার ঝোঁক আছে কিন্তু তাহা পাশ্চাত্য দেশের মত বাহ্য প্রকৃতির অনুকরণ নহে, তাহার মধ্যে ঐহিক ভাবের একটা প্রকৃতি আছে এবং এমন কতকগুলি প্রধান উপাদান আছে যাহার কাজ চিত্রের অর্থপ্রকটন করা অপেক্ষা তাহাকে শোভামণ্ডিত করা; কিন্তু তথাপি কেন্দ্রগত মূল বস্তুতে রূপান্তরকারী সংস্পর্শের একটা আধিপত্য আছে, যাহা প্রমাণ করে স্থাপত্যের মত ভারতীয় মন আর এক ক্ষেত্রে আক্রমণকারী মননকে অধিকার করিয়াছে এবং তাহাকে অধিকতরভাবে বাহিরের দিকে গতিশীল আত্মপ্রকাশের সহায়

করিয়াছে; এবং প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ অবনতির কাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের যে ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গে সহকারী হিসাবে একটা নূতন সুর সংযোজন করিয়াছে। সেই অবনতির সময়ে চিত্রবিদ্যা সকলের শেষে চরম অধঃপাতে পৌঁছিয়াছে কিন্তু তাহাই আবার প্রথমে জাগিয়াছে এবং নূতন এক সৃষ্টিশীল যুগের নূতন ঊষার প্রদীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ভারতের শোভাসম্পদ-বর্ধনকারী ও কারিগরী শিল্প সম্বন্ধে বাক্-বিস্তারের প্রয়োজন নাই, কেননা তাহাদের শ্রেষ্ঠতা নির্বিবাদেই সর্বদা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা সার্বভৌম রূপে যে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয় তাহা জাতীয় সংস্কৃতির মূল্য এবং গভীরতা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রধানতম প্রমাণ হইতে পারে, তাহাদের অন্যতম। এই বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে কাহারও সহিত তুলনায় ভীত হইবার কোন প্রয়োজন নাই; যদি তাহা জাপানের মত তেমন প্রবলভাবে শিল্পকুশলতা লাভ না করিয়া থাকে তবে তাহার কারণ এই যে, এ সভ্যতা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে অন্য সবকিছুকে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিণতির উপায় এবং তাহার অভীষ্ট সাধনে সহায়ক করিয়া তুলিয়াছে। তিনটি প্রধান শিল্পে এবং মননের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়া এ সভ্যতা প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিক আবেগ যে অন্য সকল প্রকার ক্রিয়াশীলতা রুদ্ধ নিষ্ফল বা ব্যর্থ করিয়া দেয়, সদর্পে ঘোষিত এ মত ভ্রান্ত, বরং তাহা সমগ্র মানবতার বহুমুখী উন্নতি ও পরিণতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বীর্যবন্ত একটি শক্তি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য

কোন জাতির রস ও সৌন্দর্য বোধ এবং ক্রিয়াশীল মনঃশক্তির মধ্যে আত্মার যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা এক বিশেষ ভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় সেই সমস্ত শিল্প, যেগুলি চক্ষুর ভিতর দিয়া অন্তরাত্মার নিকট আবেদন জানায়; কিন্তু তাহার অতি সাবলীল এবং বহুমুখী প্রকাশ দেখিতে হইলে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদিগকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; কেননা উপমাদি সুস্পষ্ট অলঙ্কার এবং বহুভাবে ব্যঞ্জনার সকল শক্তি লইয়া শব্দই, অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির অতি বহুল অর্থ ও ভাবরাজিকে তাহাদের সূক্ষ্মতম ভেদ, বৈচিত্র্য এবং ভঙ্গী সহ বিশদভাবে ও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করিতে পারে। কোন সাহিত্যের মহত্ত্ব নির্ণীত হয় প্রথমতঃ তন্মধ্যস্থ উপাদানের মহত্ত্ব এবং মূল্য দ্বারা, তাহার ভাব ও ভাবনার মূল্য বা উপযোগিতা এবং রূপ বা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দ্বারা, তাহা ছাড়া উচ্চতম প্রতিভাসম্পন্ন বা অতিসংবেদনশীল কোন প্রতিনিধির মধ্য দিয়া বাক্যশিল্পের উচ্চতম বিধান পরিতৃপ্ত করিয়া, কোন জাতি কোন যুগ বা কোন সংস্কৃতির অন্তরাত্মা ও জীবন যাপন প্রণালী ও মনের আদর্শের আবিষ্কার এবং সমুন্নতিসাধন যে পরিমাণে সম্ভব হয়, তাহা দ্বারাও তাহার সাহিত্যের মহত্ত্ব নিরূপিত হয়। এই উভয় দিক হইতে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার মধ্য দিয়া ভারতীয় মনের যে মহৎ অবদান আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে তাহার মহত্ত্বকে অস্বীকার বা তাহার গৌরব হানি করা যায় না—এমন কি যে ব্যক্তি এ সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং জীবনের উপর প্রভাব লইয়া কলহ করিতে অতি উৎসুক, তাহার পক্ষেও ইহা করা সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন এবং অতি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিরাজি তাহাদের উৎকর্ষের মাত্রার গুণে বা পরিমাণে, তাহাদের শ্রেষ্ঠতার প্রাচুর্যে, তাহাদের বীর্যবান মৌলিকতা, শক্তি এবং সৌন্দর্যে, তাহাদের ভাবময় উপাদান, প্রকাশ-নিপুণতা এবং গঠন-কৌশলে, তাহাদের বাক্যের মহত্ত্বে, যুক্তিযুক্ততা ও মাধুর্যে, তাহাদের প্রকৃতি বা আত্মভাবের পরম উচ্চতা এবং বিশাল বিস্তারে, অতি স্পষ্টভাবে

জগতের প্রধান এবং মহৎ সাহিত্যসকলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিচার করিবার যথার্থ অধিকারী তাঁহারা এক বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব মন আত্মপ্রকাশের জন্য যত সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছে, এ ভাষা তাহাদের মধ্যে অতি সমৃদ্ধ, অতি চমৎকার ও সর্বাঙ্গীন ভাবে পূর্ণ এবং ভাব প্রকাশের পক্ষে আশ্চর্য ভাবে উপযোগী ও প্রচুর; ইহা এক সঙ্গে জমকাল ও মহিমান্বিত, মধুর ও সাবলীল বা নমনীয়, শক্তিশালী ও স্পষ্টভাবে গঠিত, পূর্ণ ও শ্রুতিমধুর এবং সূক্ষ্ম, যে জাতির মননধারা ইহা প্রকাশ করিয়াছে এবং যে জাতির সংস্কৃতি ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহার গুণ ও প্রকৃতিই সেই জাতির গুণ ও প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রচুর সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাকে কবি ও মনীষীগণ যে মহৎ ও বৃহৎ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ইহার সমৃদ্ধ সামর্থ্যের অনুরূপই হইয়াছে। যদিও এই সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় মনের প্রধানতম গঠনক্ষম এবং মহত্তম সৃষ্টিসকলের প্রধান অংশ বিবৃত করা হইয়াছে, তথাপি কেবল যে এই ভাষায়ই তাহার উচ্চ সুন্দর এবং পূর্ণবস্তুরাজি রূপায়িত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ণভাবে মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে ইহার সঙ্গে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং সংস্কৃত ভাষা-মূলক ও দ্রাবিড়ীয় ভাষাসকলের মধ্যে প্রায় দ্বাদশটি ভাষায় লিখিত কাব্য সাহিত্যের—যাহাদের মধ্যে কোনটি অতি বিপুল কোনটি বা স্বল্পতর পরিমাণে সমৃদ্ধ—হিসাব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র ভাবে দেখিলে যেন একটা মহাদেশের সাহিত্য এখানে পাওয়া যায়, এবং বাস্তবিক স্থায়ী বস্তুরাজির কথা ধরিলে প্রাচীন মধ্য এবং বর্তমান যুগের ইউরোপের সমগ্র সাহিত্য অপেক্ষা পরিমাণে তাহা বড় বেশী কম হইবে না; শ্রেষ্ঠতম বিষয়ের কথা বিবেচনা করিলে ইউরোপের সকল যুগকে একত্র করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহার সমান হইবে। যে জাতি এবং যে সভ্যতা, তাহার বৃহৎ সাহিত্যসৃষ্টি এবং মনীষীগণের নামের মধ্যে বেদ ও উপনিষদসমূহ, মহাভারত ও রামায়ণের সুবিশাল রচনাবলী, কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি এবং জয়দেব, ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর নাটক কাব্য এবং রমন্যাসের অন্যান্য সমৃদ্ধ সৃষ্টি, ধম্মপদ ও জাতকসকল, পঞ্চতন্ত্র, তুলসীদাস ও বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, রামদাস ও তুকারাম, তিরু ভেল্লুয়ার ও কাম্‌বান, নানক ও কবীর, মীরাবাই এবং দক্ষিণ দেশের শৈব সাধু ও আলোয়ারগণের সঙ্গীতমালা—এখানে ইহাদের কেবল প্রসিদ্ধতম লেখক এবং বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সাহিত্যের কথা কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল, যদিও এ সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অন্য সব লেখা অতি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে—এই সমস্তকে গণনা করিতে পারে, তাহারা জগতের মহত্তম সভ্যতা এবং অতি পরিণত সৃষ্টিশীল জাতিসকলের মধ্যে অতি নিশ্চিত রূপেই গণ্য হইতে পারে। এত মহৎমননশক্তি, এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম উৎকর্ষের

মাত্রা তিন হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়া আজও নিঃশেষিত হয় নাই, জগতে আর কোথায়ও এরূপ দেখা যায় নাই এবং এ সংস্কৃতিতে অনন্যসাধারণ ও গভীর প্রাণশক্তিবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম অনেক কিছু যে রহিয়াছে, ইহা তাহার সর্বোত্তম এবং অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য দিতেছে।

গুণ ও উৎকর্ষে যাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই সেই ভারতীয় সাহিত্যের এই বিবরণ, তাহার অন্তরাত্মা এবং সৃষ্টিশীল মনন শক্তির এই আত্মপ্রকাশক সমৃদ্ধি ও সমারোহ, যদি কোন সমালোচক অস্বীকার বা খর্ব করে তবে সে অন্ধ বিদ্বেষ বা অদম্য পক্ষপাতিত্ব দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, আর তেমন সমালোচনা খণ্ডনের জন্যও আলোচিত হইবার যোগ্য নহে। আমাদের এই শয়তানের উকিল যে সমস্ত আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিতে গেলে সময় ও শক্তির বৃথা অপব্যয় হইবে; কেননা সাহিত্যের যাহা প্রাণভূত, বস্তুতঃ তেমন কোন বিষয়ে আপত্তি তিনি তুলেন নাই, তাঁহার আলোচনার মধ্যে খুঁটিনাটি এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকেই সাধারণত কেবল বিকৃত ভাবে দেখান ও নিন্দা করা হইয়াছে এবং বহু চেষ্টা করিয়া অতিরঞ্জিতভাবে অমূলক দোষারোপ করা হইয়াছে; এক দিকে ভারতীয় আদর্শবাদী মন এবং প্রচুর কল্পনাশক্তি, অন্য দিকে বাহ্য বিষয়ের পর্যবেক্ষণে অধিকতর ভাবে রত ইউরোপীয় মন, এবং সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে ভারতাপেক্ষা অল্প পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত কল্পনা, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, এই সমস্ত খুঁটিনাটি ও বৈশিষ্ট্য বড় জোর তাহাই প্রদর্শিত করে। সমালোচনার এই ভাব ও ভাষা ঠিক অনুরূপ ব্যাপার হইবে, যদি কোন ভারতবাসী ইউরোপীয় সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অপকৃষ্ট ও অকর্মণ্য অনুবাদ শুধু পড়িয়া, বিদ্বেষ বুদ্ধি লইয়া অবজ্ঞা সহকারে যদি তাহার সমালোচনা করে, হোমার রচিত মহাকাব্য ইলিয়াদকে (Iliad) স্থূল অসার অর্ধবর্বর এবং সেকেলে ধরনের কাব্য বলিয়া যদি বর্জন করে, দান্তের (Dante) বিশাল বিসৃষ্টিকে নিষ্ঠুর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং স্তব্ধতাজনক ধর্মের উৎকট কল্পনায়ভরা দুঃস্বপ্ন মনে করিয়া যদি উড়াইয়া দেয়, সেকস্‌পিয়ারকে মদ্যপানাসক্ত এক বর্বর বলিয়া যদি দেখে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা থাকিলেও তাহার সঙ্গে অপস্মার রোগগ্রস্ত এক কল্পনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া, তাহার নাটকাবলীকে যদি উপেক্ষা করে, গ্রীস, স্পেন এবং ইংলন্ডের সমগ্র নাট্যসাহিত্য দুর্নীতি ও বীভৎস ভীতির বিশাল স্তূপ বলিয়া যদি ঘৃণা করে, ফরাসী কবিতাকে জমকাল অথচ কুরুচিপূর্ণ এবং অন্তঃসারশূন্য অলঙ্কার বিভূষিত বাঙ্ময় ব্যায়ামপরম্পরা মাত্র, এবং ফরাসী উপন্যাসকে কলঙ্কিত দুর্নীতিপরায়ণ বস্তু, লাম্পট্য দেবতার বেদীতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এক উৎসর্গ বলিয়া যদি তাহাদের নিন্দা করে, এখানে বা ওখানে কোন গৌণ গুণের সমাবেশ

যদি শুধু দেখে, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের মূল প্রকৃতি বা তাহার রস-ভাবিত গুণাবলী বা তাহার গঠনের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা যদি না করে, এবং তাহার নিজের অযৌক্তিক বিচার পদ্ধতির বশে যদি সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, পৌত্তলিক এবং খ্রীষ্টিয় এই উভয় যুগে ইউরোপের আদর্শসকল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপকৃষ্ট ছিল, তাহার কল্পনা অভ্যস্ত ও বংশগত স্থূলতা রুগ্নতা দারিদ্র্য এবং বিশৃঙ্খলতা দ্বারা অভিভূত এবং প্রপীড়িত ছিল। অযৌক্তিকতার এইরূপ স্তূপ কোন সমালোচনারই উপযুক্ত বস্তু নহে; এখানে মিঃ আর্চারের তেমনি ভাবের হাস্যোদ্দীপক তীব্র গঞ্জনার কোন সমালোচনা করিতে চাহি না; তাহার মধ্যে যাহা অপর সমস্তের মত তত অসঙ্গত বা মূর্খতাপূর্ণ মনে হয় না, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তেমন দুই একটি বিষয় সামান্য একটু মনোযোগ হয়ত আমাদের কাছে দাবী করিতে পারে। কিন্তু যদিও এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর সমালোচনা ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ইউরোপীয়ের খাঁটি মত একেবারেই ব্যক্ত করে না, তথাপি দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় লেখার প্রকৃতি বা রূপ অথবা শিল্পরসের মূল্য নিরূপণের অক্ষমতা অনেক সময় প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ ভারতের সংস্কৃতিগত মনের যে পূর্ণ ও শক্তিশালী আত্মপ্রকাশ ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাহা অনেকে ধরিতে পারে না। এমন কি দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহানুভূতিসম্পন্ন কোন সমালোচক যখন ভারতীয় কবিতার তেজ ও বর্ণবৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি ও সমারোহ স্বীকার করেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন যে এ সমস্ত স্বত্ত্বেও ইহা তৃপ্তিদায়ক নহে; ইহার অর্থ এই, যেখানে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মন চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য অপেক্ষা আরও সহজে মিলিত হইতে পারে সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, মানসিক এবং নিজ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যজাত ভ্রান্তি এতটা প্রসারতা লাভ করিতে পারে; কেননা এই দুই প্রকৃতির মননশীলতার মধ্যে একটা ফাঁক, একটা ভেদ আছে, তাই একের কাছে যাহা আনন্দদায়ক এবং অর্থ ও শক্তিতে ভরপুর, অপরের কাছে তাহাতে কোন সার বস্তু নাই, এবং তাহা কেবল সৌন্দর্য ও বুদ্ধিজাত বাহ্য সুখের একটা রূপ মাত্র প্রতীয়মান হইতে পারে। পরস্পরকে বুঝিবার এই বাধার আংশিক কারণ, একের পক্ষে অপরের সজীব প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশের এবং প্রাণ-স্পর্শের অনুভূতি লাভের অসামর্থ্য; কিন্তু তাহা ছাড়া পরস্পরের অধ্যাত্ম বোধের অনুরূপতার মধ্যে যে ভেদ আছে, যাহা পূর্ণ বিরূপতা এবং বিভিন্নতা অপেক্ষা অধিকতর হতবুদ্ধিকর তাহাও এক আংশিক কারণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশীয় কবিতা পূর্ণরূপে তাহার এক প্রকার নিজস্ব বস্তু এবং যখন পাশ্চাত্য মনন ভিন্ন জাতীয় জগৎ বলিয়া ইহাকে একেবারে বর্জন করে না, তখন তাহার পক্ষে নিরুপদ্রবে এ কবিতা বুঝিবার শক্তি অর্জন করা সহজতর হয়; কেননা সেখানে মনের গ্রহণশীলতা

বিক্ষোভকারী কোন স্মৃতি বা তুলনার জন্য বাধাগ্রস্ত বা স্থগিত হয় না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় কবিতার মত ভারতীয় কবিতা আর্য বা আর্যভাবাপন্ন জাতীয়মনের সৃষ্টি, দৃশ্যতঃ অনুরূপ প্রেরণা লইয়া উভয়ে যাত্রা আরম্ভ করে, মনের একই ভূমিতে বিচরণ এবং সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে; তথাপি ভারতীয় প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এমন কিছু আছে, যাহার ফলে তাহার রসবোধের প্রকৃতি, তাহার কল্পনার প্রকাশ, আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি, ধারণাশীল মন, প্রকাশপদ্ধতি, রূপ এবং গঠনের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট এবং ভেদজনক বৈলক্ষণ্য আসিয়া পড়ে। ইউরোপীয় ধারণা এবং গঠন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তাহার মন, এখানেও সেই এক জাতীয় পরিতৃপ্তি খোঁজে কিন্তু পায় না, যাহার গোপন রহস্যের সঙ্গে সে অপরিচিত এমন একটা হতবুদ্ধিকর প্রভেদ সে বোধ করে, এবং তুলনা করিবার যে প্রবৃত্তি এবং মনে যে বৃথা আশা সূক্ষ্মভাবে তাহাকে অনুসরণ করে, তাহা তেমন পূর্ণভাবে গ্রহণ এবং অন্তরঙ্গভাবে জানিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মূলতঃ পশ্চাতে স্থিত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের প্রকৃতির অপ্রচুর জ্ঞান ও ধারণা, এই সংস্কৃতির ভিন্ন প্রকারের মর্মস্থানে এই আকর্ষণ ও বিরক্তি যুগপৎ উৎপাদন করে। এ বিষয়টি এত বৃহৎ যে অল্প সীমার মধ্যে ইহার যথাযথ আলোচনা চলিতে পারে না; ভারতবাসীর আত্মার ও মনের বিবরণ রূপে যাহা তাহাদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিনিধি হইতে পারে, সৃষ্টিশীল বোধি ও কল্পনামূলক তেমন প্রধান কোন কোন গ্রন্থের বিচার করিয়া শুধু কয়েকটি বিষয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিবার চেষ্টা মাত্র আমি করিব।

এ জাতির সমৃদ্ধ যৌবনে যখন অমেয় আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি কার্যকরী ছিল, যখন সূক্ষ্ম বোধিদৃষ্টি এবং অতিবিস্তৃত সীমার মধ্যে বিচরণশীল গভীর ও স্বচ্ছ বুদ্ধি, নৈতিক ভাবনা, বীরোচিত ক্রিয়া ও সৃষ্টি, তাহার অনন্যসাধারণ সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৌধের পরিকল্পনার অঙ্কন, ভিত্তি স্থাপন এবং স্থায়ী রূপ গঠনের কার্যে ব্যাপৃত ছিল, তখনকার সেই প্রাচীন ভারতীয় মনের পরিচয় আমরা পাই তাহার প্রতিভাজাত চারিটি সৃষ্টির মধ্যে, বেদ, উপনিষদ, এবং রামায়ণ ও মহাভারত নামক দুইখানি মহাকাব্যের মধ্যে; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এরূপ প্রকৃতি, রূপ এবং প্রেরণা রহিয়াছে যাহার অনুরূপ কিছু অন্য কোন সাহিত্যের মধ্যে সহজে মিলে না। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিতে তাহার ধর্ম ও অধ্যাত্মসত্তার পরিদৃশ্যমান ভিত্তি রহিয়াছে, অন্য দুইখানিতে তাহার জীবনের মহত্তম যুগের কথা; যে আদর্শ তাহাকে পরিচালিত করিত এবং মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও বিশ্বশক্তিরাজিকে যে মূর্তিতে সে দেখিত, তাহার বিশাল সৃষ্টিশীল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আমরা দেখিতে পাই। আধ্যাত্মিক বোধিচেতনার দ্বারা লব্ধ ও প্রতিফলিত ধর্মানুভূতি ও মানসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা দৃষ্ট ও গঠিত বেদ এই

সমস্ত বস্তুর প্রথম আদর্শ ও মূর্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে; রূপ, প্রতীক ও প্রতিরূপের মধ্য দিয়া উপনিষদ তাহাদের পরপারে গিয়াছে অথচ তাহাদিগকে একেবারে বর্জন করে নাই, কেননা আনুষঙ্গিক ব্যাপার বা অনুচ্চস্বর রূপে সর্বদা তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে; উপনিষদই অনন্য-সাধারণ একপ্রকার কবিত্বের মধ্য দিয়া আত্মা ও ঈশ্বর, জীব ও জগতের চরম ও অনতিক্রমণীয় সত্যরাজি ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাদের সকল তত্ত্ব ও শক্তিকে একেবারে মূলে গিয়া গভীরতম ও অন্তরতম ভাবে বাস্তব রূপে দেখিয়াছে এবং প্রকাশ করিয়াছে—উচ্চতম রহস্যগুলিকে স্বচ্ছতম ও উজ্জ্বলতম ভাবে অনাবৃত করিয়া অনিবার্য প্রত্যয়ে মন ও বোধিচেতনার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ ভাবে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গিয়া পেঁাছিয়াছে। তাহার পরে প্রাণ ও মনের শক্তি এবং আদর্শ নীতি, রসবোধ, অন্তরাত্মা, আবেগ, ইন্দ্রিয় ও জড় হইতে লব্ধ জ্ঞান, ভাবনা, ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে ও অতি শক্তিশালীরূপে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; মহাকাব্যদ্বয়ে এ সমস্তের প্রাথমিক বিবরণ স্থান পাইয়াছে এবং বাকি সকল সাহিত্যে তাহারই ধারাবাহিকতা চলিয়াছে; কিন্তু আদ্যন্ত একই ভিত্তি রহিয়া গিয়াছে; আর নূতন এবং অনেক সময় বৃহৎ ভাবের যে আদর্শ ও যে সার্থক মূর্তি পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়াছে, অথবা পুরাতনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে যুক্ত বা তাহাকে অল্প বা ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে, তাহারা সকলেই তাহাদের মৌলিক গঠনে এবং প্রকৃতিতে আদি অন্তর্দৃষ্টি ও প্রথম আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিস্তার ও রূপান্তর মাত্র, কখনই সম্বন্ধশূন্য ব্যতিক্রম নহে। চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্যের মত তেমনি সুসমঞ্জস ভাবে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মহান পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতীয় মন ঐকান্তিকতার সহিত তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে।

বেদ বোধিপরিচালিত এবং প্রতীকব্যবহারপটু প্রাচীন মননশীলতার সৃষ্টি, কিন্তু তাহা পরবর্তী যুগের বুদ্ধি দ্বারা সবলে নিয়ন্ত্রিত মনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে; একদিকে তর্কবিচারজাত ভাবনা এবং বস্তুনিরপেক্ষ সাধারণ ধারণা (abstract conception) দ্বারা, অন্যদিকে যাহা দিব্য বা রহস্যময় কোন তাৎপর্য খোঁজে না এমন প্রত্যক্ষে নিবদ্ধ বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ যে ভাবে উপস্থিত করে সেই ভাবে গৃহীত জীবন ও জড়ের তথ্যাবলির দ্বারা এ যুগের মন শাসিত হয়; এই মন সত্যের দ্বার উন্মোচনের চেষ্টা অপেক্ষা বরং রসবোধ ও সৌন্দর্যের রুচি বা খেয়ালের খেলায় ভাসিয়া চলিবার জন্যই কল্পনাকে ব্যবহার করে, কল্পনার ব্যঞ্জনাকে কেবল তখনই বিশ্বাস করে, যখন তাহা তর্কবিচার বা ভৌতিক অনুভূতি দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহার সে অনুভূতি বিচারশীল মননশীলতাপ্রভাবিত বোধিকে শুধু চিনে, এবং প্রায়শঃ অন্য কিছুকে স্বীকার করিতে চায় না। সুতরাং বেদ যে আধুনিক

মনের কাছে অবোধ্য হইয়া পড়িবে ইহা কিছুই আশ্চর্য নয়, এ মন বেদের যাহা বাহ্যতম বহিরাবরণ, সেই ভাষাকে শুধু কিছু বুঝিয়াছে বা তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে, কিন্তু অপ্রচলিত ও স্বল্পউপলব্ধ প্রাচীন রচনারীতির বাধার জন্য তাহাও অতি অপূর্ণভাবে ধরিতে পারিয়াছে; আর তাই ইহাও আশ্চর্য নয় যে এ মন বেদের অতি অপ্রচুর এরূপ এক ব্যাখ্যা উপস্থিত করিবে, যাহাতে মানব-জাতির তরুণ ও সমৃদ্ধ মনের এই বৃহৎ সৃষ্টিকে, তালি দেওয়া অপাঠ্য হিজিবিজি লেখা বা আদিকালের কিম্ভূতকিমাকার কল্পনার মূঢ়তাজাত একটা অসংলগ্ন জগাখিচুড়ীতে পরিণত করিয়াছে, অন্যথায় যাহা সম্পূর্ণরূপে সহজ ও সরল হইতে পারিত তাহাকে হতবুদ্ধিকর করিয়া তুলিয়াছে; এই আধুনিক কল্পনা বেদকে দেখিয়াছে, যাহা কেবল এক বর্বর প্রাণ ও মনের স্থূল ও জড়ীয় বাসনাসকলকে প্রতিফলিত করিতে এবং তাহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইতে পারে, তেমন এক প্রকৃতি-পূজক ধর্মের নীরস একটানা ও অতি সাধারণ বিবরণ রূপে। পরবর্তীকালের ভারতীয় পন্ডিত ও পুরোহিতগণের বিদ্যাভিমান-সূচক ও আনুষ্ঠানিক ভাবধারার কাছে, বেদ পুরাতনী কথা ও যজ্ঞসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপের গ্রন্থ মাত্র হইয়া পড়িয়াছিল; ইউরোপীয় পন্ডিতগণ বেদের কাছে যুক্তিবিচারশীল কৌতূহলের চরিতার্থতা শুধু চাহিয়াছেন, তাই তাঁহারা ইহার মধ্যে ইতিহাস, পুরাতন আখ্যায়িকা এবং আদিম-জাতীয় সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা শুধু খুঁজিতে গিয়া বেদের আরও গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন এবং বেদের পূর্ণরূপে বাহ্যভাবের অনুবাদের উপর জোর দিয়া ইহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও কবিত্বময় মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য হইতে ইহাকে আরও বিচ্যুত করিয়াছেন।

কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের নিজেদের নিকট বেদ এরূপ ছিল না, অথবা যাঁহারা তাঁহাদের ঠিক পরের যুগে আসিয়াছিলেন, সেই মহান দ্রষ্টা এবং মনীষীগণের মনেও এরূপ বোধ জাগে নাই, তাই তাঁহারা ঋষিদের ভাব ও অর্থ-সমৃদ্ধ এবং জ্যোতির্ময় বোধিজাত জ্ঞান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, আর কোথাও যাহার উদাহরণ মিলে না এমন আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ও অনুভূতির উপর, তাঁহাদের নিজস্ব ভাবনা ও বাক্যের এক অপরূপ সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন দ্রষ্টাগণের কাছে বেদ ছিল সত্যের আবিষ্কারক বাক্, প্রতিরূপ ও প্রতীকের আবরণের মধ্য দিয়া জীবনের নিগূঢ় মর্মার্থের বিবৃতি। আবার সে আবিষ্কার ছিল দিব্য আবিষ্কার, তাহাতে বাক্যের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে নিহিত শক্তির ও তাহার সৃষ্টিশীল সামর্থ্যের আবরণ উন্মোচন এবং গূঢ় রহস্যময় প্রকাশ ঘটে, তাহা তর্কবিচার বা রসভাবিত বুদ্ধির বাক্য নয়, তাহাতে আছে অনুপ্রেরণাজাত বোধিচেতনার ছন্দোময় বাক্শক্তি, যাহাকে মন্ত্র বলে। প্রতিরূপ ও পুরাতনী কথা প্রচুররূপে তথায় ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু

তাহা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া নহে, ব্যবহৃত হইয়াছে বক্তাগণের নিকট যাহা অতি সত্যবস্তু ছিল, তাহাদেরই জীবন্ত রূপক এবং প্রতীক রূপে, অন্য কোন রূপে বাক্যের মধ্য দিয়া সে সত্যবস্তুরাজি তাহাদের অন্তরঙ্গ ও স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করিতে পারিত না, আর যাহা শুধু প্রাণ ও ভৌতিক সত্তার বাহ্য ব্যঞ্জনা দ্বারা সীমিত চক্ষু ও মনকে স্পর্শ ও অধিকার করিতে পারে তদপেক্ষা বৃহত্তর সত্য-সকলের পুরোহিত ছিল তাহাদের কল্পনা। উচ্চতর কোন আলোক এবং তাহার ভাবের উপযোগী রূপ ও বাক্য যাঁহাদের মনকে স্পর্শ করিয়াছে, যাঁহারা সত্যকে দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছেন, ইঁহাদের ধারণা অনুসারে তাঁহারাই পূজ্য কবি, 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতয়ঃ'। আধুনিক পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্রের কবিগণের যে কার্য ছিল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা মানিতেন না, তাঁহারা নিজদিগকে ঔষধের উচ্চতরজাতীয় আবিষ্কারক, অথবা বলিষ্ঠ ও বর্বর এক জাতির জন্য স্তোত্র ও যাদুমন্ত্রের রচয়িতা মাত্র মনে করিতেন না; মনে করিতেন তাঁহারা দ্রষ্টা, মনীষী, 'ঋষি ধীর'। বেদের এই উদ্গাতাগণ বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহারা রহস্যময় ও নিগূঢ় এক উচ্চ সত্যকে পাইয়াছেন, যাহা দিব্য জ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে এমন এক বাক্য শুনিয়াছেন—এই ছিল তাঁদের দাবি; তাই স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের বাক্যাবলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা গুপ্ত রহস্যময় শব্দ, যাহার পূর্ণ ভাব ও তাৎপর্য যিনি দ্রষ্টা কেবল তাঁহারই নিকট ব্যক্ত করে, 'কবয়ে নিবচনানি নিন্যা বচাংসি'। আর তাঁহাদের পরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বেদ ছিল জ্ঞানের এমন কি পরম জ্ঞানের দিব্য প্রেরণালব্ধ গ্রন্থ, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় সত্যের মহাবাক্য, যাহা অলৌকিক ভাবে অনুপ্রাণিত দিব্যোপম মনীষীরা তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিতে দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছেন। বেদের প্রাচীন ব্রাহ্মণাংশের লেখকেরা খুব ভাল রূপেই জানিতেন যে, যে যজ্ঞকে অবলম্বন করিয়া স্তোত্রাবলি লেখা হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থ ক্ষুদ্রতম ব্যাপারও গভীরার্থযুক্ত প্রতীক দ্বারা সূচিত এক আন্তর চেতনার শক্তিকে ধারণ বা বহন করিবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। উপনিষদের ভাবুক ও মনীষীগণ মনে করিতেন যে, পবিত্র বেদের প্রত্যেক মন্ত্র দিব্য অর্থে পূর্ণ এবং তাঁহারা যাহা খুঁজিতেন, বেদে সত্যের গভীরার্থপূর্ণ সেই বীজ-বাক্যগুলি (seed words) রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের নিজেদের সুমহান বাক্যের সমর্থন করিবার জন্য "তদেষা ঋচাভ্যুক্তা" 'ঋগ্বেদে এই বাক্য কথিত হইয়াছে' বলিয়া যদি তাঁহাদের পূর্ববর্তী কালের এই বেদ হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতেন, তবে সর্বোচ্চ প্রামাণিকতা দেওয়া হইল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইচ্ছাপূর্বক কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, বৈদিক ঋষিগণের ঠিক পরবর্তী কালে এই যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন, কয়েকটি পরবর্তীকালীন স্তোত্র ব্যতীত, প্রাচীন বৈদিক শ্লোকে

যে অর্থ নাই তাহার সেই রূপ ভ্রান্তিপূর্ণ অর্থ দিয়াছেন, এবং এই পণ্ডিতগণ যদিও বৈদিক ঋষিগণ হইতে শুধু কালের দিক দিয়া দেখিলে বহু যুগযুগান্তের ব্যবধানে নয়, পরন্তু বুদ্ধিগত মননশীলতার দিক হইতে বিভেদকারী বহু সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের ব্যবধানে রহিয়াছেন, তবু তাঁহারাই এ সমস্ত বিষয় অনন্তগুণে অধিক জানেন! কিন্তু শুদ্ধ সহজবুদ্ধি আমাদিগকে বলে যে, যাঁহারা উভয়দিক দিয়া আদি কবিগণের অনেক অধিক নিকটবর্তী তাঁহাদের পক্ষে এ-বিষয়কে, অন্ততঃপক্ষে ইহার মূল সত্যকে ধরিবার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল; সেই সহজবুদ্ধি আরও বলে যে, বেদ নিজেকে যে নিগূঢ় রহস্য-পূর্ণ জ্ঞানান্বেষু বলিয়া দাবি করে, অন্ততঃ তাহার সত্য হওয়ার বৃহৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে, সম্ভাবনার কারণ এই যে, ভারতীয় মন পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের পশ্চাতে অবস্থিত দেবতাগণকে, শক্তিসমূহকে, জ্ঞানীগণ যাঁহাকে বহুরূপে ব্যক্ত দেখিয়াছেন সেই একের বাহ্য রূপায়ণসমূহকে—বেদ "একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই বিখ্যাত বাক্যে তাহার নিজেরই মূল ও নিগূঢ় রহস্য উচ্চারণ করিয়াছে—নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া দেখিতে চাহিয়াছে, এইজন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়াছে, ইহার প্রতি চিরকাল বিশ্বস্ত রহিয়াছে; বেদ এ আকৃতি ও চেষ্টার প্রথম রূপ বা প্রথম ফল।

নিজস্ব রূপক ও ভাষার প্রকাশভঙ্গি বা বাক্‌বৈশিষ্ট্য অনুসারে বেদের যে কোন স্থানের যদি সরলভাবে অনুবাদ করা যায়, তবে তাহাতে বেদের প্রকৃত প্রকৃতি বেশ ভালভাবে বুঝা যাইবে। একজন প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত তাঁহার শ্রেষ্ঠতর মননশীলতার উচ্চ বেদী হইতে, যাহারা বেদের মধ্যে মহত্ত্ব দেখিতে পায় সেই সমস্ত নির্বোধ ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ বালকোচিত মূর্খতায় ভরা, এমনকি কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ও ভাবনায় পূর্ণ, ইহা বিরক্তিকর, নীচ ও অতি সাধারণ বস্তু, ইহাতে মানবপ্রকৃতিকে উপস্থিত করা হইয়াছে এক নিম্নস্তরের স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তি রূপে; আর আত্মার গভীরতা হইতে উদ্ভূত ভাব বা অনুভূতিসম্মত কথা কেবল ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। ঋষিদের বাক্যাবলির উপর আমাদের নিজ মনের ধারণা আরোপ করিলে এরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন অসভ্য জাতির পক্ষে কি বলা বা ভাবা উচিত ছিল বলিয়া আমরা যাহা মনে করি, তাহার সাহায্যে এরূপ ভুল অনুবাদ না করিয়া তাহারা যে ভাবে আছে ঠিক সেইভাবে যদি পাঠ করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তৎপরিবর্তে সেখানে এক অতি পবিত্র কবিত্ব আছে, যাহা মহান এবং বাক্যে ও রূপে শক্তিশালী, যদিও আমরা বর্তমানে যাহা পছন্দ করি এবং যাহার গুণ ব্যাখ্যা করি, সেখানে তদপেক্ষা ভিন্ন এক প্রকারের ভাষা ও কল্পনা স্থান পাইয়াছে, সে কবিত্ব তাহার অন্তর-চেতনার অনুভূতিতে গভীর ও সূক্ষ্ম, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গিতে

হৃদয়স্পর্শী, আত্ম-ভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। এখন বরং বেদের সেই বাক্যই শ্রবণ করা যাউক :—

"এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা প্রজাত হয়, এক আবরণের উপর অন্য আবরণ* জ্ঞানে জাগ্রত হয়; যে মাতাকে তিনি পূর্ণরূপে দেখেন তাঁহার ক্রোড়ে। তাহারা তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা শক্তিকে অনিমেষ ভাবে রক্ষা করে; তাহারা দৃঢ় পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। পৃথিবীতে জাত মনুষ্যগণ শ্বেতবর্ণা মাতার পুত্রগণের জ্যোতির্ময় (শক্তি) বৃদ্ধি করে; তিনি হিরণ্যগ্রীব এবং বৃহৎবক্তা, তিনি যেন এই মধু-মদ্যের (শক্তি) দ্বারা প্রাচুর্যের অন্বেষু হন। তিনি মনোরম ও কাম্য দুগ্ধের মত, তিনি নিঃসঙ্গ এবং পার্শ্বে দুইজন আছে যাহারা সঙ্গী, আর তিনি যেন তাপ, যাহা সমৃদ্ধির জঠর, তিনি অজেয় এবং অনেককে জয় করিয়াছেন। হে রশ্মি ক্রীড়া কর আর নিজেকে প্রকাশ কর**" (ঋগ্বেদ ৫-১৯)

অথবা আবার পরবর্তী স্তোত্রে :—

"তোমার সেই রশ্মিমালা হে বীর্যবন্ত (দেবতা), যাহারা নিশ্চল কিন্তু বৃদ্ধিশীল ও শক্তিশালী, যাহার অন্য বিধান আছে তাহার বিদ্বেষ ও বক্রতা দূর কর। হে অগ্নি, আমরা তোমাকে বরণ করি হোতা রূপে, আমাদের শক্তি-সাধনের উপায় রূপে এবং তোমার অভিপ্সিত ভোজ্য অর্পণ করিয়া আমরা বাক্যের দ্বারা তোমাকে আবাহন করি।......হে পূর্ণকর্মসমূহের দেবতা, আমরা যেন আনন্দের জন্য সত্যের জন্য থাকি, কিরণমালার সহিত বীরগণের সহিত আনন্দোন্মত্ত হইয়া।"

এবং অবশেষে যজ্ঞের সাধারণ প্রতীকের ভাষায় বর্ণিত যে তৃতীয় স্তোত্র ইহার পরে রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্রহণ করা যাউক :—

"আমরা মনুরূপে তোমাকে তোমার স্থানে দেখি, মনুরূপে তোমাকে সমিদ্ধ করি; হে অগ্নি, হে অঙ্গিরস, যে দেবতাগণকে কামনা করে তাহার জন্য মনুর মত দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। হে অগ্নি, সুপ্রীত হইয়া তুমি মনুষ্যের মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়াছ, যজ্ঞের দর্বী (হাতা) নিরন্তর তোমার নিকট যাইতেছে।... সকল দেবতা (তোমাতে) প্রীত হইয়া একমনে তোমাকে তাঁহাদের দূত করিয়াছিলেন এবং হে দ্রষ্টা, তোমাকে সেবা করিয়া যজ্ঞে (মনুষ্যগণ) দেবতাগণের উপাসনা করে। মর্ত্যগণ দিব্য অগ্নির উপাসনা করুক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ দ্বারা। হে দীপ্তিময়, সমিদ্ধ হইয়া বাহিরে শিখা বিস্তার কর, সত্যের আসনে উপবেশন কর, শান্তির আসনে উপবেশন কর।"***

---

* অথবা "আবরকের উপর আবরক"।

** আক্ষরিক অনুবাদ—"আমাদের দিকে সম্ভূত হও"।

*** ভাষান্তরে যতদূর সম্ভব, এই উদ্ধৃতাংশগুলি আক্ষরিক ভাবেই অনূদিত হইয়াছে। পাঠক মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারেন ইহাই শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ কিনা।

আমরা বেদের রূপকগুলির যে কোন ব্যাখ্যা দিই না কেন, তাহা রহস্যময় এবং প্রতীকের ভাষায় লেখা কবিতা এবং তাহাই প্রকৃত বেদ।

যদি আমরা তুলনামূলকভাবে এসিয়ার সাহিত্যের আলোচনা করি তখন তাহার মতবাদ এবং বাক্যব্যবহারপদ্ধতি, তাহার বিশিষ্ট রূপকরাজি, চিন্তা-ধারার জটিলতা এবং প্রতীকোপলক্ষিত অনুভূতির জন্য যদিও বৈদিক কবিতা বিখ্যাত, তথাপি বস্তুতঃ তাহাতে প্রতীকের মধ্য দিয়া অথবা সাঙ্কেতিক মানসিক প্রতিরূপ এবং রূপকের ভাষায় আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিত্বময় প্রথম প্রারম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, যে ভাবের অভিব্যক্তি পরবর্তী কালের ভারতীয় রচনায়, তন্ত্র ও পুরাণের প্রতিরূপসমূহে, বৈষ্ণব কবিগণের গঠিত সালঙ্কৃত ভাষাগুলিতে—এমনকি বলিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতার কোন কোন উপাদানে—স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; চীনদেশের কোন কোন কবির লেখাতে ও সুফীগণের রূপকের মধ্যে ইহার সমজাতীয় বস্তুর সন্ধানও মিলে; আর এইভাবে দেখিলে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যসূচক শ্লোকাবলি দেখিয়া বৈদিক কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বোধ হয় তাহাতে আমাদের বিস্মিত বা ব্যর্থ হওয়ার কারণ থাকে না। এখানে কবিকে আধ্যাত্মিক ও চৈত্য চেতনার জ্ঞান ও অনুভূতিকে রূপ দিতে হইবে, তিনি চিন্তাশীল দার্শনিকের অধিকতর বস্তুনিরপেক্ষ অবিশেষক (abstract) ভাষায় পূর্ণরূপে তাহা করিতে পারেন না, কেননা শুধু উলঙ্গ ভাবাবলিকে দেখাইলে তাঁহার চলিবে না, কিন্তু তাহাকে ভাবের মধ্যে প্রাণ এবং অন্তরতম সংস্পর্শগুলি পর্যন্ত যত স্পষ্টভাবে সম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কোন না কোন ভাবে তাহাকে তাহার অন্তরস্থ একটা সমগ্র জগতকে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জগতের সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে প্রকাশিত করিতে হইবে; তাহা ছাড়া আমাদের প্রাকৃত মন যাহার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পরিচিত চেতনার সেই ভূমি হইতে বিভিন্ন ভূমিসকলের দেবতাগণ, শক্তিসমূহ, দৃষ্টবস্তুরাজি ও অনুভূতি-সকলকেও অভিব্যক্ত করিতে হইবে। তিনি তাঁহার নিজের ও মানবজাতির স্বাভাবিক বহিজীবন ও পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি হইতে রূপক ও প্রতিরূপসকল ব্যবহার অথবা তাহাদের লইয়া কার্য আরম্ভ করেন, এবং যদিও তাহারা আপনা হইতে সে সমস্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, তথাপি তাহাদের ফলিতার্থ দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আন্তর চেতনার ভাব ও অনুভূতিগুলিকে প্রকাশিত বা রূপায়িত করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। তিনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনা অনুসারে তাঁহার রূপক বা প্রতিরূপের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি স্বাধীনভাবে বাছিয়া নেন, এবং তাহাদিগকে অন্য এক তাৎপর্য প্রকাশের যন্ত্ররূপে রূপান্তরিত করেন এবং সেই সঙ্গে তাহারা যাহার মধ্যেস্থিত, সেই প্রকৃতি ও জীবনের ভিতরে সাক্ষাৎ-ভাবে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের এক ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন, বাহ্য আকারসমূহকে

অন্তরের বস্তুতে প্রয়োগ করেন, এবং জীবনের বাহ্যরূপ ও ঘটনার মধ্যে তাহাদের প্রচ্ছন্ন ও অন্তরগত আধ্যাত্মিক বা চৈত্যিক তাৎপর্য ফুটাইয়া তোলেন। অথবা অন্তরের অভিজ্ঞতার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী জড়ের ক্ষেত্র হইতে তাহার অনুরূপ কোন বাহ্যরূপ নেওয়া, এবং তাহাকে এমন স্বাভাবিক সত্য ও সঙ্গতির সহিত আদ্যন্ত ব্যবহার করা হয় যে, যাহাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে তাহাদের কাছে তাহা চিন্ময় উপলব্ধির কথা নির্দেশ করে, অপরের কাছে তাহার কেবল বাহিরের অর্থই প্রকাশ পায়—যেমন বাংলার বৈষ্ণব কবিতা ভক্তের মনে ভগবানের জন্য মানবাত্মার প্রেমের ভাবাবেগময় একটা বাহ্য প্রতিরূপ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে, কিন্তু অদীক্ষিত ঐহিক বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কাছে পরম্পরাগত দিব্যমানব রাধা ও কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের চারিপাশে প্রথানুগভাবে রচিত ও রক্ষিত ইন্দ্রিয়ানুরাগসূচক তীব্র আবেগময় প্রেমের কবিতা ভিন্ন, তাহা অন্য কিছু নয়। এই দুই প্রণালী একত্রে আসিয়া মিলিত হইতেও পারে; কবিতার দেহে বাহ্যরূপ, রূপক বা প্রতিরূপের নির্দিষ্ট ধারা রক্ষিত হইতে পারে, সেই সঙ্গে তাহাদের প্রাথমিক সীমা অতিক্রম করিবার জন্য অনেক সময় স্বাধীনতা লওয়া হয়, তাহাদিগকে কেবল প্রাথমিক ব্যঞ্জনা, আভাস বা ইঙ্গিত রূপে ব্যবহার করিয়া সূক্ষ্মভাবে তাহাদের রূপান্তর সাধন করা হয়, এমনকি কখনও বা তাহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিতে অথবা গৌণ সুর রূপে থাকিতে বাধ্য করা হয়, অথবা তাহাদের বাহ্যভাব হইতে তাহাদিগকে এমনভাবে বাহির করিয়া আনা হয়, যাহাতে আমাদের মনের উপরে তাহাদের যে অর্ধস্বচ্ছ আবরণ ছিল তাহা সরাইয়া ফেলা, অথবা তাহা উন্মুক্ত ঊর্ধ্বপ্রকাশের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া হয়। বেদে এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে, এবং কবির দৃষ্টিশক্তি ও তাঁহার উচ্চারিত বিষয়ের সমুন্নতির আবেগ ও চাপ অনুসারে তাহাদের বৈচিত্র্য সাধিত করা হইয়াছে।

আমাদের মননশক্তি হইতে বৈদিক কবিগণের মননশীলতা ভিন্নপ্রকারের ছিল; তাঁহাদের রূপক বা প্রতিরূপের ব্যবহারেও এক প্রকাশবৈশিষ্ট্য, প্রাচীন এক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যাহা তাঁহাদের ভাষায় ভাবের চারিপাশে এক বিস্ময়কর প্রান্তরেখা টানিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষুতে বাহ্যজগৎ এবং অন্তরাত্মার জগৎ, এ দুই প্রকাশ পৃথক কিন্তু তথাপি তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত ও মিলিত ছিল, এবং বিশ্বদেবতাগণের অনুরূপ মূর্তি উভয় জগতের মধ্যে দেখা যাইত, মানুষের আন্তর ও বাহ্যজীবনে দেবতাগণের সহিত দিব্য আদানপ্রদান চলিত, আর পশ্চাতে ছিলেন এক চিৎপুরুষ বা পরমসত্তা, দেবতাগণ যাঁহার বিভিন্ন নাম, ব্যক্তিত্ব ও শক্তি। এই দেবতাগণ একই সঙ্গে বাহ্যপ্রকৃতির, তাহার তত্ত্বসকলের ও রূপরাজির প্রভু, তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং তাহাদের দেহ; অন্তরের দিকে অনুরূপ অবস্থা ও বীর্যধারাসমূহ লইয়া এই দেবতারাই হইলেন দিব্যশক্তিবৃন্দ যাঁহারা আমাদের অন্তরাত্মায় জাত হন, কেননা তাঁহারা

বিশ্বের আত্মশক্তি (soul power), সত্য ও অমরত্বের রক্ষক, তাঁহারা অনন্তের সন্তান, পরমপুরুষ তাঁহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তিস্থান এবং চরম সত্যে প্রত্যেকে সেই পরমপুরুষ, যিনি সম্মুখভাবে তাঁহার এক বিভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত দ্রষ্টার নিকট মানুষের জীবন ছিল সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে গঠিত এক বস্তু, সে জীবন মর্ত্যভাব হইতে অমৃতত্বের দিকে, আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণ হইতে দিব্য সত্যের পরমজ্যোতির দিকে এক অভিযান; এই সত্য ও অমৃতের স্বধাম উপরে অনন্তপুরুষের মধ্যে, কিন্তু সে ধাম এখানে মানুষের আত্মা ও জীবনের মধ্যেও নির্মিত হইতে পারে; এখানে আলোকের সন্তান এবং অন্ধকারের পুত্রগণের মধ্যে এক যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে ধনসম্পদ লাভ হয়, দেবতাগণ মানবযোদ্ধাকে তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য অর্পণ করেন; এখানে এক অভিনব যজ্ঞ চলিতেছে; প্রকৃতি হইতে এবং যুদ্ধপ্রিয় পশুপালক কৃষিজীবী আর্যজাতির চতুষ্পার্শ্বে স্থিত জীবন হইতে, রূপক ও প্রতিরূপের নির্দিষ্ট ধারা গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে বৈদিক ঋষিগণ এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন, এবং অগ্নিপূজা, জীবন্ত প্রকৃতির শক্তিরাজির আরাধনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া এ সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন ও সাধনায় বাহ্য সত্তা ও যজ্ঞের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতীকমাত্র—তাঁহাদের কবিতায় তাঁহারা প্রাণহীন প্রতীক বা কৃত্রিম বাক্যালঙ্কার নহে, পরন্তু অন্তরের বস্তুরাজির সজীব ও শক্তিশালী ব্যঞ্জনা বা আভাস ও ইঙ্গিত এবং আন্তর বস্তুর অনুপূরক অংশ। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভাবপ্রকাশের জন্য অন্যপ্রকার রূপক বা প্রতিরূপের নির্দিষ্ট অথচ পরিবর্তনশীল ধারাসকল এবং আখ্যায়িকা ও পুরাবৃত্তমিলিত কথায় দেদীপ্যমান ভাষা ব্যবহার করিতেন; রূপক বা প্রতিরূপগুলি আখ্যায়িকা হইয়া দাঁড়াইত, আখ্যায়িকা পুরাবৃত্ত কথায় রূপান্তরিত হইত, আবার পুরাবৃত্ত কথাও সর্বদা রূপক থাকিয়া যাইত এবং তথাপি এই সমস্ত তাঁহাদের কাছে ছিল এমন এক ভাবের বাস্তব সত্য যাহা কেবল তাহারাই বুঝিতে পারিত, যাহারা আন্তর চেতনার কোন প্রকার অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত। বাহ্যবস্তুর অস্পষ্টালোক অন্তরাত্মার দীপ্তিতে গলিয়া মিশিয়া যাইত, অন্তরাত্মার দীপ্তি ঘনীভূত হইয়া আধ্যাত্মিক আলোক ও জ্যোতিতে পরিণত হইত, এই পরিবর্তনের মধ্যে তীক্ষ্ম ভেদরেখা দৃষ্ট হইত না, স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের বর্ণ ও ব্যঞ্জনার আভা পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া যাইত। ইহা সুস্পষ্ট যে যুক্তিবিচার ও রুচির যে মাপকাঠি কেবল জড়সত্তার বিধিবিধান পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত, তাহা এই ভাবের দৃষ্টি ও কল্পনায় লেখা এই জাতীয় কবিতার ব্যাখ্যা বা বিচার করিতে পারে না। "হে রশ্মি ক্রীড়া কর এবং আমাদের দিকে সম্ভূত হও" এই মন্ত্রাংশের মধ্যে একদিকে যেমন জড় বেদীর উপর অবস্থিত শক্তিশালী যজ্ঞাগ্নিশিখার ঊর্ধ্বে লম্ফনের ও জ্যোতির্ময় ক্রীড়ার ব্যঞ্জনা আছে, তেমনি সেই সঙ্গে অনুরূপ এক

চৈত্য চেতনার ঘটনা, আমাদের অন্তরস্থিত দিব্য আলোক ও শক্তির মুক্তিপ্রদ শিখার অভিব্যক্তির আভাস ও ইঙ্গিত রহিয়াছে। বেদের যে রূপকে পৃথ্বী এবং দ্যৌ-এর পুত্র ইন্দ্র তাঁহার নিজের পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলা হইয়াছে, সেই নির্ভীক বেপরোয়া কিন্তু চক্ষুতে বিকৃতাঙ্গ বা বীভৎস উক্তি দেখিয়া কোন পাশ্চাত্য সমালোচক নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে ইন্দ্র পৃথিবী ও স্বর্গের স্রষ্টা পরম-পুরুষের এক শাশ্বত দিব্য বিভাব, আবার তিনি বিশ্বদেবতা রূপে মনোময় এবং অন্নময় জগতের মধ্যস্থলে জাত বা আবির্ভূত হন এবং মানুষের মধ্যে এই দুই জগতের শক্তিরাজি পুনরায় সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এ রূপকটি কেবল শক্তিশালী নয় পরন্তু বস্তুতঃ এক সত্য এবং যথার্থ ভাব প্রকাশের উপযোগী বাক্যালঙ্কার, তাহা যে বাহ্য ভৌতিক কল্পনাকে অপমানিত করে, বেদের সম্পাদনরীতিতে তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ইহা একটি বৃহত্তর বাস্তবতাকে যেরূপ বিপুল সঙ্গতি ও উজ্জ্বল কবিত্ব শক্তিতে আপনার মধ্যে জাগাইয়া তোলে, অন্য কোন বাক্যালঙ্কারে তেমনটি করিতে সমর্থ হইত না। বেদের বৃষ ও গো, গুহাতে গোপনে শায়িত সূর্যের দীপ্তিমন্ত গোযূথ প্রাকৃত বাহ্য মনের নিকট অতি অদ্ভুত জন্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা পার্থিব বস্তু নহে, তাহাদের নিজেদের ভূমিতে তাহারা একই সঙ্গে রূপক এবং বাস্তব পদার্থ, সেখানে তাহারা প্রাণশক্তি ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। এইভাবে আমাদের কাছে আশ্চর্য এবং স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরাত্মার কাছে যাহা স্বাভাবিক এমন ভাব ও অলঙ্কারের সত্য অনুসারে, এবং তাহার নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও দৃষ্টি অনুসারে, বেদের সর্বস্থানের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, আর অনুরূপ ভাবেই বৈদিক কবিতাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এইভাবে বুঝিলে দেখিতে পাইব যে, বেদ আজিও বর্তমান ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম, ইহা মানুষ ভগবান ও জগৎ সম্বন্ধে যেমন প্রাচীনতম ব্যাখ্যা, তেমনি এক বিস্ময়কর মহান শক্তিশালী ও কবিত্বপূর্ণ সৃষ্টি। রূপে ও ভাষায় ইহা বর্বর বা অসভ্য জাতির সৃষ্ট বস্তু নহে। বৈদিক কবিরা সর্বাঙ্গ-সুন্দর গঠনরীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহাদের ছন্দাবলি দেবতাগণের রথের মত কারুকার্যখোদিত, তাহারা যেন শব্দ ও সুরের দিব্য ও বিশাল পক্ষের উপর ভর করিয়া উড়িয়া চলে, তাহাদের গতি বৃহৎ, মূর্চ্ছনা অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর, একই সঙ্গে তাহারা ঘনীভূত এবং বিশাল তরঙ্গভঙ্গযুক্ত, ভাষার গভীরতায় তাহারা গীতিকাব্য, উচ্চতায় মহাকাব্য, তাহাদের উক্তি মহাশক্তিশালী, বিশুদ্ধ, নির্ভীক এবং বর্ণিত বিষয় ও রেখাচিত্রে মহান; সংক্ষিপ্ত সে ভাষা সাক্ষাৎভাবে শ্রোতাকে স্পর্শ করে, অর্থ ও ব্যঞ্জনায় তাহা পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত, এমন ভাবে লিখিত যাহাতে প্রতিটি শ্লোক একই সঙ্গে শক্তিশালী এবং

স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শ্লোকের মধ্যে এক বৃহৎ সোপান রূপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। এক পবিত্র ও দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জীবনের ঐতিহ্য বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিবার ফলে, তাহাদের বিষয়বস্তুর ভাব ও ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে মানবাত্মার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা পূর্ণরূপে আন্তর চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার গভীরতম অনুভূতিরাজি, সে ভাষার রূপ কখনও গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয় নাই, কেননা প্রতি কবি যাহা নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টিজাত সূক্ষ্মতা ও মহত্ত্বের বৈচিত্র্যের দ্বারা যাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেন, ভাষা তাহারই বাহন হইবার উদ্দেশ্য লইয়া চলিত। বিশ্বামিত্র, বামদেব, দীর্ঘতমস্ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম দ্রষ্টার উক্তি মহৎ ও রহস্যময় কবিতার উচ্চতা ও প্রশান্ততাকে স্পর্শ করিয়াছে, আবার সৃষ্টি-স্তোত্রের মত কবিতা আছে যাহা প্রবল স্পষ্টতার সহিত ভাবনারাজ্যের শিখরদেশে পোঁছিয়াছে, সে শিখরে উপনিষদ সর্বদা বাস করিয়াছে, তাহার সঞ্জীবনী নির্মল বায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের মন যখন তাহার সকল দর্শন ও ধর্মের, তাহার সংস্কৃতির মৌলিক বস্তুরাজির মূলানুসন্ধানের জন্য এই সমস্ত দ্রষ্টা কবির (seer poets) দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সে ভুল করে নাই, কেননা তাহার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে পরবর্তী কালে যে আধ্যাত্মিকতা দেখা দিয়াছে তাহার সকল ভাবের বীজ অথবা প্রথম অভিব্যক্তি এই বেদের মধ্যেই রহিয়াছে।

বৈদিক স্তোত্রগুলিকে খাঁটিভাবে পবিত্র সাহিত্য রূপে বুঝিবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কথা এই যে, প্রধান প্রধান যে ভাবধারাগুলি ভারতীয় মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহাদের আদিরূপে তাহাদিগকে দেখিতে যে ইহা কেবল আমাদিগকে সাহায্য করে তাহা নহে, কিন্তু ইহার সাহায্যে তাহার বিশিষ্ট ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে, কল্পনার ভঙ্গিতে, সৃষ্টিশীল প্রকৃতি ও মেজাজে, সার্থক রূপের বিশেষ ধারায় তদ্দৃষ্ট আত্মা, বস্তু, জীবন ও বিশ্বের স্থায়ী যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, তাহাদের আদি রূপও দেখিতে পারিব। তাহার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার প্রেরণা এবং আত্মপ্রকাশের যে বিশিষ্ট ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থানেও তাহাই দেখা যাইবে। এই প্রেরণা ও আত্মপ্রকাশের প্রথম লক্ষণ এই যে, ইহা সর্বদা অনন্তপুরুষের ভাবে বিভাবিত, ইহাতে বিশ্বকে এবং তন্মধ্যস্থ সকল বস্তুকে বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে বা তদ্দ্বারা প্রভাবিত করিয়া এক অদ্বয় অনন্ত বস্তুর বিশাল পটভূমিকায় দেখা হইয়াছে; ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অন্তরের চৈত্যভূমি হইতে গৃহীত রূপক ও প্রতিরূপের বৃহৎ সমৃদ্ধির সাহায্যে, অথবা বাহ্য রূপ ও প্রতিরূপসমূহকে অন্তরগত চৈত্যচেতনার তাৎপর্য ও ছাপের রূপরেখা ও ভাবের চাপে,

রূপান্তরিত করিয়া তাহাদিগের সহায়তায় তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে দেখিতে ও অনুবাদ করিতে চাহিয়াছে; ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই যে, প্রায়ই ইহা পার্থিব জীবনকে অনেক বড় করিয়া—যেমন রামায়ণ ও মহাভারতে—দেখিয়া তাহার প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়াছে, অথবা এক বৃহত্তর বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতার মধ্যে তাহাকে সূক্ষ্মরূপে দেখিয়াছে, সাধারণ পার্থিব অর্থ অপেক্ষা এক বৃহত্তর অর্থ তাহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে, অথবা অন্য যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেবল তাহার নিজস্ব পৃথক মূর্তিতে না দেখিয়া, আধ্যাত্মিক ও চৈত্য চেতনার জগৎসমূহের পটভূমিকায় স্থাপিত করিয়া দেখিয়াছে। তাহাদের কাছে চিন্ময় ও অনন্ত বস্তু অতি নিকট ও সত্য, দেবতাগণ সত্য, ঊর্ধ্বস্থিত জগৎ-সমূহ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যতটা অবস্থিত তদপেক্ষা আমাদের নিজ সত্তার মধ্যে তাহারা অধিকতর পরিমাণে অনুস্যূত। পাশ্চাত্য মনের কাছে যাহা পৌরাণিকী কথা এবং কল্পনা, এখানে তাহা বাস্তবতা এবং আমাদের অন্তর-সত্তার একটি সূত্র; তাহাদের কাছে যাহা কেবল মাত্র সুন্দর কবিত্বের ভাব ও দার্শনিক আলোচনা, এখানে তাহা সর্বদা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্তমান। ভারতীয় মনের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই আধ্যাত্মিক আন্তরিকতা ও অকপটতা, এবং চৈত্য ভাবের এই দৃঢ়নিশ্চয়তা, বেদ ও উপনিষদকে এবং পরবর্তী যুগের ধর্মীয় ও ধর্ম সম্পর্কিত দার্শনিক কবিতাকে যেমন প্রেরণায় এত শক্তিশালী ও অন্তরঙ্গ, তেমনি আত্মপ্রকাশে এবং রূপক ও প্রতিরূপে এমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে; এমন কি যে সমস্ত সাহিত্য অধিকতর ভাবে ঐহিক, সেখানেও কবিতার ক্ষেত্রে তাহার ভাব ও কল্পনা ততটা অভিনিবেশকর না হইলেও, তাহার প্রভাব অতি স্পষ্ট ভাবে কার্যকরী হইয়া যে আছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

একাদশ অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য

উপনিষদ ভারতীয় মনীষার এক পরম কৃতি; ভারতীয় প্রতিভার এই উচ্চতম অভিব্যক্তি, তাহার মহত্তম কাব্য, তাহার বাক্য ও ভাবনার শ্রেষ্ঠতম এই সৃষ্টি কেবল সাধারণ ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য বা কাব্য হইতে পারে না, পরন্তু তাহাতে থাকিবে সাক্ষাৎ ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক প্রবল প্রবাহ, আর ইহাই তো স্বাভাবিক ও সার্থক ব্যাপার; তাহা এক অসাধারণ মনন শক্তি ও অদ্বিতীয় আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দেয়। উপনিষদগুলি একদিকে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মশাস্ত্র—কেননা তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের বর্ণনা আছে—অন্য দিকে তেমনি দিব্য প্রেরণা ও বোধিজাত দর্শনশাস্ত্র, যাহার মধ্যে আলোক শক্তি ও মহত্ত্বের এক অক্ষয় ভাণ্ডার রহিয়াছে, আবার পদ্যে বা স্বরবৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রুতিমধুর গদ্যে যে ভাবে লিখিত হউক না কেন, তাহা অব্যর্থ ও অবিমিশ্র ভগবৎপ্রেরণাজাত আধ্যাত্মিক কাব্য, তাহা যেমন শব্দপ্রয়োগ পদ্ধতিতে নিখুঁত—যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে অন্য কোন শব্দ দ্বারা সে অর্থ প্রকাশ হইত না—তেমনি শব্দবিন্যাস প্রণালী ও ছন্দে অপরূপ। যে মনে ধর্ম দর্শন ও কবিতা এক হইয়া গিয়াছে উপনিষদ তাহারই অভিব্যক্তি, কেননা এই ধর্ম এক বিশেষ মতবাদে শেষ, বা ধর্মবোধযুক্ত এক নৈতিক আদর্শ দ্বারা সীমিত হয় নাই, পরন্তু ঈশ্বরের, পরমাত্মার, আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির উচ্চতম ও সমগ্র সত্যকে অনন্ত ভাবে আবিষ্কার করিবার জন্য ঊর্ধ্বগামী হইয়াছে, এবং জ্যোতির্ময় জ্ঞানের এবং হৃদয়মনোমোহন পরিপূর্ণ অনুভূতির পরমানন্দ হইতে তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছে; এ দর্শন সত্যের সম্বন্ধে মনন-শক্তির বস্তুনিরপেক্ষ অবিশেষ (abstract) পরিচিন্তন ও পর্যালোচনা অথবা তর্কবুদ্ধির দ্বারা গঠিত কোন বস্তু নহে, কিন্তু যে সত্যকে ঋষিরা দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, যাহাতে বাস করিয়াছেন, আত্মা ও অন্তরতম মনে যে সত্যকে ধারণ করিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া তাহাই প্রকাশের আনন্দের মধ্য দিয়া এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর ইহার কবিতা রসভাবিত সেই মননের সৃষ্টি, যাহা সাধারণ ক্ষেত্রের উপরে উঠিয়া অপূর্বতম

আধ্যাত্মিক আত্মদৃষ্টির অপরূপতা ও সৌন্দর্য, এবং আত্মা ঈশ্বর ও জগতের গভীরতম প্রদীপ্ত সত্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। এখানে বৈদিক দ্রষ্টাগণের বোধিভাবিত মন ও আন্তর চেতনার অন্তরঙ্গ অনুভূতি এমন পরম উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে, যাহাতে চিৎপুরুষ স্বয়ং,—কঠোপনিষদের ভাষায়—তাঁহার নিজের দেহ হইতে সর্বাবরণ মুক্ত করিয়াছেন, আত্মাভিব্যক্তির উপযোগী শব্দ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং মনে ছন্দরাজির সেই কম্পন জাগাইয়াছেন যাহা চিন্ময় শ্রুতির মধ্যে নিজেরা পুনরাবৃত্ত হইয়া যেন আত্মাকেই গড়িয়া তোলে, এবং পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া আত্মজ্ঞানের শিখরাবলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপনিষদের এই প্রকৃতির কথা অত্যন্ত জোরে বলা প্রয়োজন, কেননা বৈদেশিক অনুবাদকগণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইহার মধ্য হইতে শুধু বুদ্ধিগত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করেন, ইহার ভাবনা ও দৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণ আছে তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, আর পান নাই তাঁহারা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সেই পরমানন্দের আস্বাদ, যাহা সে সময়ে এবং আজিও যাঁহারা এই সমস্ত উক্তির মর্মমূলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন বা পারেন তাঁহারা লাভ করিতেন বা করেন, এবং যাহা এই সমস্ত প্রাচীন কবিতার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র বুদ্ধির নিকটে নহে, পরন্তু আত্মা এবং সমগ্র সত্তার নিকট এক দিব্য প্রকাশ উদ্ঘাটিত করে, এবং যাহার জন্য উপনিষকে দিব্য সত্যপ্রকাশক প্রাচীন বাক্যে মনোময় ভাবনা বা বাক্যবিন্যাস বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে শ্রুতি, চিন্ময় কর্ণে শ্রুত বস্তু, অনুপ্রেরণা ও বোধিলব্ধ ধর্মশাস্ত্র। উপনিষদের মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব ও বস্তু আছে, তাহার মূল্যাবধারণ বা প্রশংসার জন্য অধিকতর আলোচনার এখন আর প্রয়োজন নাই, কেননা, এমন কি তাহা যদি শ্রেষ্ঠতম মনীষীরা প্রবলতম ভাবে স্বীকার করিতে সমর্থ হইতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলেও দর্শনশাস্ত্রের সমগ্র ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ দিবে। উপনিষদ ভারতবর্ষের অনেক গভীর দর্শন ও ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত উৎস; হিমালয়ের শিশুখট্বা হইতে নিঃসৃত মহানদীগুলির মত, এই সমস্ত দর্শন ও ধর্ম শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার অধিবাসীগণের মন ও প্রাণকে উর্বর করিয়াছে, তাহাদের আত্মাকে সজীব রাখিয়াছে; তাহারা আলোকের জন্য এই প্রাণপ্রদ সলিলরাজির অক্ষয় উৎসের দিকে সর্বদা ফিরিয়াছে, এবং উপনিষদও তাহাদিগকে নূতন আলোকে দীপ্তিমন্ত করিতে কখনও বিমুখ হয় নাই। তাহার সকল পরিণতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের অনুভূতির এক অংশের পুনর্বিবৃতি মাত্র,—যদিও তথায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হইয়াছে এবং মানসসংজ্ঞা ও তর্কবিচারের জন্য নূতন শব্দ ও ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, এই ভাবে মূল প্রায় অবিকৃত রাখিয়া কেবল পরিবর্তিত আকারে তাহা সমগ্র এসিয়াতে এবং পশ্চিমে ইউরোপের দিকে প্রবাহিত বা প্রচারিত হইয়াছে।

পাইথাগোরাস্ এবং প্লেটোর ভাবনা ও দর্শনের মধ্যে এবং নিও-প্লেটোনিজম (Neo-Platonism—তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশের যোগ তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত প্লেটোর মতবাদ) ও খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যার (Gnosticism) গভীরতম অংশে এবং তাহাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত পশ্চিমের সকল দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে উপনিষদের অনেক ভাবকে পুনরাবিষ্কার করা যায়, এবং সুফীদের মতবাদ ধর্মের অন্য এক ভাষায় উপনিষদের পুনরাবৃত্তি মাত্র। জার্মান তত্ত্ববিদ্যার অধিকাংশের মধ্যে উপনিষদের মূল কথাগুলিই মানসিক জ্ঞানে প্রকাশ করা ছাড়া বিশেষ আর কিছু করা হয় নাই—যদিও এই প্রাচীন শিক্ষায় সে সমস্ত মহান সত্য অধিকতর আধ্যাত্মিক ভাবে অনুভূত হইয়াছে; আধুনিক চিন্তাধারা আবার এই সমস্তই অধিকতর অন্তরঙ্গ সজীব ও প্রবল ভাবে দ্রুত গ্রহণ করিতেছে, যাহাতে আশ্বাসের হেতু আছে যে দার্শনিক চিন্তা ও ধর্মভাবনা এ উভয় ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আসিবে; কোথাও এ সমস্তের প্রভাব পরোক্ষ ভাবে কোথাও বা সাক্ষাৎ ভাবে উন্মুক্ত পথে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে প্রধান ভাবধারারাজির মধ্যে এমন অতি অল্প আছে, যাহা এই সমস্ত প্রাচীন ধরনের লেখার মধ্যে তাহার নিজের বক্তব্য বিষয়ের একটা প্রমাণ বা একটা বীজ, একটা উদ্দেশ্য বা একটা ইঙ্গিত খুঁজিয়া পায় নাই—অথচ এক মত অনুসারে এ সমস্ত হইতেছে এমন ভাবুকগণের আলোচনা, যাহাদের চিন্তার পটভূমিকায় বা অতীত অবদানের মধ্যে অমার্জিত বর্বরোচিত বাহ্যপ্রকৃতি ও অচেতন বস্তুসমূহের পূজারত অজ্ঞানতা অপেক্ষা বেশী কিছু ছিল না! এমন কি বিজ্ঞানের ব্যাপক সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যেও বাহ্যপ্রকৃতির সত্যে সেই সমস্ত সূত্রাবলির সর্বদা প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, যাহা ভারতীয় ঋষিরা তাহাদের আদি ও বৃহত্তম অর্থে চিদ্‌বস্তুর গভীরতর সত্যের মধ্যে ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তথাপি এই উপনিষদগুলি কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা কৃত সেই জাতীয় দর্শনালোচনা বা তত্ত্ববিদ্যার বিশ্লেষণ নয়, যাহা আমাদের সাধারণ ধারণাগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করে, ভাবগুলি বাছিয়া লয় এবং যেগুলি সত্য মনে করে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখে, যুক্তিবিচার দ্বারা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে, অথবা মন যাহাকে আদর বা বরণ করে, হেতুবিচার দ্বারা তাহা সমর্থন করে, এবং যুক্তিবিচারের এক অথবা অপর ভাবের আলোকে একটা একান্ত বা একদেশদর্শী সমাধান উপস্থাপিত করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়, এবং সর্ববস্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু এবং নিয়ামক পরিপ্রেক্ষিত হইতে দেখে। উপনিষদগুলি যদি এই প্রকৃতির হইত তবে তাহার এরূপ অমর প্রাণশক্তি এবং অব্যর্থ প্রভাব থাকিত না, এরূপ বৃহৎ ফল প্রদান করিতে অশক্ত হইত, আর বর্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত-পদ্ধতি-পরিচালিত অনুসন্ধানের অন্য ক্ষেত্রে তাহার

উক্তিগুলি স্বতন্ত্রভাবে এরূপ সমর্থন লাভ করিত না। যেহেতু এই ঋষিগণ সত্যকে মন দ্বারা ভাবনা করা অপেক্ষা বরং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছেন,—বস্তুতঃ অবশ্য তাঁহারা সত্যকে বোধিজাত ভাব এবং আত্মপ্রকাশক রূপকের ভাষার বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন, কিন্তু সে বস্ত্র স্বচ্ছতায় আদর্শস্থানীয়, তাহার ভিতর দিয়া আমরা অসীমকে দেখিতে পাই—এবং যেহেতু তাঁহারা স্বয়ম্ভু সংস্বরূপের আলোক লইয়া বস্তুর গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং অনন্তের চক্ষু-দ্বারা দর্শন করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের বাক্যে সর্বদা সজীবতা ও অমরত্ব, অক্ষয় অর্থ, অপরিহার্য প্রামাণিকতা রহিয়াছে, যাহাদিগকে যেমন শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়, তেমনি আবার সেই সঙ্গে তাহাতে সত্যের এক অনন্ত প্রারম্ভ দেখিতে পাই—সে সত্যে আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সকল ধারা তাহাদের চরম অবস্থায় আমাদিগকে পোঁছাইয়া দেয়। মানবজাতি যে যে যুগে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে সেই সেই যুগে সে সত্য তাহাদের মনে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। উপনিষদকে বেদান্ত অর্থাৎ বেদ অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে জ্ঞানের গ্রন্থ বলা হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দ এখানে গভীরতর ভারতীয় অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় অর্থে জ্ঞান শব্দে কেবল ভাবনা বা মানবমনের দ্বারা আলোচনা ও বিচার করা, সত্যের এক মনোময় রূপ, মনোময় বুদ্ধিদ্বারা অনুসরণ ও আঁকড়াইয়া ধরা বুঝায় না, তাহার সঙ্গে চাই আত্মা দ্বারা সত্যকে দেখা, আন্তর সত্তার সকল শক্তি লইয়া সত্যের মধ্যে সমগ্রভাবে বাস করা, জ্ঞেয় বস্তুকে একপ্রকার একত্ববোধ দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে ধরা। আর যেহেতু কেবল আত্মাকে পূর্ণ রূপে জানিয়াই এই ধরনের সাক্ষাৎ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা যায়, তাই বৈদান্তিক ঋষিরা আত্মাকেই জানিতে, তাহাতে বাস করিতে এবং তাদাত্ম্যবোধ দ্বারা তাহার সহিত এক হইতে চাহিয়াছিলেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহারা সহজেই দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যস্থ আত্মা সর্ববস্তুর অন্তরনিহিত বিশ্বাত্মার সহিত এক, আবার এই আত্মাই ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত সত্তা বা বিশ্বোত্তীর্ণ পুরুষের সহিত এক; এবং তাঁহারা এই এক ও মিলনসাধক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিশ্বস্থ সর্ববস্তুর এবং মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের অন্তরতম সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহা অনুভব ও তাহাতে বাস করিয়াছিলেন। উপনিষদগুলি আত্মজ্ঞান জগৎজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের স্তবগাথা-ময় মহাকাব্য। দার্শনিক সত্যের যে বৃহৎ রূপায়ণরাজি ইহার মধ্যে সুপ্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বস্তুনিরপেক্ষ অবিশেষ জ্ঞান নহে, সে-জ্ঞান নহে যাহা শুধু মনে দীপ্তি পায় এবং মনকে দীপ্ত করে, কিন্তু জীবনে অভিব্যক্ত হয় না এবং আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখে লইয়া যায় না, পরন্তু সে-সমস্ত এমন জ্ঞান যাহাতে যেমন প্রবল উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মায়, তেমনি বোধিজাত

প্রেরণার আলোকে অন্তরকে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে, এক অদ্বয় সৎস্বরূপকে, বিশ্বাতীত ঈশ্বর ও দিব্য বিশ্বাত্মাকে যেমন দেখায় তেমনি তাহাতে পোঁছাইয়া দেয়, এবং এই বিরাট বিশ্ববিসৃষ্টির মধ্যস্থিত বস্তু ও প্রাণীসমূহের সহিত ব্রহ্মের সত্য সম্বন্ধ আবিষ্কার ও নির্ণয় করে। তাহারা দৈবীপ্রেরণালব্ধ জ্ঞানময় স্তবগান, আর সকল স্তোত্রের ন্যায় তাহার মধ্যে ধর্মের আস্পৃহা ও পরমানন্দের এক সুর ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত আছে, কিন্তু তাহাতে নিম্নতর ধর্মানুভূতি-সুলভ সংকীর্ণ ভাবের তীব্রতা নাই, কিন্তু তাহা মতবাদ ও আরাধনার বিশিষ্ট রূপরাজি হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভগবানের দিব্য সার্বভৌম আনন্দে গিয়া মিলিত হয়, সে আনন্দ লাভ হয় স্বয়ম্ভূ বিশ্বপুরুষে পেঁছিবার এবং তাঁহার সহিত একত্বে মিলিত হইবার ফলে। যদিও উপনিষদ প্রধানতঃ এক অন্তর্দৃষ্টিতে নিবদ্ধ এবং মানুষের বাহ্য কর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত নয়, তথাপি তাহা সত্যরাজির প্রাণ ও তাৎপর্যের যে আত্মপ্রকাশক রূপ ও শক্তি আনিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে বৌদ্ধ এবং পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্মের উচ্চতম নীতিশাস্ত্র নির্গত হইয়াছে—অধিকন্তু তাহাতে পুণ্যকর্মের যে-কোন নৈতিক মতবাদ বা মানসিক বিধান অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু আছে, আছে ঈশ্বর ও সর্ব-সজীব সত্তার একত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার এক পরম আদর্শ। এইজন্য যখন বৈদিক মতবাদের রূপায়ণসমূহ হইতে প্রাণশক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তখনও উপনিষদগুলি সজীব ও ক্রিয়াশীল রূপে বর্তমান ছিল এবং ভক্তি-মূলক মহান ধর্মসকলকে জন্ম দিতে পারিয়াছিল এবং ভারতীয় ধর্মের স্থায়ী ধারণাকে গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিল।

উপনিষদগুলি দিব্য উপলব্ধি, বোধি-মন ও তাহার জ্যোতির্ময় অনুভূতি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের সকল ভাব ও ভাবনা, গঠন ও বাক্যবিন্যাস, রূপক ও প্রতিরূপ, গতি ও প্রবৃত্তি এই আদি ও মূল প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এ সমস্তের মধ্যে সর্বত্র তাহার ছাপ রহিয়াছে। এই সকল সর্বাবেষ্টনকারী পরম সত্য, একত্ব, আত্মা ও সার্বভৌম দিব্যপুরুষের সম্বন্ধে এই সকল অন্তর্দৃষ্টি, সংক্ষিপ্ত অথচ অক্ষয়কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ বাক্যাংশে ঢালাই করা হইয়াছে, যাহা তৎক্ষণাৎ আত্মার চক্ষুর সম্মুখে এ সমস্ত উপস্থাপিত করে, তাহার আস্পৃহা ও অভিজ্ঞতার কাছে তাহাদিগকে বাস্তব ও অলঙ্ঘনীয় করিয়া তোলে, অথবা যাহা দিব্য প্রকাশক শক্তি এবং ব্যঞ্জনাময় ভাব-বৈচিত্র্য-বর্ণাঢ্য ও কবিত্বময় বাক্যে ব্যক্ত হইয়া একটি সীমিত রূপক বা প্রতি-রূপের মধ্য দিয়া সমগ্র অনন্তকে অভিব্যক্ত করে। তাহার মধ্যে পরম একের প্রকাশের সঙ্গে তাহার বহু বিভাবও অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাষার অত্যুৎকর্ষ দ্বারা প্রত্যেক বিভাবের পূর্ণ তাৎপর্য প্রকটিত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শব্দ ও সমগ্র বাক্যবিন্যাসরীতি এমন প্রদীপ্তভাবে যথাযথ যে, তাহাতে উক্ত প্রত্যেক

ভাব যেন স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়া নিজের যথার্থ স্থান এবং অপরসকলের সহিত নিজের যথার্থ সম্বন্ধ জানিতে পারে। ইহার দিব্যপ্রেরণালব্ধ গতিবৃত্তির মধ্যে তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় বৃহত্তম সত্যরাজি এবং অন্তর চেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ এমনভাবে গৃহীত হইয়াছে যে, তাহা দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন মনের কাছে তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট হইয়া এবং আবিষ্কারেচ্ছু আত্মার কাছে অসীম ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। উপনিষদের মধ্যে এক একটি এমন পৃথক বাক্যাংশ, কবিতার এমন এক একটি যুগ্ম চরণ অথবা এমন সংক্ষিপ্ত এক একটি পদসমষ্টি আছে, যাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশাল দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ তাহাদের প্রত্যেককে অনন্ত আত্মজ্ঞানের একটা দিক, একটা বিভাব বা একটা অংশ রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সকল কিছুই এখানে ঘনীভূত এবং গভীরার্থপূর্ণ তথাপি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ও প্রদীপ্ত, আবার অমেয় ভাবে পরিপূর্ণ। বিচারবুদ্ধি যে পন্থায় মৃদুগামী সতর্ক বাগ্‌বিস্তার দ্বারা তাহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া তোলে এই ধরনের ভাব ও ভাবনা সে পন্থা অনুসরণ করিতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যাংশ, বাক্য, যুগ্মচরণ, পঙ্‌ক্তি এমন কি অর্ধপঙ্‌ক্তির মধ্যে একটা ব্যবধান বা অবচ্ছেদ, একটা বিরাম বা অবকাশ আছে, কিন্তু এই অবকাশ অব্যক্ত ভাব বা ভাবনায় পূর্ণ, তাহার মধ্যে প্রতিধ্বনি জাগাইতে সমর্থ এক নীরবতা আছে, সে ভাব সমগ্র ব্যঞ্জনার এমন কি প্রতি পদের মধ্যে অনুক্তভাবে অনুস্যূত আছে, মন যাহাতে নিজের লাভের জন্য নিজ চেষ্টায় তাহা পরিস্ফুট করিয়া লইতে পারে তজ্জন্যই অনুক্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; আবার গভীরার্থপূর্ণ এই সমস্ত ব্যবধান বা বিরামগুলি অনেক সময় অতি বৃহৎ ভাবের দ্যোতক, এ যেন কোন অতিকায় দৈত্যের এক পর্বতশৃঙ্গ হইতে অনন্ত সলিলরাশির উপর দিয়া দূরস্থিত অপর এক শৃঙ্গে পদস্থাপনের মত, ভাব ও ভাবনার অতি দীর্ঘ পদক্ষেপ। অথচ প্রত্যেক উপনিষদের গঠনে একটা পরিপূর্ণ সমগ্রতা এবং তাহার সুসমঞ্জস অংশসমূহের মধ্যে এক ব্যাপক সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এমন একটা মনোভাব এ গঠনকার্য সম্পন্ন করিয়াছে যে একসঙ্গে সত্যের বৃহৎ আয়তনগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আবার থামিয়া গিয়া ভাব ও ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্য হইতে কেবল তাহার প্রয়োজনীয় বাক্য শুধু বাহির করিয়া আনিয়াছে। ইহার কবিতার সুন্দর ছন্দ অথবা শ্রুতিমধুর শব্দপ্রবাহযুক্ত গদ্য রচনা, ইহার ভাব ও বাক্যে গঠিত সুন্দর সৌধের ভাস্কর্যের অনুরূপ। উপনিষদের ছন্দোবদ্ধ রূপে প্রত্যেক শ্লোকে চারিটি অর্ধ চরণ আছে, স্পষ্ট-ভাবে ইহার প্রত্যেকটির পর একটা যতি বা বিরামস্থান আছে, সাধারণতঃ চরণগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং অর্থে পূর্ণাঙ্গ; দুইটি চরণার্ধে আছে দুইটি ভাব অথবা একই ভাবের দুইটি সুস্পষ্ট অংশ যাহা পরস্পরের

সহিত মিলিত হইয়া একে অন্যকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে; শব্দ বা সুরের গতিও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে, প্রত্যেক পদবিন্যাস সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট যতি বা বিরাম দ্বারা একটি অন্য হইতে পৃথক, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রুতি-মধুর অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ এবং অন্তরের শ্রুতিমূলে যেন বহুক্ষণ স্পন্দিত হইতে থাকে. প্রত্যেকটি যেন অনন্তের এক তরঙ্গ যাহা মহা-সমুদ্রের সমগ্র কণ্ঠস্বর এবং কলরব বহন করে। এ ধরনের কবিতা—দিব্য-দৃষ্টিময় বাক্য, চিদাত্মার ছন্দ—ইহার পূর্বে বা পরে আর লিখিত হয় নাই।

বেদে যে ধরনের রূপক ও উপমাদি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে উপনিষদ বহুলাংশে তাহা পরিবর্ধিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং যদিও সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাবৃত স্পষ্টতার সহিত সাক্ষাৎভাবে ও প্রদীপ্তরূপে তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে পছন্দ করে, তথাপি যাহা প্রাচীনতরকালীন প্রতীকতা-পদ্ধতির প্রকৃতির সহিত এবং তাহার যে অংশ ততটা যান্ত্রিক নহে তাহার সহিত এক ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত সেই একই প্রতীকসমূহও অনেক সময় ব্যবহার করিয়াছে। এই জাতীয় উপাদানের অর্থ আমাদের বর্তমান ভাবনা পদ্ধতিতে এখন আমরা আর ধরিতে পারি না, আর প্রধানতঃ তাহাই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে. তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য করিয়াছে যে এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র একদিকে মহত্তম দার্শনিক আলোচনা অন্যদিকে মানব-জাতির শিশুমনের অনিপুণ তোতলামি এই উভয়ের এক মিশ্রণ। বেদের সহিত উপনিষদের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় নাই, উপনিষদ বৈদিক মন প্রকৃতি ও মৌলিক ভাবধারা হইতে বিপ্লবাত্মক ভাবে সরিয়া যায় নাই. বরং ইহা তাহাদেরই পরিপুষ্টি এবং কতকটা পরিবর্ধন ও রূপান্তর, রূপান্তর এই অর্থে যে বেদে যাহা নিগূঢ় রহস্যে আবৃত অবস্থায় ছিল উপনিষদে তাহা স্পষ্ট ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদ ও ব্রাহ্মণের রূপক ও প্রতিরূপ এবং ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বন্ধীয় প্রতীকসমূহ লইয়া উপনিষদ আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহা এমন ভাবে ফিরাইয়া ধরিয়াছে, যাহাতে অন্তরের নিগূঢ় রহস্যের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, আবার তাহার আন্তর চেতনার পক্ষে এই অর্থ তাহার নিজস্ব অধিকতর সুপরিণত ও বিশুদ্ধতর ভাবের আধ্যাত্মিক দর্শনের একপ্রকার আদি বিন্দু রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদের মধ্যে, বিশেষতঃ যেগুলি গদ্যে লেখা তাহার নানা স্থানে সম্পূর্ণ এই ধরনের অনেক বাক্য আছে, যাহা সেই সময়কার প্রচলিত বৈদিক ধর্মের ভাব ও ভাবনার অন্তরগত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—অবশ্য একভাবে এ সমস্ত কথা দুরূহ ও অস্পষ্ট এমন কি বর্তমানকালীন বুদ্ধির পক্ষে বোধগম্যই নয়—আবার এই সকল স্থানে তিন প্রকার বেদের, ত্রিজগতের এবং ঐ ভাবের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু উপনিষদের ভাবনায় তাহা আমাদিগকে গভীরতম সত্যে

লইয়া গিয়াছে বলিয়া এই সমস্ত বাক্যকে বুদ্ধির অর্থশূন্য শিশুসুলভ ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি বলা চলে না, অথবা যে উচ্চতর ভাবনায় আসিয়া তাহারা শেষ হইয়াছে তাহার সঙ্গে আবিষ্কারযোগ্য সম্বন্ধ তাহাদের নাই একথাও বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে একবার তাহার প্রতীকলক্ষিত অর্থের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারি তবে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহাদের যথেষ্ট গভীর তাৎপর্য আছে। আন্তর-ভৌতিক চেতনা যখন ঊর্ধ্বস্থ আধ্যাত্মিক চেতনা ও জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ইহা আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার জন্য এখানে আমরা অধিকতর পরিমাণে মানসিক এবং কম পরিমাণে বাস্তব এবং স্বল্পতর ভাবে প্রতীকমূলক শব্দাবলি ব্যবহার করিতে চাই, কিন্তু যাহারা যোগাভ্যাস করেন এবং আমাদের চৈত্য-অন্নময়-সত্তা (psycho-physical being) ও চৈত্য-চিন্ময়-সত্তার (psycho-spiritual being) নিগূঢ় রহস্য পুনরায় আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা এখনও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। আন্তর চেতনার সত্যসকলের এই ভাবের অনন্যসাধারণ প্রকাশের কয়েকটি ব্যঞ্জনাময় উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা,—সুষুপ্তি ও স্বপ্ন সম্বন্ধে অজাতশত্রুর ব্যাখ্যা, প্রাণ-তত্ত্ব ও তাহার গতিবৃত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন-উপনিষদের বাক্যাবলি, অথবা যে সমস্ত বাক্যে বেদবর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধের ধারণা লইয়া তাহাদিগের আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে, এবং যেখানে ঋগ্বেদে ও সামবেদে যে ভাবে দেবতাগণের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে, তদপেক্ষা উন্মুক্ত ভাবে অন্তরের ক্রিয়া সাধন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের জন্য তাহাদিগকে আবাহন করা হইয়াছে।

এই যে ভাবে বৈদিক ধারণা এবং তাহার প্রতীক ও প্রতিরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার উদাহরণস্বরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে একটি বাক্য* উদ্ধৃত করিতেছি যাহাতে স্পষ্টতঃ ইন্দ্রকে দিব্য মনের শক্তি ও দেবতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে :—

"যিনি বেদসমূহের ঋষভ যিনি বিশ্বরূপ যিনি অমৃত হইতে পবিত্র ছন্দ-সমূহের মধ্যে জাত হইয়াছেন সেই ইন্দ্র মেধাদ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতের আধার হইতে পারি। আমার শরীর যেন দিব্য-দৃষ্টিতে পূর্ণ আমার জিহ্বা যেন মধুমত্তমা হয়, আমার কর্ণদ্বয় যেন বহুবিধ বাণী বৃহৎ ভাবে শুনিতে পায়। কেননা তুমি ব্রহ্মের কোশস্বরূপ, মেধাদ্বারা আবৃত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ।"

সমজাতীয় আর একটি বাক্য ঈশোপনিষদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যেখানে সূর্যদেবকে জ্ঞানের দেবতারূপে আবাহন করা হইয়াছে, যাহার মহা-জ্যোতিষ্মান পরমরূপ চিৎপুরুষের একত্বস্বরূপ, এবং এখানে এই মনোময়

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।৪।১।

ভূমিতে তাহার রশ্মিমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া ভাবনাময় মনের সমুজ্জ্বল বিস্তৃতি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহার নিজের অনন্ত অতিমানস সত্যকে, এই সূর্যের দেহ এবং আত্মাকে, দিব্য শাশ্বত পুরুষের সত্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে :—

"হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে, হে জগৎ-পরিপোষক সূর্য, সত্য-ধর্মের জন্য, দৃষ্টির জন্য তাহা অপসারিত কর। হে পূষণ, হে একমাত্র ঋষি (দ্রষ্টা), হে নিয়ন্তা যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতিপুত্র, তোমার রশ্মিমালাকে যথাস্থানে ও একত্রে সন্নিবেশিত কর; এই তেজ যাহা তোমার কল্যাণতম রূপ তাহা আমি দেখি। যিনি ইহা, এই পুরুষ—তিনিই আমি"।*

এই সমস্ত বাক্যে, বৈদিক প্রতীক ও প্রতিরূপ এবং ভাষার সঙ্গে পার্থক্য সত্ত্বেও যে আত্মীয়তা আছে, তাহা স্পষ্ট এবং বস্তুতঃ শেষোক্ত বাক্যটি পরবর্তী কালের উন্মুক্ত ভাষায় বেদের মধ্যস্থ অত্রি ঋষির একটি শ্লোকের শব্দান্তরিত প্রকাশ বা অনুবাদ।

"তোমার সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত এক সত্য আছে, তাহা নিত্য শাশ্বত, সেখানে সূর্যের অশ্বগণ ধুর (জোয়াল) হইতে মুক্ত হয়। সেখানে একত্র দশ সহস্র দণ্ডায়মান আছে; তাহা হইল এক বা অদ্বয়; আমি দেহধারী দেবগণের পরম দেবতাকে দেখিয়াছি।"

বেদ ও বেদান্তের এই সমস্ত রূপক, উপমা ও অলঙ্কার আমাদের বর্তমান মননের নিকট অপরিচিত, এ মন প্রতীকের জীবন্ত সত্যে বিশ্বাস করে না, কেননা প্রকাশসমর্থ কল্পনা বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, চৈত্যিক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করিবার, অথবা তাহার সহিত এক হইয়া তাহাকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করিবার সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এ সমস্তকে বালকোচিত বা আদিমকালীন বর্বরতাপ্রসূত রহস্য, ধাঁধা বা প্রহেলিকা মাত্র বলিলে প্রকৃত সত্য হইতে বহু দূরে চলিয়া যাওয়া হইবে; বরং বলা উচিত যে এই জ্বলন্ত জীবন্ত উজ্জ্বল কবিত্বপূর্ণ বোধিভাবিত ভাষা অতি উচ্চ অতি পরিণত এক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ।

উপনিষদের বোধিজাত ভাব ও ভাবনা এই সমস্ত প্রতীক ও বাস্তব রূপক ও প্রতিরূপ লইয়া যাত্রারম্ভ করে, যে প্রতীক রূপক ও প্রতিরূপাবলি বৈদিক ঋষিগণের নিকট নিগূঢ়ার্থসূচক দৃষ্টিপ্রদ বাক্যাবলি রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারা দ্রষ্টার মনে পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশ করে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির নিকট তাহাদের গভীরতম মর্ম লুকাইয়া রাখে; তদপেক্ষা স্বল্পতর গোপন অথচ

* ঈশোপনিষদ—১৫, ১৬।

গভীরার্থসূচক ঔপনিষদিক ভাষায় এই সকল প্রতীক ও প্রতিরূপ যুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার পর তাহা এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া অন্য এক প্রকার অতিসমৃদ্ধ মুক্ত ও উদাত্ত রূপক ও রচনারীতিসমন্বিত ভাষায় পৌঁছিয়াছে, যাহা আধ্যাত্মিক সত্যকে তাহার সকল মহিমা ও গৌরবের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গদ্যে রচিত উপনিষদসমূহের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রতীক ব্যবহার পদ্ধতি কার্যকরী অবস্থায় স্থান পাইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ওম্ (অ-উ-ম) শব্দের শক্তি ও অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্ন উপনিষদের* একটি বাক্যে এই পদ্ধতির প্রাথমিক সোপান বিশেষভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"হে সত্যকাম, ওম্ এই পদাংশ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এ উভয়েরই স্বরূপ। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের এই আয়তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের এককে বা অপরকে অনুগমন করেন। যদি কেহ (এই ওঙ্কারের) এক মাত্রার অভিধ্যান করেন তবে তাহা দ্বারা সংবোধিত হইয়া তিনি শীঘ্র ভূলোক প্রাপ্ত হন। ঋক্‌সকল তাঁহাকে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়, তথায় তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি আত্মার মহিমা অনুভব করেন। আর যদি তিনি মাত্রাদ্বয়ের অভিধ্যানের দ্বারা মনকে প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যজুসকলের দ্বারা অন্তরীক্ষে সোমলোকে নীত হন, সেই সোমলোকে আত্মার বিভূতি অনুভব করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন। আবার যিনি (অ-উ-ম এই) ত্রিমাত্রাত্মক ওম্‌মন্ত্রদ্বারা পরমপুরুষকে অভিধ্যান করেন তিনি তেজস্বরূপ সূর্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। সর্প যেমন নিজ দেহের ত্বক উন্মোচন করে (খোলস ছাড়ে) তেমনি তিনি পাপ ও অনর্থ হইতে মুক্ত হন এবং সামসমূহের দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীব-ঘন লোক হইতে পুরিশয় (পুরিতে শায়িত) পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করেন। এই তিন অক্ষর (পৃথকরূপে ব্যবহৃত হইলে) মৃত্যুর বিষয়ীভূত; কিন্তু এখানে তাহারা অবিভক্তভাবে পরস্পর যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পর আত্মার অন্তরের বাহিরের এবং মধ্যম ভাবের ক্রিয়াতে সম্যক্ প্রযুক্ত হইয়া পূর্ণ হইয়াছে, আর আত্মা ইহা জানেন এবং বিকম্পিত হন না। ঋক্‌সকলের দ্বারা এই লোক, যজু-সকলের দ্বারা অন্তরীক্ষলোক এবং সামসকলের দ্বারা যে লোকের কথা দ্রষ্টা কবিরা আমাদিগকে জানাইয়াছেন সেই লোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মের আয়তন ওম্ দ্বারা সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন যিনি শান্ত, অজর, অমর ও অভয়।"

* প্রশ্নোপনিষদ—পঞ্চম প্রশ্ন।

এখানে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি এখনও আমাদের বুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু এমন ইঙ্গিত দেওয়া আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে তাহারা আন্তর চেতনার এমন অনুভূতিরাজির বর্ণনা যাহা বিভিন্ন প্রকার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আমাদিগকে লইয়া যায় এবং আমরা দেখিতে পাই যে এই উপলব্ধির বাহ্য-ভৌতিক, মনোময় ও অতিমানসময় এই তিন অবস্থা আছে এবং ইহাদের শেষটির ফলে শান্ত ও শাশ্বত অমৃতস্বরূপ চিদাত্মার মধ্যে সমগ্র সত্তার এক পরম পূর্ণতা এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া সম্ভবপর হয়। ইহার পরবর্তীকালে মাণ্ডুক্য উপনিষদে দেখা যায় যে অন্য সমস্ত প্রতীক পরিত্যক্ত হইয়াছে আর তথায় অনাবৃত তাৎপর্যের মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইতে পারি। তারপর সেখানে এমন এক জ্ঞান উন্মিষিত হয়, আধুনিক ভাবনা তাহার সম্পূর্ণ পৃথক নিজস্ব মনোময় যুক্তিবিচারশীল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাহা ফিরিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এই জ্ঞান লাভ হয় যে আমাদের বাহ্য দেহগত চেতনার ক্রিয়াধারার পশ্চাতে অন্য এক প্রকার ক্রিয়া আছে যাহাকে অধিচেতন ক্রিয়া বলা হয়—তাহা অন্য তথাপি এক—আমাদের জাগ্রত বাহ্য মন যাহার এক বাহ্য ক্রিয়া মাত্র; তারপর আরও বুঝিতে থাকি যে তাহার উপরে—আমরা আজও বলি হয়ত—এক আধ্যাত্মিক অতিচৈতন্য আছে, যাহার মধ্যে খুব সম্ভবতঃ আমাদের সত্তার সর্বোচ্চ অবস্থা ও সমগ্র রহস্য নিহিত আছে। প্রশ্ন উপনিষদের উল্লিখিত বাক্যটিকে মনোযোগসহকারে দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, এ জ্ঞান তথায় পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, আর আমি মনে করি খুব যুক্তিযুক্ত ভাবেই আমরা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রাচীন ঋষিগণের এই সমস্ত এবং ইহার সমজাতীয় বাক্যাবলি, আমাদের যুক্তিবাদ পরিচালিত মনের কাছে তাহাদের রূপ যতই হতবুদ্ধিকর হউক না কেন, বালসুলভ ভাবাবলি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, বরং বলিতে হয় যে বর্তমান কালে যুক্তিবিচার তাহার নিজের প্রণালী ও পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাহা সত্য, এবং এক গভীর সত্য ও জ্ঞানের খাঁটি বাস্তবতা বলিয়া দেখাইতে চাহিতেছে, তৎকালীন মনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তেমন এক প্রতীক ও রূপকের ভাষায় তাহাই বলা হইয়াছে।

পদ্যে রচিত উপনিষদগুলিতেও এই উচ্চ ভাবময় প্রতীকরাজি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আরও সহজে বহন করিয়া চলিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ কবিতার মধ্যে এই জাতীয় রূপক অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট উন্মুক্ত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি আত্মা ও চিদ্বস্তু, যিনি মনুষ্য প্রাণী ও প্রকৃতির এবং এই জগতের ও অন্য জগৎসমূহের মধ্যে অনুস্যূত ভগবান, আবার যিনি সব কিছুর অতীত অমৃত স্বরূপ অদ্বয় অনন্ত তত্ত্ব, তাঁহার শাশ্বত সর্বাতিক্রমী বিভাব, এবং তাঁহার অমেয় বিচিত্র আত্মপ্রকাশশীল বিভূতি এ উভয় দিকের পরমৈশ্বর্যের মধ্যে অনাবৃত ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্তবগান এ সমস্ত

উপনিষদে করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে ধর্ম ও মৃত্যুর প্রভু যম নচিকেতাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিলে উপনিষদের প্রকৃতি কিছুটা সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে :—

"এই ওম্ হইল এক অক্ষর, এই অক্ষর ব্রহ্ম, এই অক্ষর পরাৎপর; যদি কেহ এই অক্ষর ওম্‌কে জানেন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই হইয়া থাকে। এই আলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বন উচ্চতম, এই আলম্বনকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হন। সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম জাত বা মৃত হন না, তাঁহার সত্তা কোথাও হইতে আসে নাই, তিনি কোন ব্যক্তি বা বস্তু নহেন। তিনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না...।

"তিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন, আমি ছাড়া আর কে সেই পরমানন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়? ধীর ব্যক্তি (জ্ঞানী) অনিত্য এই সকল শরীরের মধ্যে অবস্থিত অথচ অশরীরী এই মহান বিভু-আত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না। জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মেধা দ্বারা অথবা বহুবিদ্যার্জন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না; ইনি যাহাকে বরণ করেন কেবল সে-ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু প্রকটিত করেন। যে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত, শান্ত এবং সমাহিত হয় নাই, যে অশান্তমনা রহিয়াছে, সে এই আত্মাকে (মস্তিষ্কপ্রসূত) প্রজ্ঞান সহায়ে জানিতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ জ্ঞানী ও যোদ্ধা) যাহার অন্ন এবং মৃত্যু যাহার অন্নের উপকরণ, তিনি যেখানে অবস্থিত তাহা কে জানিতে পারে?

"স্বয়ম্ভূ দেহের দ্বারগুলিকে বহির্মুখী করিয়া স্থাপন করিয়াছেন সুতরাং মানুষ বাহিরের দিকে দেখে অন্তরাত্মাকে দেখে না; কেবল কোন কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতের অভিলাষী ও অন্তরাবৃত্তচক্ষু হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। বালকবৎ অজ্ঞেরা বাহ্য ভোগবাসনাগুলির অনুগমন করে এবং মৃত্যুর অতি-বিস্তৃত পাশে পতিত হয় কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা অমৃতত্বকে জানিয়া অধ্রুব পদার্থ-সমূহের মধ্যে ধ্রুবকে প্রার্থনা করেন না। এই যে আত্মার দ্বারা মনুষ্য রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ ও তজ্জনিত সুখ অবগত হয় এখানে সেই আত্মার নিকট জানিবার আর কি বাকি থাকিতে পারে? ধীর ব্যক্তি মহান বিভু ও আত্মাকে জানিয়া তাহার দ্বারা স্বপ্ন এবং জাগরণে আত্মার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা দেখিতে পান, তিনি আর শোক করেন না। তিনি আত্মাকে মধুপায়ী জীবের অতি সন্নিকটবর্তী, যাহা ছিল এবং যাহা হইবে তাহার প্রভু বলিয়া জানেন, তিনি যাহা আছে তাহার কোন কিছু হইতে সঙ্কুচিত হন না। তিনি তাঁহাকেই দেখেন যিনি তপঃশক্তির ও প্রাকৃত সলিলের পূর্বেও ছিলেন, যিনি গোপন হৃদয়গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট ও সর্বভূতের সহিত মিলিত হইয়া আছেন।

তিনি জানেন সর্বদেবতাময়ী মহাজননী অদিতিকে, যিনি প্রাণশক্তি হইতে জাত হইয়াছেন, যিনি গোপন গুহায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্বভূতের সহিত অবস্থিত আছেন। ইনিই হইতেছেন সেই জাতবেদা (যাহার জ্ঞান হইয়াছে) অগ্নি, যিনি গর্ভিণী যেরূপ যত্নে গর্ভ রক্ষা করেন তদ্রূপ অরণিদ্বয়ের (কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের) মধ্যে গোপনে রক্ষিত আছেন, সেই অগ্নি যিনি ঘৃতাদি পূজোপকরণ সহকারে জাগ্রত মনুষ্যগণের দ্বারা প্রত্যহ পূজিত হইতেছেন। তিনি হন তাহাই যাহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাহাতে অস্তগমন করেন; তাঁহাতে সকল দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এখানে যাহা আছে অন্য জগৎসকলেও তাহা আছে, আবার অন্য জগতে যাহা আছে এখানেও তাহা অনুরূপভাবে বিদ্যমান। যে এখানে কেবল নানা বস্তু বা ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষ মানুষের আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি ভূত (যাহা হইয়াছে) এবং ভব্যের (যাহা হইবে) ঈশান (প্রভু), তাঁহাকে জানিলে মানুষ কিছু হইতেই সংকুচিত হয় না। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ নির্ধূম জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি ভূত ও ভব্যের ঈশান, কেবল তিনিই অদ্য আছেন এবং কেবল তিনিই কল্য থাকিবেন।"

উপনিষদগুলি এরূপ সব বাক্যে ভরা যাহা যুগপৎ কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক-দর্শন-কথায় পরিপূর্ণ, আর সে সমস্ত অতি সুস্পষ্ট ও সৌন্দর্যময়; কিন্তু মূল শব্দ ও ছন্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনা ও গভীর সূক্ষ্ম ও প্রদীপ্ত ভাবের ধ্বনি যাহাতে নাই এরূপ অনুবাদ তাহাদের শক্তির ও পরিপূর্ণতার খাঁটি ধারণা দিতে পারে না। আবার উপনিষদে অন্য এমন বাক্যাবলি আছে যাহাতে অন্তর-চেতনার সূক্ষ্মতম সত্যরাজি এবং দার্শনিক তত্ত্বসমূহ পরিপূর্ণ মনোরমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ তাহাতে কবিত্বময় অভিব্যক্তির পূর্ণ সৌন্দর্যের হানি হয় নাই, এবং সর্বদা এরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যাহাতে তাহা মন ও আত্মাতে বর্তমান থাকিতে পারে, কেবল বোধসর্বস্ব বুদ্ধির নিকট সে সমস্তকে উপস্থাপিত করা হয় নাই। কোন কোন গদ্য উপনিষদের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে অন্য এক প্রকার উপাদান দেখিতে পাই, যাহা কেবল সংক্ষিপ্ত আভাস-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান ও সাধনা এবং উচ্চতম জ্ঞানের প্রবলপিপাসা-জাত সেই অসাধারণ আন্দোলন ও গতির তাৎকালিক এক ছবি আমাদের মনে জাগাইয়া তোলে—যাহার ফলে এ সমস্ত উপনিষদ সম্ভব হইয়াছিল। ইহার কয়েক পৃষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রাচীন জগতের দৃশ্যাবলি সজীব হইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, আমরা দেখিতে পাই ঋষিরা তাঁহাদের বনভবনে জ্ঞান-পিপাসু নবাগত রাজপুত্র, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, শক্তিশালী ভূম্যধিকারীগণকে পরীক্ষা করিবার ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, দেখিতে পাই রথারোহী রাজপুত্র হইতে জারজ দাসীপুত্র পর্যন্ত খুঁজিতেছে তেমন কোন

মহান ব্যক্তিকে যিনি আলোকময় ভাবনা এবং দিব্য ভাবপ্রকাশক শব্দ নিজের মধ্যে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হয় আদর্শ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল মূর্তিরাজি, দেখিতে পাই রাজর্ষি জনককে, সূক্ষ্মমননশক্তিশালী অজাতশত্রুকে, শকটের নিম্নে অবস্থিত রৈক্ককে; দেখিতে পাই সত্যের জন্য যুদ্ধরত অথচ শান্ত পরিহাসরসিক যাজ্ঞবল্ক্য জাগতিক ঐশ্বর্য এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ অনাসক্তভাবে দুই হাতে গ্রহণ করিতেছেন, এবং অবশেষে সকল ধনসম্পদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহশূন্য সন্ন্যাসীবেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; দেখিতে পাই দেবকীনন্দন-কৃষ্ণ ঋষি ঘোরের নিকট হইতে একটি-মাত্র শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শাশ্বত পুরুষকে জানিতে পারিয়াছেন। দেখিতে পাই যেমন ঋষিদের আশ্রম তেমনি সেই সমস্ত রাজাদিগের সভাগৃহ যাঁহারা ছিলেন রাজত্বের সহিত মনীষার অধিকারী ও আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কর্তা; আবার দেখিতে পাই সেই বৃহৎ যজ্ঞভূমিসমূহ, যেখানে মুনি ঋষিরা সমবেত হইয়া তাঁহাদের পরস্পরের জ্ঞানসম্পদের তুলনা করিতেছেন। আমরা আরও দেখিতে পাই কিরূপে ভারতের আত্মা জাত হইয়াছে এবং কিরূপে এই মহান জন্মসঙ্গীত আনন্দের পাখায় ভর করিয়া মৃত্তিকা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিৎ-পুরুষের পরম ধামে গিয়া পৌঁছিতেছে। বেদ এবং উপনিষদ যে কেবল ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের প্রাচুর্যে ভরা মূল-উৎস তাহা নহে, কিন্তু ভারতের সকল শিল্প কাব্য ও সাহিত্যেরও তাহা উৎপত্তিস্থল। তাহাদের মধ্যে যে আত্মা, যে প্রকৃতি, যে আদর্শ মন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই পরবর্তীকালে মহান দর্শনশাস্ত্রসকল সৃষ্টি ও ধর্মের সুবিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে, মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে তাহাদের বীর্যোদ্‌ভাসিত যৌবনের এবং ইতিহাসবিখ্যাত ক্লাসিক্যাল যুগের পরিণত মনুষ্যত্বের অক্লান্ত মননশীলতার বর্ণনা দিয়াছে, জড়বিজ্ঞানের মধ্যে সৃজনশক্তিসম্পন্ন বোধির কত আলোকরশ্মি ফেলিয়াছে, রসবোধ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার এমন সমৃদ্ধ দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তন্ত্র ও পুরাণের মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা ও অন্তরচেতনার অনুভবরাজির নূতন রূপ দিয়াছে, চিত্রে রূপরেখা ও বর্ণের সমাবেশে গরিমা ও সুষমার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়াছে, পাথর কাটিয়া ধাতু ঢালাই করিয়া তাহার ভাবনা ও দিব্যদৃষ্টিকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে, পরবর্তী কালের ভাষাগুলির মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়াছে, এবং কিছুকাল রাহুগ্রস্ত থাকিবার পর ভেদ সত্ত্বেও সর্বদা সেই একই বস্তুরূপে নূতন জীবন ও নূতন সৃষ্টির জন্য এখন প্রস্তুত হইয়া পুনরায় উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য

তাহা হইলে দেখিতেছি বেদে ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ও আন্তর-চেতনার বীজ রহিয়াছে, এবং উপনিষদে উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতির সত্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহাই সর্বদা এ সংস্কৃতির প্রধানতম ভাব ও আদর্শ রূপে থাকিয়া ব্যক্তিগত জীবনের চরম লক্ষ্য এবং জাতীয় আত্মার আস্পৃহা সেইদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে; আবার এই দুই বিরাট পবিত্র শাস্ত্র, এ জাতির কবিত্বময় ও সৃষ্টিশীল আত্মপ্রকাশের এই বৃহৎ প্রথম প্রচেষ্টা, বিশুদ্ধ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক মননশীলতা হইতে জাত এবং এই মননের ভাষায় লিখিত হইয়াছে; যে যুগে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরে বীর্যবন্ত ও প্রাচুর্যপূর্ণ এবং আরও পরে অতিসমৃদ্ধ ও অপরূপ মননশীলতার বৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটিয়াছে। এইভাবে আরব্ধ পরিণামধারাকে জড়ের মধ্যে চিৎসত্তার একপ্রকার সমৃদ্ধিদায়ক অবতরণের সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে এবং জীবন জগৎ ও আত্মার সকল সম্বন্ধ, যুক্তিবিচার ও ব্যবহারিক বুদ্ধির নিকট যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জন্য প্রথমে এক মানসিক প্রচেষ্টায় রত হইতে হইয়াছে। এই মানসিক সাধনার প্রথম যুগের গতিধারার সঙ্গে স্বভাবতই এ জাতির মন ও আত্মা, যাহাতে সচেতনভাবে প্রকাশিত হইতে পারে এমন এক জীবনের গঠন ও পরিণতির ব্যবহারিক দিকটা বর্তমান ছিল; যাহাতে মানবজীবনের ঐহিক লক্ষ্যসকল পূর্ণ হয় তজ্জন্য ধর্ম নীতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সতর্ক শাসনাধীনে এক শক্তিশালী ও সার্থক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, কিন্তু যাহাতে মানুষের আত্মার পরিণামধারা এই সমস্তের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তাহাতে ছিল। ভারতের সাহিত্যসৃষ্টির যে যুগ ইহার অব্যবহিত পরে আসিয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই জাতীয় জীবনের গতিধারার এই স্তর আশ্চর্যরূপে ও সফলভাবে প্রাচুর্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ বিচার ও সমালোচনার চেষ্টার ক্ষেত্রে, ভারতীয় মনের এই গতি-ধারার ফলে একদিকে অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়া

দর্শনের নানা বৃহৎ প্রণালী গড়িয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে নৈতিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিয় আদর্শ ও আচরণকে স্পষ্ট দৃঢ় ও প্রতীতিজনকভাবে এবং সুসমঞ্জস রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য সমানভাবে এক অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছিল, সে চেষ্টার ফলে বহু প্রামাণিক সামাজিক গ্রন্থ বা শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত মনুসংহিতা (বা মনুর বিধান) বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। দার্শনিকগণের কাজ হইল বোধি দিব্যপ্রকাশ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত আত্মা, মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত সত্য বেদ ও উপনিষদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিচারশীল বুদ্ধির কাছে সমর্থিত করা, এবং সেই সঙ্গে এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সাধনার পদ্ধতিসমূহ নির্দেশ করা, এবং তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গড়িয়া তোলা, যাহাতে তৎসাহায্যে মানুষ তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। যে বিশিষ্টভাবে ইহা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় বোধির ক্রিয়া বিচারশীল মননের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইতেছে, এবং এই রূপান্তরের প্রকৃতির প্রকাশ-সূচক ছাপ ও রূপ তাহাতে রক্ষিত আছে। এখানে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের বাহুল্য-দোষবর্জিত সারগর্ভ ও বোধির উপাদানে ভরা বাক্য বা বাক্যাংশের স্থলে আরও বেশী সংহত ও ঘনীভূত এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা পূর্বের মত আর তেমন কবিত্বময় ও বোধিভাবিত নয়, কিন্তু অতি কঠোরভাবে বুদ্ধিজারিত—অতি অল্প কথায়, কখনও বা একটি কি দুইটি মাত্র শব্দে ক্ষুদ্রতম নিশ্চয়াত্মক একটি সূত্রে (যাহা তাহার সংহত পরিপূর্ণতার জন্য অনেক সময় যেন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে) একটি তত্ত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে, একটি দার্শনিক ভাবের পূর্ণ পরিণতি অথবা বহুল পরিমাণে ফলাফল সমন্বিত বিচারধারার একটি সোপান প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত সূত্র বা বচনকে ভিত্তি করিয়া, তত্ত্ববিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রের পদ্ধতিদ্বারা যুক্তিবিচার সহযোগে ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করিয়া, এই সমস্ত সূত্রের ধারারাজির মধ্যে প্রথম হইতে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক সময় বহু প্রকারের অর্থ বাহির করা হইয়াছে। এ সকল ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একমাত্র লক্ষ্য আদি ও চরম সত্য কি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি বা মোক্ষলাভের উপায় কি তাহা নির্ণয় করা।

পক্ষান্তরে সমাজের ক্ষেত্রে মনীষী ও বিধিব্যবস্থাপ্রণেতাগণ সাধারণ ও স্বাভাবিক কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সাধারণ জীবন, তাহার কামনা লক্ষ্য ও প্রয়োজন, তাহার বিধিবদ্ধ বিধান ও প্রচলিত প্রথাগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং তেমনি পূর্ণ ও অসন্দিগ্ধ ভাবে সূত্রাকারে ব্যক্ত করিতেন,

আর সেই সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির নিয়ামক প্রধান প্রধান ভাবধারার সহিত সবকিছুর সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, এইভাবে প্রোজ্জ্বল বুদ্ধি সহকারে এক সামাজিক পদ্ধতি গঠিত ও স্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে এমন এক ভিত্তি, এক কাঠামো এবং ক্রমবিন্যস্ত সোপানশ্রেণী পাওয়া যায় যাহা অবলম্বন করিয়া প্রাণময় ও মনোময় ধাপ হইতে মানুষের জীবন নিশ্চিতভাবে ক্রমবিকশিত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। তাহাদের প্রধান ভাবধারা এই ছিল যে মানুষের বাসনা ও প্রয়োজনগুলি নৈতিক বিধান বা ধর্ম দ্বারা এমন ভাবে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, যাহাতে প্রাণ, অর্থনীতি, রসবোধ, সুখানুভূতি, মন ও অন্য সকল ভাবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন যথাযথভাবে এবং প্রকৃতির খাঁটি বিধানানুসারে তৃপ্ত করিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে। এখানেও এ সমস্তের প্রথম রূপ আমরা বৈদিক গৃহ্যসূত্রের মধ্যে সূত্রাকারে এবং তাহার পর আরও বিস্তৃত ও পূর্ণরূপে সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে পাই, গৃহ্যসূত্র সরল ও মৌলিক ধর্মময় সামাজিক জীবনের তত্ত্বাবলি এবং তাহাদের আচরণ ও অনুশীলনের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়াই তৃপ্ত ছিল, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র জাতির বা মানুষের ব্যষ্টিগত সম্প্রদায়গত ও সমষ্টিগত জীবনের সবকিছুকে গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাহার সর্বাঙ্গসুন্দরতা এবং যে ভাব ও আদর্শ ইহার সর্বাংশে অনুস্যূত থাকিয়া ইহাকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সর্বদা তাহাতে যে একতা ও সমতা রক্ষিত হইয়াছে তাহা প্রভূতরূপে প্রমাণ করে যে, এ জাতির মানসিক রসবোধাত্মক ও নৈতিক চেতনা অতিপরিণতি লাভ করিয়াছিল, এবং এ জাতি এক উচ্চ প্রকৃতিবিশিষ্ট শক্তিশালী মহান ও সুসম্বদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। ইহার মধ্যে যে বুদ্ধি কার্য করিয়াছে, যে জ্ঞান ও গঠনশীল শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে এ জাতি প্রাচীন বা আধুনিক অন্য কোন জাতির মধ্যে অভিব্যক্ত এই সমস্ত গুণ বা শক্তি হইতে কোনক্রমে হীনতর নহে; আর ইহার মধ্যে যে গাম্ভীর্য, ভাব ও ধারণার যে মিলিত স্বচ্ছতা ও মহত্ত্ব আছে, তাহা—অন্ততঃ সংস্কৃতির খাঁটি পরিচয়ের ক্ষেত্রে—পরবর্তী যুগের মানুষ যাহার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই বৃহত্তর সাবলীলতা, অধিকতর তথ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, এবং পরীক্ষামূলক সাহসের সোৎসুক নমনীয়তার সহিত তুল্যমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যে মন একটি সুন্দর ও সুসমঞ্জস সমাজপদ্ধতি গড়িবার জন্য এমন নিবিষ্ট ভাবে সতর্ক ছিল, তাহার শাসন ও পরিচালনার জন্য এবং জীবনের শেষে বৃহৎ পূর্ণতা ও মুক্তির জন্য, এরূপ উচ্চ ও সুস্পষ্ট ভাব ও ভাবনা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল সে মন অন্ততপক্ষে যে বর্বর বা অসভ্য ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

এই যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতিনিধিরূপে দুইখানি বৃহৎ মহাকাব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার একখানি মহাভারত যাহার বিশাল আয়তনের মধ্যে ভারতীয় মনের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রচিত কবিতার বৃহত্তর অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, আর একখানি রামায়ণ। এই দুই কবিতাগ্রন্থ তাহাদের প্রেরণা ও প্রকৃতিতে মহাকাব্যজাতীয়; অথচ তাহারা পৃথিবীর অন্য কোন দুইখানি মহাকাব্যের সঙ্গে একজাতীয় নহে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাহাদের তত্ত্বে বা মূল ভাবে অপর সকল মহাকাব্য হইতে তাহারা সূক্ষ্মভাবে ভিন্ন প্রকারের। আবার শুধু তাহাই নহে, যদিও তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক প্রাচীন বীরত্বকাহিনী এবং আদিকালের অনেক উপাদান রূপান্তরিত অবস্থায় আছে, তবু মননশীল রসভাবিত ও সামাজিক সংস্কৃতির এক অতি পরিণত যুগের রূপ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়; পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত ভাব ও ভাবনারাজি দ্বারা তাহারা সমৃদ্ধ, এবং নৈতিক সুরের সুপরিণত মহত্ত্ব এবং বিশোধিত গাম্ভীর্যের দ্বারা উন্নীত হইয়াছে এবং সেইজন্য আইসল্যান্ড নরওয়ে ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের আদি যুগের প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ বা পৌরাণিকী কথা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু; আবার দৃষ্টির বিশালতা, সারগর্ভ বিষয়ের সমাবেশ এবং প্রেরণার উচ্চতার দিক হইতে—আমি এখন রসবত্তা এবং কবিত্বের পূর্ণতার দিকের কথা বলিতেছি না—হোমারের কাব্যাবলি হইতে এ দুই মহাকাব্য শ্রেষ্ঠতর; সেইসঙ্গে বলিতে হইবে ইহাদের মধ্যে প্রাণের এমন এক প্রাচীন আবহাওয়া, সাক্ষাৎ ও ঋজুভাবে অগ্রগামী এমন তেজ ও স্ফূর্তি, এমন মহত্ত্ব ও পরিস্পন্দন, সৌন্দর্য ও শক্তির এমন সরল প্রকাশ আছে, যাহাতে ইহাদিগকে ভার্জিল বা মিলটন, ফার্দুসী বা কালিদাসের বহুশ্রমসম্পাদিত সাহিত্যগুণোপেত মহাকাব্যগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আদিকালের বীরত্বপূর্ণ দ্রুতগামী ও বীর্যবন্ত জীবনীশক্তির স্বাভাবিক স্পন্দনের সহিত নৈতিক চিন্তাশীল এমন কি দার্শনিক মনের অতিপরিণতি ও ক্রিয়াধারার এই এক অপরূপ মিলন ও মিশ্রণ হইয়াছে, যাহা বস্তুতঃ ইহাদের এক অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য; এ সমস্ত কবিতা একটা জাতির যৌবনের বাণী, কিন্তু এ যৌবন কেবল নবীন ও স্ফূর্তিযুক্ত, মনোরম ও হর্ষোৎফুল্ল নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে উদার ও নানা ঐশ্বর্যসমন্বিত, জ্ঞানঘন ও মহান। এই তো হইল প্রকৃতিগত একটা পার্থক্যমাত্র, আরও দূরপ্রসারী আর একটা বিভিন্নতা আছে, তাহা হইল সমগ্র ভাব ও ধারণা, ক্রিয়াধারা ও গঠন-রীতির পার্থক্য।

সার্থক ঐতিহ্য বা ইতিহাসের জ্ঞান প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল; প্রাচীন সমালোচকগণ মহাভারত ও রামায়ণকে পরবর্তী সাহিত্যিক মহাকাব্যসকল হইতে পৃথক করিবার জন্য তাহাদিগকে ইতিহাস নামে অভিহিত

করিয়াছেন। ইতিহাস ছিল ইতিবৃত্ত বা পরম্পরাগত পৌরাণিকী কথা, যাহা আধ্যাত্মিকতা ধর্ম আদর্শ বা সুনীতির কোন অর্থপ্রকাশক পুরাবৃত্ত বা আখ্যায়িকারূপে সার্থক সৃষ্টিশীল কার্যে ব্যবহৃত হইত এবং এইভাবে তাহা জাতীয় মন গঠিত করিয়া তুলিত। মহাভারত ও রামায়ণ এই জাতীয় ইতিহাস —অতি বৃহৎ আকারে এবং অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। যে সমস্ত কবি ইহা লিখিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বৃহৎ কাব্যসাহিত্যে নূতন কিছু যোগ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন একটি আখ্যায়িকা কেবল সুন্দর বা মহৎভাবে বলিবার জন্য, অথবা এমন কি কৌতূহল ও অর্থের বহুসমৃদ্ধিতে ভরপুর শুধু এক কাব্যগ্রন্থ লিখিবার জন্য ইহা লিখিতে বসেন নাই। যদিও এ উভয় বিষয়ে তাঁহারা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বোধ লইয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহারা স্থপতি ও ভাস্কর রূপে, সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যাকার রূপে জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছেন, জাতীয় ভাবনা ধর্মনীতি ও সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ সাধন করিতেছেন। জীবনের ভাব ও ভাবনার এক গভীর ও সতেজ ধারা, ধর্ম ও সমাজের এক বৃহৎ ও প্রাণময় দৃষ্টি, দার্শনিক ভাবধারার একটা সুর এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে অনুস্যূত আছে, ভারতের সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃতি, প্রতিভা ও বুদ্ধিজাত ভাব ও ধারণা সজীব ভাবে প্রকাশের শক্তির সঙ্গে, ইহাদের মধ্যে রূপগ্রহণ করিয়াছে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে এবং মহাভারত ও রামায়ণ এ উভয় গ্রন্থকে কেবল মহাকাব্য বলা হয় নাই, পরন্তু ধর্মশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে ইহারা ধর্ম নীতি সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির এক বৃহৎ শিক্ষাভাণ্ডার; আর এ জাতির জীবন ও মনের উপর তাহাদের প্রভাব এত অধিক যে এই দুই গ্রন্থকে ভারতীয় জাতির বাইবেল (বা ধর্মগ্রন্থ) বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তুলনা পুরাপুরি ঠিক নহে, কেননা ভারতবাসীর বাইবেলের মধ্যে এ দুই গ্রন্থ ছাড়া বেদ ও উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র বা সংহিতাগুলিও আছে—প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতার এক বৃহৎ অংশের কথা যদি তাহার মধ্যে নাও ধরি। উচ্চ দার্শনিক ও নৈতিক ভাবধারা এবং সংস্কৃতিগত আচার-ব্যবহার সাধারণের মধ্যে প্রচার করাই ছিল এই সমস্ত মহাকাব্যের কার্য; যাহা কিছু আত্মা ও ভাবনার নিকট অত্যুত্তম বা জীবনের নিকট সত্য, বা সৃষ্টিশীল কল্পনা ও আদর্শ-মনের নিকট বাস্তব, অথবা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত সমাজ নীতি রাষ্ট্র বা ধর্মের প্রদীপ্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশক, সে সমস্তকে মহাকাব্যের কাঠামোর মধ্যে কবিত্বময় আখ্যায়িকার পটভূমিকায় জনগণের হৃদয়ে, যাহাদের স্মৃতি স্থায়ী হইয়া আছে জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সেই সমস্ত সার্থক-কর্মা ব্যক্তির চারিদিকে, হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভঙ্গী সহকারে কার্যকরীভাবে সুস্পষ্ট ও সমুন্নত-রূপে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত বস্তু অর্থেক

পৌরাণিক কথা, অর্ধেক ইতিহাসমূলক ঐতিহ্যের মধ্যে একত্রে গ্রথিত করিয়া অপূর্ব শিল্পকুশলতার সহিত বিশেষ ফলপ্রসূ রূপে কাব্যের ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে, আর তাহার পর হইতে তাহারা গভীরতম অতি সজীব সত্য ও তাহাদের ধর্মের এক অংশ বলিয়া এ জাতির হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হউক বা প্রাদেশিক ভাষায় পুনর্লিখিত হউক, এইভাবে গঠিত মহাভারত ও রামায়ণ কথক চারণ আবৃত্তিকার ও ব্যাখ্যাকারগণের দ্বারা সর্বসাধারণের নিকট নীত হইয়া, তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক প্রধান যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং আজিও তাহা রহিয়াছে; আর তাহারা জাতীয় জীবনের ভাবনা চরিত্র রসভাবিত এবং ধর্মময় মন গড়িয়া তুলিয়াছিল, এমন কি নিরক্ষর মূর্খের নিকটও দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাবধারা, রসভাবিত ও আবেগময় কবিতা গল্প ও মনোরম উপন্যাসের সারাংশ, কতকটা প্রচুর পরিমাণে দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুশিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে যাহা বেদ ও উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অথবা গভীরার্থসূচক দার্শনিক সূত্রের এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, অথবা ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত, সেই সমস্ত এখানে সৃষ্টিসমর্থ জীবন্ত মূর্তিতে পরিচিত উপাখ্যান বা পৌরাণিকী কথার মধ্য দিয়া জীবনের সুস্পষ্ট চিত্রে মিশ্রিত ও প্রতিফলিত করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে; যাহা যুগপৎ আত্মা কল্পনা ও বুদ্ধিকে স্পর্শ ও মুগ্ধ করে, তেমন কবিত্বময় ভাষার মধ্য দিয়া এ সমস্ত বিষয়কে এইরূপে নিকটে আনিয়া এমন জীবন্ত শক্তিশালী করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই তাহা গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারে।

বিশেষতঃ মহাভারত কেবল ভারতগণের কোন আখ্যায়িকার বা যাহা জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছে এমন কোন প্রাচীন ঘটনার মহাকাব্য নহে; কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মা, ধর্মানুগত ও নৈতিক মন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ, সংস্কৃতি ও জীবনেরও ইহা এক বিশাল মহাকাব্য। অনেকটা সত্যের সঙ্গেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে ভারতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই মহাভারতে আছে। মহাভারত কেবল একমাত্র কোন ব্যক্তিমনের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি নহে, কিন্তু একটা জাতির মন ইহা সৃষ্টি ও প্রকাশ করিয়াছে; ইহা নিজেরই এমন এক কাব্যরূপ যাহা সমগ্র জাতি দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সীমাবদ্ধ প্রেরণা লইয়া যে সমস্ত মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য কবিত্ব-শিল্প-শাস্ত্রের বিধানের দ্বারা ইহার বিচার চলিতে পারে না, তথাপি ইহার প্রত্যেক অঙ্গ ও সমগ্র দেহ মহান শিল্পসৌন্দর্যে সচেতন ও অকৃপণ ভাবেই বিভূষিত করা হইয়াছে। সমগ্র কাব্যখানি বিরাট এক জাতীয় মন্দিরের মত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে বিশাল ও নানামুখী ভাব ও ভাবনার সম্পদ ধীরে ধীরে আমাদের বিস্মিত

চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইতে থাকে, দেখা যায় তাহার দেওয়াল সার্থক চিত্রসঙ্ঘ, ভাস্কর্য ও উৎকীর্ণ লিপিতে ভরিয়া আছে, সংঘমধ্যস্থ মূর্তিগুলি দিব্য বা অর্ধদিব্য ভাবে খোদিত করা হইয়াছে; মানবতাকে বর্ধিত ও অর্ধ-উন্নীত করিয়া অতিমানবতাতে পরিণত করা হইয়াছে, এবং তথাপি সর্বত্রই তাহাতে মানবীয় ভাব প্রেরণা ও অনুভূতি রহিয়াছে, উন্নীত আদর্শের সুরের মধ্যে বাস্তবতার সুর সদা বর্তমান আছে, এই জাগতিক জীবনের ছবি অতি প্রচুর ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ইহার পশ্চাতে অবস্থিত লোক-রাজির শক্তির সচেতন প্রভাব ও সান্নিধ্যের অধীন রহিয়াছে ইহা দেখানো হইয়াছে; মূর্ত ঘটনাবলির দীর্ঘ ও বিচিত্র শোভাযাত্রার মধ্যে একই স্থায়ী ভাব অবস্থিত থাকিয়া সকলকে সমগ্রভাবে মিলিত করিয়া কবিত্বময় আখ্যায়িকার বিস্তৃত সোপানপরম্পরার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আখ্যায়িকার পরিচালনা মহাকাব্যের বর্ণনায় অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহাই কাব্যের প্রধান আকর্ষণের বিষয়, এই গ্রন্থে যুগপৎ বৃহৎ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আখ্যায়িকার গতি অতি উত্তমরূপেই রক্ষিত হইয়াছে, আদ্যন্ত সে গতি উদার ও নির্ভীক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় বিস্ময়কর ও কার্যকরী, সর্বদা সরল ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও রচনারীতিতে তাহা মহাকাব্যধর্মোপেত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, যদিও কবিত্বময় একটি গল্প বলিবার ভঙ্গিতে তাহা সুস্পষ্ট এবং বিষয়-বস্তুতে পরম রমণীয়, তথাপি ইহাতে আরও কিছু আছে,—ইহা একটি সার্থক গল্প, একখানি ইতিহাস, সর্বাংশে ইহা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগত ভাব ও আদর্শরাজির প্রতিনিধি। ভারতীয় ধর্মভাবই ইহার প্রধান প্রেরণা। সত্য আলোক ও একত্বের দেবশক্তিগণ এবং অন্ধকার ভেদ ও মিথ্যার আসুরিক শক্তিগণের মধ্যে যে সংগ্রাম বেদে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের এবং অন্তর্জগতের ভূমিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে তথা হইতে সে সংগ্রামকে বাহিরে আনিয়া মন নীতি ও প্রাণের ক্ষেত্রে স্থাপিত করা হইয়াছে। এই আখ্যায়িকার মধ্যে সংগ্রাম ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিক এই দুই রূপ নিয়াছে; ব্যক্তিগত সংগ্রামে রত দুই পক্ষের মধ্যে একদিকে আছে যাহারা ভারতীয় ধর্মের বৃহত্তর নৈতিক আদর্শকে মূর্তিমান করিয়াছে তাহাদের প্রতিনিধিগণ ও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অপর পক্ষে আছে তাহারা যাহারা আসুরিক অহংকার ও স্বৈরাচারের মূর্ত বিগ্রহ হইয়া ধর্মের অপব্যবহার করিতেছে; এই ব্যক্তিগত সংগ্রাম রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেখানে আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করিয়া অবশেষে তাহা পুণ্য ও ন্যায়পরতার এক নূতন শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ধর্মের এক নূতন রাজ্য অথবা বরং এক সাম্রাজ্য উদ্ভব হইয়াছে যাহার মধ্যে সকল যুদ্ধরত জাতি আসিয়া একত্বে মিলিত হইয়াছে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিচালিত রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দম্ভ ও দর্পের স্থানে এক শান্ত শান্তিপূর্ণ ন্যায়পর লোকহিতকর

সাম্রাজ্যের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দেবতা ও অসুরের, ঈশ্বর ও দৈত্যের সেই প্রাচীন যুদ্ধ কিন্তু এখানে মানুষের জীবনের ভাষায় তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

এই দুই রূপ যেভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত জীবনাবলির গতিবৃত্তি ও সেই সঙ্গে প্রথমে ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকা এবং তাহার পর তাহাদের রাজ্যগুলি, সৈন্যবাহিনীগণ এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়া পুরোভাগে উপস্থিত জাতীয় জীবনের ক্রিয়াকলাপ যেভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই কাব্যের ক্ষেত্রে এক অতি উচ্চ স্থাপত্যনৈপুণ্য আসিয়া গিয়াছে, ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যেভাবে কবিত্ব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা তাহার সমজাতীয়, উভয়ত্রই সব কিছু বৃহৎ কবিদৃষ্টি ও কবিত্বময় শিল্পকুশলতার সঙ্গে সংগঠিত ও রচিত হইয়াছে। উভয় স্থানেই সমগ্র দৃষ্টি দিয়া বিশাল আয়তনরাজিকে আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করিবার সেই একই শক্তি রহিয়াছে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত স্পষ্ট জীবন্ত কার্যকরী ও সার্থক প্রাচুর্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলিবার দিকে সমান আগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনার কাঠামোর মধ্যে অন্য আখ্যায়িকা, পৌরাণিকী কথা এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনার অতিপ্রচুর উপাদান আনিয়াও ফেলা হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপযোগী সার্থক প্রকৃতি এবং দার্শনিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ভাব ও ভাবনা অতি প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, আর এ সমস্ত কখনও সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত কখনও বা পুরাবৃত্ত বা আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্য দিয়া রূপায়িত করা হইয়াছে। উপনিষদ ও মহান দর্শনসমূহের ভাবধারাগুলিকে সর্বদাই আনয়ন করা হইয়াছে এবং কখনও বা গীতায় যাহা করা হইয়াছে সেইভাবে সে সমস্তের নব পরিণাম দান করা হইয়াছে; পৌরাণিকী ধর্মকথা, আখ্যায়িকা, ভাবধারা ও শিক্ষা ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে; জাতির নৈতিক আদর্শসকল অভিব্যক্ত করা হইয়াছে অথবা আখ্যায়িকা ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া কিম্বা আখ্যায়িকার মধ্যস্থিত ব্যক্তিবর্গের জীবনে মূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছে; রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শরাজি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুরূপভাবে পরিণত বা অতি স্পষ্ট ও জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া জাতীয় জীবনের সহিত যুক্ত রস ও সৌন্দর্যের অথবা অন্যভাবের ব্যঞ্জনার জন্যও স্থান রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত বস্তুকেই অপরূপ নৈপুণ্য ও অন্তরঙ্গতার সহিত এই মহাকাব্যের বর্ণনার সর্বত্র সংগ্রথিত করা হইয়াছে। যাহাতে অসমান শক্তিবিশিষ্ট বহু কবির দান আছে তেমন এক সম্মিলিত ও দুরূহ কার্যের পক্ষে অপরিহার্য বৈষম্যগুলি ইহার পরিকল্পনার সাধারণ বিশাল বহুমুখী বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে যথাস্থানেই রক্ষিত হইয়াছে, আর এ

মহাকাব্য আমাদের মনের উপর যে সমগ্র ছাপ ফেলে তাহারা তাহা ভাঙিগয়া দেয় না বরং তাহার সহায়তা করে। সমগ্র গ্রন্থখানি একটা জাতির সমগ্র অন্তরাত্মা, ভাবনা ও জীবনের শক্তি ও পূর্ণতার কবিত্বময় এক অনন্যসাধারণ প্রকাশ।

রামায়ণ মূলতঃ মহাভারতের সহিত একই জাতীয় গ্রন্থ, শুধু পরিকল্পনার বৃহত্তর সরলতা, কমনীয়তর আদর্শ প্রকৃতি ও কবিত্বের সূক্ষ্মতর বর্ণাঢ্য উদ্দীপনার অধিকতর বিশোধিত দীপ্তিই ইহার বৈশিষ্ট্য। অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত বা উপলিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এ কাব্যের প্রধান অংশ স্পষ্টতঃ একজনেরই রচিত এবং ইহার গঠনের একত্ব ও সামঞ্জস্য অধিকতর সুব্যক্ত এবং স্বল্পতর পরিমাণে জটিল। মহাভারতের সহিত তুলনায় ইহার মধ্যে দার্শনিক মন অপেক্ষা বিশুদ্ধ কবিমনের প্রভাব বেশী, গঠননৈপুণ্য অপেক্ষা শিল্পকুশলতা অধিক। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র আখ্যায়িকাটি অখণ্ড ভাবে লিখিত এবং বর্ণনার স্রোত অব্যাহত, কোথাও তাহার বিচ্যুতি ঘটে নাই। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে, ইহাতে মহাভারতের মতই দৃষ্টির বিশালতা আছে, কিন্তু ভাব ও ধারণার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠনের স্থায়ী সমৃদ্ধিতে ইহার মহাকাব্যোচিত রসগাম্ভীর্য অধিকতর ঊর্ধ্বে বিশাল পক্ষবিস্তার করিয়া উড্ডীন হইয়াছে। মহাভারতের শক্তিশালী গঠন, বীর্যবন্ত গঠননৈপুণ্য ও সন্নিবেশপ্রণালী দেখিলে যেমন আমাদের ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের কথা মনে পড়ে, তেমনি রামায়ণের রেখাচিত্রের সমারোহ ও নির্ভীকতা, বর্ণবিন্যাসের ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্ম অলঙ্কারের সমাবেশপ্রণালী দেখিলে বরং মনে হয় সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতির প্রতিলিপি যেন দেখিতে পাইতেছি। এখানেও মহাকবি তাঁহার কাব্যের বিষয় রূপে এক ইতিহাস, ভারতের প্রাচীন এক রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এক পুরাতন আখ্যায়িকা বা পুরাকাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা এবং প্রাচীন জনশ্রুতি ও রীতিনীতির নানা বিশেষ বিবরণ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু সব কিছুকে উন্নীত করিয়া মহাকাব্যের গৌরবময় মূর্তিতে এমনভাবে পরিণত করিয়াছেন যাহাতে তাহারা সমুচ্চ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের আরও উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের মত এখানেও দেখিতে পাই সেই এক বিষয়, পার্থিব জীবনে দৈব ও আসুর শক্তির সংগ্রাম। কিন্তু ইহাতে আরও বিশুদ্ধ আদর্শের রূপাবলি রহিয়াছে, তাহারা পরিমাণে অকপটভাবে স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, কল্পনা-বলে মানবচরিত্রের সু ও কু এ উভয়কে উচ্চে তুলিয়া বড় করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। যুধ্যমান শক্তিদ্বয়ের এক পক্ষের আদর্শ মানবত্ব, সাধুতা ও নৈতিক বিধানের দিব্য সৌন্দর্য, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, সমুন্নত আদর্শ, নৈতিক সিদ্ধির উচ্ছ্বাস এমনভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে যে তাহাতে রসসুষমা

সামঞ্জস্য ও মাধুর্যের এক অসাধারণ বীর্যবন্ত আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে রহিয়াছে অতিমানুষিক অহংকার ও স্বৈরতার এবং হর্ষোৎফুল্ল অত্যাচারের বন্য ও উচ্ছৃংখল প্রায়-অনিয়তাকার (amorphous) প্রবল শক্তি-সমূহের মনোময় প্রকৃতি; জীবন্ত ও মূর্ত এই দুই ভাবধারার, এই দুই শক্তির যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং পরিণামে রাক্ষসের উপর দিব্য মানবের জয়লাভ দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে যাহা কিছু ভাবের অমিশ্র বিশুদ্ধি, মূর্তিরাজির রেখাচিত্রের মধ্যস্থিত আদর্শস্থানীয় শক্তি অথবা প্রকৃতির পরিচায়ক বর্ণবিন্যাসের তাৎপর্য হ্রাস করিয়া দিতে পারে তেমন সকল ছায়া ও জটিলতা বর্জন করা হইয়াছে, আর আবেদন ও তাৎপর্য যাহাতে মানুষীভাবাপন্ন হয় তজ্জন্য যতটুকুমাত্র প্রয়োজন কেবল ততটুকুর মাত্র স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমাদের জীবনের পশ্চাতে যে বিরাট শক্তিসমূহ রহিয়াছে কবি তাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এবং মহাকাব্যোচিত বিশাল শোভা ও সমারোহপূর্ণ নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে তাহার ক্রিয়াকে স্থান দিয়াছেন; বৃহৎ রাজকীয় পুরী, পর্বতাবলি, সমুদ্রসমূহ, অরণ্য ও বন্যপ্রদেশসকল এরূপ বৃহৎ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে আমাদের মনে হয় যে সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি তাঁহার কাব্যের দৃশ্যপট, আর বর্ণিত বিষয়ে মানুষের দিব্য ও আসুরিক সমগ্র সম্ভাবনা মহান অথবা ভীষণ কয়েকটি মূর্তির মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে ভারতের নৈতিক ও রসিক মন এক সুসমঞ্জস একত্বের মধ্যে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং এমন এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও বিশালতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহা আর কোথাও কখনও দেখা যায় নাই। রামায়ণে ভারতীয় কল্পনার উপযোগী ভাবে তাহার মানবচরিত্রের উচ্চতম ও কোমলতম আদর্শরাজিকে মূর্তিমন্ত করিয়া তোলা হইয়াছে, ইহা বীর্য ও সাহস, ধীরতা ও পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গকে স্নিগ্ধতম ও সুসমঞ্জসতম রূপে আমাদের নিকট পরিচিত এবং বর্ণবিন্যাসে তাহাদিগকে হৃদয়াকর্ষক ও রসমাধুর্যে রমণীয় করিয়াছে, নীতিকে একদিকে যেমন বিরক্তি ও বিক্ষেপকর কঠোরতা হইতে মুক্ত অন্যদিকে তেমনি ঐকান্তিক ইতরতাবর্জিত করিয়াছে, জীবনের সাধারণ বস্তু-নিচয়কে, পতিপত্নী পুত্রকন্যা পিতামাতা ভ্রাতাভগিনীর প্রেম স্নেহ ভক্তি ও ভালবাসা, রাজা ও নেতার কর্তব্য, প্রজা ও অনুগামীদের আনুগত্য, মহতের মহত্ত্ব, সরল প্রাণের সত্য ও মূল্যকে এক উচ্চ দিব্য ভাব অর্পণ করিয়াছে, নৈতিক ভাব-রাজিকে আদর্শের বর্ণ ও দীপ্তিতে অন্তরাত্মার তাৎপর্যে অধিকতর ভাবে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের সংস্কৃতিগত মনের গঠন ও পরিণতির জন্য বাল্মিকীর রচনা প্রায় অভাবনীয় শক্তিশালী রূপে কার্য করিয়াছে; ভালবাসিবার ও অনুকরণ করিবার জন্য তাহা রাম ও সীতার মত মূর্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, তাঁহাদিগকে এমন দিব্য ও

সত্যপ্রকাশক ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যাহাতে তাঁহারা স্থায়ীভাবে পূজা ও আরাধনার পাত্র হইয়াছেন, আর সে রচনা তাহার নৈতিক আদর্শের সজীব মানুষী-মূর্তি হনুমান লক্ষ্মণ ও ভরতের মত মহান চরিত্র আমাদিগকে উপহার দিয়াছে; ভারতীয় চরিত্রে যাহা কিছু অত্যুত্তম ও মধুরতম তাহার অনেক কিছু ইহা গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহা অন্তরাত্মার সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পরমসুন্দর অথচ সুদৃঢ় সুরলহরী এবং মানবচরিত্রের সেই সমস্ত কোমল ও সূক্ষ্ম ভাবরাজি উন্মিষিত ও স্থায়ী করিয়াছে যাহাদের মূল্য বাহ্য ও লৌকিক ধর্ম ও আচরণের অপেক্ষা অনেক বেশী।

এই দুই মহাকাব্যের কবিতার প্রকৃতি ও ধরন ইহাদের মধ্যস্থিত বস্তুর মহত্ত্ব হইতে ন্যূন নহে। যে রচনাশৈলীতে যে ভাবের ছন্দোবন্ধ কবিতায় তাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্বদা মহাকাব্যোচিত মহৎ গুণাবলি, মহান ক্লাসিক্যাল সাহিত্যগুণোপেত উজ্জ্বল প্রাঞ্জলতা এবং সহজ সরলতা বর্তমান আছে, প্রকাশের শক্তিতে তাহা সমৃদ্ধ কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত অলংকারের ভার-বর্জিত; তাহার গতি দ্রুত বীর্যবন্ত ও সাবলীল, কবিতাগুলি সর্বদা মহা-কাব্যোচিত স্বরবৈচিত্র্য ও শ্রুতিমধুর শব্দপ্রবাহে নিশ্চিতভাবে ভরপুর। অবশ্য উভয়ের ভাষার প্রকৃতিতে একটা পার্থক্য আছে। মহাভারতের শব্দবিন্যাস প্রণালী প্রায় কঠোরভাবে পৌরুষব্যঞ্জক, অর্থের শক্তিতে এবং নিজের অনুপ্রাণিত নির্ভুলতায় বিশ্বাসী; প্রাঞ্জলতা ও সহজ সরলতার এবং প্রায়শঃ দৃষ্ট সুন্দর ও মনোরম অলংকারশূন্যতার দিকে দেখিলে মনে হয় যেন তপস্যাপরায়ণ; ইহা বীর্যবন্ত দ্রুতগমনশীল কবিত্বময় মনীষার এবং মহৎ ও সরল প্রাণশক্তির ভাষা; বাক্যাংশ বা পদসমষ্টিগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ শক্তিশালী, কিন্তু ঐকান্তিক সরলতার জন্য—গ্রন্থিযুক্ত বা জটিলার্থ কয়েকটি বাক্যাংশ বা অবান্তর কথা ছাড়া—কোথাও অলংকার দ্বারা সংহত করিবার চেষ্টা করিতে হয় নাই, ইহার রচনাপদ্ধতি দ্রুতধাবকের (runner) হাল্‌কা অথচ অতি বলিষ্ঠ দেহের মত নিরাভরণ ও অনাবৃত, পবিত্র, স্বাস্থ্যের আভায় উজ্জ্বল, প্রয়োজনাতিরিক্ত মেদ বা অযথাভাবে বর্ধিত মাংসপেশীবর্জিত, ক্ষিপ্রকর্মা ও দ্রুতগামী এবং দ্রুতধাবনে অক্লান্ত। অবশ্য এরূপ বিশাল কাব্যে নিম্নতর ধরনে ব্যক্ত অনেক কিছু থাকা অপরিহার্য কিন্তু তাহা এই গুণের কিছুটা যাহাতে সর্বদা বর্তমান আছে এরূপ এক বিশেষ স্থায়ী আদর্শের নীচে অতি অল্প নামিয়া আসিয়াছে অথবা কখনও নামে নাই। রামায়ণের রচনাপদ্ধতি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী রূপে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য ও বীর্যের এক বিস্ময়কর মিশ্রণ, উজ্জ্বলতা উদ্দীপনা ও মাধুর্যের এক অপরূপ সমাবেশ আছে; ইহার বাক্যাংশগুলিতে কেবল যে কবিত্বময় সত্য, শুধু যে মহাকাব্যোচিত শক্তি ও গঠনকৌশল আছে তাহা নহে, তাহার মধ্যে ভাব আবেগ বা বস্তুর

অনুভবজনিত এক অন্তরঙ্গ স্পন্দন সদা বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যে স্থায়ী শক্তি ও বীর্যবন্ত প্রাণপ্রবাহের সূক্ষ্ম ও মধুর এক আদর্শলালিত্যের উপাদান বর্তমান আছে। উভয় কাব্যে এক উচ্চ কবিত্বময় অন্তরাত্মা ও অনুপ্রাণিত মনীষা সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে, এখানে বেদ ও উপনিষদের বোধিমানস বুদ্ধির ও বহির্জগতের ক্রিয়াশীল চৈত্য কল্পনার অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাই হইল মহাকাব্যদ্বয়ের প্রকৃতি এবং গুণাবলি যাহা তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার জন্য তাহারা ভারতের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিগত সম্পদের মধ্যে সযত্নে পোষিত ও রক্ষিত হইয়াছে এবং যাহা ভারতের জাতীয় মনের উপর এত স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে তাহাদিগকে সমর্থ করিয়াছে। এত উচ্চ সুরে বাঁধা এত দীর্ঘকালব্যাপী বিপুল শ্রমসাধ্য সকল ব্যাপারেই আমরা যাহা দেখিতে পাই তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিবিচ্যুতি বা অসমতা বাদ দিলে, পাশ্চাত্য সমালোচনা যে সমস্ত আপত্তির কথা তুলিয়াছে, তাহা মননশক্তি ও রসরুচির এক পার্থক্যের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নহে। পরিকল্পনার বিশালতা এবং ধীরে সুস্থে বসিয়া পুঙখানুপুঙখ ও সবিস্তার বর্ণনা পাশ্চাত্য মনকে প্রতিহত ও ভ্রান্ত করিয়া তোলে। সে মন ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত এবং অতি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এমন চক্ষু ও কল্পনার ব্যবহারে ও জীবনে দ্রুততর পদক্ষেপে অভ্যস্ত; কিন্তু ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা দৃষ্টির বিশালতায় অভ্যস্ত এবং ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপের প্রতি মনোযোগ ও কৌতূহলের সহিত নিবন্ধ হইয়া পড়ে, সে মনের পক্ষে এরূপ পরিকল্পনা ও বর্ণনা তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতিরই সমজাতীয়; স্থাপত্যবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বিশ্বচেতনা ও তাহার অনুভূতির দৃষ্টি, কল্পনা ও ক্রিয়াধারা হইতেই এ বৈশিষ্ট্য জাত হইয়াছে। আর একটি পার্থক্য এই যে জড়গত মন পার্থিব জীবনকে যেমন বাস্তব বলিয়া দেখে ভারতীয় মন ঠিক তেমনভাবে দেখে না, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যাহা আছে সর্বদা অধিক পরিমাণে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেখে, দেখে যে দৈবী, আসুরিক ও রাক্ষসিক বিপুল শক্তি ও বিশাল বীর্যরাজি দ্বারা তাহা পরিবেষ্টিত আছে এবং তাহার ক্রিয়া তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়; সে মনে করে মানুষের মধ্যে যাহা মহত্তর বা বৃহত্তর তাহা অধিকতর ভাবে বিশ্বগত এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও শক্তির মনুষ্য-মূর্তিতে একপ্রকার আবির্ভাব। ইহার ফলে ব্যষ্টি মানুষের ব্যক্তিগত সুযোগ ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং সে নৈসর্গিক শক্তিসকলের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া পড়ে এই যে আপত্তি তোলা হয়, এই সাহিত্যের কল্পনাকুশল মূর্তিসকলের পক্ষে তাহা মূলতঃ বা কার্যতঃ সত্য নহে; কেননা আমরা দেখিতে পাই যে ইহা দ্বারা ব্যষ্টি পুরুষ মহত্ত্ব ও বৃহত্তর কর্মশক্তি লাভ করে, এবং নৈর্ব্যক্তিকতা তাহার ব্যক্তিত্বের খেলাকে বর্ধিত করিয়া ও উচ্চে

তুলিয়া তাহাকে কেবল মহীয়ান করিয়া তোলে। এ সাহিত্যে যে পার্থিব ও পরাপ্রকৃতির এক সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহা কেবল কল্পনার খেলা দেখাইবার জন্য করা হয় নাই, কিন্তু একান্ত সরল ও স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে, ইহার কারণ জীবনের বৃহত্তর সত্য সম্বন্ধে সেই একই ভাব ও ধারণা; আর বাস্তববাদী সমালোচক তপস্যার দ্বারা শক্তি অর্জন, দিব্য অস্ত্রের ব্যবহার, অন্তরাত্মার ক্রিয়া ও প্রভাবের প্রায়শঃ নির্দেশ বা চিহ্ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়কে অসম্ভব রূপে অপাত্রে ন্যস্ত দৌরাত্ম্য বা অনধিকার প্রবেশ মনে করিয়া আপত্তি তোলে তাহার অনেকটা এই বৃহত্তর সত্যের সার্থক মূর্তি বলিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অতিরঞ্জনের যে দোষারোপ করা হইয়াছে তাহাও যেখানে মানুষের সমগ্র ক্রিয়া সাধারণ মানুষী স্তর হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে সেখানে ঠিক তেমনি ভাবে অপ্রযোজ্য; কেননা কবিকল্পনা জীবনের স্বাভাবিক উচ্চতার সত্য যেভাবে ধারণা করিয়াছে তাহার বর্ণনায় কেবল তাহার অনুরূপতা আমরা দাবি করিতে পারি; যাহা এখানে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী সুতরাং মিথ্যা তেমন সাধারণ মানুষের পরিমাপে বিশ্বস্ত থাকিবার কল্পনা-কুশলতাহীন দাবি জানাইতে পারি না। এই মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রাণশক্তিহীন ও ব্যক্তিত্বরহিত এই অভিযোগের তেমনি কোন ভিত্তি নাই; রাম ও সীতা, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দুর্যোধন এবং কর্ণ অত্যন্ত সত্য ও মানুষীভাবাপন্ন, তাঁহারা ভারতীয় মনে আজিও সজীব রহিয়াছেন। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার মত এখানে চরিত্রের কেবল বাহ্যপ্রকাশমান দিকসকলের উপর জোর দেওয়া হয় নাই, কেননা এ সমস্ত প্রদর্শনীর বিষয়ের সহায় রূপে শুধু গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রধানতঃ, জোর দেওয়া হইয়াছে আত্মার জীবন, আত্মার আন্তর গুণাবলির উপর, সে সমস্তের সুস্পষ্টতা ও সজীবতা, শক্তি ও রেখা-চিত্রের বিশুদ্ধতা যত চরমভাবে রক্ষা করা যায় বর্ণনায় তাহা করা হইয়াছে। রাম ও সীতার মত চরিত্রের আদর্শবাদ ক্ষীণ, বিস্বাদ বা নীরস অবাস্তব পদার্থ নহে; তাহারা আদর্শজীবনের সত্যে এবং মানুষ যখন অন্তরাত্মাকে সুযোগ দেয় তখন সে যেরূপ মহৎ হইতে পারে বা হইয়া থাকে সেই মহত্ত্বে সজীব ও দীপ্তিমান; এখানে আমাদের সাধারণ প্রকৃতির ক্ষুদ্রতাগুলির অতি অল্প অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে আপত্তি তোলা হইয়াছে সে আপত্তিরও বিশেষ কোন মূল্য নাই।

সুতরাং অজ্ঞানতাবশতঃ এই দুই মহাকাব্য যে পৌরাণিকী কাহিনী ও জনশ্রুতির অরূপান্তরিত শুধু একটা স্তূপ বলা হইয়াছে তাহা সত্য নহে; কিন্তু তাহাতে জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য, উচ্চ শিল্পকুশলতার মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গভাবে চিত্রিত এবং বীর্যবান ও মহৎ এক চিন্তাধারা সজীবভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা এক অতিপরিণত নৈতিক ও রসিক

মনের, এক উচ্চ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শের, জাগ্রত আত্মা দ্বারা অধ্যুষিত এক মহান সংস্কৃতির সজীব প্রতিরূপের সাক্ষাৎ পাই। গ্রীক মহাকাব্যের মত জীবনের নবীনতায় সমৃদ্ধ কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে গভীর ভাব ও সারবস্তুতে বিভূষিত, ল্যাটিন মহাকাব্যের মত সংস্কৃতিতে পূর্ণবিকশিত কিন্তু তদপেক্ষা তেজস্বী ও প্রাণশক্তিবান যৌবনশক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ এই ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয় এক বৃহত্তর ও পূর্ণতর জাতীয় ও সংস্কৃতিগত ক্রিয়াধারার সেবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল, আর তাহারা সর্বত্র, উচ্চ ও নীচ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের দ্বারা যে আদৃত এবং একান্তভাবে গৃহীত বা মনোনিবেশ সহকারে পঠিত হইয়াছে এবং দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের এক অন্তরঙ্গ ও গঠনসমর্থ অংশরূপে যে বর্তমান রহিয়াছে শুধু তাহাই প্রাচীন এই ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্ব ও উৎকর্ষের অতি শক্তিশালী প্রমাণ।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য

যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত এবং যাহার মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিরূপিত হইয়াছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসবিখ্যাত সেই ক্লাসিক্যাল যুগ (classical age) দশশত বৎসর অথবা সম্ভবতঃ তাহার চেয়েও অধিককাল ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল; প্রাচীনতর যুগের রচনার সঙ্গে এ যুগের লিখিত সাহিত্যের অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু মূল ভাব ও ভাবনাতে ততটা নাই, পার্থক্য ঘটিয়াছে গঠনরীতিতে, ভাবনা, প্রকৃতি ও ভাষার বর্ণবৈচিত্র্যে। এ জাতি ও সংস্কৃতির দিব্য বাল্যকাল, বীর্যবান কৈশোর, উজ্জ্বল ও সবল প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে আর তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে এক সমৃদ্ধ দীর্ঘকাল-স্থায়ী পরিণত যৌবনকাল এবং তাহার পরবর্তী ঘটনারূপে আসিয়া পড়িয়াছে একই রূপে সমৃদ্ধ ও বহু বর্ণবৈচিত্র্যের শোভাসম্পদে বিভূষিত ক্ষয়-পাওয়া বা অক্ষম হইয়া পড়িবার কাল। এই ক্ষয় মৃত্যুতে পর্যবসিত হয় নাই, কেননা ইহার পরই কতকটা পুনর্যৌবন প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, আবার উন্নতির পথে চলিতে এবং নূতনভাবে আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু এ আরম্ভের ভাষা আর সংস্কৃত নহে, যাহারা প্রাদেশিক কথ্য ভাষাসমূহের কন্যা, নূতনভাবে উদ্ভূত সেই ভাষারাজিকে তখন উন্নীত ও সাহিত্য-সাধনার বাহন করিয়া তোলা হইয়াছে এবং একদিকে যেমন প্রাচীন বিশাল সংস্কৃত ভাষা তাহার বীর্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক জীবনশক্তি হারাইতেছিল তেমনি অন্য দিকে এই সমস্ত ভাষা গঠিত ও পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতি ও গঠনের ধরনে একদিকে মহাকাব্যগুলি এবং অন্য দিকে কালিদাস ও ভর্তৃহরির ভাষার মধ্যে পার্থক্য ইতিমধ্যেই অতিপ্রবল হইয়াছে এবং তাহার কারণ হয়ত বৌদ্ধধর্মের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, তখন যাহা সকল শিক্ষিত লোক বুঝিতে ও বলিতে পারে সংস্কৃত ভাষা তেমন একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা আর রহিল না এবং পালি-ভাষা তাহার সফল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জাতীয় ভাবনা ও জীবনপ্রবাহের অন্ততঃপক্ষে এক প্রধান অংশ প্রকাশের বাহন হইয়া দাঁড়াইল। মহাকাব্যগুলির ভাষা ও গতিবৃত্তিতে এমন তেজ, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি

ও ভাষার আবেদন আছে যাহা জীবনের মূল উৎস হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎসারিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; কালিদাসের ভাষা এক সুসম্পাদিত শিল্পকলার, মনীষা ও রসভাবনার সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি যাহা সুচিন্তিত ও জ্ঞানকৃত মনোরম অলঙ্কারে সমালঙ্কৃত, প্রস্তরমূর্তির মত খোদিত, চিত্রের মত নানাবর্ণে বিভূষিত, তবু তাহা কৃত্রিম বা অনৈসর্গিক হইয়া উঠে নাই, যদিও তাহার মধ্যে অতি সুনিপুণ ভাবে প্রযুক্ত কৌশল ও শিল্পচাতুর্য রহিয়াছে কিন্তু তথাপি তাহা মনীষার শ্রমজাত শিল্পের এক সতর্ক সৃষ্টি। ইহা সতর্কভাবে স্বাভাবিক, প্রথম প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্য হইতে জাত নহে কিন্তু অর্জিত ও অভ্যস্ত দ্বিতীয় প্রকৃতির (second nature) স্বচ্ছন্দ পরিবেশ হইতে উদ্ভূত। পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে কৌশল ও শিল্পচাতুর্যের উপাদান বৃদ্ধি পাইয়া এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাঁহাদের ভাষা বহু আয়াসসাধ্য, সুচিন্তিত ও সজ্ঞানে কৃত, যদিও তাহার গঠন বীর্যবন্ত ও সুন্দর, তাহাদের আবেদন শুধু সুশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলে বা পণ্ডিত সমাজে পৌঁছে। এ সময়কার ধর্মগ্রন্থসকল, পুরাণ ও তন্ত্র গভীরতর ও তখন পর্যন্ত বীর্যবন্তভাবে সজীব উৎস হইতে আসিয়াছে, সরলতার দ্বারা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাহাদের আবেদন পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা কিছুদিন পর্যন্ত মহাকাব্যগুলির ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহারা যে সরল ও সাক্ষাৎভাবে কথা বলিয়াছে তাহা স্বেচ্ছাকৃত, প্রাচীনকালের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য তাহাতে ততটা ছিল না। অবশেষে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল এবং দর্শন ও ধর্মের কোন কোন অংশ অথবা পাণ্ডিত্যসূচক কোন কোন বিষয় ছাড়া জাতির প্রাণ ও মনের সরাসরি প্রকাশের বাহন আর রহিল না।

সমস্ত প্রবর্তক অবস্থা (inducing circumstances) দূরে সরাইয়া রাখিয়া বলা যায় যে সাহিত্যিক ভাষার পরিবর্তন ভারতীয় সংস্কৃতির মনন কেন্দ্রের এক বৃহৎ রূপান্তরের অনুরূপ। এ ভাষা সর্বদা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ছিল এবং আজিও তাহাই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের কঠোরতর বস্তুরাজি যেন একটু দূরে সরিয়া গিয়া পটভূমিকায় দাঁড়াইয়াছে, তাহারা এখনও স্বীকৃত হইতেছে এবং বাকি সব কিছুর উপর ছায়াবিস্তার করিয়া বর্তমান আছে, কিন্তু তথাপি তাহারা যেন একটু আলগা হইয়া গিয়াছে এবং অন্য সব কিছুকে তাহাদের নিজেদের বিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য ক্রিয়া করিতে দিতেছে। উৎসুক বুদ্ধি, প্রাণময় আবেগ, রসবোধ, মার্জিত সক্রিয় সুখলিপ্সু ইন্দ্রিয়জীবন প্রভৃতি বাহ্য শক্তিসমূহ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইল ভারত ইতিহাসের সেই বৃহৎ যুগ যাহাকে বলিতে পারি যুক্তিবিচারপ্রতিষ্ঠ দর্শন, বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প এবং সুগঠিত কারুশিল্প, আইন বা বিধান, রাজনীতি, ব্যবসা, ঔপনিবেশিকতার যুগ, সেই যুগ যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও

বহুশ্রমসম্পাদিত শাসনপদ্ধতিযুক্ত বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, জীবন ও ভাবনার সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বহুবিস্তৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধানসকল বিধিবদ্ধ ও কার্যকরী হইয়াছে; এ যুগে যাহা কিছু উজ্জ্বল, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকর এবং মনোরম, লোকে তাহা ভোগ করিয়াছে, যাহা কিছু ভাবনা করা বা জানা যায় তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছে, যাহা কিছু বুদ্ধির পরিধির মধ্যে আনা যায়, যাহা কিছু ব্যবহারে লাগান যায় তাহা স্থির ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে—ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম, অতি জমকালো ও অতি মনোজ্ঞ সহস্রবৎসরব্যাপী বিখ্যাত যুগ।

যে মনীষা এখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা কোনক্রমে চঞ্চল অবিশ্বাসী বা নেতিবাদী নহে, কিন্তু অতি প্রবলভাবে অনুসন্ধিৎসু ও সক্রিয়, আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ও সমাজবিদ্যার সত্যের যে সমস্ত বিশাল ধারা অতীতে আবিষ্কৃত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে সে সমস্ত ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে আরও পরিণত ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে, আরও বিস্তৃত সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম ও গভীর রূপে জানিতে ও পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীতে সবিস্তারে সুবিন্যস্ত করিতে, জ্ঞানের সম্ভূত ও সম্ভাব্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শাখা-প্রশাখাকে সুগঠিত করিতে, বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়বোধকে ও জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে উৎসুক রহিয়াছে। এ সময় ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সমাজের বিশাল মূল তত্ত্ব ও ধারাগুলি আবিষ্কৃত ও সুগঠিত হইয়াছে এবং এক মহান ঐতিহ্যের বিপুলতা ও তৃপ্তিজনক নিশ্চয়তার মধ্য দিয়া সংস্কৃতির পদক্ষেপ চলিতেছে; কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রের ও বিস্তৃততর প্রদেশের মধ্যে এখনও নূতন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে, বিজ্ঞান শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎভাবে নূতন আরম্ভ ও সবলভাবে পরিণতি চলিতেছে, বিশুদ্ধ মননশীলতা ও রসভাবনার ক্রিয়াধারাগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, প্রাণময় সত্তার সুখভোগের ও আবেগময় সত্তার মার্জিত রুচির আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্র অনেক প্রসারতা লাভ করিয়াছে, বহু শিল্পের চর্চা ও জীবনের ছন্দোময় আচার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। উচ্চ মননশীল এক প্রাণশক্তির ক্রিয়া ও জীবনে বহুমুখী লক্ষ্য দেখা দিয়াছে, যুগপৎ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, সে ভোগ যাহা স্পষ্টভাবে স্থূল ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি তাহাতে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে প্রাচ্য মনের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ভাবে অনেকটা মর্যাদা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারসম্মত পদ্ধতিতে, এমন কি ভোগের মধ্যে একটা রসরুচিসম্মত সংযম, বিধান ও পরিবেশ মানিয়া চলা আছে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংযত জাতিসকল যাহার খপ্পরে পড়ে তেমন অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ইহাই মানুষকে সর্বদা রক্ষা করিয়াছে। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হইল মনীষার খেলা,

তাহাই সকল ক্রিয়ার কেন্দ্রগত পরিচালক; এই মনীষার প্রাধান্য সর্বত্র রহিয়াছে। প্রাচীনতর যুগে ভারতীয় মন ও প্রাণতত্ত্বের বহু সূত্রগুলি একত্রে গ্রথিত ছিল, তাহাদিগকে পৃথক করা যাইত না, তাহারা সকলে একই উদার গতিবৃত্তির মধ্য দিয়া বীর্যবন্ত এবং প্রাচুর্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু সরল এক রাগিণীতে বাজিয়া উঠিত; আর এখানে সূত্রগুলি যেন পাশাপাশি হইয়া সম্বন্ধযুক্ত ও সুসমঞ্জস ভাবে রহিয়াছে, তাহারা বিচিত্র ও জটিল, এককে বহুগুণিত করিয়াছে। বোধি-মনের স্বতঃস্ফূর্ত একত্বের স্থানে দেখা দিয়াছে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণকারী মানুষী বুদ্ধি দিয়া গড়া এক অর্জিত বা আরোপিত একত্ব। ধর্মে এবং শিল্পে এখনও আধ্যাত্মিকতা এবং বোধির প্রেরণা ও প্রাধান্য রহিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যে সম্মুখভাগে তাহা ততটা নাই। পূর্বতন যুগসমূহে ধর্ম ও ঐহিকবিষয়ক লেখার মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান তেমন কোন ভেদ ছিল না, এখন তথায় ভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ যুগের মহান কবি ও শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ঐহিক ক্ষেত্রেরই স্রষ্টা এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসকল রামায়ণ মহাভারতের মত অন্তরঙ্গভাবে এ জাতির ধর্ম ও নীতিগত মনের অংশরূপে যে পরিণত হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ধর্মবিষয়ক কবিতার স্রোত এ সময়ে পৃথকভাবে তন্ত্র এবং পুরাণগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

কালিদাস এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় মহাকবি। তিনি এক বিশিষ্ট ধরনের কাব্যপ্রতিভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাহা পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইতেছিল এবং তাঁহার পরেও অল্পবিস্তর নূতন অলঙ্কারযুক্ত হইয়া কিন্তু মূলতঃ অপরিবর্তিত ভাবে বহুশতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তাঁহার কবিতা এমন এক সর্বাঙ্গসুন্দর সারগর্ভ আদর্শে সুসমঞ্জসভাবে পরিকল্পিত ও গঠিত যে অন্য কবিরা সর্বদাই ঠিক অনুরূপ ছাঁচে তাঁহাদের কবিতা ঢালাই করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভার ন্যূনতা ছিল অথবা তাঁহার ছন্দের তেমন সাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের সৃষ্টি তেমন দোষপরিশূন্য এবং পূর্ণ হয় নাই। কালিদাসের যুগে কাব্যশিল্পের ভাষা এক অনন্যসাধারণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। কবিতা এ সময় নিজেই উচ্চ শ্রেণীর শিল্পবস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহা তাহার উপায় সম্বন্ধে সচেতন ছিল, অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ভালমন্দ নির্ণয় করিয়া তাহার আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররাজি ব্যবহার করিত, স্থাপত্য ভাস্কর্য বা চিত্রবিদ্যার মতই সাবধানে এবং যথাযথভাবে কলাশাস্ত্রসম্মত রীতি ও ব্যবস্থা মানিয়া চলিত, একদিকে যেমন সৌন্দর্য ও সবল রূপ ফুটাইতে চাহিত ঠিক তেমনি সমানভাবে অন্যদিকে চাহিত ভাব ও ভাবনার মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধি; আবার তৎসঙ্গে রসবোধ, দৃষ্টির পূর্ণতা অথবা ভাবাবেগময় বা ইন্দ্রিয়রাগাত্মক আবেদনের সঙ্গে কর্মসম্পাদন প্রণালীর উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং পূর্ণতার দিকে তেমনি সমান ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। এ সময়

অন্যান্য শিল্পের মত কবিতারও—বস্তুতঃ এ যুগে মানুষের কর্মধারাসকলের প্রত্যেকের—সুপরিচিত ও সতর্কভাবে অনুশীলিত এক বিজ্ঞান, এক কার্যকরী শিল্পপদ্ধতি বা শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল; এই শাস্ত্র যাহা কিছু গঠন পদ্ধতিকে পূর্ণ করিতে পারে তাহার আলোচনা এবং তদ্দ্বারালব্ধ সিদ্ধান্ত-সমূহকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিত, কি কি বস্তু বর্জন করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা দিত, মূল বিষয় ও সম্ভাবনাসকলের প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিত, কিন্তু তাহাদিগকে আদর্শের অধীন ও সীমার মধ্যে রক্ষা করিত, আর সে আদর্শ ও সীমা এরূপ লক্ষ্য লইয়া পরিকল্পিত হইত যাহাতে কোনপ্রকার আতিশয্য বা ন্যূনতার দোষ না আসিতে পারে, এই ব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে কোন-প্রকার সৃষ্টিশীল নিয়মহীনতার যেরূপ প্রতিকূল ছিল—যদিও সিদ্ধান্তের দিক হইতে কবির স্বাধীনতা বা কল্পনার স্বাভাবিক অধিকার স্বীকৃত হইত—তেমনি অবিবেচনা বা হঠকারিতার সহিত কৃত বা অনিয়মিত ও যত্নশূন্য গঠন-কার্যের প্রশ্রয় দিত না। কবির নিকট আশা করা হইত যে চিত্রকর বা ভাস্করের মত তিনি তাঁহার নিজ শিল্পের সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থাকিবেন, তাহার বিধান-সকল, তাহার স্থিরীকৃত ও নিশ্চিত আদর্শ ও পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞান ও সমালোচনাশীল বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার প্রতিভার গগনমার্গে বিচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কাব্যশিল্পের এই সতর্ক পদ্ধতি অবশেষে আলেকজান্ডারের যুগের অবনত গ্রীক কবিতার মত মাত্রাতিরিক্তভাবে কঠিন ঐতিহ্যে পরিণত হইল, ছন্দের কৌশল ও চাতুর্যকে অতিরিক্ত আদর করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি শিক্ষিত বুদ্ধির অতিবিকৃতিকে সম্মতি দিতে ও প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাচীনতর কালের কবিতা সাধারণতঃ এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে মুক্ত ছিল অথবা তাহা ক্বচিৎ কখনও দেখা যাইত।

এ পর্যন্ত জগতে যত ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই মহান ক্লাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত ভাষা সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যভাবে গঠিত এবং ভাব ও ভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন হইতে সমর্থ, অন্ততঃপক্ষে আর্য বা সেমেটিক জাতীয় মন যে সমস্ত ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহিত তুলনায় একথা বলা চলে; এ ভাষা অতি স্পষ্ট প্রকাশশক্তিতে দীপ্তিমন্ত, ইহাতে সূক্ষ্মভাবে সঠিক বিচারের ও প্রকাশের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে, অথচ সর্বদা সংক্ষেপে ও অল্প কথার মধ্য দিয়া সে সমস্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহার সর্বোত্তম কালেও ইহা বৃহদাকারে বাক্যাংশ বা পদসমষ্টি গঠন করিতে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও এ ভাষা দরিদ্র বা রিক্ত ছিল না; ভাষাকে স্পষ্ট করিতে গিয়া গভীরতাকে নষ্ট করা হয় নাই, বরং অর্থের সমৃদ্ধিতে তাহা পরিপূর্ণ এবং উচ্চ সম্পদ ও সৌন্দর্যকে রূপ দিতে সমর্থ, প্রাচীন কাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ ও বাগ্‌বিন্যাস প্রণালীর এক স্বাভাবিক ঐশ্বর্য ও শোভাতে

বিভূষিত ছিল। প্রচুর পরিমাণে যৌগিক শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষার রূপপ্রদান-শক্তির অপব্যবহার পরবর্তীযুগের গদ্য রচনার পক্ষে প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বটে কিন্তু পূর্ববর্তী কালের গদ্য ও পদ্যে এরূপ ব্যবহার খুব সীমিত ছিল, তখন সংযম দ্বারা মিতাচারী প্রাচুর্য অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছিল এবং সেইজন্যই নিজের সম্পদ ও সঙ্গতির পূর্ণতম ও যোগ্যতম ব্যবহারে সমর্থ ছিল। শ্রেষ্ঠ যুগের কবিতার বৃহৎ সূক্ষ্ম ও নিপুণ ছন্দরাজি—আর তাহাদের নাম কতই না কল্পনাত্মক, হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর ছিল—ছিল সামর্থ্যে বহুমুখী, গঠন শক্তিতে সতর্ক ও দক্ষ, তাহাদের ছাঁচই এমন ছিল যাহা পূর্ণতার দাবি করিতে পারে, যাহাদের পক্ষে নীচ বা অপরিচ্ছন্ন গঠনকার্য অথবা ত্রুটিবিচ্যুতি-ভরা গতিবৃত্তি প্রায় একরূপ অসম্ভব ছিল। এই কবিত্ব-শিল্পের একক (unit) ছিল শ্লোক যাহা নিজেই চারিপাদে রচিত এক পর্যাপ্ত কবিতা, চাওয়া হইত যে প্রত্যেক শ্লোক নিজেই যেন শিল্পের এক পূর্ণ সৃষ্টি হয়; যাহা নিজের স্বতন্ত্র মূর্তিতে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়াইতে পারে এমন কোন বস্তু, দৃশ্য, বিবরণ, ভাবনা, অনুভূতি, মনের ভাব বা ভাবাবেগের সুসমঞ্জস, স্পষ্ট ও প্রতীতিজননক্ষম অভিব্যক্তি প্রতি শ্লোকে যাহাতে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হইত; এক শ্লোকের পর অন্য শ্লোক আসিবে যেন পূর্ণতার সহিত পূর্ণতা যুক্ত হইতেছে, এইভাবে সর্বদা এক ক্রমপরিণতি চলিবে। সমগ্র কবিতাটি অথবা দীর্ঘ কাব্যের প্রতি সর্গটি এক শিল্পকলাকুশল তৃপ্তিকর ও সুন্দর মূর্তিতে এইরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকিবে, এবং সর্গগুলির পারম্পর্যে দেখা যাইবে যে, কোন নির্দিষ্ট ভাবধারা অগ্রসর হইয়া এক পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতেছে। কালিদাসের কাব্যে এই ধরনের সতর্ক কলাকৌশলপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উচ্চ ধরনের কবিতাসৃষ্টি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

দুইটি গুণের সমবায়ে এ প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল, আর সে দুইটি গুণ সেই পরিমাণে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে মাত্র দেখা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যেও সর্বদা এরূপ সমতাপূর্ণ ও সুসমঞ্জস রূপে মিলিয়া থাকে নাই, তাঁহাদের ভাব ও গঠনপদ্ধতির মধ্যে এরূপ যথাযোগ্য ভাবে এ দুই-এর সুসম্মিলন সর্বদা ঘটে নাই। কালিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পীগণের মধ্যে মিল্‌টন এবং ভার্জিলের সঙ্গে একাসনে স্থান পাইয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ কবি মিল্‌টন অপেক্ষা কালিদাসের শিল্পে অধিকতর সূক্ষ্ম ও সুকুমার তাৎপর্য ও ভাবসংস্পর্শ আছে, আর তাঁহার মধ্যে ল্যাটিন কবি ভার্জিল অপেক্ষা অধিকতর শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত এক বৃহত্তর সৃষ্টিসামর্থ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এতদপেক্ষা পূর্ণতর ও সুসমঞ্জসতর রচনারীতি সাহিত্যজগতের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিপূর্ণ সুসঙ্গত ও পর্যাপ্ত বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার-নিপুণতায় কালিদাস অপেক্ষা অধিকতর ভাবে অনুপ্রাণিত ও সতর্ক

আর কেহই নাই, তাঁহার রচনারীতিতে যতটা কম শব্দ ব্যবহার সম্ভব তাহা করা হইয়াছে, আর তাহার সঙ্গে তাহাতে অতি উৎকর্ষসম্পন্ন স্বাচ্ছন্দ্য এবং দিব্য লাবণ্য একত্রে বর্তমান আছে, আবার যাহা বস্তুতঃ অতিকায় নয় এরূপ এক মনোরম আতিশয্য কিম্বা ঐশ্বর্যময় পরিমার্জিত অতিনিপুণ রসমাধুর্যের ধারাগুলিও পরিবর্জিত হয় নাই। অন্য যে কোন কবি অপেক্ষা পূর্ণতর ভাবে দুইটি শিল্পকলাকুশল গঠনধারার অপূর্ব মিলন তাহার মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছে, প্রথমতঃ সুসমঞ্জস ও মিতব্যয়ীভাবে অভিব্যক্তি, যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন একটি শব্দ একটি বাক্য বা পদের একটি অংশও ব্যবহৃত হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনতর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণের যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল তেমনভাবে নিজের বিপুল ভাবসম্পদ অজস্রভাবে অথচ বুদ্ধিপূর্বক কি করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহার একটা সমগ্র বোধ তাঁহার ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে একটুও না বাড়াইয়া সমৃদ্ধতম বর্ণ, মাধুর্য, আবেদন ও মূল্য, বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব, শক্তি ও স্নিগ্ধতা এবং প্রতি ছত্রে প্রতি বাক্যাংশে কোন না কোন প্রকার যথার্থ সৌন্দর্য, রচনার মধ্যে পূর্ণতম মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিবার দিব্য নিপুণতা তাঁহার মত আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার ভাব ও শব্দের সংগ্রহ ও চয়ন যেমন পরম রমণীয় তেমনি তাহাদের সমাহার ও মিলন পরম সুখপ্রদ। তিনি অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রিয়রাগোদ্দীপক শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বেলায় 'ইন্দ্রিয়রাগাত্মক' শব্দটি উচ্চতর অর্থে ধরিতে হইবে, কেননা তাঁহার মধ্যে বস্তুর এক উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি ছিল। তাঁহার ইন্দ্রিয়রাগাত্মিকতা স্খলনশীল ছিল না অথবা অতি শক্তিশালী হইয়া তাহা মানুষকে অভিভূত করিত না, কিন্তু তাহা সর্বদা তৃপ্তিদায়ক এবং যথাযথ, কেননা তাহা মননশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল, তাহার এক গাম্ভীর্য ও সরলতা ছিল যাহা কোন সময় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, কখনও বা সৌন্দর্যের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইত, কিন্তু তখনও অলঙ্কৃত ও বর্ণবৈচিত্র্যে বিভূষিত পরিচ্ছদের অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যাইত, রাজোচিত ভোগের মধ্যে ইহাতে রাজোচিত এক সংযম ছিল। আবার ছন্দের উপর কালিদাসের অসামান্য আধিপত্য তাঁহার শব্দ ও বাক্যের উপর প্রবল আধিপত্যেরই মত ছিল বৃহৎ। তাঁহার কাব্যে আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছন্দের মধ্যস্থিত শব্দগত সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি পরিপূর্ণতম ভাবে আবিষ্কার করি (গীতিকাব্যের বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর এইরূপ ধ্বনিপ্রবাহ আরও পরে কেবল জয়দেবের মত দুই একজন কবির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়), সে সামঞ্জস্য দুইটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, একদিকে সদা-বর্তমান মনোরম সুরসঙ্গতির নানা সূক্ষ্ম ভাবের মিশ্রণ অন্যদিকে যাহা সঙ্গীতের সুরের প্রবহমান একত্বকে ভঙ্গ করে না এরূপ সার্থক স্বরবৈচিত্র্যের (cadance) বাধাহীন ব্যবহার। ভাবের অপ্রতিহত প্রাচুর্য কালিদাসের কবিতার অন্য একটি

গুণ। একদিকে তিনি যেমন পূর্ণ রসমাধুর্যবিমণ্ডিত শব্দ ও ধ্বনির পরিচ্ছদে তাঁহার ভাব ও ভাবনাকে বিভূষিত করিয়াছেন তেমনি অন্যদিকে সে ভাব ও ভাবনা যাহাতে উচ্চ সবল মননশীলতায় সমৃদ্ধ হয়, যাহাতে বর্ণনা বা ভাবাবেগের দিক দিয়া তাহা উত্তম ও মূল্যবান হয় সে বিষয়েও তাঁহার তেমনি সদা-সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ধারণা ও অনুভবের দৃষ্টিসীমা ছিল বিস্তৃত —যদিও তাহার প্রসারতা প্রাচীনতর কবিগণের মত বিশ্বব্যাপী ছিল না— এবং তাঁহার সৃষ্টিকার্যের প্রতি পদে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। উপাদান লইয়া বিন্যাস ও গঠনের কার্যে তাঁহার শিল্পকলানিপুণ হস্ত কখনও ব্যর্থ হয় নাই— ইহার ব্যতিক্রম তাঁহার রচনাতে দেখা গিয়াছে কেবল একখানি শেষ গ্রন্থে, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যাহার স্থান সর্বনিম্নে--আবার তাঁহার কল্পনাশক্তি সর্বদাই তাঁহার কার্যভারের যেরূপ অনুরূপ ছিল, তাঁহার তুলিকাপাতও মহত্ত্বে ও সূক্ষ্মতায় তেমনি ভরপুর ছিল।

কাব্যকুশলতার এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ যে কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল, মূলে তাহা পূর্ববর্তী কালের মহাকাব্যসকল যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছে তাহার সহিত প্রায় এক, যদিও রূপে এবং গঠনপদ্ধতিতে ভেদ আছে; সে কার্য হইল কবিত্বের ভাষায় তাহার যুগের ভারতীয় মন প্রাণ ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করা এবং সার্থকভাবে ও মূর্তিতে চিত্রিত করিয়া তোলা। কালিদাসের অদ্যাপি বর্তমান সাতখানি কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকখানি নিজস্বভাবে ও নিজের সীমার মধ্যে এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, প্রত্যেকখানি যেন উজ্জ্বল ও মনোরম অলঙ্কার-প্রাচুর্যের সহিত অংকিত চিত্র বা খোদিত শিলালিপি, যাহার মধ্যে সেই একই বস্তু প্রকৃত বিষয় রূপে গৃহীত হইয়াছে। কালিদাসের মন ছিল অতুল ভাব-সম্পদরাজিপূর্ণ এক ভাণ্ডার, তাহা একই সঙ্গে এক মহাপণ্ডিত এবং নিপুণ পর্যবেক্ষকের মন, তাহার সমসাময়িক সকল বিষয়ে তাহা শিক্ষিত এবং রাষ্ট্র-নীতি, আইন, সামাজিক ভাব ও আদর্শ, মতবাদ, ধর্ম, পুরাণ, দর্শন, তাহার সময়কার শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয় ও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিল; একদিকে রাজসভার জীবনের সঙ্গে সে মনের অন্তরঙ্গ যোগ, অন্যদিকে আবার সাধারণ লোকের জীবনও তাহার কাছে সুপরিচিত ছিল; সে মন প্রকৃতির সকল জীবন পশু ও পক্ষী ঋতু বৃক্ষ ও পুষ্পের সকল কিছু বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল; মনের এবং চক্ষুর সকল জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সে মন সর্বদা ছিল এক মহাকবি ও শিল্পীর মন। তাঁহার সৃষ্ট গ্রন্থের কোথাও পাণ্ডিত্য বা অতিরিক্ত বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনের কোন চিহ্ন নাই অথচ অন্য কয়েকজন সংস্কৃত কবির রচনা এই কারণে শিল্পকুশলতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। কালিদাস জানিতেন কি করিয়া সকল বস্তুকে তাঁহার কাব্যশিল্পপ্রকৃতির অধীন ও অনুগত করিতে হয়,

জানিতেন তাঁহার মধ্যে যে পণ্ডিত ও পর্যবেক্ষক আছে তাহার কার্য তাহারি মধ্যস্থিত কবির জন্য উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই সংগৃহীত জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সর্বদা প্রস্তুত ও হাতের কাছে রহিয়াছে এবং ঘটনা বিবরণ পারিপার্শ্বিক ভাব বা রূপের অংশরূপে সর্বদা তথা হইতে জ্ঞানের ধারা আনীত হইতেছে, অথবা কবিতার স্তবকের অথবা দ্বিচরণবিশিষ্ট শ্লোকের বহুশোভমান যে দীর্ঘ পারম্পর্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে উজ্জ্বল ও সুন্দর উপমা ও প্রতিরূপের সুবিস্তৃত ধারাতে সে জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ, তাহার সুবৃহৎ পর্বতমালা, অরণ্যানি, সমতলভূমিসমূহ ও তাহাদের অধিবাসীবৃন্দ, তথাকার স্ত্রী ও পুরুষ এবং তাহাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি, জীব ও জন্তু, শহর ও গ্রামরাজি, তাহার আশ্রমগুলি, নদী, উপবন ও কর্ষিত ক্ষেত্রসমূহ— এই সমস্তই তাঁহার বর্ণনার, তাঁহার নাটক ও প্রেম-কবিতার পটভূমিকা। তিনি এ সমস্তই দেখিয়াছেন এবং ইহাদের দ্বারা তাঁহার মন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহা কেবল তিনিই সমর্থ এমন সমৃদ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়া উজ্জ্বল ভাবে সে সমস্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে কখনও তিনি পশ্চাৎপদ বা বিফলমনোরথ হন নাই। ভারতের নৈতিক ও পারিবারিক আদর্শ, গৃহস্থের এবং বনবাসী অথবা পর্বতোপরি ধ্যান ও তপশ্চর্যারত সন্ন্যাসীর জীবন, ভারতবাসীর সুপরিচিত আচার-ব্যবহার, সামাজিক আদর্শ ও অনুষ্ঠান, তাহার ধর্মের বোধ ও ধারণা, মতবাদ, প্রতীকসকল হইতেই তাঁহার কাব্যের বাকী পরিবেশ ও অন্তরীক্ষমণ্ডল গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দেবতা ও রাজগণের উচ্চ ও বৃহৎ কার্য, মহত্তর বা সুকুমারতর মানুষী হৃদয়াবেগ, নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য, প্রেমিকের ইন্দ্রিয়রাগাত্মক ভাবাবেগ, ঋতুরাজি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শোভাযাত্রা—এই সমস্তই ছিল তাঁহার প্রিয় বিষয়বস্তু।

অনুভূতির শিল্পকলা-বিষয়ক, সুখ ও তৃপ্তিদায়ক এবং ইন্দ্রিয়রাগাত্মক দিকের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্বের কথা ধরিলে কালিদাস ছিলেন তাঁহার যুগের খাঁটি সন্তান—প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দময় জীবনের এক সর্বোৎকৃষ্ট কবি। উচ্চতর বস্তুরাজির প্রতি মননশীল ভাবাবেগের দিক হইতে জ্ঞান ও সংস্কৃতি, তপস্যামূলক আত্মসংযমের মহত্ত্ব, নৈতিক আদর্শ ও ধর্মবোধের গভীর মূল্যাববোধের ক্ষেত্রেও তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি ছিলেন এবং এ সমস্তকে তিনি জীবনের মঙ্গল ও মাধুর্যের অংশ করিয়া তুলিয়াছেন, জীবনের পূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছবির মধ্যে এগুলিকেও উচ্চ প্রশংসনীয় উপাদান বলিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার সকল সৃষ্টিই এই জাতীয় উপাদানে গঠিত। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বৃহৎ মহাকাব্য রঘুবংশে এ জাতির উচ্চতম ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কৃতি এবং আদর্শের প্রতিনিধি স্থানীয় এক প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, জমকালো

অলঙ্কারে বিভূষিত ছবির মত সুস্পষ্ট হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ক্রিয়া, মহৎ এবং সুন্দর ভাব ও ভাষা, জীবন্ত ঘটনা, দৃশ্য ও পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া সে সংস্কৃতি ও আদর্শের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। আর একখানি অসমাপ্ত মহাকাব্যে বা মহাকাব্যের এক মহান অংশে—কিন্তু আখ্যায়িকা যতদূর গিয়াছে তাহার মধ্যে তাহার গঠনপদ্ধতির গুণে তাহাই আপনাতে আপনি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিল দেবগণের এক পৌরাণিক কাহিনী, দেবতা ও অসুরগণের সেই প্রাচীন সংগ্রাম, এই কাব্যে মহাদেব ও মহাদেবীর মিলনের মধ্য দিয়া সে যুদ্ধ সমাধানের উপায় প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমনভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহাতে পবিত্র পর্বতোপরি এবং শ্রেষ্ঠ দেবগণের আবাসভূমিতে ভারতবর্ষেরই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবজীবন দিব্য ভাবে ও পরিমাণে উন্নীত করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। তাঁহার নাটক তিনখানি প্রেমের আবেগকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে, সেই আবেগের চতুর্দিকেই নাটকের গতিবৃত্তি চলিয়াছে কিন্তু সেখানেও জীবনের ছবি ও বিস্তৃত বিবরণ ঠিক তেমনি নির্বন্ধ সহকারে দেওয়া হইয়াছে। একখানি কাব্যে ভারতীয় বৎসরের ঋতুসকল বিচিত্র বর্ণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্য একখানি কাব্য মেঘদূতকে উত্তর ভারতের উপর দিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার গমনপথে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পর দৃশ্য মুগ্ধ নয়নের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে এবং অবশেষে সুকুমার ইন্দ্রিয়রাগাত্মক এবং মর্মোচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়নাভিরাম জীবন্ত চিত্রে আসিয়া শেষ হইয়াছে। নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ এই সমস্ত লেখার মধ্য হইতে আমরা সমসাময়িক ভারতের মন, ঐতিহ্য, হৃদয়ের ভাব ও আবেগ, সমৃদ্ধ, সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের এক স্পষ্ট ও অনন্যসাধারণভাবে পূর্ণ ধারণা লাভ করি, অবশ্য অতি গভীর বস্তু-সকলের সাক্ষাৎ এখানে মিলে না, তাহার জন্য আমাদিগকে অন্যত্র খোঁজ করিতে হইবে, কিন্তু সে সময়ের যাহা শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য ভারতের সেই মননশীলতা, প্রাণবন্ততা এবং রসপিপাসার পরিতৃপ্তির দিকে উন্মুখ সাংস্কৃতিক যুগের পরিচয় তাহাতে পাই।

এই সময়ের অন্যান্য কবিতার প্রকৃতি ও ধরন মূলতঃ কালিদাসের কবিতার অনুরূপ, কেননা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এইসকল কবিদের মধ্যে সেই একই ধরনের ভাবনাযুক্ত মন, প্রকৃতি, সাধারণ উপাদানরাজি এবং কাব্যরচনার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহাদের অনেকের মধ্যে আমরা অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য অথবা উচ্চ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাই, যদিও কালিদাসের মত তেমন পূর্ণতা, সৌন্দর্য ও সুষ্ঠু দ্যোতনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারবী ও মাঘের মহাকাব্যে অবনতির সূচনা আত্মপ্রকাশ করে, কেননা সেই সময় হইতে কাব্যের রূপপদ্ধতি ও প্রকাশধারার মধ্যে সেই অলঙ্কারবহুল শ্রমসাধ্য আদর্শ

ক্রমবর্ধমান ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে লাগিল, যাহা কাব্যপ্রতিভার উপর বিপুল ভার চাপাইয়া দেয় এবং পরিণামে তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলে; এ সময় ঐতিহ্য ও গতানুগতিকতাজনিত কৃত্রিমতা ও রুচির বিষম বিকৃতি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, যাহা প্রমাণ করে ভাষা সাহিত্যস্রষ্টার নিকট হইতে তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িবার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে যাঁহারা কেবলমাত্র পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে ব্যস্ত। মাঘের কাব্য কবিপ্রতিভার সহজ সৃষ্টি ততটা নহে যতটা তাহা অলংকার শাস্ত্রের বিধানানুসারে গঠিত; দেখিতে পাই তিনি শ্রুতিমধুর অনুপ্রাস গঠনের জন্য বালকোচিত অতিপ্রয়াস করিয়াছেন, এমন জটিল ও কৌশলপূর্ণভাবে শ্লোক বা কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহার আদ্য অক্ষর বা অন্যভাবে নির্দিষ্ট অক্ষরগুলি পর পর সন্নিবিষ্ট করিলে কোন নাম বা সংক্ষিপ্ত বাক্য গঠিত হয়*, অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়, আর এ সমস্ত কার্য তিনি কাব্যের গুণ রূপে দেখাইতে চান। অবনতির কালিমা ভারবীকে যে স্পর্শ করে নাই তাহা নহে তবে তিনি তত অধিক পরিমাণে কলুষিত হন নাই, তাঁহার দোষ এই যে যাহা একদিকে তাঁহার প্রকৃতি ও কাব্যপ্রতিভার পক্ষে অনুপযোগী এবং অন্যদিকে বস্তুতঃ সুন্দর ও সত্য নহে এরূপ অনেক কিছু দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হইতে দিয়াছেন। এতৎ-সত্ত্বেও ভারবীর মধ্যে গভীর কবিত্বময় ভাবনার উচ্চ গুণাবলী এবং বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত রসগাম্ভীর্য বর্তমান আছে; মাঘের মধ্যে যে স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা ছিল তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে তাহাকে অতিবিস্তৃত স্থান দিতে পারিত, যদি তাঁহার মধ্যস্থ কবিত্ব পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রবৃত্তির দ্বারা খণ্ডিত ও কলুষিত হইয়া না পড়িত। এই মহান ক্লাসিক্যাল যুগের শেষকালের কবিগণের মধ্যে প্রতিভার সহিত রুচি ও রচনাপদ্ধতির এই মিশ্রণের দিকে ইংলন্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগের কবিগণের সহিত সাদৃশ্য আছে, তবে পার্থক্য এই যে ইংলন্ডের বেলায় তাহা স্থূল এবং তখনও অপারিণত সংস্কৃতির ফল, অন্যত্র সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপরিণত এক সংস্কৃতির অবনতিই তাহার কারণ। সেই সঙ্গে বলিতে হইবে যে তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের এই যুগের বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাহার গুণাবলির সহিত খর্বতাগুলিও খুব স্পষ্টভাবে বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করিয়াছে, যে খর্বতা কালিদাসের মধ্যে আমাদের চক্ষুতে পড়ে না, তাঁহার কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তির অন্তরালে তাহা লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে।

সভ্যতায় অতি অগ্রসর ও বুদ্ধিপ্রধান এক যুগে এক অভিজাত ও বিদগ্ধ শ্রেণী যে ভাব ও ভাবনায়, যে জীবনে এবং অন্য যে সমস্ত বস্তুতে পরম্পরাগত-ভাবে অনুরাগী ছিল, এই কবিতা মুখ্যরূপে তাহাদের সুপরিণত সুচিন্তিত

---

* ইংরাজিতে এরূপভাবে রচিত শ্লোক বা কবিতাকে acrostic বলে। অনুবাদক।

কবিত্বময় চিত্র ও সমালোচনা। এখানে সর্বত্র বুদ্ধিরই আধিপত্য চলিয়াছে, এমন কি তাহা যখন নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া শুদ্ধ বস্তুগত বর্ণনাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া বোধ হয় তখনও সে-বর্ণনায় তাহার নিজের প্রতিরূপের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। প্রাচীনতর মহাকাব্যের যুগে ভাবনা ধর্ম নীতি প্রাণের গতিবৃত্তি সমস্তই জীবনে গভীরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইত, কবিত্বময় বুদ্ধি তখনও কার্য করিত কিন্তু নিজের কর্মে তন্ময় হইয়া নিজেকে ভুলিয়া বিষয়বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইত; ইহাই ছিল তাহার মহান সৃজনবীর্য এবং সজীব কবিত্বের সরলতা ও আন্তরিকতা এবং শক্তির গোপন রহস্য। পরবর্তী কবিগণও সেই একই বিষয়াবলিতে অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ সমস্ত বস্তুর বুদ্ধিতে প্রতিফলিত গভীর অভিজ্ঞতা ও বিচারশীল সমালোচনাকুশল মননশীলতা লইয়া কাজ করিতেন, আর এ বুদ্ধি সর্বদা বস্তুকে যতটা পর্যবেক্ষণ করে ততটা তাহার সহিত এক হইয়া বাস করে না। এই সমস্ত সাহিত্যধর্মী মহাকাব্যে জীবনের কোন খাঁটি গতি নাই, আছে কেবল জীবনের অন্তরঙ্গ ও উজ্জ্বল এক বর্ণনা। কবি ঘটনাবলি, দৃশ্যসকল, বিস্তৃত বিবরণ-সমূহ, মূর্তিরাজি, নানাপ্রকার মনোভাবের ছবিগুলি খুলিয়া ধরিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া লইয়া যান; নানা বর্ণে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল এই সমস্ত বস্তু চক্ষুকে যেন আকৃষ্ট করে তেমনি প্রতীতিও জন্মায়, কিন্তু তাহারা সার্থক ও মাধুর্যবিমণ্ডিত হইলেও আমরা শীঘ্রই অনুভব করি যে এ সমস্ত সজীব ছবিমাত্র। বস্তুতঃ এ সমস্ত বস্তুকে অধিকতররূপে কল্পনার বাহ্য চক্ষু দেখিয়াছে, বুদ্ধি সুস্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং কবির ইন্দ্রিয়রাগাত্মক কল্পনা তাহাদিগের ছবি আঁকিয়াছে, কিন্তু আত্মস্থ হইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করা হয় নাই। একমাত্র কালিদাস এ পদ্ধতির এই ত্রুটি হইতে মুক্ত ছিলেন, কেননা তাঁহার মধ্যে বৃহৎ ভাবনা, কল্পনা এবং তীক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন কবিত্বময় এক আত্মা ছিল, সে আত্মা এই যে সৃষ্টি করিয়াছে, এই যাহার ছবি আঁকিয়াছে তাহার মধ্যে নিজে বাস করিয়াছে, কেবল কল্পনাশক্তিবলে তেমন উজ্জ্বল দৃশ্য বা মূর্তিরাজি খাড়া করে নাই বাস্তবে যাহাদের অস্তিত্ব নাই। অন্য সকলে যখন শুধু সময় সময় এ ত্রুটির উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন তখনই শুধু উজ্জ্বল ও শক্তিশালী নয়, পরন্তু মহান কিছু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সাধারণ সৃষ্টিরাজি এত উত্তমরূপে সম্পাদিত যে তাহাদের মধ্যে যাহা আছে তাহার জন্য তাঁহারা উচ্চ ও অজস্র খ্যাতি পাইবার অধিকারী কিন্তু উচ্চতম প্রশংসা পাইতে পারেন না। অবশেষে, তাঁহাদের কাব্য যতটা শোভাসম্পদে বিভূষিত ততটা সৃষ্টিশীল নহে। এই কাব্যপদ্ধতির প্রকৃতি হইতে এক আধ্যাত্মিক পরিণাম উদ্ভূত হয়, যাহা আমরা সমসাময়িক ভারতের ভাবনায়, নীতিশাস্ত্রে, রসভাবিত শিক্ষাদীক্ষায় এবং সক্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত জীবন-

ধারার মধ্যে দেখিতে পাই, কিন্তু এ সব কাব্যের মধ্যে সে সমস্ত বস্তুর বাহ্য-প্রকৃতি ও আকৃতির প্রকাশ যতটা দেখি তাহাদের গভীরতর আত্মার পরিচয় ততটা পাই না। এ সমস্তের মধ্যে যথেষ্ট উচ্চ ধরনের ধর্ম ও নীতির ভাব ও ভাবনা আছে, তাহা সরল ও আন্তরিকও বটে, কিন্তু সে সরলতা ও আন্তরিকতা কেবল বুদ্ধিগত, সেইজন্য আমরা মহাভারত ও রামায়ণ এবং ভারতের অধিকাংশ শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে যে গভীরতর ধর্মানুভূতি ও সজীব নৈতিক শক্তির ছাপ দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। সন্ন্যাসীর জীবনের চিত্র ইহাতে আছে কিন্তু তাহা কেবল ভাবে ও বাহ্যমূর্তিতে, ইন্দ্রিয়গত জীবনও তেমনি মনোযোগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, গভীরভাবে তপস্বীজীবন পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, চক্ষুর ও বুদ্ধির সম্মুখে তাহার মূর্তি উত্তমরূপেই স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কবির আত্মাতে সে জীবন গভীরভাবে অনুভূত এবং সৃষ্ট হয় নাই। বুদ্ধি বা মনীষা বস্তুর সহিত অত্যন্ত বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে অথচ গভীরভাবে বিচার-সহকারে পর্যবেক্ষণে রত হইয়াছে, ইহার ফলে তাহা জীবনের স্বাভাবিক শক্তির সহিত বা বোধিজাত একত্বের সহিত বস্তুর মধ্যে বাস করিতে পারে নাই। অতিমাত্রায় বর্ধিত বুদ্ধিবাদের ইহাই গুণ আবার ইহাই তাহার ব্যাধিও বটে, আর সর্বদা দেখা গিয়াছে যে এইরূপ অতিপরিণত মননশক্তি অবনতির অগ্রদূত রূপেই উপস্থিত হইয়াছে।

অতি প্রবল মননশীলতার দিকে এই ঝোঁক আমরা অন্য একপ্রকার লেখায় প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই, তাহা নীতিগর্ভ শ্লোক যাহাকে 'সুভাষিত' বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিটি শ্লোককে সমগ্ররূপে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়; কোন ভাবনা, জীবনের কোন সংক্ষিপ্ত রেখাপাত বা সার্থক ঘটনা, কোন মনোবৃত্তি বা হৃদয়াবেগের ঘনীভূত সারবস্তু সেই একই শ্লোকের মধ্যে এরূপ প্রচুররূপে প্রকাশিত হয় যাহাতে তাহার মূল ভাব বুদ্ধির কাছে প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই ধরনের শ্লোক অতি প্রচুর পরিমাণে সুষ্ঠুভাবে রচিত হইয়াছে, কেননা ইহা সে যুগের তীক্ষ্ম মননশীলতা এবং বিস্তৃত পরিণত ও সুসঞ্চিত অভিজ্ঞতার অনুকূল; কিন্তু ভর্তৃহরির সৃষ্টির মধ্যে এ শক্তি প্রতিভার আকার ধারণ করিয়াছে, কেননা তিনি কেবল ভাবনা দিয়া লিখেন নাই তাহার সহিত হৃদয়াবেগও মিশাইয়াছেন; অথবা বলিতে পারা যায় যে তাঁহাতে এক হৃদয়গ্রাহী অনুভূতিময় মননশীলতা এবং এক অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা এমন ভাবে মিশিয়াছে যাহাতে রচনার মধ্যে প্রবল শক্তি এবং সময়ে সময়ে বাক্যাবলিতে অতি তীব্রতা দেখা দিয়াছে। তাঁহার শ্লোকাবলির তিনটি শতক আছে, প্রথম নীতিশতকে উচ্চ নৈতিক ভাবনা ও জাগতিক জ্ঞান অথবা জীবনের নানা বিভাবের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বিতীয় শৃঙ্গার-শতকে আছে প্রেমের আবেগের বর্ণনা, কিন্তু তাহা তেমন শক্তিশালী নহে, কেননা তাহা

কবির নিজের প্রকৃতি ও প্রতিভা হইতে ততটা জাত হয় নাই যতটা কৌতূহল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে গৃহীত হইয়াছে; আর তৃতীয় বৈরাগ্য-শতকে ঘোষিত হইয়াছে তপশ্চর্যামূলক এক অবসাদ এবং জগৎ হইতে পশ্চাদাবর্তন। ভর্তৃহরির এই ত্রিবিধ সৃষ্টি সে যুগের মনের প্রেরণার তিনটি প্রধান ধারার অভিব্যঞ্জক; প্রথম ধারা জীবনের প্রতি ভাবনামূলক ভাবে মনোযোগ এবং উচ্চ সবল সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত মননশীলতা, দ্বিতীয়টি ইন্দ্রিয়জ-ভোগসমূহের প্রতি অভিনিবেশ আর তৃতীয়টি তপশ্চর্যামূলক আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান, যাহা প্রথমটির শেষ এবং দ্বিতীয়টির নিষ্ক্রয় বা মুক্তিপণ। ইহাও দেখিবার বিষয় যে এই আধ্যাত্মিকতার প্রকৃতি এরূপ যে তাহা আর পূর্বের মত নিজের উচ্চ রাজ্যের পূর্ণতার মধ্যে আত্মার স্বাভাবিক ও বৃহৎ উড্ডয়ন নহে; ইহাতে বরং আছে, যে পরিতৃপ্তি তাহারা খুঁজিতেছিল, তাহা না পাইয়া অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তির নিজেদের এবং জীবনের নিকট হইতে পরাবর্তন এবং আধ্যাত্মিক এক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে শান্তির অন্বেষণ, যে নিষ্ক্রিয়তার ভিতরে ক্লান্ত ভাবনা ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরাজি তাহাদের চরম বিশ্রাম পাইতে এবং লয় হইয়া যাইতে পারে।

এ যুগে কবিত্বময় মনের নিকট নাটক পরম আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশ্য সে জন্য নাটক যে সাহিত্য মানসের শ্রেষ্ঠ ফল একথা বলা চলে না। তথায় অতিরিক্ত মননশীলতা নাট্যকাব্যের প্রয়োজনে আরও অন্তরঙ্গ ও সৃষ্টিশীলভাবে প্রাণের ছাঁচ ও গতিবৃত্তির সহিত একীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকধারার এক সুন্দর বিশিষ্ট রূপ আছে, সুসম্পাদিত শিল্পকলা এবং সৃষ্টিশীল নৈপুণ্য লইয়া যে সমস্ত নাটক আমাদের সময় পর্যন্ত আসিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে এ রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে বলিতে হইবে যে ইহাও সত্য যে সংস্কৃত নাটক গ্রীক অথবা সেক্স্‌পিয়ারের নাটকের মত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই নহে যে সংস্কৃতে বিয়োগান্ত নাটক (tragedy) পরিত্যক্ত হইয়াছে, —কেননা মৃত্যু দুঃখ দারুণ বিপদ ও কর্মের শোকান্ত প্রত্যাবর্তনে সমাপ্তি না করিয়াও মহত্তম ধরনের নাটক সৃষ্টি হইতে পারে—আর এরূপ নাটকের সুর যে ভারতীয় মনের নিকট একান্ত অপরিচিত ছিল তাহাও সত্য নহে, কেননা মহাভারতের মধ্যে এ সুরের সাক্ষাৎ পাই এবং প্রাচীনতর কালে রচিত রামায়ণে যে বিজয়োল্লাসযুক্ত পরিণাম ছিল তাহাতেও এ সুর পরে উত্তরকান্ডে যোগ করা হইয়াছে; কিন্তু শান্তি ও নীরবতার পরিবেশের মধ্যে নাটক শেষ করা ভারতীয় প্রকৃতি ও কল্পনার সত্ত্বগুণাভিমুখী গতির পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জীবনের বৃহৎ পরিণাম ও সমস্যাগুলি সাহসের সহিত বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয় নাই বলিয়াই সংস্কৃত নাটক গ্রীক ও সেক্স্‌পিয়রের নাটকের সমতুল্য হইয়া উঠিতে

পারে নাই। এই সমস্ত নাটক প্রধানতঃ রোমান্টিক বা রমন্যাসজাতীয়, সে যুগের সুসংস্কৃত জীবনের নিরুপদ্রব শান্তি ও প্রতিরূপগুলি প্রাচীন আখ্যায়িকা ও পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ইহাতে রূপায়িত করা হইয়াছে, কিন্তু এ সমস্ত নাটকের মধ্যে কয়েকখানিতে বাস্তব জীবনের চিত্রও ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—নাগরিক গৃহস্থজীবন, সমসাময়িক অন্যান্য দৃশ্যাবলি বা ঐতিহাসিক কোন বৃত্তান্তজাতীয় বিষয়বস্তু লইয়াও সেগুলি রচিত হইয়াছে। বহুক্ষেত্রেই জাঁকজমকশালী রাজসভা অথবা প্রকৃতির কোন পরিবেশের নানা বিচিত্র সৌন্দর্য তাহাদের নাটকের সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু যাহাই তাহাদের বিষয়-বস্তু হউক না কেন, নাটক যে জাতীয়ই হউক, তাহাতে শুধু জীবনের উজ্জ্বল প্রতিলিপি অথবা কল্পনা দ্বারা তাহারই কোন পরিবর্তিত রূপ চিত্রিত আছে, কিন্তু মহত্তম ও অতি হৃদয়স্পর্শী নাটক সৃষ্টির জন্য আরও বেশী কিছু প্রয়োজন। কিন্তু যদিও তাহা মানুষের ক্রিয়া ও প্রেরণার কোন বিশেষ গভীর ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই তথাপি এই ধরনের নাটকের মধ্যে উচ্চ বলিষ্ঠ ও মাধুর্যময় কবিত্বশক্তি অথবা প্রতিরূপ প্রদর্শনের সামর্থ্য বর্তমান আছে, এ বিষয়ে তাহারা হীন নহে। এ জাতীয় নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যে কবিত্বময় সৌন্দর্যের অতি মনোরম মাধুর্য এবং সূক্ষ্ম ও সুন্দর অনুভূতি এবং পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে—আর এ ধরনের নাটকের অতি সুসম্পন্ন রূপ আমরা কালিদাসের শকুন্তলার মধ্যে দেখিতে পাই, যাহা জগতের সকল রোমান্টিক বা রমন্যাসজাতীয় সাহিত্যের মধ্যে পরিপূর্ণতম এবং হৃদয় মন মুগ্ধ করিবার শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ—অথবা তাহাতে অনুভূতি বা হৃদয়াবেগ এবং ক্রিয়ার এক ক্রমবর্ধমান চমক এবং স্বীকৃত তত্ত্ব বা বিধান ও সতর্কভাবে পরীক্ষিত শিল্পসূত্রের নিয়ম অনুসারে অপ্রগল্‌ভ পরিস্ফুরণের নৈপুণ্য আছে, পরিমিত ও সংযতভাবে সে পরিস্ফুরণ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘটনার ভয়াবহ কোলাহল, অবস্থাসঙ্কট বা দলবদ্ধ জনতার গুরুভার চাপিয়া বসে নাই, স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তির মূল সুরের অধীন হইয়া নাটকের গতিপ্রবাহ অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম সংবেদনশক্তিসম্পন্ন মনস্তত্ত্বের মাধুর্য আছে, তবু ইউরোপীয় নাট্যশিল্পে সাধারণতঃ যে ভাবে চরিত্র চিত্রণের দাবি করা হয় তাহা তত সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না, কিন্তু নাটকের সংলাপ ও ক্রিয়ার মধ্যে মৃদু সংস্পর্শ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে তাহার নির্দেশ আছে—এই সমস্ত হইল এ জাতীয় নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহা এমন এক শিল্প যাহা সৃষ্ট হইয়াছে পরিমার্জিত রুচি মননশীল সূক্ষ্মবোধযুক্ত উচ্চকৃষ্টিসম্পন্ন এক শ্রেণীর মনীষী দ্বারা যাঁহারা শান্ত রসমাধুর্য স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য ভালবাসিতেন এবং এ জাতীয় নাটক সেই একই শ্রেণীর লোকের প্রিয়ও হইয়াছিল; এ ধরনের নাটকের অনেক অপূর্ণতা আছে কিন্তু অনেক গুণও

আছে, শ্রেষ্ঠ যুগের সৃষ্টির মধ্যে সর্বদা একটা মাধুর্য ও কমনীয়তা দৃষ্ট হয়, কবি ভাসের নাটকাবলি সরল ও সহজতররূপে সাক্ষাৎভাবে অভিব্যক্ত কিন্তু তবুও তাহা চমৎকারভাবে বীর্যবান, তাঁহার পরবর্তী তৎপথানুসরণকারী নাট্যকারগণের মধ্যেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই; ভবভূতির নাটকের মধ্যে সজীব উদারতা ও প্রাণময় শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আর কালিদাসের উচ্চ সৌন্দর্যের পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে।

নানা নিদর্শন হইতে জানা যায় যে প্রাচীনগণের সাধনা ও ক্রিয়াধারার ফলে অতি বিশাল পরিমাণে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রমাণ রূপে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে কেবল এই নাটকগুলি, এই কাব্যসমূহ, বিস্তৃত বিবরণ-পূর্ণ গদ্যে লিখিত রমন্যাস বা রোমান্সরাজি, কবি বাণের হর্ষচরিত বা জনরাজের কাশ্মিরের ইতিহাসের মত কোন এক বিশেষ বিষয় লইয়া লিখিত গ্রন্থাবলি, ধর্ম বা কল্পিত কোন আশ্চর্য বিষয় অথবা বাস্তব জীবন অবলম্বনে লিখিত উপাখ্যান ও কাহিনীসমূহের সংগ্রহপুস্তকগুলি, জাতকসমূহ, বর্ণনায় সমৃদ্ধ ও অক্ষয় প্রাচুর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র এবং তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হিতোপদেশ যাহা জীবজন্তুদের কাহিনীর মধ্য দিয়া কুট রাজনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক কৌশলের তীক্ষ্ম বুদ্ধি প্রচুররূপে সরস রুচিকর ও কৌতূহলোদ্দীপকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছে এবং স্বল্পতরভাবে পরিচিত অন্য বহু গ্রন্থ; কিন্তু এই সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া প্রচুর রূপে এক উচ্চ সংস্কৃতির সমুজ্জ্বল ধারণা, বহু বর্ণবৈচিত্র্যবিভূষিত এক চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে যাহার মধ্যে সমৃদ্ধ এক মননশীলতা এবং ধর্ম রসমাধুর্য, নীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্খলাবদ্ধ এক মহান সমাজের সাক্ষাৎ পাই, বহুমুখী ভাবে যাহা গঠিত ও পরিণত হইয়াছে আর যাহার মধ্যে প্রাণের অতি প্রচুর ক্রিয়া ও গতিধারা রহিয়াছে। ভারত তাহার দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মের স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনের মহান বস্তুসকল গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে—এই যে কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে, প্রাচীনতর কালের মহাকাব্যগুলির মত এ সমস্তও তাহা পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করে। অন্য যে উপাদান এই মিথ্যা কাহিনীর জন্ম দিয়াছে, সেই দার্শনিক ভাবনার ও ধর্মানুভূতির প্রবল ধারা এ সময় বস্তুতঃ প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক এক গতিপথে প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই বাহ্যক্রিয়ার জাঁকজমক ও গতিধারার পশ্চাতে থাকিয়া ক্রমশঃ এমন ভাব ও ভাবনার ধারা প্রভাব, প্রকৃতি ও প্রবণতা গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা ভারতবাসীর জীবনের আর এক সহস্র বৎসর ব্যাপী যুগকে শাসিত ও পরিচালিত করিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতীয় মনের সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রবল যে সুর, তাহার সকল সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ যে প্রকৃতি, তাহার দর্শন, ধর্ম, শিল্প এবং জীবনের সৃষ্টিশীল কর্মাবলির অধিকাংশ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে আশ্রিত আছে, আমি পূর্বেই বলিয়াছি তাহা আধ্যাত্মিক বোধিভাবিত এবং চৈত্যসত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত; কিন্তু তাহার এই মৌলিক অধ্যাত্মপ্রবণতা প্রবল ও সমৃদ্ধ মননশীলতাকে এবং ব্যবহারিক জগতের ও প্রাণের ক্ষেত্রের কর্মাবলিকে বর্জন করে নাই, বরং শক্তিশালী রূপে সে সমস্তকে সমর্থন ও পোষণ করিয়াছে। লৌকিক ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এই কর্মপ্রবণতা প্রবলভাবে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাই তথাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে ভারতীয় মৌলিক প্রকৃতিকে একটু পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই নয় যে তাহার সে-প্রকৃতি পরিবর্তিত বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা সে যুগের ঐহিক কবিতার মধ্যে বোধিভাবিত বা অন্তরাত্মাদ্বারা অনুপ্রাণিত কিছু নাই। পক্ষান্তরে এ সমস্ত কবিতার মধ্যে যে সমস্ত ধরনের মন প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাতে, যে পরিচিত ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সকল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত রহিয়াছে তাহারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, দেখিতে পাই সেই একই ধর্মময় দর্শন, ধর্মময় নীতিবোধ, ধর্মময় সমাজব্যবস্থা বর্তমান আছে, অতীতের সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে এবং তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিতেছে, যদিও তাহা স্পষ্টভাবে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় নাই; আমরা পূর্বে সমসাময়িক শিল্পের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি ঠিক সেই জাতীয় কল্পনা এখানেও রহিয়াছে, অতীত হইতে আগত সার্থক প্রতিরূপ, প্রতীক ও পৌরাণিকী কথা সময়ানুযায়ীভাবে কিছু পরিবর্তিত ও নূতনভাবে গঠিত ও পুষ্ট হইয়া—পুরাণের মধ্যে যাহা পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে অন্তরাত্মার ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি আছে। পার্থক্য এই যে এই সমস্ত কবির হাতে তাহারা মূল আধ্যাত্মিক সৃষ্টির রূপ অপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত ও মননশীলতার দ্বারা সুগঠিত ঐতিহ্যের রূপে অধিকতর ভাবে ফুটিয়াছে; আর

বিচারবুদ্ধিই প্রবল হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবধারাসকলকে পর্যবেক্ষণ ও গ্রহণ করিয়া এই কাঠামোর মধ্যে এই ধরণে স্থান দিয়াছে, এবং গ্রহণ করিতে গিয়া বিচার ও মন্তব্য সহ পুনরায় তাহাদের চিত্র উপস্থাপিত করিবার সময়ে তাহাদিগকে সমৃদ্ধ বর্ণের ও প্রবল রূপরেখারাজির শিল্পশোভায় বিভূষিত, এবং প্রতিরূপের সুন্দর অলঙ্কার মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। এ সময় মূল শক্তি, বোধিভাবিত দৃষ্টি জীবনের বাহ্য ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বস্তুগতভাবে প্রাণময় বিভাবাবলির উপর অতি প্রবলভাবে কার্য করিয়াছে, এবং এ যুগে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসারতাকে সাহায্য করিবার জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বস্তু পূর্ণতর রূপে গৃহীত, প্রকাশিত ও সুগঠিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃতির এই পরিণতির অর্থ বিশুদ্ধ সাহিত্যক্ষেত্রের বাহিরে সে সময়ের রচিত দার্শনিক লেখার মধ্যে এবং পুরাণ ও তন্ত্রের ধর্মবিষয়ক কবিতাবলির মধ্যে অধিকতর স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই দুই সুর একত্র মিশ্রিত এবং শীঘ্র এক বস্তুতে পরিণত হইয়া সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্যাল যুগের সর্বাপেক্ষা সজীব ও স্থায়ী গতিধারা রূপে প্রকাশ পাইল, লোকের মনে এক চিরস্থায়ী ফল আনিয়া দিল; সে ধারায় এক সৃজনশীল শক্তি ছিল যাহা পরবর্তী কালের জনপ্রিয় সাহিত্যগুলির সমুন্নত ও সুস্পষ্ট অংশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা তাহার পশ্চাতে এই যে অতি প্রবল প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে তাহাই জাতীয় মনের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ও সামর্থ্যের, গভীর অধ্যাত্মবুদ্ধি ও অনুভূতির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ; কেননা এ চিন্তাধারার প্রকৃতি ছিল উচ্চতম ও কঠোরতমভাবে মননশীল। প্রাচীনতর কালে মনের যে গতি ও প্রবণতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং মহান দার্শনিক মতবাদসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তত্ত্বনিষ্ঠ বুদ্ধির যে প্রবল প্রচেষ্টা বোধিভাবিত অনুভূতি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যাবলিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করিতে, এবং সে সকল সত্যকে তর্ক-শাস্ত্রসম্মত যুক্তিযুক্ত গভীর ও নিপুণ বিচার ও আলোচনার কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ভাবনা ও চিন্তার দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতে যাহা যাহা আবিষ্কার করা যায় সে সমস্ত সমগ্রভাবে জানিয়া লইতে চাহিয়াছিল, তাহা ষষ্ঠ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে অতি বিশাল দার্শনিক রচনাবলিতে বহু শ্রম দ্বারা সম্পাদিত সতর্ক যুক্তিবিচারের, বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম সমালোচনা ও বিশ্লেষণের এবং ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সুব্যবস্থিত সবল গঠনের মধ্য দিয়া তাহার শক্তির চরমে পৌঁছিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবাসী মহামনীষী শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বের আবির্ভাব এ যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তা ও প্রচেষ্টার এই ধারা এই সময়েই শেষ হইয়া যায় নাই কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ যুগের পরেও বাঁচিয়া রহিয়াছে, এমন কি তাহা আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিচালিত টীকা ব্যাখ্যা ও সমালোচনার

অবিরাম প্রবহমান ধারার মধ্য হইতে সময় সময় বৃহৎ সৃষ্টিশীল ভাব ও ভাবনা এবং অনেক সময়ে নূতন ও সূক্ষ্ম দার্শনিক মতবাদও উদ্ভূত হইয়াছে। এ জাতির মনে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বালোচনার যে সামর্থ্য ও প্রবণতা ছিল, এ যুগে আসিয়াও তাহার প্রাণশক্তির কোন ক্ষীণতা ঘটে নাই, নিরবচ্ছিন্নভাবেই রহিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে দার্শনিক মননশীলতার বিস্তারসাধন-ক্রিয়া এই যুগই পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের একজন সাধারণ মননশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি একবার জাগিয়া উঠে, তবে অতিসূক্ষ্ম ও গভীর দার্শনিক ভাবধারায় অত্যাশ্চর্য দ্রুতবেগে সাড়া দিতে পারে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দুধর্মের প্রাচীন বা নবীন কোন ধারাই নিজের সহায় রূপে সুস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদ ও ব্যঞ্জনা গঠিত না করিয়া সৃষ্ট হইতে পারে নাই।

গদ্যে লিখিত দার্শনিক-রচনা সাহিত্যের পদবী দাবি করে না, তাহাতে সমালোচনার দিকই প্রধান, তাহাদের সুগঠিত কোন সৃষ্টিশীল আকার নাই, কিন্তু অন্য অনেক রচনা আছে যাহাতে ভাব ও ভাবনাকে সুসম্পাদিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাহা দার্শনিক কাব্য-সাহিত্যের আকারেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উপনিষদ ও গীতার ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা সাক্ষাৎভাবে রক্ষা করিবার জন্যই ভাষার এই রূপায়ণ অধিকতর উপযোগী মনে করা হইয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রে এই সমস্ত রচনাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না; এ সমস্ত ভাব ও ভাবনার দ্বারা তাহা অতিরিক্তভাবে ভার-গ্রস্ত হইয়াছে, মননশীলতার মধ্যে অভিনিবিষ্ট রহিয়াছে; যাহাতে প্রাণের নিঃশ্বাস ও অনুপ্রেরণার শক্তি পরিস্ফুরিত হইতে পারে তাহাদের বাক্যাবলির মধ্যে বোধির তেমন প্রচুর আবেগ নাই, আর সৃষ্টিশীল কবিমানসের পক্ষে সেই গুণই অপরিহার্য। এ রচনাতে সমালোচনাপ্রিয় নিশ্চয়াত্মক মননশীলতা অধিকতর সক্রিয়, যে আন্তর দৃষ্টি বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে দেখে এবং ব্যাখ্যা করে তাহা নাই। যাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মদৃষ্টি, ঈশ্বরদৃষ্টি এবং চরম জগদ্দৃষ্টি সাক্ষাৎভাবে লাভ ও সঙ্গীতের ভাষায় কীর্তন করে, আত্মার সেই মহাকাব্যোচিত মহত্ত্ব, উপনিষদগুলিকে যাহা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছে সেই প্রজ্জ্বলিত আলোক তথায় নাই, নাই আত্মার প্রাণ ও অনুভূতি হইতে সাক্ষাৎভাবে জাত ভাব ও ভাবনাও; আর যাহার জন্য গীতা কবিত্বের ক্ষেত্রে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, ভাষার সেই পরিপূর্ণ সবল ব্যঞ্জনাবহুল বাক্যাবলি ও ছন্দোময় গতির সেই সজীব সৌন্দর্যেরও অভাব রহিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে এ সমস্ত কবিতার কতকগুলি নিশ্চিতরূপে কবিত্ব শক্তিতে মহৎ না হইলেও, অতি প্রশংসার্হ সাহিত্যিক গুণে বিভূষিত ছিল, তাহাদের মধ্যে দার্শনিকতার এক মহামনীষা সাহিত্যের এক চমকপ্রদ প্রতিভার সহিত মিশিয়াছিল; তাহাদিগকে

অবশ্য নবসৃষ্টি বলা চলে না, তথাপি তাহারা মহৎ ও সুবিপুলভাবে গঠিত, তাহাতে যাহা কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্চ যুগের ভাষাতে সম্ভব এমন এক সারগর্ভ ঘনীভূত ও সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলি দ্বারা সর্বোচ্চ ভাবনাগুলির রূপ দেওয়া হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে ছন্দের সামঞ্জস্য ও মহান মাধুর্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। শঙ্করের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ বিবেকচূড়ামণির মত পদ্যগ্রন্থে এ সমস্ত গুণ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে বলিবার দিকে অতি প্রবল ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও তথায় বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা উপনিষদের বাণীর ও গীতার বর্ণনারীতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ভারতের প্রাচীনতর রচনা অপেক্ষা মহত্ত্বে ও সৌন্দর্যে হীনতর হইলেও, অন্য যে কোন স্থানে এই জাতীয় রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অন্ততপক্ষে কবিত্বময় রচনা-রীতির দিকে ইহারা তাহাদের কাহারও অপেক্ষা হীনতর নহে, আর ভাব ও ভাবনার উচ্চতায় সকলের উপরে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং যে উদ্দেশ্যে এ সমস্ত রচিত হইয়াছিল তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সমীচীনভাবে বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেখানে সেখানে কিছু টুকরো টুকরো দার্শনিক গান দেখা যায়, যাহারা এক সঙ্গে দার্শনিক ভাবনা ও কবিত্বময় সৌন্দর্যের সারাৎসার; তাহা ছাড়া সাহিত্যরসভাবিত প্রচুর স্তোত্রাবলি আছে যাহাদের অনেকগুলি তাহাদের শক্তি, উৎসাহ ও হৃদয়োচ্ছ্বাসে, তাহাদের ছন্দ ও প্রকাশরীতির মাধুর্যে সর্বাঙ্গসুন্দর। পরবর্তী যুগে প্রাদেশিক সাহিত্যে সেই জাতীয় কিন্তু বৃহত্তর সৃষ্টি দেখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে প্রস্তুত করে।

তাত্ত্বিক দর্শনের ক্ষেত্রে ইউরোপের চিন্তাধারার অধিকাংশ হইতে ভারতীয় সৃষ্টির পার্থক্য এই যে, যখন ভারতীয় দর্শন মননের রূপ ও পদ্ধতি প্রবলভাবে গ্রহণ করে তখনও তাহার প্রকৃত বিষয়বস্তু মননশীলতা নহে, কিন্তু বরং দিব্য-দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ উপাদানের উপর ক্রিয়াশীল সূক্ষ্ম ও অতি গভীর বুদ্ধি যাহার সন্ধান পাইয়াছে তাহাই তাহার সৃষ্টির বিষয়বস্তু। ভারত তাহার দর্শন ধর্ম ও যোগের মধ্যে যে মিলন সর্বদা রক্ষা করিয়াছে তাহারই ফলে এ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ধর্মময় মনন ও তাহার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে সত্যকে প্রথমে অনুসন্ধান করা হইয়াছে দর্শন তাহাই বোধি বা মনের ভাষায় উপস্থাপিত করিয়াছে, সে সত্যকে শুধু ভাবনা বা ধারণার মধ্যে আবিষ্কার অথবা বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমর্থন করিয়া সে তৃপ্ত হয় নাই—যদিও সে কাজও এ-দর্শন চমৎকার ভাবেই সাধিত করিয়াছে—কিন্তু আত্মার জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার দিকে সর্বদা সে দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং তাহাই যোগের উদ্দেশ্য। এ যুগের ভাবনাধারা বুদ্ধিবিচারের এত বেশী প্রাধান্য দিয়াও ভারতীয় মনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই; এ ধারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া কঠোরভাবে ও বহু শ্রম সহকারে বুদ্ধিজাত

পর্যবেক্ষণ ও অন্তরদর্শনের মধ্য দিয়া নিজেকে গঠিত করিয়া তুলি: আবার ফিরিয়া অন্তরভিমুখী হইয়া মানসপ্রত্যয় হইতে নূতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য খণ্ড খণ্ড করিবার এবং খণ্ডিত অংশগুলির কোন একটির প্রতি ঐকান্তিক ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবার প্রবৃত্তিও আসিয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদের বিশাল সর্বাঙ্গীণ সত্য এ যুগের পূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল এবং তাহার মধ্য হইতে বিভিন্নমুখী নানা মতবাদ দেখা দিয়াছিল; এ সময় সে সমস্ত আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইতে লাগিল এবং ব্যাপকতা আরও হ্রাস পাইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই সমস্ত ক্ষুদ্রতর প্রদেশের প্রত্যেকটিতে সূক্ষ্মরূপে গভীর ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চলিতেছিল, এবং মোটের উপর যদিও উচ্চতর ক্ষেত্রের ব্যাপকতা কমিতেছিল তথাপি তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ গ্রহণ ও পরিপাকযোগ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান কিছু বাড়িতেছিল। এ সময় আত্মা ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে পরস্পর বিনিময়ের একটা সুন্দর ছন্দ ছিল, যাহাতে আত্মা আলোক দিয়াছে এবং বুদ্ধি অনুসন্ধান করিয়া সত্যে পৌঁছিয়াছে এবং নিম্নতর জীবনকে বোধিজাত আত্মভাব গ্রহণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে; জগতে অন্য কোথাও যাহার উদাহরণ মিলে না ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাতে তেমন এক অত্যাশ্চর্য গভীরতা, নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার কার্যে তাহার যে অংশ ছিল, এই ছন্দ নিপুণভাবেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানতঃ এই দার্শনিকগণের—যাঁহারা সেই সঙ্গে যোগীও ছিলেন—রচনা অধঃপতনের যে অন্ধকার রাত্রি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল তাহার মধ্যেও ভারতের আত্মাকে সজীব ভাবেই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু ইহা করা সম্ভব হইত না যদি তাহা সহজে বুঝা ও গ্রহণ করা যায় এমন অনেকগুলি ভাব, রূপায়ণ ও প্রতিরূপের সাহায্য না পাওয়া যাইত, যাহারা অংশতঃ উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের অভিব্যক্তি ও অংশতঃ সাধারণ ধর্মময় মনন হইতে আধ্যাত্মিক মননে রূপান্তরের সেতুস্বরূপ হইতে পারে; সম্ভব হইত না যদি জাতীয় কল্পনা, হৃদয়াবেগ, নৈতিক বুদ্ধি ও রসবোধের নিকট তাহাদের আবেদন না পৌঁছিত। তন্ত্র ও পুরাণের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। পুরাণসমূহ ছিল ধর্মীয় কবিতা এবং এ যুগের বৈশিষ্ট্য; কেননা যদিও ইহাদের রূপ সম্ভবতঃ প্রাচীনতর কালে বর্তমান ছিল, তথাপি কেবল এই সময়েই তাহারা পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ধর্মভাবের অভিব্যক্তির প্রধান ও বৈশিষ্ট্যসূচক সাহিত্যিক বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর এই সময়েই যে তাহাদের সকল সারমর্ম প্রথমে জানা গিয়াছে তাহা সত্য নহে বটে, কিন্তু পুরাণগুলির বর্তমান আকার ও প্রধান অংশ এই কালেই সৃষ্ট হইয়াছে। যে সময় অনেকের মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত বহু নব্য ভাবের

অভ্যুদয় হইয়াছে, আবার অন্য অনেকের মধ্যে যখন এক নূতন আবেগ জাগিয়াছে যাহার ফলে বুদ্ধি প্রাচীন সংস্কৃতির প্রথম যুগের মৌলিক ভাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই আধুনিক কালে পুরাণগুলিকে যথেষ্ট তুচ্ছ ও তাহাদের সুনাম নষ্ট করা হইয়াছে। অবশ্য মধ্যযুগের ধর্মবিষয়ক রচনার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝাই এই অপযশের প্রধান কারণ। আমরা যখন ভারতীয় ধর্মচিন্তার গতিধারা এবং এ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে এই সমস্ত রচনার স্থান বুঝিতে পারিব কেবল তখনই তাহাদের তাৎপর্য আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইবে।

বস্তুতঃ আমাদের নিজ আত্মার ও অতীতের যে উৎকৃষ্টতর উপলব্ধি বর্তমানে ফিরিয়া পাইতেছি তাহা আমাদিগকে দেখাইতেছে যে, পুরাণের ধর্ম কেবল প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও ধর্মময় সামাজিক সংস্কৃতির সত্যরাজির নূতন রূপ ও বিস্তার মাত্র। ইহার স্বীকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের বোধগম্য বা উপযোগী ভাবে প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত জগদুৎপত্তিতত্ত্ব, প্রতীক-ময় পুরাবৃত্ত কথা ও প্রতিরূপ, ঐতিহ্য, মতবাদ, সমাজবিধি সংক্ষেপতঃ উপস্থাপিত করা; পুরাণ শব্দটির তাহাই তাৎপর্য। ইহাতে প্রাচীন ভাবধারার মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নাই, শুধু রূপের পরিবর্তন হইয়াছে। বৈদিক যুগে সত্যের যে চৈত্য প্রতীক বা খাঁটি প্রতিরূপরাজি ছিল তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে, অথবা পরিবর্তিত ও খর্বীকৃত অর্থযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে কোন গৌণ পরিকল্পনার মধ্যে নির্বাসিত করা হইয়াছে; যাহারা দৃশ্যতঃ আরও মহদুদ্দেশ্যপরিকল্পিত বিশ্বগত ও ব্যাপক, বাহ্য জগৎ জাত ধারণা হইতে যাহাদিগকে গড়িয়া তোলা হয় নাই, বরং পূর্ণরূপে আমাদের মধ্যস্থ চৈত্য-পুরুষের নিজক্ষেত্র হইতে যাহাদিগকে সরবরাহ করা হইয়াছে, তেমন অন্য বস্তুরাজি তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বৈদিক দেবদেবীগণ বাহ্য জড়গত বিভাবের দ্বারা অপবিত্র সাধারণ লোকের নিকট নিজেদের চৈত্য ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লুকাইয়া রাখিতেন। পক্ষান্তরে দেহগত মন বা কল্পনার কাছে পুরাণের ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) এবং তাহার স্ত্রীশক্তিসমূহের কোন অর্থ নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দার্শনিক ও চৈত্যসত্তাগত, তাহারা সর্বস্রষ্টা ঈশ্বরের একত্ব ও বহুত্বের মূর্তবিগ্রহ। পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি বৈদিক ধর্মের অবনতি হইতে জাত হইয়াছে একথা বলা হইয়াছে, কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়রূপে বলা যাইতে পারে যে পুরাণ বৈদিক ধর্মকে প্রসারিত ও অগ্রগামী করিয়াছে, মূল বিষয়বস্তুতে নহে তাহা সর্বদা একই রহিয়া গিয়াছে, পরিবর্তন আনিয়াছে শুধু বাহ্য গতিবৃত্তিতে। মূর্তিপূজা, মন্দিরে উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য—তাহাদের অপব্যবহার যেরূপ কুসংস্কার অথবা বাহ্য বিষয়মগ্নতা লইয়া আসুক না কেন—অবশ্যম্ভাবীরূপে একটা অধঃপতন নহে।

বৈদিকধর্মে মূর্তিপূজার প্রয়োজন ছিল না, কেননা তথায় বাহ্য প্রকৃতির রূপ-রাজি ছিল দেবতাগণের বাহ্য প্রতীক বা চিহ্ন, আর বাহিরের এই বিশ্বজগৎ ছিল তাহাদের পরিদৃশ্যমান বাসগৃহ। পৌরাণিক ধর্ম আমাদের অন্তরস্থ দেবতার চৈত্যমূর্তি পূজা করিয়াছে, আর বাহিরে তাহার প্রতীকরূপী মূর্তির মধ্যে তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে এবং তাহাকে বিশ্বগত ভাব ও তাৎপর্যের স্থাপত্যচিহ্নস্বরূপ মন্দিরের মধ্যে বাস করাইতে চাহিয়াছে। অন্তর্মুখীনতাই ইহার উদ্দিষ্ট বস্তু, তাই বাহ্য কল্পনা ও দৃষ্টির কাছে এই সমস্ত অন্তরের বস্তুর জটিলতা মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য বাহ্য প্রতীকের এত প্রাচুর্য অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে ধর্মীয় সৌন্দর্য ও রুচির বোধ পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধর্মের অর্থ কোন বাহ্য রীতি ও মেজাজে অন্য রূপ নিয়াছে, সারমর্মে নহে। খাঁটি পার্থক্য এই যে প্রাচীনতর কালে ধর্ম যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন উচ্চতম রহস্যবিজ্ঞানবিদ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন সাধুপুরুষ, যাঁহারা তখনও জাগতিক বাহ্যজীবন দ্বারা অভিভূত জনসাধারণের মধ্যে বাস করিতেন; উপনিষদগুলি জড়ের আবরণ অপসারিত করিয়া স্বতন্ত্র এক বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত দৃষ্টি ও অনুভূতি লাভ করিয়াছিল; পরবর্তী যুগে জনসাধারণের নিকট এমন নানা প্রতিরূপের আকারে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছিল, যাহাদের মধ্যে বৃহৎ দার্শনিক ও মানসিক অর্থরাজি নিহিত ছিল, ত্রিমূর্তি এবং বিষ্ণু ও শিবের শক্তিরাজি ছিল এই সমস্ত প্রতিরূপের কেন্দ্রস্থানীয় বিগ্রহ; পুরাণগুলি বুদ্ধি ও কল্পনার নিকট এই আবেদন আরও অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল এবং চৈত্যে অনুভূতি, হৃদয়াবেগ, রসানুভূতিও ইন্দ্রিয়গণের নিকট সজীব করিয়া তুলিয়াছিল। যোগী ও ঋষি-গণের দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যাবলীকে মানুষের সমগ্র প্রকৃতির নিকট পূর্ণাঙ্গরূপে গূঢ়ার্থপ্রকাশক চিত্তাকর্ষক ও কার্যকরী করিবার জন্য, এবং যাহাতে সাধারণ মানুষের বা একটা সমগ্র জাতির মন তাহাদের প্রথম সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বাহ্য উপায় প্রতিষ্ঠার এক অবিরাম চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম ও দর্শন দ্বারা বিভাবিত ক্রমাভিব্যক্তির প্রকৃত তাৎপর্য।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পুরাণ ও তন্ত্র উভয়ের মধ্যেই উচ্চতম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্যরাজি রহিয়াছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে বা পরস্পর-বিরোধী রূপে যে তাহাদের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা নহে—সেরূপ বিরোধ কেবল পণ্ডিতগণের বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যেই আছে—ভারতীয় মন ও প্রকৃতিসুলভ উদারতার নিকট এ দুই-এর মধ্যে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত, সম্বন্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ সুতরাং সুসমন্বিত হইয়া আছে। কোন কোন সময় স্পষ্টভাবে ইহা করা হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আখ্যায়িকা, পুরাতন কাহিনী, প্রতীক, নীতিকথাপূর্ণ উপাখ্যান, অলৌকিক ঘটনা ও রূপকাখ্যানের

সাহায্য লইয়া এমন এক রূপে করা হইয়াছে যে, জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনায়ও তাহার কিছু গিয়া পৌঁছিতে পারে। আন্তরচেতনা ও আধ্যাত্মিকতার প্রচুর ও দুরধিগম্য অনুভূতিগুলিকে চাক্ষুষ প্রতিরূপ বা রূপকের সাহায্য লইয়া যোগসাধনার উপযোগী ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে তন্ত্রসমূহে মূর্ত করা হইয়াছে। পুরাণের মধ্যেও এ উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় তবে অপেক্ষাকৃত আল্‌গাভাবে, তথায় অবিচলিত পারম্পর্য তেমনভাবে রক্ষা করা হয় নাই। সব দিক দেখিলে এই পদ্ধতি বৈদিক প্রণালীরই প্রবর্ধিত সংস্করণ বলিয়া বুঝা যাইবে—অবশ্য অন্যরূপে, সমসাময়িক কালের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত আকারে। পুরাণগুলির প্রত্যেকে নিজের বিশিষ্ট আন্তর তাৎপর্যের উপযোগী ভাবে বাহ্য প্রতিরূপ ও আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায় গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলের পবিত্রতা এক আন্তর-সঙ্গমের রূপক, যাহা যোগের আন্তরচেতনাময় দেহগত একটা প্রণালীর মধ্যস্থ সমাধানমূলক একটা খুব বড় অনুভূতির নির্দেশ দেয়, তাহা ছাড়া ইহার অন্য তাৎপর্যও আছে—এইরূপ নানা অর্থের ব্যঞ্জনা এই জাতীয় প্রতীকের সাধারণ ধর্ম। পুরাণগুলির মধ্যেই স্পষ্টভাবে বলা আছে যে পুরাণের তথাকথিত অবাস্তব ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এক সমৃদ্ধ কবিত্বময় রূপক, অন্তরস্থিত চৈত্য-সত্তার নিজ জগতের এক প্রতীকময় ভূবৃত্তান্ত। পুরাণে যে বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্ব সময় সময় বাহ্যজগতের উপযোগী ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে, বেদের মতই তাহার এক আধ্যাত্মিক ও আন্তর-চৈতন্যগত অর্থ ও ভিত্তি আছে। ইহা বুঝা কঠিন নয় যে কিরূপে পরবর্তী যুগের ক্রমবর্ধমান অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক প্রতীকবাদের অধিকতর পারিভাষিক অংশ অনিবার্যরূপে নিজে-দিগকে অনেক কুসংস্কারে, এবং আধ্যাত্মিকতা ও আন্তর-চেতনার বিষয়সমূহকে স্থূল জড়ীয় ধারণায় পরিণত হইতে দিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুকে সাধারণ গণচেতনার বিষয়ীভূত করিবার সকল চেষ্টার সঙ্গে এরূপ বিপদ দেখা দিয়া থাকে; কিন্তু যাহাতে জনসাধারণ আন্তর-চেতনাময় ধর্ম ও আন্তর-চেতনাময় আধ্যাত্মিকতার আবেদনে সাড়া দিতে পারে—এই সাড়া দেওয়ার শক্তিই মানুষের উচ্চতর বিষয় গ্রহণের সামর্থ্যকে প্রস্তুত করে—তেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়ার এই প্রচেষ্টা যে বিপুল ফলোৎপাদন করিয়াছে, এই প্রতি-কূলাবস্থা যেন আমাদিগকে সে দিকে অন্ধ করিয়া না দেয়। আরও সূক্ষ্ম আবেদন ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যে আরও সাক্ষাৎভাবে পৌঁছিবার উপযোগী জাগরণ দ্বারা পৌরাণিক এই শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি স্থানচ্যুত করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও এ ফল স্থায়ীভাবে থাকিয়া যাইবে, আর তেমন স্থানচ্যুতি যদি সম্ভবও হয় তাহা হইলেও পুরাণ যে কার্য করিয়াছে প্রধানতঃ তাহার জন্যই সে সম্ভাবনা ফলবতী হইবে।

পুরাণ মূলতঃ খাঁটি ধর্মবিষয়ক কবিতা; সরল ও সুন্দরভাবে ধর্মের সত্যকে অভিব্যক্ত করিবার এক শিল্প। অষ্টাদশ পুরাণের সকলগুলিই বস্তুতঃ এই ভাবের কবিতায় ও শিল্পে উচ্চ স্থান পায় নাই; ইহাদের মধ্যে অনেক বাজে জিনিস আছে, স্থূল ও শুষ্ক বিষয়ও যে খুব কম আছে তাহাও নহে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর সৃষ্টির যে সমৃদ্ধি ও শক্তি ইহার মধ্যে আছে তাহা যে কবিত্বময় রচনাপদ্ধতি ইহাতে অবলম্বিত হইয়াছে তাহাকে সমর্থন করে। প্রাচীনতম পুরাণগুলিই সর্বোত্তম, শেষের দিকে নূতন পদ্ধতিতে রচিত একখানিতে শুধু এই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, সে পুরাণখানি স্বপ্রতিষ্ঠিত ও অদ্বিতীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মরুভূমির মত শুষ্ক ও নিরস দু-একটি স্থান থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুপুরাণ অতি উচ্চগুণোপেত এক আশ্চর্য সাহিত্যিক সৃষ্টি, প্রাচীন মহাকাব্যের রচনা-পদ্ধতির উপযোগী সাক্ষাৎ শক্তি ও উচ্চতা তাহাতে বহুল পরিমাণে প্রকাশিত ও রক্ষিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নানা গতিবৃত্তি, প্রভূত সজীবতা ও সরলতা এবং কতক পরিমাণে গভীর ভাবব্যঞ্জক মহাকাব্যোচিত রচনা আছে, মধ্যে মধ্যে গীতধর্মী খণ্ডকাব্যের গুণযুক্ত উজ্জ্বল মাধুর্য ও সৌন্দর্যের উপাদান, মনোরম উদ্দীপনাপূর্ণ অনেক বর্ণনা ও কবিত্বসৃষ্টির সরল নিপুণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শ্রীমদভাগবত সর্বশেষে রচিত হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণের অধিকতর ভাবে জনপ্রিয় ভাষা ও রচনারীতি হইতে এ পুরাণ অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, কেননা ইহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং আরও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্কার-বহুল সাহিত্যিক ভাষার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, সূক্ষ্মতা, সমৃদ্ধ গভীর ভাব ও চিন্তাধারা এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ইহা আরও বিস্ময়কর এক সৃষ্টি। ইহার মধ্যে আমরা সেই গতিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাই যাহা পরবর্তী কালে অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল উৎপন্ন করিয়াছিল—হৃদয়াবেগপূর্ণ পরমানন্দদায়ক ভক্তিধর্মকে প্রকাশ ও বিবর্ধিত করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ধর্মের রূপরাজির মধ্যে এই পরিণতির দিকে একটা প্রবণতা অন্তর্নিহিত ভাবে বর্তমান ছিল, আর ধীরে ধীরে তাহা শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা জ্ঞান ও কর্মের কঠোর তপশ্চর্যা এবং কেবল ঊর্ধ্বতম ভূমিতে আধ্যাত্মিক পরমানন্দের অন্বেষণের দিকে প্রভাবশালী প্রবণতা দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন ছিল এবং পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগে যে মনোবৃত্তি বহির্মুখী হইয়া বাহ্যজীবন ও ইন্দ্রিয়পরিতর্পণে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা নূতন রূপে অন্তরাবৃত্ত হইয়া পরবর্তী কালের হর্ষোন্মাদ-জনক বৈষ্ণবধর্মের নানা রূপের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। জীবন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া এই অনুধাবন যদি কেবল ঐহিক ও বাহিরের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে স্নায়ুর শৈথিল্য, জীবনীশক্তির হ্রাস, নৈতিক

অবনতি বা উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিতে পারিত, কিন্তু ভারতীয় মনের পরিচালক প্রধান প্রেরণা এই যে তাহা জীবনের সকল অভিজ্ঞতাকে তাহাদের অনুরূপ আধ্যাত্মিক বস্তু ও উপাদানে পরিণত হইতে বাধ্য করে, আর তাহারই ফলে এই সমস্ত অতি বাহ্য বিষয়ও নূতন আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিত্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। আত্মাকে বাহিরের দিকে আরও অধিক দূর টানিয়া লওয়ার পূর্বে সত্তার আবেগময় ইন্দ্রিয়গত এমনকি ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ গতিবৃত্তি-সকলকে গ্রহণ করিয়া অন্তরাত্মার এক রূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল, এবং এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া তাহারা হৃদয় ও ইন্দ্রিয়সকলের মধ্য দিয়া ভগবানকে বন্দী করিবার এক রহস্যময় উপাদানে, ভগবানের প্রেম আনন্দ ও সৌন্দর্যের আস্বাদনমূলক পরম সুখময় এক ধর্মে পরিণত হইল। তন্ত্র এই নূতন উপাদানগুলিকে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ চৈত্য-আধ্যাত্মিক ও চৈত্য-ভৌতিক (psycho-spiritual and psycho-physical) যোগবিজ্ঞানের মধ্যে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থান দান করিল। বালক কৃষ্ণের রাখাল-জীবনের রহস্যময় উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিপাশে ইহার জনপ্রিয় আকার, বৈষ্ণবধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বীরত্বপূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী পুরাণসমূহে এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া আনন্দময় আদি রসাত্মক এক প্রতীক গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং ভাগবতে আসিয়া ইহার পূর্ণশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, আর ইহার মধ্যস্থিত দার্শনিক আধ্যাত্মিক ও আন্তর-চৈতন্যগত বোধ ও অর্থ পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং সমন্বয়ের কেন্দ্র জ্ঞান হইতে আধ্যাত্মিক প্রেম ও আনন্দের মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া নিজের বিশিষ্ট ধারায় প্রাচীনতর কালের বেদান্তের তাৎপর্যকে এক নূতনভাবে পুনরায় গঠন করা হইয়াছে। এই পরিণতির পূর্ণ ফল শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত দিব্য প্রেমের দর্শন ও ধর্মের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদান্ত দর্শনের পরবর্তী কালের পরিণতিতে, পুরাণের ভাব ও রূপক বা প্রতিরূপের ধারাগুলি এবং ভক্তিধর্মের কবিত্বময় ও রসসৌন্দর্যবিমণ্ডিত আধ্যাত্মিকতাই প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্মকাল হইতে তাহাদিগকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের ধারা যে হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল তাহা নহে। সে ভাষায় ক্লাসিক্যাল বা উচ্চশ্রেণীর কবিতা লেখা চলিতে লাগিল, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত কবিতার এই ধারা অব্যাহত ছিল, এ সময়েও দর্শনশাস্ত্রের ও সকল প্রকার পাণ্ডিত্যের ভাষা সংস্কৃতই রহিয়া গেল; সকল গদ্য রচনা, সমালোচনা হিসাবে লেখা সমস্ত বিষয় প্রাচীন ভাষায়ই চলিতে লাগিল। কিন্তু তন্মধ্যস্থ প্রতিভা দ্রুতভাবে হীনপ্রভ হইতে লাগিল এবং ইহা কঠিন, গুরুভারাক্রান্ত ও কৃত্রিম হইয়া উঠিল,

আর তাহার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিবার জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক মনীষামাত্র অবশিষ্ট রহিল। কোথাও কিছু পূর্বে বা অন্য কোথায় কিছু পরে হইলেও প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যের গৌরবের ভূমিতে উন্নীত হইতে ও কবিত্বময় সৃষ্টির এবং জনসাধারণের সংস্কৃতির বাহন হইয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণ লোকের উপযোগী উপাদান-বর্জিত না হইলেও সংস্কৃত মূলতঃ এবং প্রধান অর্থে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাষা; সে সময় সংস্কৃতির যে অংশকে এইভাবে গ্রহণ শুধু উচ্চতর শ্রেণীসমূহের পক্ষে সম্ভবপর ছিল, সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক মানসিক নৈতিক এবং রসবোধকে, বিশেষত সংস্কৃতির মহৎ আস্পৃহা ও বৃহৎ রীতিকে রূপ দিবার প্রয়োজনেই এ ভাষা গঠিত ও পরিণত হইয়াছিল; আবার ইহা অপরকে প্রভাবিত ও অপরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য নানা প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া এ সমস্তের ধারণা লোকের মনে জন্মাইতে চাহিয়াছে এবং বিশেষতঃ ধর্ম, শিল্প, সামাজিক ও নৈতিক বিধান দ্বারা জনগণমনে তাহাদিগকে সংক্রামিত করিয়াছে। বৌদ্ধগণের হাতে পড়িয়া পালি ভাষা এই ভাব সংক্রামণের এক সাক্ষাৎ উপায় হইয়া দাঁড়াইল। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কবিতা, কবিতা শব্দের সকল অর্থেই এক গণসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার লেখকগণ উচ্চতর তিন বর্ণের এবং প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিলেন, এবং পরবর্তী কালে তাঁহাদের মধ্যস্থ পণ্ডিতগণ উচ্চ সংস্কৃতি-বিভূষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য লিখিতেন; বৌদ্ধ লেখকগণও দার্শনিক, সন্ন্যাসী, রাজা বা প্রচারক ছিলেন, তাহারা কখন কখন নিজেদের কখন কখন জনসাধারণের জন্য অধিকতর জনপ্রিয় ভাষায় লিখিতেন; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষার কবিতা জনসাধারণের হৃদয় হইতে সাক্ষাৎভাবে জাত হইয়াছে, তাহার লেখকগণ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম শূদ্র ও অন্ত্যজ সকল শ্রেণীর মধ্য হইতেই আসিয়াছেন। কেবল উর্দু ভাষার মধ্যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগোচিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোভাব ও অভ্যাসের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং তদপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে তামিলের মত দক্ষিণ-দেশীয় ভাষাসকলের মধ্যেও দৃষ্ট হয়, এই সমস্ত দক্ষিণী ভাষার প্রধান যুগ সংস্কৃত ভাষার ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সমসাময়িক, আর তাহার পরবর্তীকালের রচনা দক্ষিণদেশের স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজাদের সভা ও রাজ্যগুলি যত-দিন বর্তমান ছিল ততদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল; কিন্তু এখানেও সাহিত্যের মধ্যে জনসাধারণের উপযোগী উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল; উদাহরণস্বরূপ শৈব সাধু ও বৈষ্ণব আলোয়ারগণের গানগুলির কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রাদেশিক সাহিত্যের এই ক্ষেত্র এত বিশাল যে সহজে তাহা সমগ্রভাবে জানা যায় না, অথবা দ্রুতভাবে তাহা পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবু পরবর্তীকালের এই সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে কিছু

বলিতে হইবে, কেননা তাহাতে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার বৃহত্তর যুগাবলির তুলনায় যে যুগকে বাধানিষেধ ও অবনতির কাল বলা যাইতে পারে তখনও ভারতীয় সংস্কৃতি কিরূপ সজীব ও অবিচলিত ভাবে সৃষ্টিশীল ছিল।

যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের সূচনা হইয়াছে বেদ এবং উপনিষদ হইতে, তদ্রূপ পরবর্তী কালে এইসমস্ত সাহিত্য, সাধু ও ভক্তগণের অনুপ্রেরণালব্ধ কবিতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কেননা ভারতে নূতন ভাবধারা ও সম্ভাবনা রূপায়িত করিবার এবং জাতীয় জীবনের পরিবর্তন আনয়নের সূচনা করিবার প্রেরণা সর্বদাই আধ্যাত্মিক গতিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা অন্ততঃ তথা হইতেই সেসমস্ত কার্যের আবেগ আসিয়াছে। বর্তমান সময়ের পূর্বে এই সমস্ত ভাষার অধিকাংশ সৃষ্টিশীল ক্রিয়াবলির মধ্যে পূর্বাপর প্রায় সর্ব অবস্থাতে এই জাতীয় বস্তুই সর্বদা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কেননা এই জাতীয় কবিতাই এ জাতির হৃদয় ও মনের কাছে নিকটতম স্থান সর্বদা অধিকার করিয়াছে; এমন কি যখন অধিকতর ঐহিক বিষয় লইয়া কোন কিছু রচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও ধর্মভাব প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার কাঠামো গড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার সুরের ও ব্যক্ত প্রেরণার অঙ্গীভূত হইয়া বর্তমান আছে। প্রাচুর্যে, কাব্যগুণোৎকর্ষে, প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য ও লিরিকধর্মী সৃষ্টিনৈপুণ্যের মিলনে তাহার নিজস্ব ক্ষেত্রে অন্য কোন সাহিত্যে এ কবিতার তুল্য কিছু নাই। শুধু ঐকান্তিক ভক্তিময় অনুভূতি এ জাতীয় মধুর ও সুন্দর কবিতাসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ইউরোপে এ ধরনের রচনার অভাবই এ কথা প্রমাণ করে; ইহা সৃষ্টি করিবার জন্য সমৃদ্ধ ও গভীর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি প্রয়োজনীয়। এ সময়কার সাহিত্যের আর এক অংশে, মহাভারত ও রামায়ণের আখ্যায়িকাসকলের নূতন কবিতানুবাদের অথবা প্রাচীন পুরাবৃত্ত কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত ভাবব্যঞ্জক রোমান্টিক (romantic) বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রাচীন সংস্কৃতির মূলবস্তুসকলের কিছুটা জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাতে আনয়নের প্রচেষ্টা চলিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও আমরা উচ্চতম প্রতিভার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তদপেক্ষা হীনতর প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট হইলেও উচ্চগুণসম্পন্ন প্রচুর রচনার সাক্ষাৎ পাই। এ সাহিত্যের তৃতীয় এক অংশের ভিতর এ জাতির ধর্মমত ও অনুভূতিসকল, রাজসভা, নগর, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পল্লীগ্রামের এবং ভূম্যধিকারী, বণিক, শিল্পী ও কৃষকের জীবনের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভাষার অধিকাংশ রচনা এই সকলের কোন না কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কিন্তু সময় সময় অন্য ভাবের রচনাও দেখা গিয়াছে, যেমন মহারাষ্ট্রে রামদাসের ধর্মময় নৈতিক ও রাষ্ট্রিক কবিতাবলি, অথবা তামিল সাধু তিরুবেল্লুয়ারের লিখিত সারগর্ভ কবিতা বা সুভাষিতাবলি; পরি-কল্পনায়, ভাবে, ধারণায় ও শক্তিতে, এ জাতীয় কবিতা যেখানে যত রচিত

মধ্যে ইহা সর্বোত্তম। এই সমস্ত ভাষার একটি বা দুইটিতে পরবর্তীকালে যথেষ্ট পরিমাণে গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্যযুক্ত আদিরসাত্মক কবিতাও দেখা যায় যাহার অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণভাবে পার্থিব বিষয় হইতে আসিয়াছে। নানা প্রাদেশিক জাতির লিখিত এই সমস্ত রচনাবলির রূপের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও একই সংস্কৃতির আধিপত্য সর্বত্রই রহিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও প্রকৃতি অনুসারে রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকের রচনাতে বিভিন্নতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই এই সমস্ত সুন্দর ও সবল সাহিত্যের প্রত্যেকের মধ্যে মূলগত একত্বের সঙ্গে এক সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে।

এই ভাবে মানস প্রকৃতির বৈচিত্র্যের চাপে বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণব কবিতা বিভিন্ন ভাবের কলাকৌশলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাতে পুরাণসমূহের দ্বারা সৃষ্ট চৈত্যপ্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাংলা দেশে ইহা সুমনোহর কলাকৌশলের এক পরিপূর্ণতম রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ঐতিহ্য বজায় রহিয়াছে। ভগবানের জন্য অন্তরাত্মার আকূতি ও কামনা তথায় রাধা ও কৃষ্ণের ভাবরসাবিষ্ট প্রেমময় মূর্তির প্রতীকের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে; মানুষের মধ্যস্থ প্রাকৃতিক আত্মা প্রেমের মধ্য দিয়া দিব্য পরমাত্মাকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ ও বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার অপরূপ বাঁশির যাদুতে আকৃষ্ট ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, এই তীব্র আবেগে অভিভূত হইয়া মানুষী সকল চিন্তা প্রযত্ন ও কর্তব্য ত্যাগ করিয়াছে, প্রেমের বিভিন্ন দশার মধুর স্বরবৈচিত্র্যে পূর্বরাগ হইতে মিলনের পরম আনন্দ, বিরহের মর্মান্তিক যাতনা, নিত্য লালসা এবং পুনর্মিলন এই সমস্ত ভাবের মধ্য দিয়া মানবাত্মার ভগবদভিমুখী প্রেমজীবনের নানা লীলা তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। এ রচনার মধ্যে একটা অবধারিত পদ্ধতি ও পারম্পর্য, সূক্ষ্মভাবে সরল রসময় এক গীতিছন্দ আছে, প্রায় সর্বদা সুন্দর তাহার পরম্পরাগত বাগ্‌বিন্যাসরীতি সাক্ষাৎভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে। যাহারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই দুই প্রথম কবির প্রতিভা হইতে অত্যুৎ-কর্ষসম্পন্ন ভাবরসপ্রধান এই কবিতা একেবারে পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এ দুই-এর প্রথম ছিলেন শব্দ ও পদের সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পী বিদ্যাপতি; দ্বিতীয় ছিলেন অনুপ্রেরণালব্ধ গায়ক চণ্ডীদাস—যে কোন ভাষার ভাবরসপ্রধান প্রেমগীতি-কবিতার মধ্যে যাহা মধুরতম তীব্রতম ও অত্যুত্তম এমন কয়েকটি লিরিক কবিতা যাঁহার নামের সহিত যুক্ত। প্রতীক এখানে মানুষী আবেগ ও অনুরাগের বাহ্যতম আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং এরূপ সঙ্গতির সহিত তাহা রক্ষিত হইয়াছে যে এখন অনেকের মত এই যে ইহার অন্য কোন অর্থ নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের ভক্ত কবিরাও সেই একই প্রতীক ব্যবহার

করিয়াছেন, ইহাতেই এ মত যে ভ্রান্ত তাহা পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। অনুপ্রেরণালব্ধ সেই ভগবদ্‌বাণী প্রচারক, পরমানন্দময় দিব্যপ্রেমের সেই অবতার এই প্রতীকের পশ্চাতে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল তাহাদিগকে সমগ্রভাবে নিজের জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষায় ইহার অধ্যাত্ম দর্শনকে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুবর্তীগণ প্রাচীনতর গায়ক ও কবিগণের কবিত্বের পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন এবং যদিও প্রতিভার দিক দিয়া তাঁহাদের মত উচ্চস্থান ইঁহারা পান নাই তবুও এই প্রকার কবিতার যে এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, আর তাহাদের রূপ সর্বদা সৌন্দর্য ও মাধুর্যময়, তাহা প্রায়ই গভীরার্থব্যঞ্জক এবং বিষয়বস্তুতে হৃদয়গ্রাহী। রাজপুত রাণী মীরাবাঈ এই পরিপূর্ণ ভাবরসময় গীতিকবিতার আর একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে কৃষ্ণ প্রতীকের প্রতিরূপরাজিকে আরও সাক্ষাৎভাবে প্রেমের গানের এবং গায়িকার আত্মার দিব্যপ্রেমিককে অনুসরণের বিষয়বস্তু রূপে পরিণত করা হইয়াছে। বাংলার কবিগণ প্রতীক-মূর্তির প্রতি নিজেরা নৈর্ব্যক্তিক থাকিতে পছন্দ করিতেন, মীরাবাঈ-এর রচনাতে একটা ব্যক্তিগত সুর সংযোজিত হইয়া হৃদয়াবেগকে বিশেষ ভাবে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। দক্ষিণ দেশের একজন মহিলা কবি নিজেকে কৃষ্ণের নববধূর মূর্তি দিয়া ব্যক্তিগত ধারা আরও সাক্ষাৎভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবের বৈষ্ণব ধর্ম ও কবিতার বিশেষ শক্তি এই যে ইহাতে মানুষের সকল ভাবাবেগ ভগবানের দিকে ফিরানো হইয়াছে, সমস্ত আবেগের মধ্যে প্রেমই তীব্রতম হইতে এবং ঐকান্তিকভাবে আমাদিগকে অভিনিবিষ্ট করিতে পারে বলিয়া তাহাকেই বরণ করা হইয়াছে, এবং যদিও যেখানেই ভক্তিধর্ম প্রবলভাবে গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই এ ভাবের আবৃত্তি দেখা দিয়াছে, তথাপি ভারতীয় কবিদের রচনাতে তাহা যেরূপ বৃহৎ শক্তি ও ঐকান্তিকতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে তেমন ভাবে অন্য কোথাও হয় নাই।

অন্য অনেক বৈষ্ণব কবিতা কৃষ্ণ-প্রতীক ব্যবহার করে নাই, তাহারা আরও সাক্ষাৎভাবে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ভাষায় লিখিত অথবা কখনও তাঁহার অবতার রামকে কেন্দ্র করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ধরনের কবিতার মধ্যে তুকারামের গানগুলি সর্বাপেক্ষা পরিচিত। বাংলার বৈষ্ণব কবিতা অতি কদাচিৎ যুক্তিবিচার-পরায়ণ ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ ভাবাবেগ, অনুরাগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তি ও অনুভূতির তীব্রতার উপর নির্ভর করিয়াছে, পক্ষান্তরে মারাঠা কবিতার মধ্যে প্রথম হইতেই মননশীলতার একটা প্রবল সুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মারাঠা কবি একাধারে ভক্ত যোগী ও মনীষী ছিলেন; যিনি একটা জাতির জন্ম ও জাগরণের সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন সেই সাধু রামদাসের কবিতার প্রায় সর্বত্রই ধর্মীয় ও নৈতিক বিচার ও ভাবনার এক প্রবাহকে গীতি

কবিতার রসমাধুর্যের এক উচ্চ স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে; আর ভক্তির হৃদয় হইতে উদ্ভূত অন্তরস্পর্শী সত্য ও তীব্র ভাবনার এক উচ্ছ্বাসই তুকারামের সংগীতগুলিকে এরূপ মাধুর্যমণ্ডিত ও বীর্যবন্ত করিয়াছে। তিনি যে সুরে গাহিয়া গিয়াছেন ভক্তকবিগণের গীতিকার এক দীর্ঘধারা সে সুরকে ধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাঁহাদের রচনা মারাঠী কবিতার বৃহত্তর অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কবিরের কবিতা এই ধরনের, কিন্তু তাহা আরও সরল অথচ আরও উচ্চ সুরে বাঁধা। মুসলমান যুগের শেষভাগে আবার বাংলাদেশে মাতা ভগবতীর উদ্দেশ্যে লিখিত রামপ্রসাদের কবিতার গভীর ভক্তির সংগে ধর্ম-ভাবনার অনেক গভীরতা ও বৈশিষ্ট্যসূচক রীতির সেই একই ভাবের এক গাঢ় সংমিশ্রণ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কল্পনার এক উজ্জ্বল খেলা, পরিচিত সকল বস্তুকে উদ্দেশ্যোপযোগী সারগর্ভ প্রতিরূপে পরিবর্তন করিবার এক শক্তি ও অনুভূতির এক তীব্র স্বতঃস্ফূর্ততা একত্রে আসিয়া মিশিয়াছিল। দক্ষিণ দেশে বিশেষতঃ তথাকার শৈব কবিদের মধ্যে ভক্তির সুরের সংগে অনেক সময় গভীরতর দার্শনিক বাক্যাবলি মিশিয়া গিয়াছে এবং আদিযুগের সংস্কৃত কবিতার মত জীবন্ত বাক্যাংশ ও প্রতিরূপসমূহের এক বৃহৎ শক্তি দ্বারা তাহা সঞ্জীবিত করা হইয়াছে; আরও উত্তরে সুরদাসের হিন্দী কবিতায় বেদান্তের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নূতন রূপে দেখা দিয়াছে এবং তাহাই নানক ও শিখগুরু-দিগকে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে প্রস্তুত ও পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহাই এই সমস্ত লোকের মনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে এবং নূতন নূতন বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের কণ্ঠধ্বনি তাহাদের প্রগতি-পথের সর্বত্র হইতে সর্বদা শুনা যাইতেছে।

কয়েকখানি মহৎ বা বিখ্যাত গ্রন্থ বাদ দিলে, এ যুগের বর্ণনামূলক রচনার মধ্যে তেমন বিস্ময়কর বা মৌলিক কিছু নাই। এই সমস্ত ভাষার অধিকাংশই মহাভারতের সমগ্র মূল আখ্যায়িকা অথবা তন্মধ্যস্থ কোন কোন ঘটনা এবং তদপেক্ষা ব্যাপকতর ভাবে রামায়ণের প্রাচীন কাহিনী সাধারণের নিকট সহজ-বোধ্য ভাবে উপস্থাপিত করিবার সংস্কৃতিগত প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন মহাকাব্যের সারাংশ সহজ ভাষায় উজ্জ্বল উচ্চ শ্রেণীর রচনারীতিতে পুনরায় কথিত হইয়াছে; আর কীর্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন যাহা এ দেশের প্রাণশক্তির সংগে অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে বিজড়িত; এ দু-এর কোন গ্রন্থই মহাকাব্যোচিত রচনারীতিতে পৌঁছিতে পারে নাই বটে, তথাপি সহজ কবিত্বপূর্ণ ও দ্রুত বর্ণনার শক্তিতে তাহারা বিভূষিত। অবশ্য পরবর্তীকালের কবিগণের মধ্যে কেবল দুইজন প্রাচীন আখ্যায়িকাকে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে পুনরায় সৃষ্টি

করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই উভয় গ্রন্থই উৎকর্ষে এক অতি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে; এ দু-এর একজন তামিল কবি কাম্বান, যিনি তাঁহার বিষয়বস্তুকে এক মৌলিক মহাকাব্য রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন; আর অন্যজন তুলসীদাস, হিন্দী ভাষায় রচিত যাঁহার বিখ্যাত রামায়ণে তীব্র ভাবরস প্রকাশের অসাধারণ দক্ষতা, রোমান্সের সমৃদ্ধি ও কল্পনার মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য অপরূপভাবে মিলিত হইয়াছে, এ গ্রন্থ একদিকে যেমন ভগবানের এক অবতারের আখ্যায়িকা তেমনি অন্য দিকে তাহা ধর্মভক্তিময় ভগবদ্‌গুণকীর্তনের দীর্ঘ স্তোত্র-গীতিকা। এমন কি সাহিত্যের একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বাল্মিকীর মহাকাব্য হইতে তুলসীদাসের গ্রন্থ শ্রেষ্ঠতর এই দাবি জানাইয়াছেন; অবশ্য ইহা অতি-রঞ্জন, কেননা যতই গুণ থাকুক না কেন, মহত্তম হইতে মহত্তর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু তুলসীদাস বা কাম্বান সম্বন্ধে এরূপ দাবি অন্ততঃপক্ষে প্রমাণ করে যে এই দুই কবি প্রভূত শক্তিশালী ছিলেন, আরও প্রমাণ করে যে এ যুগে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় মনের সৃষ্টিশীল প্রতিভার অবনতি ঘটে নাই। বস্তুতঃ দেখা যায় যে এই সমস্ত কবিতা গভীরতার দিকে এরূপ লাভবান হইয়াছে যাহাতে প্রাচীন কালের উচ্চতা ও বিস্তারের যে হানি ঘটিয়াছিল কিছু পরিমাণে তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

যেরূপ এই ধরনের বর্ণনামূলক রচনাধারার মূল মহাকাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আর এক রচনার ধারা কালিদাস, ভারবী ও মাঘ প্রভৃতির সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল (classical) কবিগণের কাব্য হইতে তাহাদের রূপ ও প্রেরণা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত রচনার কয়েকখানি সেই প্রাচীনতর কাব্যসকলের মত তাহাদের বিষয়বস্তু মহাভারত বা অন্য কোন কাহিনী বা পৌরাণিকী উপাখ্যান হইতে লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুগের ক্লাসিক্যাল বা মহাকাব্যোচিত রচনারীতি অন্তর্হিত হইয়াছে, অনুপ্রেরণাতে পুরাণগুলির রচনাপদ্ধতির সহিত তাহাদের অধিকতর মিল রহিয়াছে, আর জনপ্রিয় রোমান্সের (রমন্যাসের) সুর তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকটা স্বাধীন ও সহজভাবে তাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ এই জাতীয় রচনা পশ্চিম ভারতেই অধিক দেখা যায়, গুজরাট দেশীয় কবিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রেমানন্দ এই জাতীয় রচনার উৎকর্ষসাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অর্ধরমন্যাস জাতীয় ও অর্ধ-বাস্তব বর্ণনামূলক আর এক প্রকার রচনা বাংলা দেশে দেখিতে পাই, যাহা সমসাময়িক কালের দৃশ্যাবলি ও ধর্মময় মনপ্রাণের কবিত্বপূর্ণ ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, আর তাহাদের প্রেরণায় রাজপুত-চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বাহ্য উপাদান-সমূহের সহিত প্রবল সাদৃশ্য রহিয়াছে। সহজ ও অকপট ভাবময় রোমান্টিক পদ্যে লিখিত চৈতন্যচরিত আন্তরিকভাবে সোজাসুজি বর্ণনা পদ্ধতির

জন্য হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে কিন্তু কবিত্বের আদর্শে তাহা অপ্রচুর। এ গ্রন্থে একটা ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি ও ভিত্তির কথা অনন্যসাধারণভাবে সমকালীন বর্ণনার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অন্য দুইখানি কাব্যগ্রন্থ শিবের শক্তি দুর্গা বা চন্ডী দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ক্লাসিক সাহিত্যের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—একখানি মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল', ইহা কবিত্বপূর্ণ সৌন্দর্যমন্ডিত খাঁটি রমন্যাস জাতীয় সাহিত্য, তাহার জনপ্রিয় পুরাকাহিনীর কাঠামোর মধ্যে জনসাধারণের জীবনের এক জীবন্ত ছবি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; অপরখানি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', তাহার প্রথম ভাগে বাংলা দেশের গ্রামবাসী তাহার মানুষী জীবনের অনুরূপ যাহা কল্পনা করিতে পারে তদনুরূপ ভাবে দেবতাগণের পৌরাণিক কথা বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে রমন্যাস জাতীয় এক প্রেমের কাহিনী রহিয়াছে, তৃতীয় ভাগে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের এক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা আছে; একটা কেন্দ্রগত প্রেরণার পরিণতির রূপায়ণে এই সমস্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় উপাদান একত্র করা হইয়াছে, কোন কল্পনার দ্বারা তাহাদিগকে উচ্চ ভূমিতে তোলা হয় নাই, কিন্তু অতুলনীয় উজ্জ্বল ভাবের বর্ণনা এবং প্রাণময় ও প্রতীতিজননক্ষম বাগ্-বিন্যাসের শক্তিতে তাহা বিভূষিত। এই সমস্ত মহাকাব্য, রমন্যাস ও উপদেশপূর্ণ কবিতা—রামদাসের কবিতা এবং তিরুভেল্লুয়ারের বিখ্যাত 'কুরাল' যাহাদের প্রধান প্রতিনিধি—এবং দার্শনিক ও ভক্তিময় ভাবরসপ্রধান লিরিক রচনাবলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা অথবা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রশংসা পাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু কয়েকখানা গ্রন্থকে বাদ দিলে এ সমস্তকে জনসাধারণের সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলিতে পারি। তুলসীদাসের রামায়ণ, রামপ্রসাদ ও বাউল নামে খ্যাত পরিব্রাজক বৈষ্ণব ভক্তগণের সঙ্গীতাবলি, রামদাস ও তুকারামের কবিতাগুলি, তিরুভেল্লুয়ার ও মহিলা কবি আব্বায়ীর উক্তিরাজি, দক্ষিণ দেশীয় সাধু ও আলোয়ারগণের ভাবরসপ্রধান লিরিক রচনাবলি সকল শ্রেণীর লোকেরই পরিচিত ছিল এবং তাহাদের ভাব ভাবনা ও আবেশ জনসাধারণের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এত বিস্তারিত ভাবে আমি সাহিত্যের কথা বলিলাম, কেননা বস্তুতঃ ইহাতে একটা জাতির সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিবরণ না থাকিলেও তাহার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভাবের যে মহৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই খাঁটি ও অত্যাশ্চর্য এক সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে শেষ যুগে ক্রমশঃ এক অবনতি দেখা দিয়াছে, কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে অবনতির মধ্যেও এক সমৃদ্ধ গৌরবশ্রী, বিশেষতঃ ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের এক সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন প্রাণশক্তির সহিত বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমানে যখন বোধ হইতেছে যে অবনতির সে যুগ শেষ

হইয়া আসিয়াছে তখন এ জাতি প্রথম সুযোগেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আর এক নূতন যুগচক্রের গতি আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সক্রিয়তা, সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যা এই যে তিনটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছে ঠিক তাহাদেরই ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এই নবজাগরণ দেখা দিয়াছে, কিন্তু জীবন ও সংস্কৃতির অন্য যে বহু ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একদিন মহান ও নেতৃস্থানীয় ছিল তাহার সর্বত্রই পুনরায় এই সতেজতা বিস্তার লাভ করিবে তাহার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা গিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র

মানবের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে, মন ও বুদ্ধিতে, আধ্যাত্মিকতায়, ধর্মে, নৈতিক জীবনে এবং সৌন্দর্যানুভবের ভূমিতে ভারতীয় সভ্যতার যে সকল ক্রিয়াধারা মানুষের মধ্যস্থিত মহত্তম সম্ভাবনাসকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া এ সভ্যতার মহত্ত্বের কথা আমি এ পর্যন্ত বলিয়াছি, বলিয়াছি যে খাঁটিভাবে বুঝিবার ইচ্ছা লইয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার সহিত এ সংস্কৃতির বাস্তব অবদানসকলের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহার সমগ্রতা ও প্রত্যেক অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাতে যে উচ্চতা বৃহত্তা ও গভীরতা প্রকাশ পায় তাহার কাছে সমালোচকের সমস্ত মিথ্যাদোষ-দর্শনের কুহেলিকা নিরস্ত হইয়া যায়। আর, আমাদের সম্মুখে একটি বৃহৎ সভ্যতার চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া যে উঠে শুধু তাহা নহে, কিন্তু যে সমস্ত সভ্যতার বিবরণ এখনও পাওয়া যায় সেই ছয়টি বৃহত্তম সভ্যতার অন্যতম রূপে ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনের ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রের বিষয়সমূহে ভারতের উচ্চ কৃতিত্ব ও সফলতা স্বীকার করেন, কিন্তু তবুও তাঁহারা বলিতে চাহেন যে জীবনের ক্ষেত্রে ভারত অকৃতকার্য হইয়াছে; ইউরোপের মত দৃঢ় সফল বা প্রগতিশীল সংঘবদ্ধ জীবন গঠন করিতে ভারতীয় সভ্যতা সমর্থ হয় নাই; এবং অবশেষে অন্ততঃপক্ষে তাহার মনের উচ্চতম অংশ জীবন হইতে সরিয়া গিয়া বৈরাগ্য এবং কর্মবিমুখ পারলৌকিক পথে চলিয়াছে, ব্যক্তিগত ভাবে আধ্যাত্মিক মুক্তি তাহার ব্যষ্টিজীবনের প্রধান কাম্য হইয়াছে। অথবা বড়জোর কতকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তাহার অগ্রগতি বন্ধ হইয়াছে এবং সে অবনতি ও ক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে।

আধুনিককালে বিচারের তুলাদণ্ডে এই অভিযোগের ভার খুব বেশী বলিয়া বিবেচিত হয়—কারণ বর্তমান কালের মানুষ এমনকি বর্তমান যুগের শিক্ষিত মানুষ অভূতপূর্ব অধিকমাত্রায় নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সত্তার প্রাধান্য দেয়, সে বাহ্যজীবনের সার্থকতাকে সকলের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান মনে করে, পূর্ণরূপে না হইলেও প্রধানতঃ মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়

মানুষের বাহ্যজীবন ও যান্ত্রিক সত্তার প্রগতি যতখানি সহায়তা করে তাহা দ্বারাই তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে। প্রাচীনগণ অন্তরের পরিপুষ্টি ও আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতাকে মানুষের সংস্কৃতি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যেরূপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্পদ ও অবদান মনে করিত, তাহাদিগকে যেরূপ সর্বোচ্চ স্থান দিত অথবা যেরূপ নিঃসন্দিগ্ধরূপে ও নিরপেক্ষভাবে ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধা করিত, বর্তমান মানুষ তাহা করে না। বর্তমান কালের এই মনোভাব অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট ও কুৎসিত, ইহা অতিরঞ্জনের দ্বারা মানুষের অবনতি ঘটায়, তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা জন্মায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে সত্যের এই একটা দিক আছে যে, যদিও সংস্কৃতির মূল্য ভিতরের মানুষকে, তাহার মন ও অন্তরের সূক্ষ্মশক্তি-সমূহকে, তাহার আত্মাকে জাগরিত ও উন্নত করিবার শক্তিদ্বারা নিরূপিত হয়, তথাপি ইহা যদি বাহ্যজীবনকে গঠিত করিতে, তাহাকে উচ্চ ও মহৎ আদর্শের অগ্রগতির ছন্দে চালিত করিতে না পারে, তবে সে সংস্কৃতি পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে নাই—ইহাই বলিতে হইবে। ইহাই উন্নতি ও প্রগতির প্রকৃত অর্থ, আর এ উন্নতির মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কথা গভীর ভাবে থাকিবে; জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পুষ্ট করিয়া নিশ্চিতভাবে সমষ্টিগত পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার পক্ষে যথোচিত শক্তি ও কার্যকারিতাও তাহার থাকা চাই, বাহ্যজীবনে এরূপ নমনীয়তা ও সাড়া দেওয়ার এরূপ শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে যাহাতে মন ও আত্মার বহির্বিকাশ অগ্রগতির পথে সর্বদা অগ্রসর হইতে থাকিবে। কোন সংস্কৃতি যদি এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন না করে তবে স্পষ্টতঃ কোথাও—হয় সংস্কৃতির মূল ধারণাসমূহে অথবা তাহার সমগ্রতার মধ্যে কিংবা তাহাদিগকে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে—একটা ত্রুটি ও অপূর্ণতা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে; তখন সে সভ্যতার পূর্ণ বা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া পরিচিত হইবার দাবির পক্ষে গুরুতর বাধা উপস্থিত হইয়াছে ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

যে আদর্শদ্বারা ভারতীয় সমাজের ভাব ও রূপ নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা ছিল অতি উচ্চ; সমাজব্যবস্থার ভিত্তিভূমি ছিল অতি দৃঢ় ও স্থায়ী, ইহার মধ্যে যে সবল জীবনধারা কাজ করিত তাহা অজস্র পরিমাণে শক্তি সমৃদ্ধি ও নানা বিষয়ক প্রতিভা সৃষ্টি করিয়াছিল, সে জীবন প্রভূত পরিমাণে ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, সৌন্দর্য, উৎপাদিকাশক্তি ও গতিশীলতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসে শিল্প ও সাহিত্যের সমস্ত বিবরণে এই প্রকার জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়, এমনকি ইহার অবনতি ও ক্ষয়ের যুগেও এ সমস্তের এমন সব নিদর্শন বর্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা যতই অস্পষ্টভাবে হউক বা যতই দূর হইতে হউক, ইহার অতীত মহত্ত্বের কথা মনে করাইয়া দেয়। তাহা হইলে কিসের জন্য জীবনীশক্তির ক্ষেত্রে

ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং কিসেই বা এ অভিযোগের সমর্থন পাওয়া যায়? যাঁহারা ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন তাঁহারা ইহার অবনতি ও ক্ষয়ের সময়কার লক্ষণগুলিকে ভিত্তি করিয়া এবং পশ্চাতে ফিরিয়া অবনতি ও ক্ষয়ের যুগের এই সমস্ত লক্ষণ ইহার শ্রেষ্ঠতার যুগেও আরোপ করিয়াছেন; ইঁহাদের অভিযোগ এই যে ভারতবর্ষ কখনই স্বাধীন ও সুস্থ রাষ্ট্রগঠনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, চিরকাল ইহা বহুধা বিভক্ত ছিল, তাহার দীর্ঘ ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে সে পরাধীনতায় কাল কাটাইয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন সু-বিধান কখনই ছিল কিনা সন্দেহ, যদিই বা পুরাকালে কিছু থাকিয়া থাকে তাহা গতিশূন্য অচলায়তন হইয়া পড়িয়াছিল, সময়ের প্রয়োজনে তাহাতে কোন পরিবর্তন আনা হয় নাই, আর বর্তমানকালে তাহা এ জাতিকে নিষ্ফলতা ও দারিদ্র্যে পেঁছাইয়া দিয়াছে; বংশমর্যাদা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ জাতিভেদ দুষ্ট তাহার সমাজে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ, ইহা অর্ধবর্বরোচিত কালের কুপ্রথাসমূহে পূর্ণ, শুধু অতীতের ভগ্ন আবর্জনারাশি রূপে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবারই উপযুক্ত বস্তু। ইহার স্থানে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার স্বাধীনতা সুস্থতা ও পূর্ণতার আমদানি করা উচিত অথবা অন্ততঃপক্ষে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠিবার যে ক্ষমতা পাশ্চাত্য সমাজের আছে, সেই ক্ষমতা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। এস্থলে প্রকৃত সত্য ঘটনা এবং তাহার অর্থ কি তাহা নির্ণয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং তাহা হইলে পরে ভারতীয় সংস্কৃতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর রায় দেওয়ার সময় আসিবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর অযোগ্যতার লোককাহিনী তাহার ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা এবং তাহার প্রাচীন অতীত ইতিহাসের অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে জাত হইয়াছে। বহুদিন হইতে ইহাই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের আদিম আর্যজাতির যে অধিকতর স্বাধীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইতে ভারত সহসা একেবারে এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে সমাজে ব্রাহ্মণ পরিচালিত ধর্মানুশাসনের যথেচ্ছাচার এবং রাজনীতিতে প্রাচ্যদেশসুলভ অব্যাহত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র দেখা দিয়াছে—যেরূপ রাজতন্ত্র পশ্চিম এসিয়ায় প্রচলিত ছিল—আর এই দুই বিষয়ে তদবধি বরাবর সেই একই ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। বিচার-বিবেচনা না করিয়া দ্রুত ও সংক্ষিপ্তভাবে ভারত ইতিহাস পাঠের এই ফলকে আরও সাবধান ও সূক্ষ্ম এবং জ্ঞানালোকিত ঐতিহাসিক গবেষণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার। ইউরোপের উন্নতিপথের কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন মধ্যবিত্ত বা বৈশ্য যুগে, যাহাতে

সর্বদা কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে এরূপ এক শ্রমশিল্পবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য মধ্যশ্রেণীদ্বারা পরিচালিত পার্লিয়ামেন্ট শাসিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে—যাহাকে ইহারা নিজেরাই গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী নাম দিয়াছে; ইহা সত্য যে ভারতবর্ষ এরূপ শ্রমশিল্পবাদ বা এরূপ ভাবের পার্লিয়ামেন্ট পরিচালিত শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলে নাই। এ সমস্তকে আদর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া একরূপ বিচারহীন প্রশংসা করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যখন ধরা পড়িতেছে তখন পাশ্চাত্যের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড দ্বারা প্রাচ্য সভ্যতার মহত্ত্বের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক গণতন্ত্রের এই সমস্ত ধারণা ও পদ্ধতি এমনকি ইউরোপের পার্লিয়ামেন্টের অনুরূপ গণপরিষদ ভারতে ছিল ইহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ প্রচেষ্টা ভুল বিচারের ফলে আসিয়াছে। আমাদিগকে পাশ্চাত্যের পরিভাষা যদি ব্যবহার করিতে হয় তবে বলিতে হয় যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবের একটি প্রবল ধারা বর্তমান ছিল, এবং এমনকি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পার্লিয়ামেন্টের অনুরূপ কিছু ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, আর ইহারা বর্তমান পার্লিয়ামেন্ট বা বর্তমান গণতন্ত্র যে-বস্তু তাহা একেবারেই নয়। পাশ্চাত্য সমাজের এবং তাহার কৃষ্টিগত জীবনের বিশিষ্ট প্রয়োজনের ভিন্ন প্রকার মাপকাঠি দ্বারা বিচার না করিয়া যদি এইভাবে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সমাজের জীবন্ত মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া ভারতবাসী যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক সামর্থ্যের আরও চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্যজাতির প্রাচীন ইতিহাসে সাধারণতঃ যে রাষ্ট্রতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারই এক প্রকার-ভেদ বা বিশেষ রূপ লইয়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, কিন্তু সে ব্যবস্থার কতকগুলি উপাদান আরও সাধারণ প্রকৃতিবিশিষ্ট, যাহা মানবজাতির সামাজিক উন্নতির আরও আগেকার যুগের ভাবধারা হইতে আসিয়াছে। ইহা কুল বা গোষ্ঠী প্রথা; ইহা কোন কুলের মধ্যস্থিত সকল স্বাধীন ব্যক্তির সমত্ব জ্ঞানের উপর স্থাপিত; প্রথমতঃ কুল ভৌগোলিক কোন বিশেষ দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিত না, তখনও কুলের এক দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবার প্রবৃত্তি ছিল অথবা দায়ে পড়িয়া যাইতে হইত; এ সময় যে কুল আসিয়া কোন দেশ অধিকার করিত, তাহার নামানুসারে সে দেশের নাম রাখা হইত যেমন কুরু দেশ অথবা শুধু কুরু, মালব দেশ বা শুধু মালব। যখন যাযাবর প্রবৃত্তি লোপ পাইল এবং নির্ধারিত সীমার মধ্যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া গেল তখনও কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রহিল, উহা নির্দিষ্ট ও

স্থায়ী পল্লীসমাজের অন্যতম উপাদান, পরমাণু বা একক রূপে পরিণত হইল। তখন বিশ নামে পরিচিত এক জনসভার অধিবেশন হইত, যাহার কাজ ছিল সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা, যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান, অথবা যুদ্ধার্থ সৈন্যদল গঠন; বহুদিন পর্যন্ত এই বিশই জনসাধারণের সমবেত শক্তির প্রতীক ছিল, এই জনসভা রাজাকে প্রতিনিধিরূপে শীর্ষস্থানে রাখিয়া সাধারণ সামাজিক জীবনের সকল কর্ম নির্বাহ করিত; প্রচলিত প্রথানুসারে এই রাজার নির্বাচন বা সমর্থন ও অনুমোদন বহুকাল পর্যন্ত এই জনসভার হাতে ছিল, রাজ্যলাভ যখন বংশগত হইয়া দাঁড়াইল তখনও এই সভার সম্মতির প্রয়োজন হইত। কালক্রমে যজ্ঞরূপ ধর্মাচরণের জন্য পুরোহিত বা অনুপ্রাণিত গায়ক দলের উদ্ভব হইল, ইহারা যজ্ঞবিধি এবং যজ্ঞের প্রতীকের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম রহস্যপূর্ণ জ্ঞানে শিক্ষিত হইত, এদেশে যে মহান ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূল এইখানে। এই ব্যবস্থা প্রথমতঃ বংশগত ছিল না, ইহারা এতদ্‌সঙ্গে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিত এবং সাধারণ জীবনে জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত ছিল। আর্য ভারতের সর্বত্রই এই স্বাধীন ও সরল এবং স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থা বোধ হয় প্রচলিত ছিল।

এই প্রাথমিক ব্যবস্থা হইতে পরবর্তী যুগে কতক দূর পর্যন্ত যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় দেখা দিতে থাকে, তেমনি সাধারণ ধারা অনুসরণ করিয়া ক্রমোন্নতি চলিতে থাকে, কিন্তু সে সময়ও এ জাতির বিশেষ মানসিক গতির জন্য কতকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় ভাবধারা বিকশিত হইয়া উঠে এবং সেগুলি স্থায়ী হইয়া চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহারাই ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর অন্য জাতি হইতে পার্থক্যের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দেয়। অতি প্রাচীন কালে বংশানুক্রম নীতি দেখা দিয়াছিল, এবং ক্রমাগত তাহা শক্তিশালী হইয়া সমাজ জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিতে এবং অবশেষে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা ও কর্মধারার ভিত্তিভূমি রূপে সর্বত্র গৃহীত হইতে লাগিল। বংশানুক্রমিক ভাবে রাজত্বলাভের ব্যবস্থা স্থির হইয়া গেল, এবং শক্তিশালী রাজ্যশাসক ও যোদ্ধার শ্রেণী উদ্ভব হইল, বাকি লোকসকলের মধ্য হইতে বণিক শিল্পী এবং কৃষক শ্রেণী চিহ্নিত হইয়া পড়িল, এবং হয়ত দেশজয়ের ফলস্বরূপ বিজিত লোক-সকলকে লইয়া কখনও বা এক ভৃত্য বা দাস শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সম্ভাবনা এই ছিল যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার বশেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণী উদ্ভূত হইল। অতি পুরাকাল হইতে ভারতীয় এই জাতির মনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রধান স্থান দেওয়ার ঝোঁক থাকাতে ইহাদের সমাজ ব্যবস্থায় শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণ শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে, ইঁহারাই পুরোহিত পণ্ডিত আইনকর্তা এবং সুপবিত্র বৈদিক জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ

ছিলেন; অন্যান্য দেশেও এরূপ এক শ্রেণীর উদ্ভব দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু এখানে এ ব্যবস্থাকে যেরূপ স্থায়ী বিশিষ্ট রূপ ও পরম প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হইয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা হয় নাই। অন্য দেশে যেখানে মননশক্তি এত জটিল ভাবে নানামুখী হয় নাই, এইরূপ প্রাধান্যের ফলে ধর্ম ও পুরোহিত পরিচালিত এক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের হাতে ক্রমবর্ধমান এবং অবশেষে প্রধান প্রভুত্ব আসিয়া পড়া সত্ত্বেও তাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক শক্তি অধিকার করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। পবিত্রচিত্ত পুরোহিত আইন-প্রণেতা এবং রাজার ও জনসাধারণের ধর্মগুরু রূপে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত বা কার্যকরী রাজশক্তি রাজা, ক্ষত্রিয় নামক অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোকের হাতেই ছিল।

কিছুকালের জন্য এক অপরূপ মূর্তি দেখা গিয়াছিল, এ মূর্তি যিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন সেই ঋষির। সমাজের যে কোন শ্রেণী হইতে তিনি আবির্ভূত হইতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন, রাজা তাঁহাকে ভক্তি এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কোন কোন সময় তিনি রাজার ধর্মগুরু হইতেন; তখনকার সামাজিক অভিব্যক্তির তরল বা অগঠিত অবস্থায় নূতন মৌলিক ধারণা ও ভাবধারাসকল উদ্ভূত করা রূপ অতি প্রয়োজনীয় কার্য করিবার শক্তি তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি অতি শীঘ্র সোজাসুজি ভাবে ধর্মমূলক সমাজ ব্যবস্থার ধারণা ও আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করিতেন। ভারতীয় মনের বিশেষ লক্ষণ এই ছিল যে, সর্ববিষয়ে এমন কি জীবনের বাহ্যতম সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায়ও ভারতবাসী আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অর্পণ করিতে, ধর্মভাব দ্বারা তাহাকে অনুমোদিত করিয়া নিতে চায়, সকল শ্রেণীর ও তাহাদের সকল ক্রিয়াধারার সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করে, দাবি বা অধিকার অথবা শক্তির কথা ঘটনাক্রমে আসিয়া না পড়িলে বলে না, কিন্তু কর্তব্যাবলি ও তাহার সম্পাদন করিবার এক বিধান ও আদর্শ উপায়ের কথা সর্বদা উল্লেখ করে, যে চরিত্র, মেজাজ, মনোভাব এবং আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত ধর্মভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করে। জাতীয় মনের উপর এই ভাবকে অঙ্কিত করা, ইহাকে দীর্ঘ জীবন দান ও স্থায়ী করা, আদর্শ বিধান ও তাহার ব্যবহারিক অর্থ আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা, জনসাধারণের জীবন সুগঠিত আদর্শে এবং আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সার্থক রূপে রূপায়িত করা—এ সমস্তই ছিল এই ঋষিদের কার্য। আর পরবর্তী যুগে আমরা আইন প্রণেতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রণীত বিভিন্ন আইন বা সংহিতা দেখিতে পাই, যদিও কেবল তৎকালে প্রচলিত বিধি ও ব্যবস্থা তাহাতে থাকিত, তথাপি সে সমস্ত যে প্রাচীন ঋষি-গণের দ্বারা স্থিরীকৃত বা অনুমোদিত ছিল এ কথাও উল্লেখ করা হইত।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি যে পথেই উন্নতিলাভ করুক না কেন, এই মৌলিক প্রকৃতির প্রভাব তখনও ছিল, এমন কি অবশেষে স্বাধীন ও সজীব ভাবে আচরণ দ্বারা সর্বদা সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হইয়া যখন সব কিছু পরম্পরাগত অভ্যাস ও দেশাচারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল তখনও এ প্রভাব বর্তমান ছিল।

রাজনীতির এই প্রাথমিক পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে হইয়াছিল। অন্যান্য প্রায় সকল দেশের মত এখানেও সাধারণ উন্নতিতে রাজাকে কেন্দ্র করা, তাহাকে শীর্ষস্থানে রাখা এবং শাসন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান জটিল বিধানসমূহে একত্ব ও সমতা স্থাপন করিবার কার্যে রাজাকে প্রধান স্থান দেওয়ার উপর ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ঝোঁক দেওয়া হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এই প্রথা বিজয়ী এবং প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইল। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত ইহার বিপরীত একটা ভাবধারা এ পদ্ধতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এবং ইহাকে দমিত রাখিয়াছে, আর এই ধারাই সবল ও স্থায়ীভাবে সজীব নাগরিক বা জানপদ সমিতি অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ গণতন্ত্রসমূহ গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা এই গণতন্ত্রের বংশগত বা নির্বাচিত প্রধান কর্মকর্তা হইতেন, অথবা অল্প ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান শাসনকর্তা রূপে গৃহীত হইতেন, অথবা কখনও কখনও দেশের শাসনতন্ত্রে তাঁহার কোন স্থান থাকিত না। গণতন্ত্রসমূহের এই শক্তি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে আসিয়াছিল, কিন্তু অন্যত্র কোন প্রকার বিপ্লবের মধ্য দিয়াও এ শক্তি লাভ করিতে হইয়াছিল, এই সমস্ত ক্ষেত্রে নানা ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছিল এবং অনেক সময় রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে গণতন্ত্র অবশেষে জয় লাভ করিয়াছিল, এবং সবল ও সুদক্ষ শাসন পদ্ধতি রূপে শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এবং বহুশতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার কোন কোন রাজ্য গণতন্ত্রসম্মত সমিতি দ্বারা কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অল্প লোক দ্বারা গঠিত মুখ্যতান্ত্রিক শাসনসভা (oligarchical senate) দ্বারা শাসিত হইত। দুঃখের কথা এই যে এ সমস্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ বা তাহাদের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস আমরা জানি না, কিন্তু ইহাদের অসামরিক বিধির ও শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ এবং সামরিক গঠনের দুর্বার কার্যকরী শক্তির জন্য সমস্ত ভারতে যে ইহাদের উচ্চ যশপ্রভা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বুদ্ধের একটা সুন্দর অনুশাসন বাক্য পাওয়া যায় যে, যতদিন পর্যন্ত এই সাধারণতন্ত্রসমূহকে খাঁটি ও সজীব ভাবে রাখা যাইবে ততদিন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যও অজেয় থাকিবে, এমন কি শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী মগধ সাম্রাজ্যের নিকটও তাহাকে নতি স্বীকার করিতে হইবে

না; রাজনৈতিক লেখকগণও পূর্ণভাবে এ মত সমর্থন করিতেন, সেই জন্য তাঁহারা এইরূপ সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মিত্রতাকে রাজার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রধান সহায় মনে করিতেন, যুদ্ধ করিয়া ইহাদের দমন করিবার পরামর্শ দিতেন না, কারণ তাহাতে সফলতার সম্ভাবনা যথেষ্ট সন্দেহসংকুল হইত, কিন্তু কূট রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চক্রান্ত ও চতুরতার সহিত—গ্রীসে ম্যাসিডনের ফিলিপ বস্তুতঃ যেরূপ করিয়াছিলেন—তাহাদের আভ্যন্তরীণ একতা ও গঠনপ্রণালীর কার্যকারিতা নষ্ট করিবার পরামর্শ দিতেন।

এই সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজ্য বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দেখিতে পাই যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পূর্ণ ও সতেজ ভাবে কার্য পরিচালনা করিতেছিল, সুতরাং ইহারা গ্রীসের উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ও নানা ভাবে উপদ্রুত পৌর গণতন্ত্রসমূহের সমসাময়িক; কিন্তু ভারতে এই ভাবের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা গ্রীসের সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী চঞ্চল, তরলপ্রকৃতি জাতিসমূহ অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় মন রাজনৈতিক সত্য আবিষ্কারে কোন অংশে অনুর্বর ছিল না, আর ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্থায়ী শাসনপ্রণালী নির্ণয় ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠায় ভারত ঐ সমস্ত জাতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সমস্ত গণতন্ত্রের কয়েকটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতার সতেজ গৌরবে রোমের সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এমন কি খৃষ্টযুগের প্রথম শতকসমূহেও তাহাদের অস্তিত্ব হারায় নাই। কিন্তু ইহাদের কোনটিই সাধারণতান্ত্রিক রোমের মত রাজ্যবিস্তার-স্পৃহা বা জয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ এবং বিস্তৃত ভাবে সঙ্ঘ-গঠন শক্তির অনুশীলন করে নাই; তাহারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের অন্তর্জীবন যাপন ও নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে ভারতবর্ষ একতাবদ্ধ হইবার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে বোধ করিয়াছিল; কিন্তু তখন এই গণতন্ত্রগুলি সে চেষ্টার পরিপন্থী হইয়াছিল। স্ব স্ব ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইলেও সমগ্রভাবে ভারত উপদ্বীপের সংগঠন কার্যে তাহারা কিছু করিতে পারে নাই; সারা ভারতের সংগঠন কার্য এত বৃহৎ ব্যাপার যে, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের কোন প্রকার সংঘবন্ধন দ্বারা তাহা করা সম্ভব ছিল না; প্রাচীন কালে জগতের কোথাও এরূপ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; কতকগুলি সংকীর্ণ সীমার বাহিরে আত্মবিস্তার করিতে গেলেই ইহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; এবং অধিকতর রূপে কেন্দ্রীভূত শাসন পদ্ধতির দিকবর্তী গতিবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। তাই অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতেও রাজতন্ত্র শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং অবশেষে অন্য

সকল প্রকার শাসনপ্রণালীর স্থান অধিকার করিল। ভারতের ইতিহাস হইতে এইভাবে গণতন্ত্র লোপ পাইল; আমরা এখন কেবল প্রাচীন মুদ্রা, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্রীক দেশ হইতে আগত পরিদর্শকগণের এবং সেই সময়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লেখক ও মতবাদীদের—যাঁহারা ভারতের সর্বত্র রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিতেন এবং তাহা স্থাপন ও বর্ধন বিষয়ে সাহায্য করিতেন—সাক্ষ্য হইতেই তাহাদের কথা এখন জানিতে পারি।

কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে ভগবৎশক্তির প্রতিনিধি ও ধর্মের রক্ষক রূপে রাজার ব্যক্তিত্ব ও রাজার পদকে অনেকটা পবিত্র স্থান এবং বহুল প্রভুত্ব দিলেও, এ শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার বা পূর্ণরূপে একনায়কত্ব কখনও ছিল না। প্রাচীন পারস্যের অথবা পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার রাজতন্ত্রের অথবা রোমের সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের কিম্বা ইউরোপের পরবর্তী যুগের একতন্ত্রী শাসনপদ্ধতির সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য ছিল না; ইহা পাঠান এবং মোগল সম্রাটগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। ভারতে শাসন বা বিচার বিভাগের চরম ক্ষমতা রাজা পরিচালনা করিতেন, রাজ্যের সমস্ত সামরিক শক্তি তাঁহার হাতে ছিল, শান্তি ও যুদ্ধের জন্য কেবল মাত্র তাঁহার মন্ত্রীসভার সঙ্গে তিনিই দায়ী হইতেন, সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও সুপরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি সাধারণ ভাবে তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার শক্তি ব্যক্তিগত ছিল না, তাহা ছাড়া রাজা যাহাতে তাঁহার শক্তির অপব্যবহার এবং অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিতে পারেন এরূপ রক্ষা-কবচ দ্বারা তাঁহার শক্তিকে বেষ্টিত করা হইত; সাধারণের মঙ্গলবিধান ও প্রভুত্ব পরিচালনের জন্য অন্য অনেক সমিতি বা প্রতিষ্ঠান ছিল, বলিতে গেলে শাসন কার্য পরিচালনায়, আইনপ্রণয়নে বা সাধারণ ভাবে রাজনৈতিক জীবন গঠন ও নিয়ন্ত্রণে তাহারা রাজার ক্ষুদ্রতর অংশীদার ছিল, এবং তাহাদের স্বাধীনতা ও শক্তির দ্বারা রাজার শক্তিকে সীমাবদ্ধ করা হইত। বস্তুতঃ তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তাঁহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজা (constitutional monarch) বলা যাইতে পারে, যদিও যে উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইত অথবা যে ভাবে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইত, তাহা ইউরোপীয় ইতিহাসে যে ভাবে করা হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই, তাহা হইতে অনেক ভিন্ন জাতীয় ছিল; এমন কি তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব ইউরোপের মধ্যযুগ হইতে অনেক অধিক পরিমাণে জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিত।

রাজার চেয়ে বড় শাসনকর্তা ছিল ধর্ম; ধর্মই এ জাতির ধর্মবিষয়ক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বিচারবিষয়ক ও আচারমূলক বিধিবিধান, প্রাণ যেমন দেহকে চালায় তেমনি ভাবে চালাইত। এই নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তিকে, ইহার প্রকৃতিতে পবিত্র ও শাশ্বত মনে করা হইত; ইহার সমগ্র আয়তন নিজস্ব

বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবে সর্বদা একই আছে মনে করা হইত, সমাজের ক্রমোন্নতি সহকারে সুব্যবস্থিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইহার বাস্তব রূপের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন আনয়ন করা হইত সর্বদা তাহা মূল দেহের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইত; স্থানীয়, পারিবারিক ও অন্যান্য আচার এই ধর্মের অনুবর্তী ও অধীন ছিল এবং মাত্র ভিতর হইতে পরিবর্তিত হইতে পারিত—আর এই ধর্মের উপর স্বেচ্ছাচারী ভাবে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পার্থিব কোন রাজশক্তি বা প্রভুর ছিল না। ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মের লেখক ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন, ইহার স্রষ্টা ছিলেন না, নিজেদের ইচ্ছাক্রমে ইহার কোন পরিবর্তন সাধন করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না, যদিও ইহা স্পষ্টতই দেখা যায় যে, জোরের সহিত তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়া ইহার কোন তত্ত্ব বা তাহার কোন অংশের পরিবর্তনের প্রবণতাকে সমর্থন করিতে বা বাধা দিতে পারিতেন; ধর্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার বিধান যাহাতে কার্যে পরিণত হয় ইহা শুধু দেখিবার ভার রাজার উপর ছিল, তিনি নিজে ছিলেন ধর্মের সম্পাদক ও ভৃত্য, যাহাতে ধর্মবিধি অনুসারে সকলে চলে, কোন অপরাধ বা পাপাচরণ না করে, গুরুতর অনিয়ম বা ধর্মচ্যুতি যাহাতে না ঘটে তাহা দেখা রাজার কর্তব্য ছিল। সর্বাগ্রে তাঁহাকে নিজে ধর্মবিধান মানিয়া চলিতে হইত, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম, তাঁহার রাজকীয় অধিকার কর্তব্য প্রভুত্ব ও পদের উপর যে সমস্ত কঠোর বিধিনিষেধ থাকিত, তাহা তাঁহাকে পূর্ণরূপে পালন করিতে হইত।

শাসনশক্তির এই ধর্মাধীনতা কেবল যে মাত্র মতবাদে পর্যবসিত হইত এবং কার্যতঃ মানা হইত না তাহা নহে; কারণ ধর্মনীতি ও তাহার বিধান দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, সুতরাং ইহা একটি সজীব সত্য ছিল এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও কার্যতঃ ইহার বিপুল প্রভাব ছিল। ইহার প্রথম বা প্রধান অর্থ এই ছিল যে, রাজার নিজের আইন প্রণয়নের কোন সাক্ষাৎ অধিকার ছিল না, ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জাতির জন্য যে শাসন পদ্ধতি স্থিরীকৃত ছিল, রাজাকে তদনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার আদেশ প্রদান করিতে হইত, এমন কি এ কার্যও রাজা একাকী করিতেন না, দেশের মধ্যে এমন অন্যান্য শক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছিল যাহারা স্বাধীন ভাবে আদেশ দেওয়া এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যাপারে রাজার অংশীদার ছিল; তাঁহার শাসনকার্যের সাধারণ গতি ও প্রকৃতিতে এবং তাঁহার শাসনে যে কার্যকরী ফল লাভ হইত সে বিষয়ে জনসাধারণের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইচ্ছাকে রাজা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

ভারতে ধর্মবিষয়ে জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং পার্থিব কোন শক্তি সাধারণতঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়, নূতন অথবা পুরাতন প্রত্যেক ধর্ম তাহার নিজের জীবন ও তাহার

বিধিবিধান নিজস্ব ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করিতে পারিত, তাহার নিজের পৃথক গুরু বা শাসক সম্প্রদায় থাকিত এবং তাহা নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। পৃথক রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা এক রাজ্যের সকল লোকের অবশ্যপালনীয় কোন এক নির্দিষ্ট ধর্ম বলিয়া কিছু ছিল না, রাজা প্রজাগণের ধর্মনেতা হইতেন না। ধর্মের ব্যাপারে অশোক রাজকীয় আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং অন্যান্য শক্তিশালী সম্রাটগণ কখনও কখনও অল্পমাত্রায় এরূপ প্রভুত্ব বিস্তারে ইচ্ছুক হইতেন বলিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত অশোকের অনুশাসনসমূহ আদেশমূলক ছিল না পরন্তু অনুরোধমূলক সুপারিশ মাত্র ছিল; ধর্মবিষয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা থাকিবে, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও ইচ্ছার সম্মান দিতে হইবে, পরিবর্তন আনিতে হইলে তাহাদের সঙ্গে পূর্বে পরামর্শ করিতে হইবে, এই সমস্ত ভারতীয় বিধান মানিয়া লইয়া যে-রাজা ধর্মবিশ্বাসে, তাঁহার আচরণে বা প্রতিষ্ঠানে কোন পরিবর্তন আনিতে চাহিতেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে হয় স্বীকৃত ধর্মপরিচালকবর্গের সম্মতি নিতে হইত, অথবা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্ত্রণাসভাসমূহে যেরূপ করা হইত তদ্রূপ ভাবে পরামর্শসভা আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের মতামত নিতে হইত, কিম্বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে বিচারের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে হইত। রাজা নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মমতের অনুকূলে থাকিতে পারিতেন, এবং তিনি বিশেষভাবে যে মতকে প্রাধান্য দিতেন স্পষ্টতঃ প্রচার কার্যে তাহার যথেষ্ট প্রভাব থাকিত, কিন্তু এ সময়ও তাঁহাকে তাঁহার সর্বজনীন পদের জন্য রাজা হিসাবে স্বীকৃত সকল ধর্মকে অনেকটা নিরপেক্ষতার সহিত সম্মান দিতে বা রক্ষা করিতে হইত; এইজন্যই দেখিতে পাই যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সম্রাটগণ তাঁহাদের রাজ্যে প্রতিযোগী এ উভয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতেন। কোন কোন সময় প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে সামান্য বা বহুল পরিমাণে রাজশক্তি দ্বারা নিপীড়নের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রবল ধর্মালোড়নের সময়ে সাময়িকভাবে রিপুর উত্তেজনায় এই বিচ্যুতি দেখা দিয়াছে, আর ইহা সর্বদা বিশিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ ও অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছে। সাধারণতঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের উপর অত্যাচার অসহিষ্ণুতা বা অনুদারতার কোন স্থান ছিল না, এবং কোন রাষ্ট্র বা রাজা উহা নীতিস্বরূপ গ্রহণ করিবে একথা কেহ ভাবিতেও পারিত না।

ধর্মের মত কোন সামাজিক ব্যাপারেও লোকের স্বাধীনতার উপর কোন স্বৈরাচারী শাসকের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। সামাজিক বিষয়ে রাজা কোন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না, এখানেও যদি কখনও তাহা করা হইয়া থাকে তবে যাহাদের জন্য ইহা করা হইয়াছে

তাহাদের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে, যথা দীর্ঘকালব্যাপী বৌদ্ধ প্রাধান্যের ফলে জাতিভেদ প্রথা যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাংলাদেশের সেন-বংশীয় রাজাগণ এইভাবেই তাহার পুনঃসংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। কৃত্রিমভাবে সমাজের কোন পরিবর্তন উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইত না, পরন্তু কোন কুল বা বংশকে অথবা কোন সম্প্রদায়কে স্বনিয়মে উন্নতির পথে চলিবার অথবা নিজেদিগকেই জীবনের ধারা ও আচারের পরিবর্তন করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত, এবং প্রধানতঃ সেই স্বাধীনতার ফলে তাহারা ভিতর হইতে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হইত।

রাজ্যশাসন বিষয়ে রাজার শক্তিও এইরূপভাবে ধর্মের নির্ধারিত বিধান দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা হইয়াছিল; যে সমস্ত স্থান হইতে আয়ের সংস্থান হইতে পারে তাহাদের প্রধান প্রধান স্থলে রাজার কর বা খাজনা আদায়ের অধিকার উৎপন্নের কত অংশের অধিক হইতে পারিবে না তাহা নির্দিষ্ট ছিল, আর অন্য বিষয়ে জন-সাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের তদ্বিষয়ক মতামত দ্বারা রাজার ক্ষমতা প্রায় সর্বত্র সীমাবদ্ধ হইত; সর্বদা এই সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত যে, প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিতে এবং তাহাদের শুভেচ্ছা লাভ করিতে না পারিলে রাজার রাজ্য শাসনের অধিকার লোপ পায়। আমরা দেখিতে পাইব যে এ ব্যবস্থা ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক ব্রাহ্মণগণের শুধু সদিচ্ছা বা কেবলমাত্র মতবাদ ছিল না। রাজা ব্যক্তিগতভাবে নিজেই সর্বোচ্চ বিচারপতির কার্য নির্বাহ করিতেন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ ও পরিচালনার প্রধান ভার তাঁহার উপর থাকিত, কিন্তু এখানেও তাঁহার শক্তি আইনের বিধান প্রয়োগে নিবদ্ধ থাকিত, তাঁহার অধীনস্থ বিচারকগণ যেভাবে বলিতেন তদনুসারে বা এই সমস্ত বিষয়ের বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্য লইয়া তাঁহাকে খাঁটিভাবে আইনের বিধান অনুসারে কার্য করিতে হইত। শুধু বৈদেশিক নীতি ও সামরিক কার্য-পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধিবিগ্রহ এবং অন্যান্য অনেক পরিচালনামূলক কর্মে মন্ত্রীবর্গের সাহায্য লইয়া নিরঙ্কুশভাবে কার্য করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল। শাসন প্রণালীর যে সমস্ত অংশ দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলসাধন বা উন্নতিবিধান করা যায়, যাহা দ্বারা নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, সাধারণ নৈতিকজীবন উন্নততর হইয়া উঠে, এবং যে সমস্ত বিষয় রাজশক্তি দ্বারা সর্বোৎকৃষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা যায়, সে সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার অধিকারও রাজার ছিল। তিনি আইনসঙ্গতভাবে কাহাকেও পুরস্কৃত করিতে অথবা শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এ শক্তি প্রয়োগ করিবেন, ইহাই তাঁহার নিকট হইতে আশা করা হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বৈরাচারী খেয়াল বা রাজার দৌরাত্ম্য বা অত্যাচারের স্থান ছিল না বা অতি

অল্পই ছিল; অন্য কোন কোন দেশে যে বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা নৃশংস প্রজা-পীড়ন প্রায় সর্বদা দেখা গিয়াছে তাহার সম্ভাবনা ভারতে আরও অল্প ছিল। তথাপি রাজার পক্ষে ধর্মকে উপেক্ষা অথবা তাঁহার শাসনকার্য সংক্রান্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠা অসম্ভব ছিল না, এরূপ উদাহরণও পাওয়া গিয়াছে, যদিও যে লিখিত বিবরণ পাই তাহাতে দেখা যায় যে, বিদেশ হইতে আগত রাজবংশের একজন অত্যাচারী এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধম স্থান অধিকার করিয়াছিল; অন্য সকল সময় স্বৈরাচারের খেয়ালবশে পীড়ন বা অন্যায়াচরণ দীর্ঘকালব্যাপী হইতে থাকিলে জনসাধারণ এমন তীব্র প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে যে অচিরকাল মধ্যে তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। আইন প্রণেতা সংহিতাকারগণ অত্যাচারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। রাজপদকে পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য দান করা সত্ত্বেও, ইহা সংহিতায় লিপিবদ্ধ করা আছে যে, যদি রাজা খাঁটিভাবে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা না করেন, তবে প্রজাগণ তাঁহাকে মানিতে বাধ্য নহে। রাজা যদি অকর্মণ্য হয়েন বা রাজ্যশাসন কার্যে লোকরঞ্জনের দায়িত্ব ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহাকে রাজত্ব হইতে অপসারণ করিবার যথোচিত কারণ পাওয়া গেল, ইহাই মনে করিতে হইবে, আর কার্যতঃ সেই চেষ্টাই করা হইত। মনু এতদূর পর্যন্ত বিধান দিয়াছেন যে, অন্যায়কারী ও প্রজাপীড়ক রাজাকে তাঁহার প্রজাগণই ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হত্যা করিতে পারিবে; চরমক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও রাজাকে হত্যা করিবার এই অধিকার দেওয়া, এমনকি তাহা কর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল, এই ব্যবস্থা সর্বশ্রেষ্ঠ আইন ও বিধানকর্তা কর্তৃক এইভাবে যে সমর্থিত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে রাজাকে যথেচ্ছভাবে চলিবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া অথবা তাঁহার সর্তহীন ভগবদ্দত্ত অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া—ভারতীয় রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা প্রণেতা-গণের অভিমত ছিল না। প্রজাবর্গের এই অধিকার কার্যতঃ যে প্রতিপালিত হইত, ইতিহাস ও সাহিত্য এ উভয়ের মধ্যে আমরা তাহা দেখিতে পাই। আরও বেশী সাধারণভাবে অন্য একটি অধিকতর নিরুপদ্রব উপায় অবলম্বন করা হইত—সম্বন্ধছেদ বা দেশত্যাগ করিয়া যাইবার ভয় দেখাইলে অনেক সময় অন্যায়কারী শাসক ন্যায়বিচারের পথে ফিরিয়া আসিতেন। দক্ষিণদেশে সপ্তদশ-শতাব্দীর মত এমন পরবর্তীকালেও জনসাধারণের অপ্রিয় জনৈক রাজাকে সম্বন্ধছেদের ভয় দেখান হইয়াছে, এবং জনসাধারণের সমিতি এরূপ রাজাকে কোন সাহায্য করিলে তাহা রাষ্ট্রদ্রোহ বলিয়া গণ্য করা হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিকারের এতদপেক্ষা সাধারণ এক উপায় ছিল, মন্ত্রীসভা বা সাধারণ সমিতির দ্বারা রাজাকে রাজপদ হইতে অপসারণ। এইরূপ নানাভাবে প্রণালীবদ্ধ রাজপদ কার্যতঃ সংগত কার্যকরী ও কল্যাণকর ছিল, ইহার উপর ন্যস্ত উদ্দেশ্য বেশ সুন্দরভাবে সাধিত হইত, আর এই জন্য ইহা লোকের হৃদয়ে

শ্রদ্ধার স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল। রাজতন্ত্র লোকানুমোদিত ও অতি প্রভাবশালী একটি রাজশাসন ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন সাধারণতন্ত্রসমূহেরও অস্তিত্ব ছিল এবং ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকেই একমাত্র এবং অপরিহার্য ব্যবস্থা মনে করিতে পারি না; এ ব্যবস্থা পর্যালোচনার রাজকীয় ব্যবস্থার একটি মাত্র দিক দেখিয়া যদি আমরা নিবৃত্ত হই, ইহার পশ্চাতে কি ছিল তাহা না দেখি, তবে এ পদ্ধতি ও ইহার কার্যপ্রণালীর তথ্য বুঝিতে পারিব না। রাজতন্ত্রের পশ্চাতে ভিত্তিস্বরূপ কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির মূল প্রকৃতির প্রকৃত সন্ধান আমরা পাইব।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র

যখন ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে একটি পৃথক বস্তুরূপে না দেখিয়া এ জাতির মন ও প্রাণের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র মনে না করিয়া তাহাকে পূর্ণ সামাজিক সত্তার একটা প্রাণময় অংশরূপে দেখি, শুধু তখনই আমরা তাহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে একটা জাতি বা বিশাল এক মানবসমষ্টি একটা প্রণালীবদ্ধ সজীব সত্তা, তাহার সমবেত বা একত্রীভূত (collective) অথবা আরও ভালভাবে বলিতে গেলে—কেননা একত্রীভূত শব্দটিতে একটা যান্ত্রিক ভাবের ব্যঞ্জনা আছে বলিয়া ভিতরের সত্য এ শব্দদ্বারা ভালরূপে প্রকাশ করা যায় না—সাধারণ অথবা জাতিগত একটা আত্মা মন ও দেহ আছে। ব্যক্তিগত দৈহিক জীবনের ন্যায় সমাজগত জীবনকেও পুষ্টি যৌবন পরিণতি ও ক্ষয়ের কালচক্রের মধ্য দিয়া চলিতে হয়, আর ক্ষয়ের দিকের গতি রুদ্ধ না হইয়া যদি দীর্ঘকাল চলিতে থাকে তবে মানুষ যেমন বার্ধক্যের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তেমনি জাতিরও মৃত্যু ঘটিতে পারে—যেমন ভারত ও চীন ব্যতীত জগতের অন্য সকল পুরাতন জাতি এভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতিগত প্রাণ ও সত্তার একটা বিশেষত্ব এই যে পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার, নিজের পূর্বশক্তি ফিরিয়া পাইবার, অথবা নূতন পথে পুনরায় চলিবার সামর্থ্য তাহার আছে। কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহার আত্মার বা জীবনের একটি বিশেষ ভাব বা আদর্শ কার্য করে যাহা তাহার দেহ অপেক্ষা অল্প মরণশীল, এই ভাব যদি নিজেই যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী ও বৃহৎ হয়, শক্তিসঞ্চার করিবার সামর্থ্য যদি তাহার থাকে, জাতি যদি যথোচিতভাবে দৃঢ় শক্তিমান ও সজীব হয়, জাতির মনে ও প্রকৃতিতে যদি স্থিতিশীলতার সহিত এমন নমনীয়তা থাকে যাহাতে সর্বদা তাহার বিশিষ্ট ভাবকে প্রসারতা দান করিতে পারে, অথবা সে আত্মভাবকে বা প্রাণশক্তিকে নূতন ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে পারে, তবে সে জাতি চরম ধ্বংসের পূর্বে বহুবার তাহার জীবনচক্রের উত্থান-পতনের আবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে পারে। আর এক কথা, ঐ জাতীয় বিশেষ ভাব বা আদর্শ জাতিগত সত্তা

বা জাতিগত আত্মার অভিব্যক্তি মাত্র, আবার জাতিগত আত্মা অপেক্ষাও মহত্তর শাশ্বত এক আত্মা আছে যাহা কালের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং যাহা এই পৃথিবীতে মানুষের নানা ভাবের জীবনধারার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নিজের পূর্ণতাকে যেন ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে; সেই বৃহত্তর আত্মা প্রত্যেক জাতিগত আত্মাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার ভিতর নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে। তাহা হইলে যে জাতি সজ্ঞানে তাহার বাহ্য জড়-জীবনে মাত্র বাস না করিবার শিক্ষা পাইয়াছে, এমনকি প্রাণ ও আত্মাতে যে বিশিষ্ট ভাব ও শক্তিধারা কার্য করিয়া তাহার পুষ্টির উপযোগী পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে, যাহা তাহার মানসিক গতি ও প্রকৃতির চাবিকাঠির মত কাজ করিতেছে, কেবল সেই ভাব বা শক্তিতে মাত্র বাস না করিয়া, ইহারও পশ্চাতে যে আত্মা ও তাহার ভাবধারা আছে তাহাতে সচেতনভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে জাতির জীবনীশক্তির ভাণ্ডার আদৌ নিঃশেষিত না হইতে পারে; সে জাতি পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া না যাইয়া, বা অন্য জাতির মধ্যে নিঃশেষে আত্মবিলয় না করিয়া, অথবা অন্য কোন নূতন জাতি বা সম্প্রদায়কে স্থান দিয়া নিজে বিদায় গ্রহণ না করিয়া, অপরপক্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজের জীবন ও ভাবধারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে, তাহাদিগকে নিজের রসরক্তে পরিণত করিতে, তাহার স্বাভাবিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিতে, এবং মৃত্যুর মধ্যে না যাইয়া পুনঃপুনঃ বহু সঞ্জীবিত জীবন-ধারার পথে চলিতে পারে; এমনকি এরূপ জাতি কোন সময় চরম অবসাদ বা মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেও তাহার আত্মার শক্তিবলে এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া হয়ত পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক গৌরবজনক অন্য একটি নূতন জীবনধারার মধ্যে আত্মবিকাশ আরম্ভ করিতে পারে। এইরূপ এক জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস।

যে সর্বপ্রধান ভাবধারা ভারতীয় জীবন সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শসমূহ শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা হইল মানুষের খাঁটি আধ্যাত্মিক সত্তার অনুসন্ধান এবং তদনুসারে জীবনযাপন—প্রথমে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করিবার ফলে তাহার মনপ্রাণময় নিম্নপ্রকৃতিকে যথোচিতভাবে উপযুক্ত করিয়া লওয়া, তাহার পরে সেই আত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করিবার ও মানুষকে তাহার অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাকৃত সত্তা হইতে আধ্যাত্মিক সত্তায় তুলিয়া লইবার জন্য জীবনকে এক কাঠামো ও উপায় রূপে ব্যবহার। জীবন নিয়ন্ত্রণকারী এই প্রধান ভাবধারাকে ভারতবাসী কখনও পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই, এমনকি যখন তাহার বাহ্যজীবনের উপর প্রবল চাপ পড়িয়াছে, সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে অথবা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় বাহিরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা ব্যাপারের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে, তখনও ইহাকে সে ভুলে নাই। ধর্ম, ভাবনা, কাব্য,

সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতি মননের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃত আত্মস্বরূপের প্রকাশ দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু তদপেক্ষা অপরিমেয় রূপে দুরূহ ব্যাপার হইল সামাজিক জীবনকে মানুষের প্রকৃত আত্মার প্রকাশক্ষেত্র করিয়া তোলা, অথবা অন্তরস্থ চিৎপুরুষের উচ্চতম উপলব্ধির কিছুটা তাহাতে পরিস্ফুট করিয়া উঠানো; তাই আমরা দেখিতে পাই যে যদিও মননের ক্ষেত্রের বিষয়সমূহে ভারত অসাধারণ উচ্চতা ও প্রসারতা লাভ করিয়াছিল, তথাপি বাহ্যজীবনের মধ্যে তাহার আদর্শের অংশত উপলব্ধি ও পরীক্ষামূলকভাবে অত্যন্ত অপূর্ণ প্রয়াস ছাড়া অধিক কিছু করিতে পারে নাই; এই প্রয়াসের ফলে সাধারণভাবে কেবল অধ্যাত্মক্ষেত্রে পৌঁছিবার প্রতীক সৃষ্ট হইয়াছে, উচ্চতর অভীপ্সা সমাজের নানাস্তরে কতকটা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সামাজিক জীবনে উচ্চভাবের ছাপ কিছু দেওয়া হইয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্ভব ও উন্নতির সুবিধা হইতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠান কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতে যে চতুর্বর্গের (অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষের) কথা আছে তাহার মধ্যে বাহ্য ও স্থূলতর বিষয় লইয়া যাহাদের কারবার সেই অর্থ ও সুখানুসন্ধিৎসু বাসনা (কাম) নামক প্রথম দুইটি বিষয় রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির সহজ ও স্বাভাবিক ক্ষেত্র; বাহিরের এই জীবনে চতুর্বর্গের উচ্চতর বিধান, ধর্মের অংশতঃ ছাড়া কোথাও পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সে প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে হইয়াছে; কেননা নৈতিক বিধান দ্বারা রাষ্ট্রিয় কর্মপদ্ধতির শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সাধারণতঃ ছলনায় পর্যবসিত হইয়াছে। মানবজাতি এখনও সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ, তাহার অতীত ইতিহাসে বাহ্য সমষ্টিগত জীবনকে মোক্ষের সহিত খাঁটিভাবে যুক্ত বা সমন্বিত করিবার ধারণা জন্মে নাই বা তজ্জন্য চেষ্টা করা হয় নাই বলা যাইতে পারে, কোথাও তাহা সফল হওয়া ত দূরের কথা। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন প্রথায় ভারতবর্ষে ধর্ম দ্বারা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়ের শাসন, রাষ্ট্রিক জীবনের বিধানে ও ব্যবস্থায় তাহার সমষ্টিগত সত্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের অস্পষ্ট একটা ধারণা দ্বারা প্রণোদিত ধর্মানুশাসন মানা ছাড়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই—এমন কি এই ক্ষেত্রে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা অন্য ক্ষেত্র অপেক্ষা পূর্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; আধ্যাত্মিক পূর্ণতা জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে গ্রহণ ও তদনুযায়ী ভাবে সাধনা ও তাহার পূর্ণ পরিণতি ব্যক্তিগত ব্যষ্টি জীবনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়ে এই পরিমাণ চেষ্টা ভারতবর্ষ ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহকারে করিয়াছে, তাহার ফলে তাহার সমাজব্যবস্থায় একটা বিশিষ্ট ধারা দেখা দিয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ ভারতকে আরও প্রসারতা দান করিয়া অধিকতর পূর্ণ এক লক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য গভীরতর ও পূর্ণতর অনুভূতি লাভ করিতে হইবে, আরও এমন নিশ্চয়তর জ্ঞান অর্জন

করিতে হইবে যাহাতে বাহিরের জীবন ও অন্তরের আত্মার মধ্যে একত্ব ও সমন্বয়বিধান রূপ তাহার জীবনের নির্দিষ্ট প্রাচীন ব্রত বা উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব হইবে, আমাদের সত্তায় এখনও যাহা সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে কিন্তু উপলব্ধি করা হয় নাই, তখন আধ্যাত্মিক সত্যের সেই গভীরতর অনুভূতির উপর সমষ্টিগত জীবনের কর্ম ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইভাবে তাহার জাতীয় জীবনের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিবে, যাহাতে তাহা সমস্ত মানবের মধ্যে যে বৃহত্তর চৈতন্যময় আত্মা আছেন, তাহার লীলাক্ষেত্র এবং বিরাটের, বিশ্বাত্মার এক সচেতন সমষ্টিগত আত্মা ও দেহে পরিণত হইবে।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাহা প্রাচীন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জন্য ভারতীয় মন ও তাহার ভিতরকার সংস্কৃতির মত এ ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য দেশের মান ও বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে না। অভ্যন্তরস্থিত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের পূর্বে মানব সমাজকে তাহার ক্রমোন্নতির পথে তিনটি স্তর পার হইয়া যাইতে হয়। ইহাদের প্রথমটি এমন এক অবস্থা যাহাতে প্রাণের তত্ত্ব এবং শক্তিসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হইয়া সমষ্টিগত সত্তার কর্ম এবং রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। তখন সমাজের সমস্ত উন্নতি ও পরিণতি, সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও রূপায়ণ, সমস্ত আচার ও অনুষ্ঠান অন্তরস্থ প্রাণশক্তির স্বাভাবিক পরিণতি রূপে প্রকাশ পায়—এ সমস্তের প্রেরণা ও গঠনশক্তি প্রধানতঃ প্রাণতত্ত্বের মধ্যস্থিত অবচেতনা হইতে আসে, তখন যে অভিব্যক্তি হয় তাহার মধ্যে সজ্ঞানে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ থাকে না,—সে সকলের ভিতর দিয়া জাতির সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি, শরীর ও প্রাণের প্রয়োজন প্রকাশ হয় এবং কতকটা ভিতরের প্রেরণার এবং কতকটা সমষ্টিগত মন ও প্রকৃতির উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাহারা টিকিয়া থাকে অথবা অংশত পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় জাতি তখনও যুক্তিবিচার বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে আত্মসচেতন হইয়া উঠে নাই, সমষ্টিগত-ভাবে ভাবনা করিতে শিখে নাই, সমস্ত জাতিগত জীবন বুদ্ধিপরিচালিত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা শাসন করিতে চেষ্টা আরম্ভ করে নাই, কিন্তু প্রাণের স্বতোলব্ধ বোধ অথবা সেই বোধ মনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রাথমিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহা দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যান্য অধিকাংশ জনসংঘের ন্যায় ভারতীয় সমাজ ও শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক কাঠামো সেই প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত ও পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে যখন সামাজিক চৈতন্য পরিপুষ্ট হইয়া স্বসংবেদনশীল হইয়া উঠিল, তখনও সে কাঠামো পরিত্যক্ত হয় নাই, বরং এরূপভাবে আরও সুগঠিত পরিবর্ধিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিল, যাহাতে তাহা সর্বদা ভারতবাসীর মন, সহজাত সংস্কার ও প্রাণের সহজোপলব্ধির পক্ষে স্বাভাবিকভাবে দৃঢ়, স্থিতিশীল,

জীবন্ত সমাজতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে, আর এ ব্যবস্থা আইনকর্তা অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মনীষীদের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই।

সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় মন বুদ্ধির ক্ষেত্রে অধিক হইতে অধিকতর আত্মসচেতন হইয়া উঠে, প্রথমে জাতির ভিতরে যাহারা সংস্কৃতি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে, পরে আরও ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে প্রথমে মোটামুটিভাবে পরে ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্মভাবে জীবনের সকল অংশে ইহা প্রকাশ পায়। তখন জাতি প্রথমে বিকশিত চিন্তাশক্তি এবং অবশেষে বিশ্লেষণ-মূলক ও গঠনক্ষম বিচারবুদ্ধির আলোকে তাহার নিজের জীবন তাহার সংঘগত ধারণা প্রয়োজন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিচার করিয়া দেখিতে ও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে। এই স্তরে উন্নতি ও পরিণতির বৃহৎ সম্ভাবনা যেমন আছে তদ্রূপ বৈশিষ্ট্যসূচক বৃহৎ বিপদের আশঙ্কাও রহিয়াছে। স্বচ্ছ বোধশক্তি এবং পরে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, সমাজের এই স্তরে প্রথমতঃ তাহা লাভ হয়, যখন বিচারশীল ও গঠনসমর্থ মনের শক্তিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারধারার পূর্ণ প্রয়োগের পুরস্কার রূপে খাঁটি প্রণালীবদ্ধ, সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত কার্যকরী শক্তি বা দক্ষতা লাভ হয়, তখন এ স্তর উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে বুঝা যায়। সামাজিক উন্নতির এই স্তরে ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর একটা পরিণাম এই যে, ইহাতে উচ্চ ও আলোকোজ্জ্বল আদর্শসমূহ উদ্ভূত করিয়া তোলে, যাহা মানুষকে তাহার প্রাণগত সত্তার সীমার উপরে তুলিবার, তাহার সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রিক প্রথম প্রয়োজন বা আকাঙ্খার উপরে এবং তাহাদের প্রথাবদ্ধ ছাঁচের বাহিরে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, জাতীয় জীবন লইয়া অসমসাহসিক পরীক্ষা করিবার শক্তির অনুপ্রেরণা যোগায়, যাহার ফলে সমাজ জীবনে ক্রমশঃ মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শের সফলতার ক্ষেত্র উদ্ভূত হইতে থাকে। ইউরোপের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টার যাহা কিছু সীমা ও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকুক না কেন, ইহার বিশিষ্ট গুণ এই যে জীবনে এই বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রয়োগের সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ ফলস্বরূপ দৃঢ় সুগঠিত প্রণালীবদ্ধ সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত দক্ষতা লাভ করিয়াছে, এই ভাবে ইউরোপ খুব সচেতন ভাবে নির্বাচিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিয়াছে, এবং এই বিশেষ সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সে যেরূপ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাই এ সাধনায় সে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

পক্ষান্তরে বিচারশক্তি যখন জীবনের উপাদানসমূহ লইয়া কারবার করে, তখন সে-ই তাহার একমাত্র শাসক ও নিয়ন্তা এই দাবি করে; তখন সমাজকে সজীব ও বর্ধমান প্রকৃত সত্তারূপে না দেখিয়া তাহাকে যন্ত্ররূপে দেখিয়া

চালাইতে চায়—প্রাণহীন কাষ্ঠ বা লৌহকে যেমন বুদ্ধি স্বেচ্ছায় চালাইয়া গঠন কার্যে লাগাইতে পারে, সমাজকেও তদ্রূপভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আদেশ দ্বারা চালন ও গঠন করা যায়—ইহা মনে করিয়া বসে। কুতর্ক দ্বারা বিকৃত শ্রমশীল গঠনদক্ষ ও কার্যকরী যান্ত্রিকতাকারক (mechanising) বিচারবুদ্ধি জাতীয় জীবনের প্রাণতত্ত্বের সহজ ধারাসমূহের কথা ভুলিয়া যায় এবং জীবনের গোপন শিকড়গুলি কাটিয়া দেয়। ফলে এই দাঁড়ায় যে, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান, আইন-প্রণয়ন ও তদ্দ্বারা শাসনের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে নির্ভরতা আসে, এবং সজীব ও সতেজ জাতির পরিবর্তে যন্ত্রচালিত এক রাজ্য গড়িয়া তুলিবার একটা প্রাণক্ষয়কর প্রবণতা উদ্ভূত ও বর্ধিত হয়। জাতির জীবনের একটা যন্ত্র তাহার প্রাণের স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে, একটি শক্তিশালী কিন্তু কৃত্রিম ও যান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই বাহ্যিক শক্তি লাভের জন্য এই মূল্য দিতে হয় যে, স্বাধীন ও সজীব জাতির দেহে যে-জাতীয়-আত্মা প্রাণশক্তির মধ্য দিয়া আত্মবিকাশ করিতে চায় তাহার প্রাণের সত্য নষ্ট হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের এই ভ্রান্তির ফলে ইহার যান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুভারে প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রেরণার উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া পড়ে; এইখানেই ইউরোপের দুর্বলতা, ইহা তাহার অভীপ্সাকে প্রতারিত করিয়াছে, এবং ইহার জন্যই তাহার নিজের উচ্চতর আদর্শরাজির প্রকৃত সিদ্ধিতে সে পৌঁছিতে পারিতেছে না।

মানুষের ব্যষ্টিগত জীবনের মত সমষ্টিগত সামাজিক জীবন যখন ক্রমোন্নতির তৃতীয় স্তরে পৌঁছে, কেবল তখনই মানুষের চিন্তাধারা প্রথমে যে সমস্ত আদর্শ গ্রহণ ও পোষণ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত মূল ও প্রকৃতি এবং তাহা সফল করিবার উপযোগী উপায় ও অবস্থা আবিষ্কার করিতে পারে; আর তাহা না করিতে পারিলে, পূর্ণ সমাজ স্থাপনের প্রচেষ্টা মেঘরাজ্যের উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত এক স্বপ্নের চারিদিকে চক্রাকারে ছুটিয়া চলা, অথচ তাহাকে ধরিতে না পারা, সুতরাং নৈরাশ্যে প্রপীড়িত হওয়ার এক দৃশ্যে পরিণত হইবে। এই তৃতীয় অবস্থা আসিবে, যখন সমষ্টিগত মানুষ প্রধানতঃ প্রাণময় সত্তা হইতে উদ্ভূত প্রয়োজনবোধ, সহজাত প্রবৃত্তি বা অনুপ্রেরণা অথবা দ্বিতীয়তঃ বিচারশীল মনের ভাবধারা মাত্র দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, আরও গভীরে বাস এবং তথা হইতে তাহার যে উচ্চতর ও মহত্তর সত্তা ও আত্মাতে তাহার ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের একত্ব, পূর্ণত্ব ও স্বাধীনতার বিধান রহিয়াছে, তাহাকে আবিষ্কার করিতে এবং প্রথমতঃ, প্রধানত ও সর্বদা সেই আত্মার ঐক্যের শক্তি, সহানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা এবং সাবলীল ও সজীব বিধান অনুসারে তাহার সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিবে। যাহাতে ইহার চেষ্টার আরম্ভও দেখা দিতে পারে, এই বিধানের উপযুক্ত তেমন পরিবেশ এখনও

কোথাও দেখা দেয় নাই, কারণ যখন মানুষ আধ্যাত্মিক সত্তার বিধানে পৌঁছিবার বা তদনুসারে চলিবার প্রচেষ্টা কয়েকজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তির জীবনের এক আদর্শরূপে শুধু থাকিবে না, অথবা উক্ত বিধানকে অবনত করিয়া সাধারণের অভীপ্সার ক্ষেত্রে তাহাকে যে-সুলভ জনপ্রিয় ধর্মে পরিণত করা হয়, কেবল সেই ধর্মের অনুশাসনে চলিতে শুধু চাহিবে না, পরন্তু যখন সে বিধান তাহার সত্তার পক্ষে পরম ও চরম বলিয়া স্বীকার করিবে, এবং তদনুসারে চলিতে চাহিবে, যখন ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি জাতীয় জীবনের পরবর্তী সোপান রূপে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করিবে, কেবল তখনই এ অবস্থা আসা সম্ভব হইবে।

প্রাচীন ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়সমূহ তাহাদের প্রথম অবস্থায় অন্যান্য দেশের ন্যায় সজীব, সতেজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধর্মের ক্ষেত্রে বর্ধিত হইয়াছিল, স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনধারার আদর্শ ও গতিপথ নির্ধারিত করিয়াছিল, নিজেদের সমষ্টিগত সত্তার সহজ অনুপ্রেরণা ও প্রকৃতি হইতেই জীবনের রূপ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত করিয়াছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যেমন সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের ক্রমবর্ধমান ঐক্যের মধ্যে মিশ্রিত ও একত্রীভূত হইয়া, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, তেমনি নিজেদের গতিপথে নানা বিষয়ে অল্পমাত্রায় বৈশিষ্ট্য বিস্তারের বৃহৎ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, তাহাদের মধ্যে সাধারণ প্রকৃতি, সাধারণ ভিত্তিভূমি ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল। সর্ববিষয়ে বৈচিত্র্যবিহীন কঠোর একরূপত্ব স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না, সাধারণ প্রকৃতি ও প্রাণাবেগ সমাজজীবনের এই নমনীয়তার উপর একটা সাধারণ একত্বের বিধান আরোপ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এমন কি যখন বৃহৎ রাজ্য বা সাম্রাজ্যসকল গঠিত হইয়া উঠিল, তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের, গণতন্ত্রের এবং সম্প্রদায়সমূহের বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানাবলি নষ্ট অথবা নূতন ছাঁচে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে দূরীভূত না করিয়া, তাহাদিগকে যথাসম্ভব বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইত। জাতির স্বাভাবিক ক্রমোন্নতিতে যাহা বাঁচিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত বা যাহার প্রয়োজন আর না থাকিত, তাহা হয় আপনা হইতে খসিয়া পড়িত, না হয় অপ্রচলিত হইয়া যাইত; যাহা নূতন ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পরিবর্তিত করিয়া বাঁচিতে পারিত, তাহাকে স্থান দেওয়া হইত; ভারতীয় প্রকৃতি এবং তাহার অন্তরাত্মা ও প্রাণের ধর্মের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে যাহার সুরসঙ্গতি হইত, তাহাকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহে স্থায়ী ভাবে একীভূত করিয়া লওয়া হইত।

ভারতে যে যুগে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বর্ধিত হইতেছিল সেই যুগে এই

স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণতত্ত্বকে শ্রদ্ধা করা হইত। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতাগণ তাঁহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ ও ব্যবস্থাসমূহ নির্ণয়ের জন্য কেবলমাত্র অন্যনিরপেক্ষ বুদ্ধি বা বিচার শক্তির (abstract intelligence) উপর নির্ভর করিয়া চলা কর্তব্য ইহা মনে করিতেন না, জাতীয় মন ও জীবন দ্বারা পূর্বেই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, জাতি যে যে ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে ও পরিচালিত করিতে চাহিতেন, যে সমস্ত মৌলিক উপাদানে ইহারা গঠিত ছিল নষ্ট না করিয়া তাহা-দিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশ, এবং তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন, যে সমস্ত নূতন উপাদান অথবা ভাবধারা প্রয়োজন বোধ করিতেন তাহাদের দ্বারা সমাজের অবয়ব বৃদ্ধি বা আবশ্যক পরিবর্তন করিতেন, কিন্তু পুরাতনকে ধ্বংস বা তাহার মধ্যে বিপ্লব আনয়ন করিবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিতেন না। এই ভাবে পরিবর্তন সাধন করিয়া রাষ্ট্রিয় পদ্ধতির প্রাথমিক অবস্থা হইতে পূর্ণ গঠিত রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালী গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজা বা সম্রাটের একচ্ছত্র পরিচালনাধীনে একত্রিত ও অঙ্গীভূত করিয়া এ গঠন কার্য অগ্রসর হইয়াছিল। রাজ্য বা সাম্রাজ্য-তন্ত্র উপরে চাপাইয়া দেওয়াতে ইহাদের অনেকগুলির প্রকৃতি ও মর্যাদা অনেকটা পরিবর্তিত হইত বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করা হইত না। ইহার ফলে কেবলমাত্র বুদ্ধিচালিত আদর্শ রাজনৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা, এবং ঐ বিষয়ে বিপ্লবমূলক পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ভারতে দেখা দেয় নাই, কিন্তু দেখিতে পাই প্রবলভাবে এইরূপ প্রচেষ্টাই প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপের বিশিষ্ট লক্ষণ। জীবনে মন ও প্রাণের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির এবং তাহার সত্তার ধর্মের বা প্রকৃতিগত নিয়মের গভীর প্রকাশের ফলে যে সমস্ত সৃষ্টি অতীতে দেখা দিয়াছে, তাহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভারতবাসীর মানসপ্রকৃতির এক প্রধানতম উপাদান, তাহার এই রক্ষণশীল প্রবৃত্তিকে সহস্র বৎসরব্যাপী মন ও বুদ্ধির অতি উচ্চ সংস্কৃতি ও পরিণতির মহৎ যুগেও ভঙ্গ বা নষ্ট করা হয় নাই, বরং তাহাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নজির বা পূর্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছাঁচ ও কাঠামোর সুনিয়ন্ত্রিত বিধান রক্ষণশীলতার সঙ্গে মানিয়া লইয়া তাহাদের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে আচার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা, উন্নতির এই একমাত্র পথ খোলা ছিল বা এই একমাত্র পথ মানিয়া চলা হইত। পক্ষান্তরে ভারতীয় শাসনপ্রণালী জাতির স্বাভাবিক জীবন ধারার স্থলে কখনও অস্বাস্থ্যকর যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থাপিত করে নাই, এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটি প্রবল ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার ফলে বিস্তৃত

বিকৃত ও কৃত্রিম আমলাতান্ত্রিক ও শ্রমশিল্পপ্রধান রাজ্যসমূহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ বুদ্ধিচালিত মানস প্রকৃতিপ্রধান আদর্শসমূহের সুবিধাগুলি যেমন গ্রহণ করিতে পারে নাই, তেমনি বুদ্ধি ও বিচারশক্তি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলে যে সমস্ত বিপদ ও অসুবিধা উপস্থিত হয়, ভারতকে তাহাও ভোগ করিতে হয় নাই।

ভারতীয় মন সর্বদা বোধি ও অন্তর প্রেরণা লাভে গভীরভাবে অভ্যস্ত, এমন কি যে যুগে ইহা বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্নতিচেষ্টাতে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তখনও এ স্বভাব সে হারায় নাই। এই জন্য ইহার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভাবধারাতেও জীবনের সহজোপলব্ধি ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের বোধি প্রেরণার সঙ্গে বুদ্ধি ও বিচারকে মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারশক্তির আলোক উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবনে যাহা প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হইয়াছে ভারতবর্ষ তাহা ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আদর্শের জন্য বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া ঊর্ধ্ব হইতে আগত আলোকের প্রেরণা ও আত্মার উচ্চতর অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, বিচারবুদ্ধিকে সমালোচনার শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের পদক্ষেপকে পরীক্ষা করিবার এবং নিশ্চিত ও নিরাপদ করিবার জন্য ব্যবহার করিয়াছে, বুদ্ধিবিচারকে আত্মা ও জীবনের স্থান গ্রহণ করিতে না দিয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার অধিকার দিয়াছে—কেননা প্রকৃতপক্ষে জীবন ও আত্মাই সর্বদা মানুষকে খাঁটি ও গভীররূপে গড়িয়া তুলিতে পারে। ভারতের আধ্যাত্মিক মন জীবনকে আত্মার অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়াছে, শক্তিকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছে, জনসাধারণকে সমষ্টিগতভাবে ব্রহ্মের সজীব দেহ বলিয়া দেখিয়াছে, ইহাকে সমষ্টিনারায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছে, তেমনি আবার ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবকেও ব্রহ্ম বলিয়াছে, তাহাকে ব্যষ্টিনারায়ণ নাম দিয়াছে; রাজাকে ভগবানের সজীব প্রতিনিধি রূপে ভাবনা করিয়াছে এবং জাতির মধ্যস্থ অন্য সকলকে যিনি সর্বভূতাত্মা সেই সমষ্টিগত আত্মার স্বাভাবিক শক্তিরূপে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে 'প্রকৃতয়ঃ' প্রকৃতিসমূহ আখ্যা দিয়াছে। স্বীকৃত রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, সকল অংশ সমেত সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের বিন্যাস—এ সমস্তের যে অলঙ্ঘনীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল শুধু তাহা নহে, তাহাদিগকে কতকটা পবিত্র ও পূজার্হ মনে করা হইত।

প্রাচীন ভারতের ধারণা এই ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি খাঁটিভাবে তাহার স্বধর্ম পালন করে, তাহার নিজ প্রকৃতির, নিজ শ্রেণীর বা নিজের জাতীয় প্রকৃতির সত্য বিধান ও আদর্শ যদি মানিয়া চলে, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি তাহার সমষ্টিগত জীবনও সেই ভাবে পরিচালিত করে, তবে মানবজীবনে ও

জগতে প্রকৃত শৃঙ্খলা স্থাপিত ও রক্ষিত হয়। পরিবার কুল বর্ণ ও শ্রেণী, সামাজিক আধ্যাত্মিক শ্রমিক ও অন্যবিধ সংঘ, উপজাতি ও জাতি—ইহাদের প্রত্যেকের প্রাণশক্তিবিশিষ্ট সমষ্টিগত সত্তা আছে, ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম নিজের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হয়, সেই ধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিলে তাহারা রক্ষা পায়, সুস্থভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং সুচারু ভাবে কর্ম করিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির পদ ও বৃত্তির উপযোগী ধর্ম ও অপর সকলের সহিত তাহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধের জন্য ধর্মবিধান আছে, তদুপরি অবস্থা পরিবেশ ও কালের উপযোগী ধর্ম বা যুগধর্ম আছে, যাহাকে সর্বজনীন ধর্ম বা নীতি-ধর্ম বলা যায়; এই সমস্ত ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম বা স্বভাবগত কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সমাজব্যবস্থা বা আইনের বিধানসমূহ সৃষ্টি করে। যখন ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত মানুষ পূর্ণ ও গভীররূপে এবং যথাযথভাবে অবিকৃত ও নির্দোষ অবস্থায় থাকে—যে কালে ইহা সম্ভব হয় পুরাণের ভাষায় তাহাকে স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ বলে—তখন কোন প্রকার রাজ্যশাসনপ্রণালী বা শাসনতন্ত্র অথবা মনুষ্য রচিত কোন প্রকার সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, ইহাই ছিল প্রাচীন মতবাদ; কারণ সেই যুগে সকলে স্বাধীন ভাবে তাহাদের জ্ঞানালোকিত আত্মার এবং ভগবান দ্বারা অধ্যুষিত সত্তার সত্যের মধ্যে বাস করে বলিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিব্য আন্তর ধর্মের বিকাশ হয়। এই আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম ব্যক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণশীল সমাজ নিজ নিজ সত্তার খাঁটি বিধানে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবে সুতরাং ইহাই হইবে আদর্শ জীবন। কিন্তু কার্যতঃ মানবজাতি যে অবস্থায় আছে, যখন তাহার অজ্ঞ ও বিপথগামী প্রকৃতি ব্যক্তিগত ও সমাজগত ধর্মের বিকৃতি ও বিচ্যুতির অধীন রহিয়াছে, তখন সমাজের স্বাভাবিক জীবনের উপর একটা প্রভুশক্তি, এক রাজা বা এক শাসক সম্প্রদায় চাপাইয়া দিতে হয়; সমাজজীবনের উপর অযথাভাবে হস্তক্ষেপ করা এই রাজশক্তির কাজ হইবে না, সমাজকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বাভাবিক বিধান ও আচার পালন করিতে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বর্ধিত হইতে দিতে হইবে, কিন্তু শাসকের কর্তব্য হইবে যাহাতে ধর্ম রক্ষিত এবং সতেজভাবে বর্ধিত হয় তাহা দেখা, সমাজের প্রকৃত নিয়ম পদ্ধতি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহাতে সাহায্য করা, অথবা ধর্মের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধকে দমন করা বা শাস্তি দেওয়া, এবং এই রূপে যতটা পারা যায় পাপানুষ্ঠানের প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা। ধর্মের বিকৃতি অধিকতর অগ্রসর হইলে আইন প্রণেতার আবশ্যকতা দেখা দেয়, সমাজের সমগ্র জীবন পরিচালনার জন্য বাহ্যবিধানের বা লিখিত আইন বা সংহিতার প্রয়োজন উপস্থিত হয়; কিন্তু এ কাজ সমাজ ও ধর্মজগতের স্রষ্টা ও নেতা ঋষি, শাস্ত্রপ্রণেতা বা ব্যাখ্যাকার ব্রাহ্মণকেই করিতে হইত, রাজশক্তির উপর এ কার্যের ভার ছিল না, সে শক্তির শুধু কার্য পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষতা

করিবার ক্ষমতা ছিল এবং সেই পরিচালনার জন্য যাহা প্রয়োজন, বাহ্যদিকের সেইরূপ ক্ষুদ্র দফার পরিবর্তনের অধিকার শুধু তাহার ছিল। বিধিবিধানসমূহ লিখিত বা অলিখিত যাহাই হউক না কেন, তাহা কখনই রাষ্ট্রিয় শক্তি বা ব্যবস্থাপক সমিতি দ্বারা নূতন করিয়া উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট হইত না, কিন্তু যে বিধি বর্তমান আছে কেবল তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইত বা তাহাকে নূতন করিয়া বলা হইত অথবা জাতির জীবন ও চৈতন্যে যে বিধান বা যে তত্ত্ব পূর্বে ছিল তাহা হইতে স্বাভাবিক ভাবে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইত। দেশাচার ও রীতিনীতি ক্রমশঃ আরও বেশী কৃত্রিম হইয়া পড়িলে তাহা হইতে শেষ ও অতি অবনত অবস্থা অবশ্যই যখন উপস্থিত হয়, তখন অরাজকতার, বিরোধের এবং ধর্মহীনতার এক যুগ আসিয়া পড়ে—এই যুগকে কলিযুগ বলা হয়—এই অবস্থায় মানবসমাজের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ এবং তাহার মধ্যে আত্মার এক নূতন আত্মপ্রকাশের পূর্বে কলিযুগের রক্তধূসর সন্ধ্যার দারুণ বিপদ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজশক্তি রাজা শাসনসভা বা রাষ্ট্রিক দেহের অন্য শাসকগণের প্রধান কর্তব্য ছিল সমাজজীবনের যথার্থ নিয়ম ও বিধান পালন করা এবং সে বিধানকে রক্ষা করিতে সাহায্য করা; রাজা ছিলেন ধর্মের রক্ষক পরিপালক ও পরিচালক। মানুষের প্রাণধর্মের প্রয়োজনসমূহ, তাহার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অভাব পরিপূরণ, তাহার সুখ ও উপভোগের পরিতৃপ্তির দাবি, যথাযথভাবে মিটানো সমাজের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু নৈতিক সামাজিক ও পারমার্থিক ধর্মবিধানের অধীনে রাখিয়া, উহাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এ সমস্তের খাঁটি বিধান ও পরিমাণ স্থিরীকৃত হইত। সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের সকল অবয়বের সকল লোকের এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে, সমাজে তাহাদের যে স্থান ছিল এবং সমগ্র সমাজের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল তদনুসারে নির্ণীত হইত; খাঁটিভাবে এ ধর্মকে রক্ষা এবং স্বাধীনভাবে তাহাকে পরিচালনা করিতে দেওয়া হইত; তাহাদের সীমার মধ্যে তাহাদের নিজ প্রকৃতির অনুরূপভাবে আত্মনিয়ন্ত্রিত এই ধর্ম প্রতিপালনে কোন বাধা দেওয়া হইত না, কিন্তু যাহাতে বিধি লঙ্ঘন, পরের উপর হস্তক্ষেপ এবং প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুতি না হয় অথবা যথাযথ সীমার বাহিরে না যায় তাহাও সর্বদা দেখা হইত। মন্ত্রীসভা ও সাধারণ সমিতিগুলির সাহায্যে রাজাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় শ্রেষ্ঠ প্রভুশক্তিকে এই কার্য করিতে হইত। কোন বর্ণ ধর্মসম্প্রদায় শ্রমিকসংঘ গ্রাম্য বা নাগরিক সমাজের স্বাধীন কার্যকলাপে, কোন প্রদেশের প্রাণধর্মের অঙ্গীভূত আচার ও অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেওয়া অথবা তাহাদের কোন সত্ত্বলোপ করা রাজকীয় প্রভুশক্তির কার্য ছিল না; কারণ সমাজধর্ম যথাযথভাবে পালন করিবার পক্ষে অপরিহার্য

বলিয়া এ সমস্তের উপর সকলের জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হইত। সমাজের সকল ব্যাপারের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা, শ্রেষ্ঠশক্তিরূপে সাধারণ-ভাবে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা, জাতি বা সম্প্রদায়কে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব হইতে রক্ষা করা, পাপ ও বিশৃঙ্খলা দমন করা, সমাজের অর্থনৈতিক ও শিল্পবিষয়ক কল্যাণের বৃহৎ ধারাগুলিকে সাহায্য করা, তাহা-দিগকে উন্নীত ও পরিচালিত করা, সকলেই যাহাতে কাজের সুযোগ পায় তাহার উপায় করা এবং যে সমস্ত উদ্দেশ্য অন্য কেহ সাধিত করিবার শক্তি রাখে না, সেই সমস্ত উদ্দেশ্যে নিজ শক্তি প্রয়োগ করা—রাজশক্তিকে ইহা ভিন্ন আর কিছু করিতে হইত না।

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে কার্যত জটিল রাজ্যশাসন প্রণালী আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম সম্প্রদায়সমূহের স্বাধীনতার ক্ষেত্র ছিল; জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একক স্বরূপ প্রত্যেক সংঘের একটা নিজস্ব স্বাভাবিক অস্তিত্বের ধারা ছিল, এবং নিজেদের বিশিষ্ট জীবন ও কর্ম নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত; এইরূপ সংঘ অপর সকল সংঘ হইতে নিজের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সীমার দ্বারা পৃথক থাকিলেও, সমগ্রের সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত ছিল এবং সে সম্বন্ধ বুঝিতে কোন কষ্ট হইত না; সম্প্রদায়গত জীবনে একে অপরের সঙ্গে শক্তি ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে অংশীদার ছিল, প্রত্যেকে নিজের বিধান ও নিয়ম নিজের উপযুক্ত সীমার মধ্যে পরিচালনা করিত, কিন্তু যেখানে সাধারণ বা পরস্পরের কোন স্বার্থ জড়িত থাকিত, সেখানে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া কর্মের বিধান স্থির করিয়া মিলিত হইয়া কার্য করিত; আবার ইহারা রাজ্য বা সাম্রাজ্যের সাধারণ সমিতিতে নিজ যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে কোন না কোন প্রকার স্থান পাইত। রাজা বা রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল সমন্বয় বিধানের, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা সাধনের যন্ত্র; প্রধান প্রভুত্বের শক্তি তাহার হাতে থাকিত বটে, কিন্তু সে প্রভুত্ব অপ্রতিহত বা নিরূঢ় ছিল না; কারণ আইন বা সংহিতা এবং জনসাধারণের ইচ্ছা দ্বারা তাহার সকল অধিকার ও শক্তি নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হইত; ভিতরকার কার্যে এই রাষ্ট্রিয় সমাজের অন্য সকল অংশের সঙ্গে রাজশক্তি একজন অংশীদার মাত্র ছিল।

কার্যতঃ ইহাই ছিল ভারতীয় শাসন পদ্ধতির তত্ত্ব ও মতবাদ এবং গঠন-পদ্ধতি; ইহাতে জটিলভাবে সম্প্রদায় সমূহের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বর্তমান ছিল; কিন্তু সমন্বয় সাধন করিবার জন্য এক শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, একজন রাজা বা শাসক-সমিতি ছিল, সে শক্তি পদ ও মর্যাদা এবং প্রভূত কার্যকরী সামর্থ্যের অধিকারী ছিল কিন্তু সে সকলই যথাযোগ্য ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন সে শক্তি সকলকে শাসন করিত তেমনি একই সঙ্গে সকলের দ্বারা নিজেও শাসিত হইত, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সকলকে রাজশক্তির সক্রিয় অংশীদার

বলিয়া স্বীকার করা হইত, সম্প্রদায়গত সত্তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে রাজাও নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেন; রাজা প্রজা এবং রাজ্যের সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে ধর্মের বন্ধনে বদ্ধ এবং ধর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হইত, সকলকেই ধর্মের বিধান মানিয়া চলিতে হইত। ইহা ছাড়া সমাজজীবনের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক বিষয় ও বিভাবগুলিও ধর্মের একটি অংশমাত্র ছিল, আর এ অংশ ধর্মের অপর সমস্ত অংগ হইতে ধর্মানুষ্ঠানে, নৈতিকজীবনে বা সমাজজীবনের সংস্কৃতিগত উচ্চতর উদ্দেশ্যে একেবারে পৃথক ছিল না বরং অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিলিত ছিল। রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সকল নৈতিকজীবনের ভাবধারা দ্বারা অনুরঞ্জিত ছিল; রাজা বা তাঁহার মন্ত্রীবর্গ, শাসনসভা বা সমিতি, সমাজের ব্যক্তিবর্গ, সমাজের অন্তর্গত সকল স্বতন্ত্র সংঘ—ইহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্যে নৈতিক নিয়ম পালন করিতে হইত; নৈতিকজীবন লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃতিগত গতি ও প্রকৃতি বিচার করিয়া মন্ত্রী, কর্মচারী অথবা সভাসদগণের যোগ্যতা নিরূপিত হইত, বা তাঁহাদের নির্বাচিত হইবার অথবা ভোট পাইবার অধিকার স্থিরীকৃত হইত; আর্যজাতির সমাজে যাহারা উচ্চপদ বা শক্তি লাভ করিতেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে উচ্চচরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষা আশা করা হইত। রাজা ও প্রজার সমগ্র জীবনের শীর্ষদেশে স্থান ছিল ধর্মভাবের, এবং তাহার পশ্চাতে ছিলেন তাঁহারা, যাঁহারা সকল সময় ধর্মের কথা মনে করাইয়া দিতেন। সমাজের কোন কোন অংশ বিশিষ্ট কার্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেও সমাজজীবনকে মানুষের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধরা হইত না; কিন্তু ইহার প্রত্যেক অংশে এবং ইহাকে সমগ্রভাবে মানুষের মন ও আত্মার শিক্ষা-ক্ষেত্র বা শিক্ষার জন্য প্রস্তুত একটা বৃহৎ কাঠামো বলিয়া গ্রহণ করা হইত, প্রত্যুত এ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উন্নতি ও পরিণতির মধ্য দিয়া মানুষ তাহার প্রাকৃত জীবন হইতে আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাতে পেৌঁছিতে পারে তাহাই ছিল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র

যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় সভ্যতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি ও পরিণতি চারিটি ঐতিহাসিক ধারার মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সরল এক আর্য সমাজ ছিল, তাহার পর এক দীর্ঘ পরিবর্তনের যুগের ভিতর দিয়া জাতীয়জীবন পরীক্ষা-মূলক নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন ও তাহাদের সমন্বয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ জাতির নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার জটিল ভাবধারা সংমিশ্রিত ও সমন্বিত করিয়া দৃঢ়ভাবে রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং দেশগত ও সাম্রাজ্যগত ঐক্যসকল স্থাপিত হইল। অবশেষে অবনতির এমন এক যুগ আসিয়া পড়িল যখন ভিতরের উন্নতি বন্ধ হইল, জীবন গতিহীন হইয়া উঠিল, এবং পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপ হইতে আগত নূতন সংস্কৃতি ও শাসনপদ্ধতি ভারতের উপর আরোপিত হইল। প্রথম তিন যুগের বিশিষ্ট প্রকৃতির ফলে সকল প্রতিষ্ঠানই অত্যাশ্চর্যরূপে দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল, জাতীয় জীবন গভীর সজীব ও প্রবলভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সমস্ত পদ্ধতির মৌলিক রক্ষণশীল স্থায়িত্বের জন্য উন্নতি দ্রুত না হইয়া অতি ধীরে চলিতেছিল বটে, কিন্তু সেইজন্য জীবনগঠন ও জীবনযাপন অধিকতর নিশ্চিতভাবে চলিতেছিল, এবং তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহ জীবন্তভাবে পূর্ণ হইতেছিল। এমনকি অবনতির সময়ও এই দৃঢ়তা ধ্বংসের গতিপথে প্রবল বাধা দিয়াছে। বৈদেশিক চাপে এ সৌধের উপরটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরেও বহুকাল পর্যন্ত ভিত্তি বজায় আছে, এবং বহিরাক্রমণ হইতে নিজেকে যতটা রক্ষা করা যায় তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহার বিশিষ্ট পদ্ধতির অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে, এমনকি শেষযুগেও নিজের প্রকৃতি ও রূপ পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করিবার সামর্থ্য পুনঃপুনঃ দেখা দিয়াছে। বর্তমানে যদিও সমগ্র রাষ্ট্রীয়পদ্ধতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহার শেষ যে ভাবধারা ছিল চাপে পড়িয়া তাহারও অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তবুও যে বিশিষ্ট সামাজিক মন ও প্রকৃতি এ সমস্ত গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা বর্তমান সমাজের গতিশূন্যতা

দৌর্বল্য বিকৃতি এবং ধ্বংসের মধ্যেও বাঁচিয়া আছে; বর্তমানে বাহিরের প্রত্যক্ষ আকারে ভিন্নরূপ ও প্রবণতা সত্ত্বেও সে মন ও প্রকৃতি উন্নতির পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বন না করিয়া একবার যদি নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজের মতে নিজের পথে চলিতে পারে, তবে তাহার নিজ প্রকৃতির অনুরূপ এক নূতন সৃষ্টি সে করিতে পারিবে; জাতির অগ্রগামী চিন্তাধারায় যাহা অস্পষ্টভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার দাবির আহ্বানে হয়ত এ সৃষ্টি জাতীয় জীবনকে সমাজের তৃতীয় স্তরে পেঁাছাইয়া দিবার, এবং সমগ্র মানবসমাজের একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিবার উপক্রম আরম্ভ করিবে। যাহাই হউক প্রতিষ্ঠানসমূহের এই দীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং তাহাদের আশ্রয়ে বর্ধিত এই মহত্ত্ব নিশ্চয়ই অসামর্থ্যের চিহ্ন নহে, পক্ষান্তরে ভারতীয় সংস্কৃতিগত মনের শক্তির ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আশ্চর্য সহজ বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

সমষ্টিগত জীবন সজীবভাবে নিজ সত্তা হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম, এই তত্ত্বকে স্থায়ীভাবে ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়া সর্বদা ভারতের রাষ্ট্রিয় সৌধের গঠন বিস্তার এবং পুনর্গঠন করা হইয়াছে—জনসাধারণের মধ্যে একটা সাধারণভাবের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ভোটের দ্বারা জাতির কেবল একটা অংশের, কেবল রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি লইয়া, বহিঃস্তরে একটা প্রতিনিধিমূলক সভা গঠন করিয়া, তদ্দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা অধিক কিছু আধুনিক প্রণালী করিতে পারে নাই, কিন্তু ভারত এতদপেক্ষা বেশী কিছু করিতে সক্ষম হইয়াছিল, জীবনের প্রতি স্পন্দন তাহার সত্তার প্রতি স্বতন্ত্র অঙ্গকে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিল। স্বাধীনভাবে সমাজজীবনের সকল ধারার মধ্যে সমন্বয় ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা ইহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যে স্বাধীনতালাভ তাহার লক্ষ্য ছিল তাহা যতটা সমষ্টিগত বা সংঘগত ততটা ব্যক্তিগত নহে। প্রারম্ভে ইহার সমস্যা বেশ সরল ছিল, কারণ কেবলমাত্র দুই প্রকার সমষ্টিগত জীবন লইয়া চলিতে হইত, একটি কুল ও গ্রাম, অপরটি সম্প্রদায় অথবা স্বল্পপরিমিত স্থানের অধিবাসীগণ। স্বায়ত্বশাসনে পরিচালিত গ্রামগত সমষ্টির মধ্যে স্বাধীন ও সজীব এক জীবন প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং এ গঠন এরূপ প্রাচুর্যের সহিত দৃঢ়ভাবে করা হইয়াছিল যে, সময় ও অন্যান্য শাসনপদ্ধতি ইহাকে যে ছিন্নভিন্ন ও ক্ষয় করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল, তাহা প্রতিরোধ করিয়া ইহা প্রায় আমাদের সময় পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল, এবং ব্রিটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির নিষ্ঠুর ও প্রাণহীন যান্ত্রিক শাসন কেবলমাত্র অতি অল্পদিন হইল ইহাকে দারুণ চাপে ফেলিয়া ভাঙিগয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রামসমূহের সমস্ত অধিবাসীগণ প্রধানতঃ কৃষিকর্ম করিয়া জীবিকার্জন করিত এবং প্রত্যেক গ্রামে ধর্মবিষয়ে সামাজিক সামরিক অথবা রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজার নেতৃত্বাধীনে নিজেদের মধ্যে গঠিত কেবলমাত্র একটি

সমিতি দ্বারা পরিচালিত হইত, এ প্রাচীন সমাজে তখন শ্রমবিভাগের জন্য শ্রেণীবিভাগ বা সমাজের অধিবাসীগণের মধ্যে কার্যবিভাগ স্পষ্টভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

কৃষক ও পশুপালকগণকে লইয়া অতি ক্ষুদ্র স্থানে নিবদ্ধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে ভিন্ন অন্যত্র এই সরলতম প্রণালী অপ্রচুর ও অনুপযোগী, সেইজন্য পরবর্তী কালে ভারত তাহার মৌলিক ভাবের প্রয়োগ কিছু রূপান্তরিত করিয়া জটিলতর এক প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রথমে আর্য সমাজের সকল লোকের যে কৃষি ও পশুপালনের জীবন (কৃষ্টয়ঃ) ছিল, তাহাকে বৃহৎ-ভাবে মূল ভিত্তিরূপে রক্ষা করিয়া, ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবসায়ী নানা প্রকার শ্রম ও কারুশিল্পীগণ দ্বারা সমাজদেহের উপরিভাগ সমৃদ্ধভাবে গঠিত হইতে লাগিল, এবং তাহারও উপরিতলে ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিশেষভাবে শিক্ষিত সামরিক ও রাষ্ট্রিক, ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের এবং তাহাদের বৃত্তি ও নিজ নিজ কার্যের স্থান দেওয়া হইল। সর্বত্র সমাজদেহের স্থায়ী একক, দৃঢ়দানা বা অবিনাশী পরিমাণুরূপে গ্রাম্যসমিতি রহিয়া গেল, কিন্তু এবার বহুসংখ্যক গ্রামের এক-একটি সমষ্টি লইয়া এক-একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইল এবং তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে প্রধান বা নেতা এবং তাহার শাসন ও পরিচালনার জন্য এক নূতন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। আবার অন্য রাজ্য জয় করিয়া অথবা অপরের সহিত মিলিত হইয়া যেমন কুলসকল বৃহদাকার জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল, তেমনি পূর্বোক্ত সমষ্টিগত সমাজসমূহ একটি রাজ্যে বা সন্ধিসূত্রে গ্রথিত সম্মিলিত এক গণতন্ত্রে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুনরায় বহুতর রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল বা বৃহত্তর রাজ্য অথবা অবশেষে এক বা একাধিক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আর তখন ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান ও নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, স্বনিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা রক্ষারূপ মূলতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দ্বারা সামাজিক রাষ্ট্রের গঠনে (socio-political constructions) ভারতীয় প্রতিভার পরীক্ষা হইয়া গেল।

এই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় মন সুদৃঢ় চাতুর্বর্ণ্য বিধানের উদ্ভাবন করিয়াছিল, এ ব্যবস্থা ছিল একাধারে ধর্মীয় ও সামাজিক। পুরোহিত সম্প্রদায়, সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যপরিচালক অভিজাত সম্প্রদায়, শিল্পী ব্যবসায়ী ও স্বাধীন কৃষকগণকে লইয়া গঠিত একটি সম্প্রদায়, এবং শ্রমজীবী ও ভৃত্যগণকে লইয়া গঠিত অন্য একটি সম্প্রদায়, মোট এ চারি সম্প্রদায় লইয়া যেরূপ স্বাভাবিকভাবে চারিভাগে শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ অধিকাংশ মনুষ্যত্বসম্পন্ন জাতি কোন না কোন সময় গ্রহণ করিয়াছে, বাহ্যতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ভারতীয় ব্যবস্থা সেই

পরিচিত বিধানের আরও দৃঢ় একপ্রকার ভেদ মনে হইতে পারে, কিন্তু এ সাদৃশ্য কেবল বাহিরের দিকে, ভারতের চাতুর্বর্ণ্য বিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকারের। ভারতীয় বিধান ছিল একই সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজের ধর্মীয় সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন, যে কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের স্বাভাবিক নিজস্ব স্থান নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সমাজের কোন মূল প্রয়োজনীয় ব্যাপার ও কর্ম কোন বর্ণবিশেষের মধ্যে একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল না। এই প্রাচীন পদ্ধতি বুঝিতে হইলে এই বৈশিষ্ট্যটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু বুঝিবার দোষে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার জন্য, অথবা পরবর্তীকালে যখন অবনতি আসিয়া পড়িয়াছিল তখনকার ঘটনা বা অবস্থার অতিরঞ্জনের ফলে, এ বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে আবৃত বা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পবিত্র বিদ্যা ও শিক্ষা অথবা উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার সুযোগ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল না। আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম প্রথম আধ্যাত্মিক বিষয়ের নেতৃত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগিতা ছিল, এবং বহুদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে শিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের দাবির নিকট ক্ষত্রিয়ের দাবি পরাভূত হয় নাই। স্মার্ত বা আইনজ্ঞ, শিক্ষক ও পুরোহিতরূপে তাহাদের সমস্ত সময় ও শক্তি দর্শনশাস্ত্রে, অন্যান্য বিদ্যায়, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে নিয়োগ করিতে পারিত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা অবশেষে নির্দিষ্ট ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাবে প্রাধান্য লাভ করিল। তখন শিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণী ধর্মবিষয়ে মতামত দেওয়ার, পবিত্রগ্রন্থ ও ঐতিহ্য রক্ষা করিবার, আইন বা সংহিতা এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত, জ্ঞানের সমস্ত বিভাগের শিক্ষক বলিয়া স্বীকৃত এবং অন্যান্য বর্ণের গুরু বা সাধারণ ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল; আর এই শ্রেণীর মধ্য হইতে অধিক পরিমাণে দার্শনিক চিন্তাশীল সাহিত্যিক বিদ্বান বা মনীষী পাওয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহাদের বাহিরে ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যে একেবারে ছিল না এ কথাও সত্য নহে। বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যে নিবন্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল, যদিও উচ্চ তিন বর্ণের এ বিষয়ে অধিকার ছিল, শূদ্রকে মতবাদের দিক দিয়া এ অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কার্যত দেখিতে পাই যে, শেষযুগ পর্যন্তও ধর্মীয় গতিবৃত্তির ধারাসমূহের এমন এক পর্যায়ের সাক্ষাৎ মিলে, যাহা পূর্বের স্বাধীনতার মৌলিকভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাহা অর্জনের উপায় সকলের দ্বারেই উপস্থিত করিয়াছে; এবং প্রথম যুগে বেদ ও বেদান্তের ঋষিগণ যেমন সকল বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তদ্রূপ শেষ পর্যন্ত যোগী, সন্ত, অধ্যাত্মবিষয়ে চিন্তাশীল, নূতন ধর্মমত প্রবর্তক, পূর্ব মতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা, ধর্মবিষয়ের কবি ও গায়ক, এবং যাহাদিগকে শাস্ত্র ও বিদ্যার গতানুগতিক

অধিকারী হইতে স্বতন্ত্র জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের মূল উৎপত্তিস্থান বলা যায়, তেমন বহু মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন নিম্নস্থিত শূদ্র পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের এমন কি ঘৃণিত ও অত্যাচার প্রপীড়িত অন্ত্যজের মধ্য হইতে।

ক্রমে চারিবর্ণ নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীবিভাগে পরিণত হইল; কিন্তু অন্ত্যজদিগের কথা বাদ দিলে প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে একটি আধ্যাত্মিক জীবন ও উপযোগিতা, কতকটা পরিমাণে সামাজিক পদমর্যাদা ও একটা শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক ও নৈতিক সম্মানের একটা বিধান ছিল, জাতীয় জীবনে একটা স্থান, একটা কর্তব্য ও একটা অধিকার ছিল। আবার এ পদ্ধতি বিনা আয়াসে সমাজে শ্রমবিভাগ ও নিশ্চিত অর্থনৈতিক সংস্থিতি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইল; প্রথমতঃ বংশানুক্রম নীতি প্রচলিত ছিল, অবশ্য এ ক্ষেত্রে নিয়ম বা মতবাদ যেরূপ দৃঢ় ছিল, কার্যতঃ তদ্রূপ কড়াকড়ি ছিল না, ধনসঞ্চয়ের সুবিধা বা অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইত না, অথবা তাহার নিজ বর্ণের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার বা মর্যাদালাভ দ্বারা সমাজে রাজনীতিতে বা রাজকর্মে উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারে কাহাকেও বাধা দেওয়া হইত না। কারণ শেষ পর্যন্ত সামাজিক বর্ণবিভাগ পদ্ধতি সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগে পরিণত হইয়া পড়ে নাই; সাধারণ রাজনৈতিক অধিকারসমূহে, সাধারণসমিতি ও শাসনবিভাগে স্থান লাভের এবং তাহার ফলে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে প্রত্যেক বর্ণের অধিকার ও অংশ ছিল। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য প্রাচীন জাতির রুচি ও হৃদয়াবেগে যেমন স্ত্রীলোকদিগকে কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া অনুচিত বোধ হইত, এখানে তদ্বিপরীতভাবে আইনে এবং অন্ততঃপক্ষে মতবাদ অনুসারে নারীগণের ঐরূপ অধিকার কখনও অস্বীকৃত হয় নাই, যদিও নারীকে সামাজিক ব্যাপারে পুরুষের অধীন করাতে, এবং গৃহকর্মকে প্রধান স্থান দেওয়াতে, রাজনৈতিক জীবনের এই সাম্য কার্যতঃ কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ নারীর পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছিল; তথাপি যে সমস্ত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় তাহাতে বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, নারী শুধু রাণী ও শাসনকর্ত্রীরূপে বা এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক রূপে নয়—এ ঘটনা ভারতেতিহাসে অতি সাধারণভাবে দেখা যায়—কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি রূপেও স্থান পাইত।

সাধারণ জীবনে সকল বর্ণ পূর্ণরূপে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিয়া মিলিতভাবে কাজ করিবে, এই ব্যবস্থার উপর ভারতীয় সমগ্র পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ছিল; প্রত্যেক বর্ণ তাহার নিজের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিবে, ধর্ম শিক্ষা ও সাহিত্যে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ রাজকার্য ও অন্য রাজ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও ধনোপার্জন বিষয়ে বৈশ্য প্রাধান্য পাইত, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের অংশ গ্রহণে রাজনীতিতে শাসনকার্য পরিচালনায়

ও ন্যায়াধিকরণে কার্যকরীভাবে স্থানলাভের ও মতামত দিবার অধিকার হইতে কাহাকেও, এমন কি শূদ্রকেও বঞ্চিত করা হইত না। ইহার ফলস্বরূপ অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেরূপ এক শ্রেণীর একাধিপত্যমূলক শাসন-ব্যবস্থা বহুকাল পর্যন্ত শক্তিশালী ভাবে চলিয়া আসিয়াছে দেখিতে পাই, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেরূপ কখনও দেখা যায় নাই, অন্ততঃপক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা কখনও দীর্ঘজীবী হয় নাই। তিব্বত দেশে যেমন পুরোহিত পরিচালিত ধর্মমূলক শাসনতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে, অথবা বহু শতাব্দী পর্যন্ত ফ্রান্স ইংলন্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে জমিদার ও যুদ্ধব্যবসায়ী অভিজাত সম্প্রদায়গণ যেরূপ ভাবে দেশ শাসন করিয়াছে, অথবা কার্থেজ ও ভেনিসে যেমন বণিক সম্প্রদায় পরিচালিত শাসনতন্ত্র চলিয়াছিল, এক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত তেমন শাসনতন্ত্র একান্তভাবে ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মহাভারতে যে ঐতিহ্য রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে যেন দেখিতে পাই যে, যুদ্ধ বিবাদ ও রাজ্যবিস্তারের সময় যখন কুল ও উপজাতিসমূহ লইয়া জাতি ও রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বড় বড় ক্ষত্রিয় বংশ অনেকটা রাষ্ট্রিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবং রাজচক্রবর্তীত্ব লাভ করিবার জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে রত ছিল; কতকটা স্থূল ভাবে মধ্যযুগে রাজপুতনায় আমরা কুলপরিচালিত জাতীয়তার পুনরাবর্তনে এইরূপ ক্ষত্রিয় প্রাধান্য দেখিতে পাই; কিন্তু প্রাচীন ভারতে এ ভাব মাঝে মাঝে দেখা দিলেও কখনও স্থায়ী হয় নাই, এবং এরূপ প্রাধান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অপর বর্ণের প্রভাব বর্জন করে নাই, অথবা বিভিন্ন প্রকার সম্প্রদায়ের বা সংঘের স্বাধীন জীবনে হস্তক্ষেপ করে নাই, বা তাহাদের উপর অত্যাচারের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে নাই। মধ্যযুগে যে সমস্ত সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, খুব সম্ভব তাহাতে সাধারণ সমিতি পরিচালিত কর্মে সমস্ত লোক একত্রে কাজ করিবার যে প্রাচীন প্রথা ছিল, পূর্ণরূপে তাহা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত, সেগুলি গ্রীস-দেশীয় সাধারণতন্ত্রের অনুরূপ ছিল না, অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা পরিচালিত বা মুখ্যতান্ত্রিক যে সমস্ত শাসনপদ্ধতি ছিল, তাহারা হয় কুলগত শাসনতন্ত্র ছিল, অথবা সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত লোক দ্বারা গঠিত সমিতি কর্তৃক শাসিত হইত, এবং এই শাসনতন্ত্র কালক্রমে চারি বর্ণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সমিতি বা শাসনপরিষদে পরিণত হইয়াছিল, ইহারাই শেষ যুগের রাজকীয় বা পৌরসমিতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; যাহা হউক শেষ কালে যে শাসনপদ্ধতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্ব বর্ণের মিশ্রণে গঠিত এবং তাহাতে কোন বর্ণের অযথা আধিপত্যের স্থান ছিল না। এইজন্য গ্রীস ও রোমের সংঘর্ষসঙ্কুল ইতিহাসে যেমন সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে চিরবিবাদ ছিল, অথবা মুখ্যতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ও ধারণা লইয়া

কলহের ফলে অবশেষে স্বেচ্ছাচারমূলক যেরূপ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ দেখিতে পাই না; পরবর্তী যুগে ইউরোপে শ্রেণীসংগ্রামের ফলে পর পর নানা প্রকার শাসনতন্ত্র চলিয়াছিল—প্রথমে অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন চলে, তার পর ইহাদের সীমা লঙ্ঘন করিয়া, অথবা বিপ্লব দ্বারা ধনী ও ব্যবসায়ীগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়; তার পর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজকে শ্রমশিল্পপ্রধান করিয়া তোলা হয়, এবং সাধারণের নামে দেশ শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে, এবং অবশেষে বর্তমানে বিত্তহীন শ্রমিকদের হাতে শাসনভার চলিয়া যাইতেছে—এই ভাবে শ্রেণীসংগ্রাম ভারতে কখনও দেখা দেয় নাই। ভারতীয় মনোবৃত্তি ও প্রকৃতি পাশ্চাত্যের তুলনায় অধিকতর সমন্বয়শীল ও নমনীয়, প্রতীচ্যের মত তাহা তর্কবুদ্ধি ও প্রাণের আবেগকে একান্তভাবে ধরিয়া থাকে না, বোধি ও সহজবোধের বেশী অনুসরণ করে; সেইজন্য এই মন ও বুদ্ধি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি গঠিত করিয়াছে, তাহা সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিপূর্ণ আদর্শস্থানীয় না হইলেও, অন্তত তাহা একটা সুনিপুণ জ্ঞানের এবং সকল স্বাভাবিক শক্তি ও বর্ণের স্থায়ী সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অস্থায়ী সাম্যের বিপজ্জনক সমন্বয় বা আপোষ হয় নাই; সমাজ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া সকলকে মিলাইয়া এক জীবন্ত সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেইজন্য যদিও মানুষের সকল প্রতিষ্ঠান যেমন ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে চলে, তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই, তথাপি ইহা অন্ততঃপক্ষে সমাজদেহের মধ্যে এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের যে অস্বাভাবিক বিরোধ বা অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপরিভাগে তিন প্রকার শাসন ব্যবস্থা ছিল, প্রথমে রাজা ও তাহার মন্ত্রীপরিষদ, দ্বিতীয় রাজধানীতে অবস্থিত পৌরসমিতি, তৃতীয় সমস্ত রাজ্যের সাধারণ শাসকসভা। সভাসদ ও মন্ত্রীগণ সকল বর্ণ বা শ্রেণী হইতে গৃহীত হইত। সভাসদগণের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রতিনিধি থাকিত। বস্তুতঃ সংখ্যা গণনায় বৈশ্য অবিসংবাদিত ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করিত, সমগ্র জাতির মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকাতে, সভাসদগণের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাধিক্য ন্যায়সংগত ছিল; কারণ প্রাচীন আর্য সমাজে বৈশ্য বর্ণ বলিতে বৃহৎ বণিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শুধু বুঝাইত না, কিন্তু শ্রমশিল্পী ও কারুশিল্পী এবং কৃষক ইহারা সকলেই এ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কাজেই সাধারণ লোকের অধিকাংশই 'বিশ' নামে পরিচিত এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই উচ্চ বর্ণের যতই পদমর্যাদা বা প্রভাব থাকুক না কেন, এই

তিন বর্ণ সমাজে পরে আসিয়াছে এবং তুলনা করিলে সংখ্যা হিসাবে ইহারা অতি নিম্ন স্থানে ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম উত্থানের পর তাহার দ্বারা সমাজে এক বিশৃঙ্খলা আনীত হইয়াছিল, তাহার পর যখন সংস্কৃতির অবনতির যুগে ব্রাহ্মণগণ সমাজ পুনর্গঠন করেন, কেবলমাত্র তখন ভারতের অধিকাংশ স্থানে কৃষক শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের এক অতি বৃহৎ অংশ শূদ্র পর্যায়ে আসিয়া পড়িল ; ফলে উপরে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং মধ্যস্থানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ছিটাফোঁটা মাত্র রহিল। বুদ্ধ-পূর্ব যুগে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এই পরিষদের হাতে শাসন ও কার্যনির্বাহের প্রধান ক্ষমতা ছিল, জাতীয় কর্মের সকল বিভাগে শাসনপরিচালনা, রাজস্ব, শাসনকার্যের কর্মপদ্ধতি বিনির্ণয় প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বিষয়ে রাজা যে সমস্ত কার্য করিতেন বা আদেশ দিতেন, তাহাতে এই সমিতির সম্মতি ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদগণ শাসন ও পরিচালনার জন্য স্থাপিত পরিষদগুলির সাহায্য লইয়া রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্যের অধ্যক্ষতা ও পরিচালনা করিতেন। রাজার শক্তি কালক্রমে বাড়িয়া যাইবার দিকে প্রবণতা যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং অনেক সময় রাজা তাহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে চলিতে, কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রলুব্ধ হইতেন, কিন্তু তথাপি যতদিন এ পদ্ধতি সতেজ ছিল, ততদিন পর্যন্ত রাজা তাহার মন্ত্রী ও সভাসদগণের ইচ্ছা ও অভিমত উপেক্ষা বা তুচ্ছ করিলে পরিত্রাণ পাইতেন না। এমন কি মনে হয় মহাসম্রাট অশোকের ন্যায় শক্তিশালী ও দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্ন রাজাকেও সভাসদগণের সহিত বিবাদে পরাজিত হইতে হইয়াছিল এবং কার্যতঃ তাঁহার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্ত্রীপরিষদ অত্যন্ত অবাধ্য অথবা অযোগ্য রাজাকে গদীচ্যুত করিতে, অথবা তাহার বংশের বা অন্য নূতন বংশের কাহাকেও তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিত, এবং অনেক সময় ইহা করিত ; এইভাবে ইতিহাসে দেখিতে পাই অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ মৌর্যবংশ হইতে সুঙ্গবংশের রাজ্যলাভ, পুনরায় কণ্ববংশীয় সম্রাটগণের ধারা প্রবর্তন উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজ্যশাসন প্রণালীর মূল মতবাদ অনুসারে এবং সাধারণতঃ কার্যক্ষেত্রে রাজার সমস্ত কার্য মন্ত্রীগণের সহায়তায় কৃত ও স-সভাসদ রাজার কার্য বলিয়া গৃহীত হইত, রাজার ব্যক্তিগত কার্যাবলি ততক্ষণ ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যতক্ষণ সভাসদগণের সম্মতিতে তাহা কৃত এবং ধর্মদ্বারা তাহার যে কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ন্যায্য ও বিশ্বস্ত ভাবে তাহা পালন করা হইত। সভাসদসমিতি রাজশক্তির সারভাগ ও রাজকার্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, কার্যপরিচালনার উপযোগী আকারে রাখিবার জন্য ইহাতে ঘনীভূত ভাবে শক্তি সমাবেশ করা হইত, সমাজ দেহের প্রধান প্রধান অঙ্গের অর্থাৎ চারিবর্ণের প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত

হইত; রাজা এই শক্তি বা সমিতির সক্রিয় প্রধান অধ্যক্ষ মাত্র হইতে পারিতেন, স্বেচ্ছাচার-শাসনতন্ত্রে রাজা যেমন নিজেই রাজ্য ও রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, অথবা আজ্ঞাবহ প্রজাগণের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগত শাসক হইয়া দাঁড়ান, এখানে সেরূপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিত না, আইন ও ধর্মের আজ্ঞা পালন জনসাধারণের কর্তব্য ছিল, স-পরিষদ রাজার অনুশাসন বা আজ্ঞাপালন ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম পালনের জন্য রাজকীয ব্যবস্থা মাত্র বলিয়া পালিত হইত।

এই সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে পরিষদ বা সভার মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যাহা সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রভাবাধীনে থাকিত, যদি তাহাই একমাত্র শাসন সমিতি হইত তবে তাহা স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনযন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু বিস্তৃততর ভাবে সমাজদেহের প্রতিনিধি রূপে আরও দুইটি শক্তিশালী সমিতি ছিল, ইহারা রাজার প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া, সামাজিক মনপ্রাণ ও ইচ্ছাকে নিকটতর ও গভীরতরভাবে প্রকাশ করিতে, রাজকার্য পরিচালনায় এবং তজ্জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতা বৃহৎ ভাবে সর্বদা প্রয়োগ করিতে, এবং সর্বসময়ে রাজশক্তির যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে পারিত; কারণ ইহারা অসন্তুষ্ট হইলে সাধারণের বিরাগভাজন অথবা অত্যাচারী রাজাকে অপসারণ করিতে, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা জনসাধারণের ইচ্ছার নিকট নতি-স্বীকার না করিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত, তাহার রাজ্যপরিচালনা অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারিত। এ দুইটি রাজধানীস্থিত পৌরসমিতি এবং সাধারণ মহাসভা বা জানপদসমিতি; ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন শক্তি পরিচালনার জন্য পৃথক-ভাবে ইহাদের অধিবেশন হইত; সমস্ত লোকের স্বার্থ ও সুবিধা যে সমস্ত বিষয়ে রহিয়াছে তাহার মীমাংসার জন্য এ দুই সভার একত্রে অধিবেশনও হইত।* রাজ্য বা সাম্রাজ্যের রাজধানী যে সহরে অবস্থিত ছিল পৌরসমিতির অধিবেশন সর্বদা সেখানেই হইত, যেখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেখানে সেই প্রকারের কিন্তু কমশক্তিশালী সমিতি প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরেও অবস্থিত ছিল, এই সমস্ত প্রদেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন সেখানকার রাজধানীতে যে পৌরসভা ছিল, এই সমস্ত ক্ষুদ্রতর সমিতি তাহারই ধ্বংসাবশেষ; এই পৌর-সমিতি সহরস্থিত শিল্প ও ব্যবসায় সম্পকীয় পৌরসঙ্ঘ সকলের এবং বর্ণগত বিভিন্ন সমিতিসমূহের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইত, ইহাতে অন্ততঃপক্ষে ব্রাহ্মণেতর ত্রিবর্ণের প্রতিনিধি থাকিত। বৃত্তিগত এবং বর্ণগত সমিতিসমূহ প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে অবস্থিত নিজ নিজ সম্প্রদায় হইতে স্বনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রাণধর্মবশে সৃষ্ট হইত; আর পৌরসমিতি একটা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান ছিল না,

* শ্রীযুক্ত জয়সয়ালের সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভ বর্ণনাতে এই সমস্ত সমিতির অতি স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় কোথায় পাইয়াছেন তাহার নির্দেশও তাঁহার প্রবন্ধে আছে, তাহা হইতে আমার উদ্দেশ্যের উপযোগী বিষয়গুলি আমি লইয়াছি।

কিন্তু রাজধানীর মধ্যে অবস্থিত সমস্ত সমাজদেহের সমষ্টিগত সত্তার সকল অঙ্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইত। ইহা সমস্ত পৌরজীবনশাসন কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও পাঁচজন দশজন অথবা তদধিক সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত অধীনস্থ ক্ষুদ্রতর সমিতি, শাসনসংসদ বা কমিটির সাহায্যে কার্যনির্বাহ করিত। এই সমিতি সমস্ত সমাজের পক্ষ হইতে বাণিজ্য শিল্প রাজস্ব এবং সকল প্রকার পৌর স্বায়ত্তশাসনের অধ্যক্ষতা ও পরিচালনা করিত; করিত প্রত্যক্ষ ভাবে এবং বিধান প্রণয়ন ও আদেশ প্রদান দ্বারা, যাহা প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক সমিতি পালন করিতে বাধ্য থাকিত। কিন্তু ইহা ছাড়া রাজা বা তাহার কর্মচারীবৃন্দকে এই সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চলিতে হইত; কখনও-বা একা কখনও-বা জানপদ-সমিতির সহিত সহযোগিতা করিয়া রাজ্যের বৃহত্তর ব্যাপারে ইহা হস্তক্ষেপ করিতে পারিত, রাজধানীতে অবস্থিত থাকিয়া সর্বদা কার্য করিত বলিয়া ইহা এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিত যে, রাজা তাহার মন্ত্রী ও সভাসদগণ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারিত না। প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত দূরস্থিত রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত যদি রাজার মন্ত্রী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিবাদ উপস্থিত হইত, যদি তাহাদের পদমর্যাদার বা তাহাদের বিশিষ্ট সুবিধা বা ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হইত, যদি রাজকার্য পরিচালনায় তাহাদের রুষ্ট হওয়ার কারণ ঘটিত, তবে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে, এবং অপরাধী কর্মচারীকে সরাইয়া লইতে বাধ্য করিতে পারিত।

অনুরূপভাবে রাজধানীর বাহিরে অবস্থিত জানপদসমিতি (general assembly) প্রাণধর্মে একীভূত সমস্ত দেশের মন ও ইচ্ছার প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিল, কারণ ইহা নগর ও গ্রামের প্রতিনিধি, নির্বাচিত প্রধান ব্যক্তি বা নেতাগণকে লইয়া গঠিত হইত। ইহার গঠনের মধ্যে কিছু পরিমাণে ধনতান্ত্রিক ভাব বিদ্যমান থাকিত বলিয়া মনে হয়, কারণ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিগণ প্রধানতঃ অধিকতর ধনীগণের মধ্য হইতে গৃহীত হইত; সুতরাং ইহা সাধারণের সমিতি হইলেও পূর্ণভাবের গণতান্ত্রিক বলা যায় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সমিতি জাতীয় জীবন ও মনের প্রকাশ যথাযথ স্পষ্ট ভাবে করিত, অতি আধুনিক কালের গণসমিতি বা পার্লিয়ামেন্টের পূর্বে অন্য কোন দেশের পার্লিয়ামেন্টে সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্থান হইত না, কিন্তু এ সমিতিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত শূদ্রও স্থান পাইত। ইহা অবশ্য সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন গণসমিতি ছিল না, কারণ কোন মৌলিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার সাধারণতঃ স-সভাসদ রাজা অথবা পৌরসমিতির যেমন ছিল না তেমনি ইহাদেরও ছিল না; প্রচলিত আইনের বিধানুসারে নিয়ন্ত্রণ ও মীমাংসা বা আজ্ঞাদান করিবার অধিকার ইহার ছিল। ইহার কার্য ছিল জাতীয় জীবনের নানাবিধ কর্মের সমন্বয় করিবার পক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছার সাক্ষাৎ যন্ত্র হওয়া, যাহাতে তাহার সমস্ত কার্য প্রকৃত

পথে চলে তাহা দেখা, সমগ্র জাতির ব্যবসায় শিল্প কৃষি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুফলপ্রসূ হয় তাহার ব্যবস্থা করা, এবং তজ্জন্য বিধিবিধান ও অনুশাসন প্রচার করা, এই সমস্ত কার্যের জন্য রাজা ও সভাসদ-গণের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার আদায় করা: ইহা ছাড়া রাজার কার্যে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া এবং প্রয়োজন হইলে রাজার কুশাসনে প্রবল-ভাবে বাধা দেওয়া ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের হাতে যে সমস্ত উপায় আছে, তাহার দ্বারা সে কুশাসন দূর করাও ইহাদের কার্য ছিল। পৌরসমিতি এবং জানপদসমিতি একত্রে বসিয়া রাজার উত্তরাধিকার নির্ণয়, প্রয়োজন হইলে রাজাকে অপসারণ, রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী পরিবর্তন অথবা যে বংশের রাজত্ব চলিতেছিল সে বংশের বাহিরের অন্য কাহাকেও সিংহাসন অর্পণ করিতে পারিত; এই যুক্তসমিতি যে সকল স্থানে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আছে, তথায় রাজ-দ্রোহিতার বিচারে অথবা যেখানে ন্যায়বিচার হয় নাই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় উচ্চতম বিচারালয়ের স্থান গ্রহণ করিত। রাজ্যের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে রাজা যেরূপভাবে কার্য করিতে চাহিতেন তাহা, এই সমস্ত সমিতিতে প্রচার করা হইত এবং বিশেষ করধার্যকরণ যুদ্ধ যজ্ঞ ও জলসেচনের বৃহৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে, আর যে সমস্ত প্রশ্নে দেশের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত সে সমস্ত বিষয়ে, এই দুই সমিতির সম্মতি নিতে হইত। এই দুইটি সমিতির অধিবেশন সব সময়ে হইত বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাদের নিকট হইতে নানা বিষয় প্রত্যহ রাজার নিকট উপস্থিত হইত: ইহাদের ব্যবস্থাসকল রাজসরকারে লিপিবদ্ধ হইত এবং তাহা আপনা হইতে আইনের অধিকার লাভ করিত। ইহাদের স্বত্ব অধিকার ও কর্মপদ্ধতি পূর্ণভাবে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ দুইটি সমিতি রাজ্যশাসন বিষয়ে রাজার অংশীদার ছিল; ইহাদের মধ্যে রাজশক্তি সহজাত ভাবে বর্তমান ছিল, এমন কি সাধারণ সময়ে যে সমস্ত শক্তির প্রয়োগ ইহাদের কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অসাধারণ সময়ে বা সঙ্গীণ মুহূর্তে সে সমস্ত শক্তিও ইহারা পরিচালনা করিতে পারিত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে সম্রাট অশোক কর্তৃক জনসাধারণের নূতন ধর্ম গ্রহণ প্রচেষ্টার সময়ও তাহা মাত্র রাজকীয় অনুশাসন জারি করিয়া করা হয় নাই, পরন্তু রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত পরামর্শ করা হইয়াছিল। এই জন্য প্রাচীন বিবরণে দেখা যায় যে, এই দুইটি সমিতিকে রাজকার্যের কার্যকরী সমিতি অথবা প্রয়োজন অনুসারে রাজশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার যন্ত্ররূপে যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কার্যতঃ পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া মনে হয়।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে অথবা বৈদেশিক বিজয়ের ফলে কোন্ সময় যে এই সমস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লোপ পাইয়াছিল তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে শীর্ষদেশের পুরাতন শাসনতন্ত্র নষ্ট হইলে, নূতন

রাজকীয় শাসনতন্ত্র এবং সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অন্য সংঘসমূহের মধ্যে সমুদ্রোপম ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন মাত্র রাজকীয় শাসনতন্ত্রের হাতে সমস্ত বৃহৎ ব্যাপার রহিল এবং অন্য সংঘ ও সমিতি হইতে পৃথক হইয়া পড়াতে সে শাসনতন্ত্র অধিকতর স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল; অন্য পক্ষে যাহারা প্রত্যেকে নিজেদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারসমূহ নিজেরা নিয়ন্ত্রিত করিত, সেই সমস্ত সমিতি রাজ্যের উচ্চতর বিষয়সমূহের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িল—শেষকালে গ্রাম্যসমিতিসমূহের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল; জটিলতর সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা সফল করিতে হইলে সংঘগুলির মধ্যে যে সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাহা আর না থাকাতে, এ অবস্থা দেশের দুর্বলতার প্রবল কারণ হইয়া উঠিল। যাহাই হউক ভারতে মধ্য এসিয়া হইতে আগত আক্রমণ ধারার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্রের যে ঐতিহ্য আসিয়াছিল, তাহা এরূপ বাধ্যবাধকতায় অনভ্যস্ত ছিল, তাই এই নবাগত শাসনতন্ত্র ঐরূপ সমিতি ও সংঘ অথবা যেখানে তাহাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট বা বাঁচিয়াছিল তাহাদিগকে অবিলম্বে ধ্বংস করিত, আর সমস্ত উত্তর ভারতে ইহা ঘটিয়াছিল। ইহার পরেও ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতি বহু শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণাংশে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে যেসমস্ত সাধারণ সমিতি ছিল, তাহাদের গঠনপ্রণালী প্রাচীন কালের রাষ্ট্রীয় সমিতির মত ছিল বলিয়া বোধ হয় না; বরং মনে হয় ভিন্ন প্রকারের কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সংঘ ও সমিতির সমন্বয় সাধন করিবার ফলে এই সমস্ত প্রধান শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত নিম্নতর সমিতির মধ্যে এমন সমস্ত সংঘ ছিল, গোড়ায় যাহাদের রাজনৈতিক প্রকৃতি ছিল, এবং যাহারা পূর্বে এক সময় কুল জাতি ও গণতন্ত্র হিসাবে শাসনের প্রধান প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন ব্যবস্থায় ইহাদের অস্তিত্ব বজায় রহিল কিন্তু পূর্বে তাহাদের যে সর্বোচ্চ শক্তি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল, এখন তাহারা অধীনভাবে সীমার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কেবল নিজ নিজ সম্প্রসায়ের নানা বিষয়ের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে থাকিল। রাজনৈতিক প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পরও কুল বা বংশগত-সংঘ ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান রূপে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, বাঁচিয়াছিল এবং ইহাদের ধর্ম ও সমাজবিধানের অথবা কুলধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে কুলসংঘ নামক সাম্প্রদায়িক সমিতিও বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতে অতি আধুনিক কালেও প্রাচীন সাধারণ মহাসভার স্থান পূরণ করিবার জন্য যে সাধারণ সমিতিগুলি দেখিতে পাই তাহা এই ভাবের সমিতির রূপান্তর, ইহাদের একাধিক সমিতি একত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা পৃথক-ভাবে বা মিলিত হইয়া কার্যনির্বাহ করিত। রাজপুতনায়ও বংশগত পরিবার বা কুল রাষ্ট্রীয়প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি পুনরায় লাভ করিয়াছিল, কিন্তু অন্য-

ভাবে, প্রাচীন কালের প্রতিষ্ঠান বা তাহার পরিমার্জিত সংস্কৃতিগত প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলেও, তাহারা অতি প্রভূত পরিমাণে ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত সাহস সৌজন্য দুর্বলরক্ষণপ্রবৃত্তি মহত্ত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের সম্প্রদায়গত সমাজ পদ্ধতির আর একটি অধিকতর শক্তিশালী ও স্থায়ী এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উপাদান হইল বৃত্তিগত-শ্রেণীভেদ-প্রথা (caste system),* এ প্রথা চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে গঠিত ও পরিণত হইয়াছিল—এমন কি পরিণামে চাতুর্বর্ণ্য প্রথার স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা অসাধারণভাবে সতেজ প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার মূল্য ও গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এ প্রথা যদিও বর্তমানে অবনতির পথে চলিয়াছে তবুও কিছুতেই নষ্ট হইতে চাহিতেছে না। প্রথমতঃ নানা শক্তির চাপে পড়িয়া চারিবর্ণের প্রত্যেক বর্ণ নানা ভাগে বা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া এ প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রধানতঃ ধর্ম সমাজগত-ধর্ম-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভেদের জন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে নানা শ্রেণী উদ্ভব হইল, স্থান ভেদে বা স্থানীয় কারণেও বিভাগ দেখা দিয়াছিল; ক্ষত্রিয়েরা নানা কুলে বিভক্ত হইলেও বর্ণ হিসাবে প্রায় সর্বত্র একই রহিয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক বৃত্তি বা পেশা বিভাগের প্রয়োজনে বংশানুক্রম রীতির ভিত্তিতে বৈশ্য ও শূদ্রগণ অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কঠোরতরভাবে বংশানুক্রম রীতি অনুসরণ না করিয়া বৃত্তি অনুসারে এইরূপ বিভাগের স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অন্য দেশের মত বৃত্তিসংঘ** পদ্ধতিতে (guild system) বেশ সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত করা যাইত, সহরে সতেজ ও কার্যকরী এই বৃত্তিসংঘ সকল আমরা বর্তমানেও দেখিতে পাই। কিন্তু পরে বৃত্তিসংঘ পদ্ধতি লোপ পাইতে লাগিল এবং অর্থনৈতিক কার্য বিভাগের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে সর্বত্র বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ প্রথা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সহরে এবং গ্রামে বৃত্তি অনুসারে নিরূপিত প্রত্যেক শ্রেণী পৃথকরূপে সাম্প্রদায়িক ভাবের একক রূপে গৃহীত

* ইংরাজি 'nation' ও 'caste' এ-উভয় শব্দের অনুবাদে বাংলায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন আমরা English nation শব্দের অনুবাদ করি 'ইংরাজ জাতি' শব্দ দ্বারা, তেমনি—যেখানে বৃত্তি (function) অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—ইংরাজি caste শব্দের অর্থ জাতি ধরি—যেমন বলি কুম্ভকার কিম্বা কর্মকার জাতি। 'Caste system' কথাটার অনুবাদও 'জাতিভেদ প্রথা' করা হইয়া থাকে, আবার শ্রীঅরবিন্দ চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগকে caste system হইতে পৃথক বস্তু বলিয়াছেন, তিনি চারিবর্ণকে four orders বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা চারিবর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে জাতি শব্দ দ্বারা অভিহিত করি, যেমন বলি ব্রাহ্মণ জাতি। এই সমস্ত কারণে বাংলায় অনুবাদ করিতে গিয়া nation, order, caste শব্দের স্থানে একই জাতি শব্দ ব্যবহার করিলে অর্থ বোধগম্য হইবে না বলিয়া caste শব্দ আমি বৃত্তিগত-শ্রেণী এবং caste system বৃত্তিগত-শ্রেণীভেদ-প্রথা বলিয়াছি। (অনুবাদক)

** একই বৃত্তি (বা পেশা) অবলম্বনকারীগণকে লইয়া স্থাপিত সংঘ, সে বৃত্তি অবলম্বনকারীগণ নানা বংশ নানা শ্রেণী বা নানা সম্প্রদায় হইতে আসিতে পারে। (অনুবাদক)

হইল; প্রত্যেক একক এক সঙ্গে ধর্ম সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত হইতে লাগিল; প্রত্যেক একক তাহার ধর্ম, সমাজ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা ও তাহাদের সম্প্রদায়গত ব্যাপার পরিচালনা করিতে লাগিল এবং বাহিরের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া নিজ বৃত্তিগত শ্রেণী মধ্যস্থ জনগণকে চালাইতে লাগিল, কেবলমাত্র ধর্মের মৌলিক প্রশ্ন মীমাংসার জন্য ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইতে এবং শাস্ত্রের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণের নিকট প্রামাণিক ব্যাখ্যা ও মীমাংসা চাহিতে লাগিল। কুলের মত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আইন ও বিধিবিধান রচিত হইল এবং বিধিবিধানকে 'জাতিধর্ম' বলা হইত, আর প্রত্যেক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক সমিতি, "জাতিসংঘ" গঠিত হইল। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপিত না হইয়া সম্প্রদায়গত ভাবে হইত বলিয়া রাজ্যের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বৃত্তিগত শ্রেণীকেও গণনা করা হইত। ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে বৃত্তিসংঘসমূহও (guilds) তুল্যরূপে স্বনিয়ন্ত্রিত হইত, তাহারা নিজেদের কার্য পরিচালনার জন্য সমবেত হইত ও আলোচনা করিত, একত্র হইয়া সমিতি গঠন করিত, তাহাই এক সময়ে নগরের শাসন সমিতি রূপে কার্য করিত বলিয়া বোধ হয়। নগরের আধুনিক স্বায়ত্তশাসন সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এই সমস্ত বৃত্তিসংঘচালিত গবর্ণমেন্টের--যদি তাহাদিগকে এ নামে (guild নামে) অভিহিত করা যায়-- ক্ষমতা বেশী ছিল। বৃত্তিসংঘরূপী এই সমস্ত গবর্ণমেন্ট পরবর্তী কালে সাধারণ নাগরিক বা পৌরসমিতিতে মিশিয়া গিয়াছিল। এই পৌরসমিতিতে পূর্বোক্ত বৃত্তিসংঘ ও বৃত্তিগত শ্রেণীসমিতিসমূহ সজীব ভাবে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। রাজ্যের সাধারণ মহাসভার বৃত্তিগত শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করা হইত না কিন্তু স্থানীয় শাসন কার্য নির্বাহ ব্যাপারে তাহাদের স্থান ছিল।

গ্রামের ও সহরের সমিতিসমূহ সমস্ত শাসন পদ্ধতির অতি স্পষ্টভাবে স্থায়ী ভিত্তিভূমি স্বরূপ ছিল; কিন্তু ইহা জানা প্রয়োজন যে, এ সমস্ত শুধু প্রাদেশিক একক অথবা ভোট গ্রহণ, রাজকার্য পরিচালনা, অথবা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অন্য প্রয়োজন সাধনের সুবিধাজনক যন্ত্রমাত্র ছিল না, কিন্তু সর্বদা ইহাদের খাঁটি সাম্প্রদায়িক একত্ব, নিজস্ব স্বতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ছিল; কেবলমাত্র রাজ্যরূপ যন্ত্রের অধীনে তাহার নিম্নতর অংশরূপে কার্য না করিয়া নিজেদের শক্তিতে ও অধিকার বলে নিজেদের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিত। গ্রাম্য সমিতিকে গ্রামের ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এ বিবরণ অতিরঞ্জন নহে, কারণ প্রত্যেক গ্রাম নিজ সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র ও স্বপর্যাপ্ত ছিল, নিজেদের নির্বাচিত পঞ্চায়েৎ এবং নির্বাচিত অথবা বংশানুক্রমিক

কর্মচারীগণ দ্বারা শাসিত হইত, নিজেদের সমস্ত প্রয়োজন নিজেরা পূরণ করিত, নিজেদের শিক্ষা, পুলিশ, বিচার বিভাগ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমস্ত প্রয়োজন ও কার্যের ব্যবস্থা নিজেরা করিত, এক কথায় গ্রামের নিজস্ব জীবন স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনশীল এককরূপে নিজেরাই পরিচালিত করিত। অনেকগুলি গ্রাম নানাভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াও কার্য করিত; কয়েকটি গ্রাম একত্র হইয়া তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত বা বংশানুক্রমিক প্রধান ব্যক্তির নেতৃত্বে স্বাভাবিক ভাবে সমিতি স্থাপন করিত, যদিও এক গ্রামের মধ্যে যেরূপ একপ্রাণতা ছিল এ সমস্তের মধ্যে তাহা অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণে দেখা যাইত। কিন্তু ভারতের নাগরিক সমিতিগুলিও কিছু কম পরিমাণে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল না, তাহারাও তাহাদের নিজেদের সমিতি ও সংঘ দ্বারা শাসিত হইত; এই সমস্ত সমিতিতে নির্বাচন প্রথা ও ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার বলে নিজেদের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিত, এবং রাজ্যের সাধারণ মহাসভায় গ্রামগুলির ন্যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত। নাগরিক এই শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের আর্থিক ও অন্য প্রকার মঙ্গলসাধক কার্য, পুলিশ, বিচার বিভাগ, সরকারী পূর্তকার্য বিভাগ, সাধারণ ও পবিত্রস্থানসমূহের রক্ষণ, রেজেষ্ট্রিকরণ, স্বায়ত্তশাসন সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য কর সংগ্রহ এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত সকল কার্য নির্বাহ করিত। যদি গ্রাম্য সমিতিকে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য গণতন্ত্র বলা হয়, তাহা হইলে ঠিক তেমনি ভাবে নাগরিক সমিতিকে এক বৃহত্তর নাগরিক গণতন্ত্র নামে অভিহিত করা যায়। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, নৈগম-সমিতি বা বৃত্তিসংঘসমূহ পরিচালিত শাসনতন্ত্র এবং পৌরসমিতি বা রাজধানিস্থিত শাসনতন্ত্র এ উভয়ের নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার ছিল, যে অধিকার অন্যত্র রাজার বা গণতন্ত্রের প্রধান নায়কের মধ্যে মাত্র থাকিতে দেখা যায়।

আর এক প্রকার সংঘজীবনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, এ সংঘের কোন রাজনৈতিক সত্তা ছিল না তথাপি একপ্রকার নিজস্ব ভাবে ইহা স্বায়ত্তশাসনশীল ছিল, কারণ সমাজের সকল প্রকাশকে একরূপ দৃঢ়বন্ধ সংঘগত আকার দেওয়ার যে প্রবল প্রবণতা ভারতীয় জীবনের মধ্যে দেখা যায়, নানা প্রকার সংঘজীবন তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই সংঘবন্ধ হওয়ার প্রবণতার একটি উদাহরণ যৌথ পরিবার প্রথা, যে প্রথা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমান অবস্থার চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; ইহার দুইটি মূলসূত্র ছিল, প্রথমটি এই যে সমস্ত সম্পত্তি একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত ব্যক্তি ও তাহাদের পরিবারের লোকেরা যথাসম্ভব যৌথভাবে দখল ও ভোগ করিত, গৃহকর্তার পরিচালনাধীনে অবিভক্ত ভাবে যৌথজীবন যাপন করিত; দ্বিতীয় সূত্র এই যে পিতার

সম্পত্তিতে প্রত্যেক পুত্রের সমান স্বত্ব ছিল, পৃথগন্ন হইলে সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেলে প্রত্যেকে তাহার অংশ পাইত। স্থায়ী ব্যক্তিগত পৃথক স্বত্ব সর্বদা স্বীকার করিয়া এইরূপ যৌথভাবের একত্ব ভারতীয় মন ও জীবনের সমন্বয়-মূলক প্রকৃতির পরিচয় দেয়, ইহাতে মানুষের মধ্যে মৌলিক যে সমস্ত প্রকৃতি ও প্রবণতা আছে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে, এবং যাহা সাধারণ জীবনে পরস্পরের বিরুদ্ধ মনে হয় তাহারও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা রহিয়াছে। সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির মধ্যে যে সমন্বয় ও মিলনের দিকে লইয়া যাইবার প্রকৃতি ভারতের আছে এখানে তাহার সাক্ষাৎ পাই; এখানে যাজক পরিচালিত শাসনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রভৃতির নানা ভাবের এক অপরূপ মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সমগ্রভাবে এ সমস্ত শাসনতন্ত্রের কোনটির বিশেষ লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহাদের নানারূপ বাধা ও পরস্পরের দাবির সমতা রক্ষার চেষ্টায় জোড়াতালি দেওয়া একরূপ আপোষও ইহা নহে, অথবা বুদ্ধি দ্বারা গঠিত সমন্বয় সাধনের কোন প্রতিষ্ঠান ইহাকে বলা যায় না, বরং বলা চলে যে ইহা ভারতীয় সামাজিক মন ও প্রকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার স্বাভাবিক এক বাহ্য প্রকাশ, এক রূপ।

অন্য প্রান্তে ভারতীয় প্রাণ-মনের তপস্যারত খাঁটি আধ্যাত্মিকতার এক চূড়ান্ত বিকাশ ধর্মসংঘে দেখিতে পাই, এখানে ইহাও সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করিয়াছে। প্রাথমিক বৈদিক সমাজে কোন পুরোহিত পরিচালিত সাধারণ উপাসনাগৃহ বা ধর্মসংঘ অথবা যাজক সম্প্রদায়ের কোন স্থান ছিল না, কারণ দেখা যায় সে সময়কার পদ্ধতিতে সমস্ত লোক লইয়া সমাজ ও ধর্মের একটি মাত্র অবয়ব গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ধর্মবিষয়ক ও ঐহিক অথবা সাধারণ লোক এবং পুরোহিত, এমন কোন বিভেদ সৃষ্টি হয় নাই, এবং পরবর্তী কালের নানামুখী পরিণতি সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম মোটের উপর অথবা অন্ততঃপক্ষে মূল-ভিত্তিরূপে এ নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পক্ষান্তরে কালক্রমে বৈরাগ্য প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজীবনকে সাধারণ জীবন হইতে পৃথক ভাবে দেখিবার প্রবৃত্তি আসিতে এবং ফলে পৃথক ধর্ম সম্প্রদায় গঠনের প্রবৃত্তি দেখা দিতে লাগিল, বৌদ্ধ ও জৈন মত ও সাধনার উদ্ভবের ফলে এই ভাবে পৃথক হইয়া পড়িবার প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়া গেল; সুসম্বদ্ধ ধর্মসংঘের প্রথম পূর্ণ পরিণতি বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু সম্প্রদায়ে দেখা দিল। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে বুদ্ধ কেবল ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিই সন্ন্যাস জীবন গঠনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ধর্মসংঘ গড়িবার উদ্দেশ্যেই তিনি এ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে গোষ্ঠীবদ্ধ মিলিত জীবন যাপন করিয়া প্রত্যেক মঠ এক একটি ধর্মসংঘে

পরিণত হইবে, বৌদ্ধগণের ধর্ম সম্বন্ধীয় যে ধারণা ছিল তাহা রক্ষা করিয়া এবং তাহাকে মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য নব জীবন ধারায় প্রকাশ হইবে। আমরা প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাই যে ইহা সমগ্র হিন্দু সমাজের নীতি এবং মত বা আদর্শ, কিন্তু এখানে আধ্যাত্মিক সংঘ ও বিশুদ্ধ ধর্মসমাজের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা উচ্চতর প্রগাঢ়তা শুধু অর্পণ করা হইয়াছে। এই সংঘ ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংঘসমূহের ন্যায়ই নিজেদের কার্য পরিচালনা করিত। ভিক্ষুমণ্ডলীর সকলকে লইয়া গঠিত সভায় ধর্ম ও তাহার সাধনার সম্বন্ধে বিচার্য প্রশ্নসমূহ লইয়া আলোচনা এবং গণতান্ত্রিক শাসন সমিতির সভাগৃহের মত ভোট লইয়া এ সকলের মীমাংসা করা হইত, কিন্তু অত্যন্ত বেশী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সমস্ত দোষত্রুটি দেখা যায় তাহা হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য এ মীমাংসাকে একটা সীমাদায়ক শাসনের অধীন রাখা হইত। এইভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত মঠের জীবন বৌদ্ধধর্মের নিকট হইতে নিষ্ঠাবান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার বহুবিস্তৃত গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই। এই সমস্ত ধর্মসংঘ যেখানে ব্রাহ্মণ পরিচালিত প্রাচীনতর ব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, সেখানে তাহা জাতির জনসাধারণের একরূপ ধর্মনেতা হইয়া উঠিয়াছিল,—উদাহরণ স্বরূপ শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন আধিপত্য দাবি করিত না, এবং ধর্মসংঘ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিবাদের কথা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না।

সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ভারতের সমস্ত জীবনে, যখন বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখনও, তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম মৌলিক সত্য ও তদনুযায়ী কার্যপ্রণালী বজায় ছিল, সে প্রণালী মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রিত ও আত্মশাসিত সাম্প্রদায়িক সমিতিসমূহকে লইয়া গঠিত এক জটিল পদ্ধতিরূপে বর্তমান ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও এই পদ্ধতির উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রাজকীয় প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল; ক্ষুদ্রতর স্থানে নানা প্রকার স্বাভাবিক জীবন যাত্রার যেরূপ সমন্বয় স্থাপন করা যায় তাহা স্বল্পপরিসর জীবনের পক্ষে উপযোগী হইলেও, সমাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহারিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, আরও কঠোর ও আরও বৈজ্ঞানিক ভাবে কার্যকরী সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল, ইহাই ছিল প্রথম আংশিক প্রয়োজন কিন্তু আরও বলবৎ প্রয়োজন ছিল যুদ্ধ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অন্যান্য কার্যের ব্যবস্থা করা; এই উভয় প্রয়োজনে কেন্দ্রস্থিত একটি শক্তির হাতে সমস্ত ব্যবস্থা একত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তার সাধন করিলে প্রথম প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে

পারিত, কারণ তাহার সম্ভাবনা এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান ছিল; কিন্তু রাজতন্ত্রের কেন্দ্রগত ব্যবস্থা আরও সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ এবং আরও সহজ প্রত্যক্ষ হওয়াতে এবং তাহা আরও উপযোগী আরও কার্যকরী ও অধিকতর সহজ পরিচালনযোগ্য বিবেচিত হওয়াতে, তাহাই গৃহীত হইয়াছিল। বাহিরের অন্য দেশের সঙ্গে নানা কার্যের জন্য যে ভারতকে একটা দেশ না বলিয়া বরং একটা মহাদেশ বলা চলে, সেই ভারতকে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যে বন্ধ করা রূপ বহুযুগাগত যে অতি দুরূহ সমস্যা প্রায় প্রথম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার সমাধান প্রয়োজন ছিল; কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি—যাহা অন্য দেশ আক্রমণ অপেক্ষা নিজ দেশ রক্ষার বেশী উপযোগী ছিল—তাহার সুদক্ষ সামরিক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এ কার্যে অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। এইজন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও অবশেষে শক্তিশালী রাজতন্ত্র বিজয়ী হইল, এবং অন্য সকল প্রকার শাসনতন্ত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মৌলিক অনুপ্রেরণা ও আদর্শের প্রতি ভারতীয় মনের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ভারতবাসীর স্বাভাবিক-প্রকৃতি-জাত সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর ভিত্তিভূমিকে রক্ষা করিয়াছিল, রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালীকে স্বেচ্ছাচারে রত হইতে অথবা তাহার যথোচিত কার্যের সীমাকে অতিক্রম করিতে দেয় নাই; সমাজ জীবনকে যন্ত্ররূপে পরিণত হইবার পথে সফলতার সহিত প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে কেবল যখন দীর্ঘকালব্যাপী অবনতির ফলে একদিকে রাজশক্তি অন্যদিকে জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রিত সংঘগত জীবনের মধ্যে যে সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বা তাহাদের প্রাচীনকালীন শক্তি ও তেজ যখন প্রভূত পরিমাণে কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন ব্যক্তিগত শাসনতন্ত্রের অথবা কেরানী ও কর্মচারীগণের সাহায্যে পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক শাসনের এবং কেন্দ্রগত রাজশক্তির মাত্রাতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধির ফলে জাত দোষ ও ত্রুটিগুলি বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইল। ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতির প্রাচীন ঐতিহ্য যতদিন ও যে পরিমাণে সজীব ও কার্যকরীরূপে বর্তমান ছিল, ততদিন ও সেই পরিমাণে এ সমস্ত দোষ সমাজদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইবার পক্ষে বাধা পাইয়াছে, তখন কখনও বা সাময়িকভাবে ইহারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিন্তু গুরুতর আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাধীনতা ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘকালব্যাপী শক্তিহ্রাস ও শেষ-পতনের সহিত মিলিত হইয়াছে, তখন এ পুরাতন প্রতিষ্ঠানের অনেক স্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা ধীরে ধীরে ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এ জাতির সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্গঠিত হইবার উপযুক্ত উপায় ও সুযোগ পায় নাই।

সংস্কৃতির মহৎ যুগে যখন ভারত উন্নতির উচ্চ শিখরারূঢ় ছিল, তখন উচ্চতমভাবে কার্যকরী স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত সংঘগত স্বায়ত্তশাসনের অতি চমৎকার রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সাক্ষাৎ আমরা পাই। রাজশক্তি শাসন, বিচার, অর্থনীতি ও দেশ রক্ষার সকলপ্রকার কার্যনির্বাহ করিত, কিন্তু ঐ সকল বিভাগ জনসাধারণের বা তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার ও স্বাধীন কার্যে বিঘ্ন ঘটাইত না বা বাধা দিত না। রাজধানীতে ও দেশের মধ্যে রাজকীয় বিচারালয়সমূহ দেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। তাহারা রাজ্যের মধ্যস্থিত সমস্ত বিচারপদ্ধতি সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করিত; কিন্তু গ্রাম বা সহরস্থ সংঘসমূহের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের উপর অযথাভাবে হস্তক্ষেপ করিত না, এমন কি রাজকীয় বিচারপদ্ধতি সালিশ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া বৃত্তিগত সংঘ, বৃত্তিগত শ্রেণী ও পরিবারের মধ্যস্থ বিচারের সহযোগিতা করিত; কেবলমাত্র গুরুতর দুষ্কর্মকারীর দমনকার্যে অপরকে হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া সে কার্য নিজের হাতে রাখিত। শাসন ও রাজস্বসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও গ্রাম ও সহরের সংঘসমূহের শক্তি ও অধিকারের প্রতি অনুরূপ সম্মান দেখান হইত। সহরে ও মফঃস্বলে রাজার নিয়োজিত শাসনকর্তা ও কর্মচারীগণের সহিত জনসাধারণ ও তাহাদের সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত সাম্প্রদায়িক মুখ্য বা নেতা ও কর্মচারীগণ পাশাপাশি থাকিয়া কর্ম করিত। রাজশক্তি জনসাধারণের ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতায় অথবা প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিত না; রাজশক্তির কার্য ছিল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সতেজভাবে ও শক্তিশালীরূপে জাতির সকল কর্মের তত্ত্বাবধান, সাহায্য ও সমন্বয়বিধান করা, তাহাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া—এই জাতীয় কর্মের মধ্যে সে শক্তি আবদ্ধ থাকিত। রাজশক্তি ভারতের সংঘগত মন দ্বারা সৃষ্ট স্থাপত্য, সুকুমার শিল্প, সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব বিষয় সর্বদাই বুঝিত এবং বদান্যতার সহিত প্রভূতভাবে ইহাদিগকে উৎসাহ দিবার যে শক্তি ও সুবিধা ইহার ছিল, তাহা অতি চমৎকারভাবে ব্যবহার করিত। ব্যক্তিগতভাবে রাজা নিজে একটি মহৎ ও স্থায়ী সভ্যতার, একটি স্বাধীন ও সজীব জাতির মহিমান্বিত ও শক্তিশালী প্রধান অধ্যক্ষরূপে রাজ্যশাসনপদ্ধতির সর্বোচ্চ যন্ত্ররূপে বিরাজিত থাকিতেন, তাঁহার শক্তি স্বেচ্ছাচারমূলক স্বৈরতান্ত্রিক বা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হইত না, অথবা যন্ত্ররূপে জনসাধারণের জীবনের স্থান গ্রহণ করিত না এবং অত্যাচার বা প্রপীড়নের কারণ হইয়া উঠিত না।

———

ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র

ভারতীয় মন যদিই বা অধ্যাত্ম-দর্শন, ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যে আশ্চর্যরূপে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে তথাপি জীবনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে অপটু ছিল, ব্যবহারিক বুদ্ধি যে সমস্ত কার্যে লাগে তাহাতে নিম্নতর স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং বিশেষতঃ রাজনৈতিক পরীক্ষা ও গবেষণায় ইহা কোন সুফল দেখাইতে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন, রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণজনক বিবরণ উপস্থিত করিতে পারে নাই, ইহাই পাশ্চাত্য সমালোচকগণ বলিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আমরা যদি ঘটনাবলি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি, যদি ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্রপদ্ধতির তত্ত্ব ও প্রকৃতি খাঁটিভাবে বুঝিতে পারি, তবে তৎক্ষণাৎ এ সমালোচনা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে ভারতীয় সভ্যতা এক বিস্ময়কর রাষ্ট্রপদ্ধতি উদ্ভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল, স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তির উপরে সে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের চেষ্টায় মানুষ অন্য যে সকল শাসনপ্রণালী, তত্ত্ব ও প্রবণতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা আশ্চর্য নিপুণতার সহিত সে সমস্তের মিলন ও সমন্বয় সাধন করিয়াছে, অথচ বর্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রের যে দোষ, সকল বস্তুকে যান্ত্রিক করিয়া তুলিবার দিকে যে অত্যধিক প্রবণতা তাহা হইতে মুক্ত রহিয়াছিল। ক্রম-পরিণতিবাদের এবং তাহার উন্নতির ধারণার দৃষ্টিভঙ্গীতে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তির কারণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তোলা যাইতে পারে তাহা আমি পরে আলোচনা করিব।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের আর একটি দিক আছে, যাহাতে একথা বলা যাইতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের অকৃতকার্যতা ছাড়া অন্য কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। বলা হইয়াছে যে ভারত যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্যরূপে রাজকার্য পরিচালনায় স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ত ছিল, প্রাচীনকালীন অবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতি হয়ত

স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখানে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেকে পৃথক-ভাবে স্বায়ত্তশাসনশীল সুশাসিত ও সমৃদ্ধ হইলেও, সমস্ত দেশে উচ্চবিকশিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিশ্চিতভাবে কার্য করিয়া যাইতে থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় পদ্ধতি জাতিগতভাবে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভারতে একত্ব স্থাপন করিতে এবং অবশেষে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে বা ইহার প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ধ্বংস ও দেশবাসীকে বহু যুগ ব্যাপী পরাধীনতার হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে, জাতিকে স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে যতটা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা যতটা দিতে পারিয়াছে, দেশকে যতটা সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে, তাহা দ্বারাই সে দেশের বা সমাজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বিচার করিতে হয়, কিন্তু অন্য রাজ্য হইতে কতটা নিরাপদ হইতে পারিয়াছে, দেশের মধ্যে কতটা একতা আসিয়াছে, বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর হাত হইতে কতটা আত্মরক্ষার শক্তি আছে বা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নিজে কতটা শক্তিশালী হইয়াছে. তাহা দ্বারাও উহার বিচার হয়। শেষোক্ত প্রকার রাষ্ট্রশক্তি লইয়া যে বিচার করিতে হয়, ইহা মানবজাতির পক্ষে হয়ত নিছক প্রশংসার বিষয় নহে; দেখা গিয়াছে এই শেষোক্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে হীনতর কোন জাতি—উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীকজাতি এবং মধ্যযুগের ইতালীয় জাতির নাম উল্লেখ করা যায়—হয়ত তাহার বিজেতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক অধিক উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল এবং সামরিকশক্তিবিশিষ্ট সফলকাম রাজ্য, আক্রমণকারী সম্প্রদায় বা লুণ্ঠনরত সাম্রাজ্যসমূহ হইতে অনেক বেশী পরিমাণে মানুষের খাঁটি উন্নতির পথে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু মানুষ এখনও প্রধানতঃ প্রাণের ক্ষেত্রে বাস করে, সুতরাং প্রাণের প্রধান নিয়ম বা বিধান, আত্মবিস্তার, অধিকার, আক্রমণ, পরস্পরকে নিজের কুক্ষিগত করিবার জন্য লড়াই এবং বিজয়ীর উদ্বর্তন—এই সমস্ত বৃত্তি ও প্রবণতা দ্বারা সে পরিচালিত হয়; কোন সমষ্টিগত মন ও চেতনা যদি আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় অসামর্থ্যের প্রমাণ দেয়, নিজে নিরাপদে থাকিতে গেলে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত কার্যকরী যে ঐক্য-সাধন করা প্রয়োজন তাহা যদি করিতে না পারে, তবে তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ প্রধান স্থানের অনেক নীচে পড়িয়া যায়। ভারত জাতি-হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কখনও এক হয় নাই। ভারত প্রায় এক হাজার বৎসর বর্বর বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছে, এবং প্রায় আর এক হাজার বৎসর সে ধারাবাহিকরূপে বৈদেশিক প্রভুগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে বিচারে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অসামর্থ্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

পুনরায় বলিতে হইবে যে এ ক্ষেত্রেও প্রথম প্রয়োজন হইল অতিরঞ্জন বর্জন করা, প্রকৃত ঘটনাসমূহ ও তাহাদের তাৎপর্যের স্পষ্ট ধারণা করা, যে

সমস্যার প্রকৃত সমাধান ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে স্পষ্টতঃ সম্ভব হয় নাই, সে সমস্যার প্রবণতা ও তথ্য ভালরূপে বুঝা। প্রথমেই বলি সামরিক শক্তিবলে অন্য দেশ আক্রমণের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা, বৈদেশিক রাজ্য বিজয়ের পরিমাণ, অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে নিজের সফলতা, অন্য রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠনের সহজাত প্রবৃত্তির সুব্যবস্থিত সামর্থ্য, অন্য দেশকে নিজ দেশের অন্তর্বর্তী করিয়া লইবার এবং তাহা শাসন ও শোষণ করিবার অদম্য প্রেরণা দ্বারা যদি কোন জাতির মহত্ত্ব ও সংস্কৃতির বিচার করিতে হয় তবে হয়ত ভারতবর্ষ জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিবে। ভারত কোন সময়ই সামরিক শক্তিবলে তাহার সীমার বাহিরের কোন দেশ জয় এবং তথায় রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের কোন মহাকাব্য বা সুদূর দিগ্বিজয় ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন মহান কাহিনী ভারতের সামরিক কৃতিত্ব হিসাবে কখনও রচিত হয় নাই। আত্মবিস্তার, আক্রমণ ও বিজয়ের যে একমাত্র মহৎ প্রয়াস সে করিয়াছে তাহা তাহার সংস্কৃতির আত্মবিস্তার—বৌদ্ধধর্মের ধারণা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা, শিল্প ও চিন্তাশক্তির অনুপ্রবেশ দ্বারা প্রাচ্য জগৎ আক্রমণ ও অধিকার। এ আক্রমণ শান্তির আক্রমণ—যুদ্ধের নহে; কারণ বাহ্য শক্তির বলে ভৌতিক বিজয় সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করিবার নীতি, ভারতীয় মন ও প্রকৃতি যে প্রাচীন ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল, এবং তাহার ধর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ধারণা বা আদর্শ ছিল, এ উভয়ের বিরোধী ছিল—যদিও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ঐরূপ আস্ফালন ও গর্ব প্রকাশ করে, অথবা ঐরূপভাবে দেশ জয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য করিতেছে বলিয়া অজুহাত দেখায়। সত্য বটে পর পর কয়েকটি ঔপনিবেশিক অভিযান ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় রক্ত ও সংস্কৃতি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের পূর্ব বা পশ্চিম উপকূল হইতে যে সমস্ত জাহাজ এই কার্যে যাত্রা করিয়াছিল, তাহা বহিঃস্থিত ঐ সমস্ত দেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় নাই, পরন্তু নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, অথবা সাহসী ভাগ্যান্বেষীগণ ঐ সমস্ত জাহাজে গিয়া তথাকার তখনও অসংস্কৃত লোক বা জাতির নিকট ভারতীয় ধর্ম, স্থাপত্য, সুকুমার শিল্প, কাব্যচিন্তা, জীবনযাত্রার ধারা ও আচার-ব্যবহার উপস্থিত করিয়াছে। রাজ্য এমন কি জগৎব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের ধারণা যে ভারতীয় মনে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের নিকট ভারতই ছিল জগৎ এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসী সকল লোক ও জাতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া ঐক্যস্থাপন।

এই ধারণা, এই প্রয়োজন বোধ এবং ইহাকে সফল করিবার নিরবচ্ছিন্ন এক

প্রেরণা প্রাচীনতর বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের শৌর্য ও বীর্যপূর্ণ যুগের ঐতিহ্য এবং মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া মুঘল যুগের ঐক্যসাধনের ও পেশোয়াগণের তদ্বিষয়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষার যুগ পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের সর্বত্র দেখিতে পাই; অবশেষে অবনতির শেষ যুগ উপস্থিত হইল, বৈদেশিক অধিকারের চাপে সকল বিবদমান শক্তি সমতা-প্রাপ্ত হইল, এক স্বাধীন জাতির স্বাধীন ঐক্যের স্থানে পরাধীনতার সাম্য আসিয়া পড়িল, কিন্তু এ অবস্থা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত এ ধারণা ও প্রেরণা বর্তমান ছিল। এখন ইহাই হইল প্রশ্ন যে, ঐক্যসাধনের এই মন্থরতা ও দুষ্করতা, হ্রাসবৃদ্ধিশীল এই চঞ্চল গতি এবং অবশেষে দীর্ঘকাল পরে সকল প্রয়াসের এই ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি যে দেখিতে পাই, তাহা এ-জাতির সভ্যতা বা রাষ্ট্রীয় চেতনা ও শক্তির মৌলিক কোন অযোগ্যতার ফলে ঘটিয়াছে, অথবা ইহার অন্য কোন কারণ আছে। ভারতবাসীরা একতাসাধনে অক্ষম, তাহাদের সর্বজনীন স্বদেশপ্রেমের অভাব, ধর্ম ও বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদের জন্য তাহারা বহুধা বিভক্ত, এবং কেবল বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সাধারণের মধ্যে স্বদেশানুরাগ দেখা দিতেছে—এইরূপ অনেক কথা বলা এবং লেখা হইয়াছে। এই যাহা বলা হইয়াছে তাহার সকল কথা পূর্ণরূপে সত্য নহে, ন্যায্যভাবে উক্ত নহে, অথবা এ বিষয়ে সজীবভাবে প্রযোজ্য নহে, তথাপি এই সমস্ত সমালোচনার শক্তি স্বীকার করিলে এমন কি পূর্ণভাবে মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে, তাহারা রোগের লক্ষণমাত্র, গভীরতর কারণের জন্য আমাদিগকে আরও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই উত্তর সাধারণতঃ দেওয়া হয় যে ভারতবর্ষ কার্যতঃ একটা মহাদেশ যাহার মধ্যে নানা জাতীয় লোকের বসতি—প্রায় ইহা আয়তনে যেমন ইউরোপের মত বৃহৎ, ইহার সমস্যার দুরূহতাও সেই পরিমাণে বৃহৎ, অথবা অন্ততঃপক্ষে প্রায় সেই পরিমাণে প্রচুর বা বহুমুখী। যাহা শুধু আদর্শের ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্ত ইউরোপের সেই ঐক্যসাধন এখনও নিষ্ফল কল্পনামাত্র বলিয়া বোধ হয়, আজিও তাহা কার্যতঃ সিদ্ধ করা অসম্ভব মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা যখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অপূর্ণতা এবং ইউরোপের জাতিসমূহের রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তখন যে-ভারতে পূর্ণ একত্বের অথবা অন্ততঃপক্ষে একত্রে মিলিত হইবার আদর্শ স্পষ্টতররূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং যেখানে ঐ একত্বলাভের চেষ্টা অবিরাম চলিয়াছে, এবং যেখানে অনেক সময় সে চেষ্টা সফলতার নিকটে পৌঁছিয়াছে, সেই ভারতের প্রতি অন্য প্রকারের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ সমীচীন নহে। এ উত্তরের কিছু মূল্য আছে কিন্তু ইহা পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে; কারণ উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পূর্ণ নয় বা উভয়ত্র অবস্থা এক প্রকার নহে। তাহাদের

সমষ্টিগত বিশিষ্ট সত্তাতে ইউরোপের জাতিসমূহ পরস্পর অতি স্পষ্টভাবে বিভক্ত; ভারতে প্রাচীন কালে আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেরূপ একত্ব লাভ হইয়াছিল, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ খৃষ্টধর্মের মধ্যস্থিত ঐক্য অথবা এমন কি সাধারণ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কৃতিগত একত্ব তেমন খাঁটিভাবে ও পূর্ণরূপে কখনই লাভ করিতে পারে নাই; একত্ব কখনই তাহাদের জীবনের কেন্দ্রস্থান অধিকার করে নাই বা ইহা কখনই তাহাদের সত্তায় দৃঢ় ভিত্তি বা যে ভূমি তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে তাহা হয় নাই, ইহা কেবল তাহাদের চতুর্দিকবর্তী সাধারণ বায়ুমণ্ডলের স্থান মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ভিত্তিভূমি রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং তাহা প্রত্যেক দেশে প্রবল রূপে বিভিন্ন। পাশ্চাত্য মনের রাষ্ট্রনীতিক চেতনার এই প্রবল প্রভাব ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে সর্বদা ভেদ বজায় এবং তাহাদিগকে পারস্পরিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহের কর্ম ও গতি ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে, এবং বর্তমানকালে সমস্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহা একত্ব স্থাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই, অবশেষে যাহা গড়িয়া তুলিতেছে তাহা কেবল একটি অকার্যকর জাতিসংঘ (League of Nations), আর তাহা ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাধারণ স্বার্থ রক্ষণের জন্য বহু যুগাগত বিভেদ-জাত মনোবৃত্তি প্রয়োগ করিতে বৃথাই উগ্র চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতে অতি প্রাচীন কালে আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত ঐক্য পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছিল, এবং তাহা হিমালয় ও দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানের বিপুল জন-সংঘের জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভেদের দ্বারা পরস্পর হইতে প্রবলভাবে বিভিন্ন জাতি ছিল না, পরন্তু তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি-সম্পন্ন একটি বৃহৎ জাতির মধ্যস্থিত উপজাতিসমূহ রূপে গ্রহণ করা যায়, আবার ভৌগোলিক সংস্থানে এই দেশ সমুদ্র ও পর্বতমালা দ্বারা দৃঢ়ভাবে অন্য দেশ হইতে পৃথক ছিল, এবং এই বৃহৎ জাতি তাহার প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নিজস্ব বিশিষ্ট সাধারণ ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক ছিল; এইজন্য দেশের আয়তন যতই বেশী হউক এবং কার্যক্ষেত্রে যতই বাধা থাকুক না কেন, ভারতের রাজনৈতিক একতা লাভ ইউরোপের তদনুরূপ ঐক্য অপেক্ষা সহজে হওয়া উচিত ছিল। তাই ভারতের এই বিফলতার কারণাবলি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং তাহা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে-ভাবে এ সমস্যা দেখা হইয়াছিল বা দেখা উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে চেষ্টা তদনুযায়ী পথে চলে নাই, যে পথে চলিয়াছে তাহা ভারত-বাসীর বিশিষ্ট মনোভাবের বিরোধী।

ভারতীয় মনের সমগ্র ভিত্তি তাহার আধ্যাত্মিক ও অন্তরাভিমুখী গতি ও প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি এবং অন্তরপুরুষকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অনুসন্ধান করা, অন্য সমস্তকে তাহার অধীন রূপে ও গৌণভাবে দেখা, এবং উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে তাহাদিগকে গভীরতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের এক প্রকাশ, এক প্রাথমিক অভিব্যক্তি অথবা ক্ষেত্র বা সহায় কিম্বা অন্ততঃপক্ষে তাহাতে ঝুলানো কোন অলঙ্কার (pendent) বলিয়া মনে করা এবং তদনুসারে তাহাদিগকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তি যাহা তাহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা প্রথমে তাহার আন্তর ক্ষেত্রে সৃষ্টি করিতে এবং পরে তাহার অন্যান্য দিকের বিকাশ সাধন করিতে চায়। এই মনোভাব এবং ইহার ফলস্বরূপ ভিতর হইতে বাহিরে সৃষ্টি করিবার এই প্রবৃত্তির জন্য ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, যে ঐক্য ভারত তাহার নিজের মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি করিবে, তাহা হইবে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। তাই বাহিরের নিয়ম ও বিধান দ্বারা গঠিত বা আরোপিত এবং কেন্দ্রীভূত কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য—পররাজ্য জয়ের অথবা সামরিক ও গঠনশীল প্রতিভার দ্বারা রোমে বা প্রাচীন পারস্যে যেরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ভারতে প্রথমে সম্ভব হইতে পারিত না। আমার মনে হয় না যে, এ বিষয়ে ভারতের ভুল হইয়াছিল বা ইহা ভারতীয় মনের ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবের পরিচয় দেয়; আমার বিবেচনায় ইহা বলা ঠিক হইবে না যে, এই বৃহৎ ও সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তাহার পর তথায় নিরাপদে আধ্যাত্মিক ঐক্য উদ্ভূত করিয়া তোলা যাইত। শতাধিক রাজ্য জাতি উপজাতি শ্রেণী ও সম্প্রদায় যাহার অন্তর্বর্তী তেমন এক অতি বৃহৎ দেশের একীকরণের সমস্যা প্রথম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল; এ সমস্যা সম্পর্কে ভারতকে অপর একটি গ্রীস দেশ বলা চলে, কিন্তু আয়তনে এ গ্রীস প্রাচীন গ্রীস অপেক্ষা অতি সুবৃহৎ, এমন কি প্রায় বর্তমান ইউরোপের সমান। যেমন সমস্ত গ্রীক জাতির মনে মৌলিক একটা একত্ববোধ জাগাইবার জন্য গ্রীসে সংস্কৃতিগত ঐক্য প্রয়োজন হইয়াছিল, তদ্রূপ এখানে আরও অলঙ্ঘনীয় রূপে সমস্ত জাতির মধ্যে সচেতনভাবে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগানো প্রথমতঃ ও অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন ছিল, ইহা ব্যতীত কোন স্থায়ী ঐক্য সম্ভব হইতে পারিত না। এ বিষয়ে ভারতীয় মনীষার, তাহার মহান ঋষিগণের এবং তাহার সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতাসমূহের সহজ-বুদ্ধি অভ্রান্ত ছিল। আর যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সামরিক বা রাষ্ট্রিক উপায়ে প্রাচীন ভারতের জাতিসমূহের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্যগত একটা বাহ্যিক ঐক্য স্থাপিত করা যাইতে পারিত, তথাপি আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, রোমের স্থাপিত ঐক্যও স্থায়ী হয় নাই, এমন কি রোমের

দেশ জয় ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ফলে প্রাচীন ইতালি দেশে যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও স্থায়ী হয় নাই; আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি পূর্বে প্রস্তুত না করিয়া বিশাল ভারতে তদ্রূপ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা স্থায়ী ফল প্রদান করিত ইহা মনে করা যায় না। যদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যদি তাহা ব্যাপকভাবে জাতীয় মন অধিকার করিয়া থাকে, এবং রাজনৈতিক ও বাহ্যিক ঐক্যের দিকে দৃষ্টি যদি অতি মৃদুভাবে দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা যে কেবল অনর্থপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাতে কোন সুবিধা বা লাভ হয় নাই তাহাও বলা চলে না। মৌলিক এই বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিকতার এই স্থায়ী ছাপ বহুত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত একত্বের দিকে এই দৃষ্টির জন্য যদিও ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সুব্যবস্থিত এক-জাতিত্ব আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি সে এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ভারত আজিও ভারতই রহিয়াছে।

সর্বশেষে এই বলিতে হয় যে, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যই একমাত্র ঐক্য যাহা স্থায়ী হইতে পারে, সহিষ্ণু ও স্থায়ী স্থূল দেহ বা বাহিরের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা স্থির ও অধ্যবসায়ী মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বলে একটি জাতির আত্মার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা অনেক অধিক। এ সত্য ইহসর্বস্ব পাশ্চাত্য মন বুঝিতে বা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, তথাপি সমগ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণাবলি লিখিত আছে। ভারতের সমসাময়িক অনেক প্রাচীন জাতি অথবা তদপেক্ষা পরে জাত অনেক তরুণ জাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, পশ্চাতে তাহাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলি মাত্র রাখিয়া গিয়াছে। গ্রীস ও ঈজিপ্ট মানচিত্রে এবং নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে, কারণ গ্রীক দেশের আত্মা, অথবা যে গভীরতর জাতীয়-আত্মা মেম্‌ফিস্‌ (Memphis —Egypt-এর প্রাচীন এক রাজধানী) প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ আমরা আর এথেন্স বা কাইরোতে পাই না। রোম ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী জাতি-সমূহের উপরে রাষ্ট্রীয় এবং শুধু বাহ্য সংস্কৃতিগত একটা ঐক্য চাপাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সজীব আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, সেই জন্যই রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ পশ্চিমাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, রোমান অধিকারের কোন ছাপ আফ্রিকা রক্ষা করে নাই, এমন কি পশ্চিমাংশস্থিত জাতিসমূহ, যাহাদিগকে এখনও লাটিন (Latin) নামে অভিহিত করা হয়, তাহারাও বর্বরগণের আক্রমণে কোন সতেজ বাধা দিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে বৈদেশিক প্রাণশক্তির সহিত মিশ্রণের ফলে বর্তমান ইটালি, স্পেন ও ফ্রান্স রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহার আন্তর মন আত্মা ও প্রকৃতিতে যুগযুগান্তরের প্রাচীন ভারতের সহিত ধারাবাহিকতা বজায়

রাখিয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণ ও অধিকার, গ্রীক শক এবং হূনগণ, ইসলামের প্রবল প্রাণশক্তি, ব্রিটিশ অধিকার ও তাহার শাসন পদ্ধতির সমভূমিকর পেষণ-যন্ত্রের গুরুভার, পাশ্চাত্যের অতি প্রবল চাপ বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্ট ভারতের দেহস্থিত প্রাচীন আত্মাকে দেহ হইতে বহিষ্কৃত বা চূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রতি পদে, প্রত্যেক বিপদে, আক্রমণ ও পরাধীনতার মধ্যে সে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বাধা দিতে বা বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার উন্নতির যুগে তাহার আধ্যাত্মিক সংহতি, বহিরাগত বস্তুকে পরিপাক করিয়া নিজ দেহের উপাদানে পরিণত করিবার শক্তি ও প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য দ্বারা সে ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহা সে নিজস্ব উপাদানে পরিণত করিতে পারে নাই তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে, যাহা দূর করা যায় নাই তাহাকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে; এমন কি যখন অবনতি আরম্ভ হইয়াছে তখনও সে সেই শক্তিবলে—যে শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও ছিল অবধ্য—বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে; পশ্চাদপসরণ করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত দক্ষিণ দেশে তাহার প্রাচীন রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বজায় রাখিয়াছে, মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে তাহার প্রাচীন আত্মা ও আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত শিখ ও মারাঠা শক্তির উদ্ভব করিয়াছে, যেখানে সক্রিয় বাধা দিতে পারে নাই সেখানে সহনশীল ভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষা করিয়াছে, যে সমস্ত সাম্রাজ্য তাহার সমস্যাপূরণ বা তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করে নাই তাহাদের প্রত্যেককে অবনতি ও ধ্বংসের পথে পাঠাইয়াছে—এইভাবে পুনরুজ্জীবনের সুদিনের অপেক্ষা করিয়া সে বাঁচিয়া আছে। এমন কি বর্তমানে আমাদের চোখের সম্মুখে অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে দেখিতে পাইতেছি। এ সভ্যতার এই লোকোত্তর যে প্রাণশক্তি, যাহা এই অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং এই সমাজগঠনকারী-গণের যে জ্ঞান বাহ্য কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া আত্মা ও অন্ত-র্মানসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, এবং আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে তাহার সত্তায় কেবল ক্ষীণজীবী পুষ্পমাত্র না করিয়া মূল ও কাণ্ডরূপে পরিণত এবং তাহার সমাজসৌধের নশ্বর উপরিভাগ মাত্র না করিয়া তাহার শাশ্বত ভিত্তিভূমি রূপে স্থাপিত করিয়াছিল, সেই প্রাণশক্তি ও জ্ঞানের কথা অতঃপর আর কি বলিব?

কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐক্য একটা বৃহৎ অনমনীয় বস্তু এবং তাহা রাষ্ট্রীয় ও বাহ্য ঐক্যের মত সমাজকে কেন্দ্রীভূত ও একাকারে পরিণত করিতে চায় না; বরং তাহা সমাজ পদ্ধতির সর্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া জীবনে বিপুল বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতাকে স্থান দিতে পারে। প্রাচীন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যার যে প্রবল বাধা ছিল, এখানে আমরা তাহার গোপন মূলের সংস্পর্শে আসি। সাধারণতঃ যেরূপ এক কেন্দ্রীভূত-একাকার-সাম্রাজ্যগত রাজশক্তির দ্বারা সকল

বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়া ঐক্য স্থাপিত করা হয়, সেইরূপ উপায় দ্বারা নানা স্বাধীন বৈচিত্র্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, দৃঢ়ীভূত সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতা চূর্ণ করিয়া ভারতে ঐক্য স্থাপন করা যাইত না; প্রত্যেকবার যখনই এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে তাহা আপাতসফলতার সঙ্গে যতকালই থাকুক না কেন, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমরা এতদূর পর্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারত-ভাগ্যের তত্ত্বাবধায়কগণ যাহাতে তাহার অন্তরের খাঁটি প্রকৃতি নষ্ট না হয়, এবং তাহার আত্মা তাহার জীবনের গভীর মূল উৎসের সঙ্গে যাহাতে নিরাপদে থাকিবার স্বল্পকালস্থায়ী ব্যবস্থা বা যন্ত্রের বিনিময় না করে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঐরূপ বৈচিত্র্যহানিকর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নষ্ট হইতে বাধ্য করিয়া বিজ্ঞের মত কাজই করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের মন অনুপ্রেরণাবলে তাহার প্রয়োজন বুঝিত; ভারতে সাম্রাজ্যের আদর্শ ছিল এমন একটি ঐক্যসাধক শাসনব্যবস্থা-স্থাপন, যাহা স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্ত স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করিবে, বিনা প্রয়োজনে কোন সজীব স্বায়ত্তশাসন নষ্ট করিবে না, এবং যাহা যান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত ঐক্য স্থাপন না করিয়া তাহার সমস্ত জীবনের সমন্বয় সাধন করিবে। যে অবস্থায় এরূপ সমাধান স্থিরনিশ্চিত ভাবে উদ্ভূত হইতে পারিত, এবং যে অবস্থায় ইহার প্রকৃত উপায়, রূপ ও ভিত্তি নির্ণয় করা যাইত, পরবর্তী কালে তাহার অভাব হইয়া পড়িল। এবং সে সমাধানের দিকে না গিয়া একটি মাত্র শাসনতন্ত্র পরিচালিত সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইল। সাময়িক বাহ্য প্রয়োজনের চাপে নির্ধারিত সে প্রচেষ্টা সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই। পারে নাই তাহার কারণ—ইহা এমন একটি কার্যধারা অনুসরণ করিয়াছিল, যাহা শেষপর্যন্ত ভারতীয় প্রকৃতির প্রকৃত গতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমাজ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতি এই ছিল যে, তাহা সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা, গ্রামের সহরের রাজধানীর জাতির সংঘের পরিবার বা কুলের ধর্মসংঘের ও স্থানীয় এককসমূহের স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ও সংশ্লেষণে গঠিত হইবে। রাষ্ট্র বা রাজ্য অথবা মৈত্রীবন্ধ বহু রাজ্য লইয়া গঠিত সাধারণতন্ত্র এই সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে স্বাধীন ও সতেজ ভাবে প্রাণধর্মের ভিত্তিতে একত্র ধরিয়া রাখিবার ও সমন্বয় সাধন করিবার উপায় স্বরূপ ছিল। সাম্রাজ্যের সমস্যা ছিল এই সমস্ত রাজ্য বা জাতির পুনরায় সমন্বয় করা, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তদপেক্ষা বৃহত্তর স্বাধীন ও সজীব প্রাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একত্বে গ্রথিত করা। এমন একটি পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত করিবার প্রয়োজন ছিল, যাহা ইহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য স্থাপন করিবে, বাহিরের আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবে, ইহার মধ্যস্থিত সাম্প্রদায়িক ও স্থানীয় এককসমূহকে বলপ্রয়োগ না করিয়া সক্রিয় জীবন যাপন করিতে দিবে, ধর্মকে মহৎ ভাবে পূর্ণরূপে কার্য

করিতে দিবে, এবং সমস্তকে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্মা ও দেহকে একত্ব ও বহুত্বের মধ্য দিয়া পূর্ণ ও স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দিবে, এবং সকলকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে।

ভারতের প্রাচীনতর মন এ সমস্যা এই অর্থেই বুঝিয়াছিল। পরবর্তী কালে শাসনপরিচালক সাম্রাজ্য ইহাকে কেবল অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রীভূত শক্তিতে যে প্রবৃত্তি অপরিহার্য তাহার বশে, অতি ধীরে প্রায় অবচেতন ভাবে অধীনস্থ স্বতন্ত্র এককসমূহের সতেজ জীবনকে সক্রিয় ভাবে ধ্বংস না করিলেও, ক্ষয় করিয়া আনা এবং দুর্বল করিয়া তুলিবার দিকে ইহার ঝোঁক ছিল। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে যখনই কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তখনই ভারতীয় জীবনের পক্ষে মূলতঃ প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের চিরন্তন-নীতি, প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু সমগ্র জীবনের মিলন সাধন করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান তখনও বর্তমান ছিল, আরও স্বাধীন ভাবে তাহার গভীরতর উৎকর্ষ সাধন করিবার যে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল, তাহা তখন করা হয় নাই। সাম্রাজ্যাভিলাষী রাজতন্ত্রের ঝোঁক ছিল স্বাধীন সমিতিসমূহের শক্তি ও তেজ ক্ষয় সাধনের দিকে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, সাম্প্রদায়িক এককসমূহ একতাবন্ধ শক্তির উপাদান না হইয়া পৃথক ও ভেদজনক অংশ হইয়া দাঁড়াইল। এ সময় গ্রাম্য সমিতিগুলি তাহাদের প্রাণশক্তি কিছু রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সহিত কোন সজীব সম্বন্ধ না থাকাতে, এবং বৃহৎ জাতীয়তাবোধ বর্জিত হইয়া পড়াতে, তাহাদের স্বকীয় স্বপর্যাপ্ত ও সংকীর্ণ জীবন যাহারা স্বীকার করিত, দেশী বা বিদেশী তেমন যে কোন শাসন মানিতে তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ধর্মসংঘগুলিও অনুরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রেণীবিভাগ বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল, অথচ এরূপ বাড়িবার প্রকৃত কোন প্রয়োজন ছিল না, অথবা দেশের আধ্যাত্মিক বা অর্থনৈতিক কোন সার্থকতাও তাহাতে সাধিত হইল না, কেবল পরমশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত প্রথামূলক বিভেদের সৃষ্টি হইতে লাগিল, মূলতঃ সমষ্টিগত জীবনে সমন্বিত ও সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্যসাধনের যে উদ্দেশ্যে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হারাইয়া তাহারা ভেদজনক শক্তি হইয়া দাঁড়াইল। ইহা সত্য নহে যে প্রাচীন ভারতে জাতিভেদপ্রথা জাতীয় জীবনের ঐক্যের পক্ষে একটা বাধারূপে উপস্থিত হইয়াছিল, এমন কি পরবর্তীকালেও এ প্রথা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভেদ ও সংগ্রাম-জনক সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয় নাই, যদিও অবশেষে চরম অবনতির সময় বিশেষতঃ ইতিহাসের আরও পরবর্তী যুগে, যখন সন্ধিসূত্রে যুক্ত মারাঠা শক্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন এ ভাবের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে; তখন কার্যতঃ জাতিভেদ সামাজিক বিভেদের নিষ্ক্রিয় ও গৌণ কারণ এবং নিশ্চল

প্রকোষ্ঠ বা অংশসমূহ সৃষ্টি করিয়া, স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে মিলিত একতাবদ্ধ জীবন পুনর্গঠনের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল।

এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, তাহার সবগুলি মুসলমান আক্রমণের পূর্বে শক্তিশালী ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, কিন্তু ইতিপূর্বে সে সমস্ত বর্তমান ছিল, এবং পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যগুলি যে অবস্থাবলি সৃষ্টি করিল তাহাতে তাহারা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তীকালীন এই সমস্ত সাম্রাজ্যতন্ত্র যতই জাঁকজমকপূর্ণ ও শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদের স্বেচ্ছাচারমূলক প্রকৃতির জন্য কেন্দ্রীকরণের কুফলগুলি ইহাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যসমূহ অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়াছিল; কৃত্রিমভাবে গঠিত ও একীকৃত শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে ভারতের স্থানীয় প্রাণধর্মের আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সেই পুরাতন প্রবৃত্তির ফলে, এই সমস্ত সাম্রাজ্য ক্রমাগতই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; অপরপক্ষে দেশের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সত্য সতেজ ও সহজ সম্বন্ধ না থাকাতে, যে সাধারণ স্বদেশানুরাগ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তাহা সৃষ্টি করিতে ইহারা সমর্থ হয় নাই, এবং অবশেষে পাশ্চাত্য শাসনের একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি আসিয়া তখনও দেশে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক অথবা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া দিয়া তৎস্থানে প্রাণহীন যান্ত্রিক একাকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপে প্রাচীন সেই প্রকৃতি ও ঝোঁক পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে; তাহার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য পুনর্গঠনের চেষ্টা দেখা দিয়াছে, জাতি ও ভাষাগত সত্য-বিভেদ অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, জাতীয় স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে সজীব এককরূপে প্রয়োজনীয় অবলুপ্ত গ্রাম্য সমিতির আদর্শের দিকে ভারতীয় মনের পুনরায় দৃষ্টি পড়িয়াছে; ভারতীয় জীবনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির আরও খাঁটি ধারণার এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জীর্ণসংস্কার ও পুনর্গঠনের এক প্রয়োজনবোধ এখনও জাত না হইলেও, অধিকতর অগ্রগামী মনের নিকট প্রথম ঊষার ন্যায় অস্পষ্ট ভাবে উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতে একত্ব লাভের চেষ্টার বিফলতার ফলে বৈদেশিক আক্রমণ হইয়াছিল এবং অবশেষে তাহাদের অধীনতা ভারতকে ভোগ করিতে হইয়াছে; বিফলতার কারণ এ কার্যের বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণের বিশালতা; কেননা এককেন্দ্রীভূত শক্তিবিশিষ্ট সাম্রাজ্যতন্ত্র স্থাপন রূপ সহজ উপায় ভারতবর্ষে প্রকৃত ভাবে সফল হইতে পারিত না, পক্ষান্তরে ইহাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া বার বার এভাবের চেষ্টা আংশিক সফলতার সহিত করা হইয়াছে, সেই সময় ও পরে বহুকাল পর্যন্ত এইরূপ সফলতার এ প্রকার প্রচেষ্টা সমর্থিত হইয়াছিল মনে

করা গিয়াছিল; কিন্তু এ চেষ্টা বরাবর বিফল হইয়াছে। আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতের প্রাচীন মনীষা এ সমস্যার প্রকৃত মৌলিক প্রকৃতি আরও স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারিয়াছিল। বৈদিক ঋষি ও তাঁহাদের অনুবর্তীগণ ভারতীয় জীবন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন, এবং ভারত উপদ্বীপের এই সমস্ত জাতি ও উপজাতিগণকে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক একতা দ্বারা আবদ্ধ করা, তাঁহাদের প্রধান কার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অন্ধ ছিলেন না। আর্যজাতির কুলগত জীবনের সদাবর্তমান প্রকৃতি বৈরাজ্য, সাম্রাজ্য প্রভৃতি বহু নামে নানা অনুপাতে নানা ভাবের নেতৃত্বের অধীন বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহু স্বাতন্ত্র্যের মিলন ও সমন্বয়ের দিকে চলিতেছিল ইহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন; আর ইহা দেখিয়া এই পথ ধরিয়া এই প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত পন্থা ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন; এইজন্য এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত ভারতের সকল রাজ্য ও জাতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া, তাহাদিগকে একত্রে মিলাইবার জন্য ঐক্যসাধক এক সাম্রাজ্যবিধানের, চক্রবর্তিত্বের এক আদর্শ উদ্ভূত করিয়াছিলেন। ভারতীয় জীবনের সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ছায়াতলে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইহার বাহ্য প্রতীক রূপে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতঃ, শক্তিশালী রাজার এই আদর্শ পূরণের চেষ্টা রাজকীয় ও ধর্মমূলক কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই কার্যে যে সমস্ত জাতি তাহার অধীনে আসিত, তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার অধিকার এ-ধর্ম রাজচক্রবর্তীকে দিত না, অধিকৃত রাজ্যের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত বা রাজবংশকে নষ্ট করিবার, অথবা সেখানে পূর্বনিযুক্ত কর্মচারীগণের স্থানে, নিজ শাসনকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিবার অধিকারও বিজয়ী রাজচক্রবর্তীকে দেওয়া হইত না। রাজ্যের ভিতর শান্তিরক্ষার ও প্রয়োজনের সময় দেশের সকল শক্তিকে মিলিত করিতে পারে, এমন একটি সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার কার্য। এই প্রাথমিক কর্তব্যের সহিত ভারতীয় ধর্মের মিলনসাধক এই প্রবল শক্তির হাতে ভারতের অধ্যাত্ম-জীবন, ধর্ম, নীতি ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রকৃত কার্য যাহাতে সার্থক হয়, এবং তাহাদের আদর্শ যাহাতে রক্ষিত ও পূর্ণ হয়, তাহার ভার দেওয়া হইত।

এই আদর্শের পূর্ণ পরিস্ফুরণ বৃহৎ মহাকাব্যগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে এইরূপ ভাবের একটি সাম্রাজ্য, একটি ধর্মরাজ্য স্থাপন-চেষ্টার এক পৌরাণিক চিত্র রহিয়াছে—চিত্রটি ঐতিহাসিকও হইতে পারে। তথায় যে আদর্শ অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা এরূপ বহুলভাবে স্বীকৃত এবং অবশ্যপালনীয় মনে করা হইত যে, যুধিষ্ঠির ধর্মের আদেশ পালনের জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন বিবেচনা করিয়া, শিশুপালের মত

দুর্দান্ত রাজাও অধীনতা স্বীকার করিয়া যজ্ঞে উপস্থিত ছিল ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণেও ঐরূপ ভাবের ধর্মরাজ্যের, নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম সাম্রাজ্যের একটি আদর্শ চিত্র পাই। এখানেও ইহা স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারমূলক শাসনতন্ত্র নহে, পরন্তু নগর ও প্রদেশের স্বাধীন সমিতি ও সকল শ্রেণীর লোক দ্বারা সমর্থিত একটি সর্বজনীন রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ মিলে, ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বনিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয় ও সংশ্লেষণ করিয়া, ধর্মের বিধান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা করিয়া, রাজতন্ত্রের ইহা এক পরিবর্ধিত রূপ। বিজয় অভিযানের যে আদর্শ তাহাতে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা বিজিত জাতির সজীব স্বাধীনতা হরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নষ্ট এবং পার্থিব সম্বল অপহরণ করিয়া, ধ্বংস ও লুণ্ঠনপরায়ণ আক্রমণ নহে, পরন্তু যজ্ঞার্থ দিগ্‌বিজয় যাত্রায় যে সামরিক শক্তির পরীক্ষা হইত, তাহার ফল সহজে গৃহীত ও স্বীকৃত হইত, কেননা পরাজয়ের সঙ্গে অপমানের, দাসত্ব বা উৎপীড়নের কোন স্থান ছিল না, উপরন্তু ইহাতে জাতির প্রকাশ্য একত্ব ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সদা উদ্‌যুক্ত সর্বোচ্চ এক শক্তিতে আরও শক্তি যোগ করা হইত। প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল; রাষ্ট্রিক উপযোগিতা এবং দেশের বিভক্ত ও যুদ্ধরত লোকসকলের ঐক্য সাধনের প্রয়োজন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র জীবন অথবা সাম্প্রদায়িক এককসমূহের স্বাধীনতার বিনিময়ে এ ঐক্য সাধন উচিত নহে; সুতরাং কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র অথবা দৃঢ়ভাবে গঠিত সাম্রাজ্যের ঐক্যমূলক শাসনতন্ত্র দ্বারা এ চেষ্টা করা কর্তব্য নহে। তাঁহারা লোকের মনে এ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যে তাহার নিকটতম সাদৃশ্য দেখা যাইবে সেই ব্যবস্থায়, যাহা একজন সম্রাট বা এক সাম্রাজ্যতন্ত্রের নেতৃত্বে অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বিভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি ও রাজ্যের সম্মিলন।

এই আদর্শ কখনও কার্যতঃ সফল হইয়াছিল, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদিও যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য স্থাপনের পূর্বে এই ভাবের অনেকগুলি সাম্রাজ্যের কথা মহাকাব্যের ঐতিহ্যে উল্লিখিত আছে দেখা যায়। বুদ্ধের সময়ে এবং পরে যখন চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য দ্বারা প্রথম ঐতিহাসিক ভারত সাম্রাজ্য গঠন চলিতেছিল, তখনও দেশ স্বাধীন রাজ্য ও সাধারণতন্ত্র-সমূহে পূর্ণ ছিল, এবং আলেকজান্ডারের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত শক্তিশালী কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল না। ইহা স্পষ্ট যে পূর্বে যদি কোন একনায়কত্ব বা চক্রবর্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াও থাকে, তবু তাহাকে স্থায়ী করিবার কোন উপায় বা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। সময় দিলে হয়ত তাহারও বিকাশ সম্ভব হইত, কিন্তু ইতিমধ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন আসিয়া পড়িল, যাহার জন্য একটা আশু সমাধান অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ঐতিহাসিক

যুগ হইতে বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্তের মধ্য দিয়া ভারত উপদ্বীপ আক্রমণের সুবিধা থাকাতে, ইহা ভারতের দুর্বলতার কারণ হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত প্রাচীন ভারত সিন্ধুনদকে অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং শক্তিশালী গান্ধার ও বাল্হিক রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় দুর্গের কাজ করিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত এ দুর্বলতা দেখা দেয় নাই। কিন্তু সুশৃঙ্খল পারস্য রাজ্যের আক্রমণে এ সমস্ত রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে সিন্ধু নদের পরপারস্থিত প্রদেশগুলি ভারতের অংশ আর রহিল না, সুতরাং ভারতকে রক্ষা করিবার কারণও থাকিল না; পক্ষান্তরে পর পর প্রত্যেক সফল বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে এই প্রদেশ নিরাপদে দাঁড়াইবার স্থান হইল, এবং তথা হইতে তাহারা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মনের নিকট বিপদের গুরুত্ববোধ জাগাইয়া তুলিল, এবং আমরা দেখিতে পাই এই সময় হইতে কবি, লেখক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সর্বদা সাম্রাজ্যের আদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন, এবং কি উপায়ে ইহা সম্ভব করা যায় তাহা চিন্তা করিয়াছেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার আশু ফলস্বরূপ রাষ্ট্রনীতিবিদ চাণক্যের প্রতিভা দ্বারা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত গঠিত এক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় দেখিতে পাই; এ সাম্রাজ্য পর পর মৌর্য, সুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র ও গুপ্ত বংশের অধীনে—মধ্যে মধ্যে দুর্বলতার যুগ ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবার প্রাথমিক উপক্রম থাকা সত্ত্বেও—আট অথবা নয় শতাব্দী পর্যন্ত সর্বদা রক্ষিত বা পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ইহার অত্যাশ্চর্য শৃঙ্খলা ও রাজকার্যের ব্যবস্থা, পূর্তবিভাগ ও সমৃদ্ধি, বৃহৎ সংস্কৃতি ও সতেজ সজীবতা এবং ঔজ্জ্বল্য, ইহার আশ্রয়ে ভারত উপদ্বীপের জীবনের বিস্ময়কর সফলতার ইতিহাস—এ সমস্তের বিবরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শন-সকল হইতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর মহান জাতিসমূহের প্রতিভা হইতে যে সমস্ত মহত্তম সাম্রাজ্য গঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সমশ্রেণীতে ইহা স্থান পাইতে পারে। এ দিক হইতে দেখিলে সাম্রাজ্য স্থাপন বিষয়ে ভারত যাহা করিয়াছে তাহাতে তাহার গর্ব ও গৌরব বোধ না করিবার কোন কারণ নাই; অথবা অবিবেচনাপ্রসূত এবং দ্রুতভাবে কৃত যে সিদ্ধান্ত তাহার প্রাচীন সভ্যতাতে শক্তিশালী কার্যকরী প্রতিভা বা উচ্চ জাতীয় রাষ্ট্রীয় গুণ ও দক্ষতার অভাব দেখিতে পাইয়াছে, তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

জরুরি প্রয়োজন প্রপূরণজন্য এ সময়ের এই সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতে ব্যস্ততা, জোরজবরদস্তি ও কৃত্রিমতা অবলম্বন করা অপরিহার্য হইয়াছিল, এবং সুবিবেচিত স্থিরসঙ্কল্পিত ও স্বাভাবিকভাবে ভারতের গভীরতম আদর্শ

ও সত্যের অনুসরণে, তাহার নিজস্ব ভাবে ইহা উদ্ভূত ও গঠিত করা সম্ভব হয় নাই, তাই ইহার কুফল এ সাম্রাজ্যকে ভুগিতে হইয়াছে। কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সাধন না করিয়া, তাহাদিগকে ভাঙিগয়া দিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও ভারতীয় নীতি অনুসারে তাহাদের আচার-অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইত, এমন কি প্রথমতঃ তাহাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ-রূপে নষ্ট করা হয় নাই, তবুও তাহাদিগকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের অধীনে আনা হইয়াছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির ছায়ায় ইহারা খাঁটিভাবে বর্ধিত হইতে বা জীবিত থাকিতে পারে নাই. ফলে প্রাচীন ভারতের স্বাধীন জাতিসমূহ অন্তর্হিত হইতে লাগিল. এবং তাহাদের ভগ্নাবস্থার উপাদানসমূহ দ্বারা পরবর্তী কালে ভারতের বর্তমান উপজাতিসমূহ (races) গঠিত হইয়াছে। আমি মনে করি যে মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যদিও দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনগণগঠিত প্রধান প্রধান জাতীয় সমিতিগুলি সজীবভাবে বর্তমান ছিল, তবু অবশেষে তাহাদের কার্যাবলি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন হইতে, এবং তাহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। সহরের সাধারণতন্ত্রসমূহও ক্রমশঃ অধিকতরভাবে শৃঙখলাবদ্ধ রাজ্য বা সাম্রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটিতে মাত্র পরিণত হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণ প্রথা মনের যে অভ্যাস সৃষ্টি করিতেছিল তাহার এবং প্রাচীন কালের অধিকতর গৌরবযুক্ত স্বাধীন সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা বা অন্তর্ধানের ফলে, একপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইল; এই ব্যবধানের একদিকে ছিল শাসিত প্রজাবৃন্দ, যাহারা যে কোন শাসনতন্ত্র তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিত, বা তাহাদের ধর্ম, সাধারণ জীবনযাত্রা এবং আচার-ব্যবহারে অতিরিক্তমাত্রায় হস্তক্ষেপ না করিত সেইরূপ শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে লাগিল, অন্যদিকে রহিল শাসনতন্ত্র, যাহা নিঃসন্দেহভাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনমঙ্গলসাধনরত কিন্তু তাহা প্রাচীন ভারতের খাঁটি রাষ্ট্রীয় মনঃপরিকল্পিত স্বাধীনতা ও সজীবতাযুক্ত জাতির প্রাণধর্মী অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত আর রহিল না। এই কুফল অবনতির সঙেগ স্পষ্ট ও অবশেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ইহার বীজ প্রথম হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, এবং ঐক্যের জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে সে থাকা প্রায় অপরিহার্য ছিল। এই পদ্ধতির সুবিধা এই হইল যে, ইহার ফলে অধিকতর শক্তিশালী ও সুসম্বদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অধিকতরভাবে সুগঠিত সমভাবাপন্ন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইল, কিন্তু বহুবিচিত্র সুগঠিত স্বাধীন জীবন যাহা জনগণের মন ও প্রকৃতির খাঁটি প্রকাশস্বরূপ ছিল, তাহা নষ্ট হওয়াতে যে ক্ষতি হইল, শেষ পর্যন্ত সে ক্ষতির পূরণ আর হইল না।

এ ব্যবস্থার একটা অধিকতর কুফল এই হইল যে ইহাতে ধর্মের উচ্চ আদর্শ হইতে কতকটা পতন দেখা দিল। শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের যুদ্ধে কূটবুদ্ধিযুক্ত রাষ্ট্রপরিচালন-কৌশল প্রয়োগের অভ্যাস প্রাচীন কালের মহত্তর নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিল, আক্রমণাত্মক উচ্চাকাঙ্খার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত পরিমাণে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বাধা রহিল না, রাষ্ট্রীয় ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে জাতীয় মনের নৈতিক বুদ্ধি স্থূল হইয়া পড়িতেছিল, এই স্থূলতা মৌর্য বংশের শাসন সময়ে দণ্ডবিধি বিষয়ে কঠোর আইন প্রণয়নের এবং অশোকের রুধিরলিপ্ত উড়িষ্যাজয়ের পূর্বেই দেখা দিয়াছিল। এই অবনতির দুষ্ট ব্রণ ধর্মবুদ্ধি ও উচ্চ মনীষা দ্বারা কতকটা দমিত ছিল, এবং পরবর্তী এক হাজার বৎসরের মধ্যে পাকিয়া উঠিতে পারে নাই, অবশেষে অবনতির চরম যুগে ইহার পূর্ণ প্রকোপ দেখিতে পাই, যখন অসংযতভাবে পরস্পরকে আক্রমণ, রাজা ও নেতাগণের নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কার্যকরীভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবার শক্তির একান্ত অভাব, সাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমহীনতা এবং শাসনতন্ত্র পরিবর্তন বিষয়ে জনসাধারণের পরম্পরাগত ঔদাসীন্য, এই সুবৃহৎ উপদ্বীপকে সমুদ্রপার হইতে আগত মুষ্টিমেয় বণিকের হাতে তুলিয়া দিল। কিন্তু চরম কুফল যতই বিলম্বিত হউক না কেন, সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব, অত্যুন্নত মানসিক ও কলাকুশলতাযুক্ত সংস্কৃতি এবং বহুধাবৃত্ত আধ্যাত্মিক জাগরণ দ্বারা, ইহা মধ্যে মধ্যে যতই সংশোধিত ও বাধাগ্রস্ত হউক না কেন, গুপ্তবংশীয় শাসনের শেষ সময়ে ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনের খাঁটি মন ও অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক পূর্ণ প্রস্ফুরণের সুযোগ হারাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্ণরূপে সে উদ্দেশ্য প্রতিপালিত না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে তাহার কাজ করিয়াছিল; যখন বর্বর জাতি হইতে অশান্তির প্রবল প্লাবন আসিয়াছিল, যাহার প্রবাহে সমস্ত প্রাচীন স্থায়ী সংস্কৃতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা অবশেষে অত্যুন্নত গ্রীক ও রোমান জাতির মিলিত কৃষ্টি ও বৃহৎ শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যকে ডুবাইয়া দিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল, এই সাম্রাজ্য প্রথা সেই প্লাবন হইতে ভারত-ভূমি ও তাহার সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এই অশান্তি টিউটন, শ্লাভ, হূন ও শক জাতির অতি বৃহৎ বাহিনীসমূহ পশ্চিমে, পূর্বে ও দক্ষিণে প্রেরণ করিয়াছে, এবং ভারতের দ্বারে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া আঘাত হানিয়াছে, কখনও কখনও তাহার ভিতর কিছুদূর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু পুনরায় তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার পর দেখা গিয়াছে ভারতীয় সভ্যতার বৃহৎ সৌধ দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের সহিত নিঃশঙ্কভাবে স্থির ও দণ্ডায়মান আছে। যখনই সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তখনই আক্রমণ আসিয়াছে, এবং যখনই

দেশ কিছুকাল নিরাপদে রহিয়াছে তখনই ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যে প্রয়োজন ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার অভাব হওয়াতে, সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল, কারণ তখন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ভেদজনক গতি ও শক্তি লইয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিল, এবং রাজ্যের ভিতরের ঐক্য বিশ্লিষ্ট করিয়া দিতে থাকিল, এবং সমস্ত উত্তর ভারতের বহু বিস্তৃত রাজ্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। পুনরায় নূতন বিপদ উপস্থিত হইলে, নূতন এক বংশের অধীনে শক্তির পুনরভ্যুদয় হইতেছিল, কিন্তু এরূপ ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল, এবং অবশেষে বিপদ বহুদিন পর্যন্ত না আসাতে, যে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল, এবং আর তাহার পুনরুজ্জীবনের আশা রহিল না। এ সাম্রাজ্যের অবসান সময়ে দক্ষিণে, পূর্বে ও মধ্য প্রদেশে কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল জনপুঞ্জ রহিয়া গেল; উত্তর-পশ্চিমের এই দুর্বল প্রদেশে মুসলমানগণ আসিয়া হানা দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতে এক প্রাচীন সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত করিল বটে, কিন্তু এই নূতন সাম্রাজ্যের প্রকৃতি অন্যরূপ, ইহা হইল মধ্য এশিয়ার বিশেষত্বযুক্ত।

প্রথম কালের এই সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণ এবং তাহাদের ফল আমাদিগকে খাঁটিভাবে দেখিতে হইবে। প্রাচ্য বিষয়ের গবেষকগণ অনেক সময় অতিরঞ্জিত মতবাদ দ্বারা প্রকৃতভাবে দেখার বাধা জন্মাইয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ছিল গ্রীক সভ্যতা ও প্রকৃতির পূর্বদিকের আবেগময় এক অভিযান, তাহার পক্ষে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াতে করিবার মত কার্য ছিল, কিন্তু ভারতে তাহার কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা উন্মূলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল এবং কোন চিহ্ন রাখিয়া গেল না। মৌর্য বংশের রাজত্বের শেষ কালের দুর্বলতার সময় যাহারা গ্রীক ভাবাপন্ন ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারা পূর্ব হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত ছিল, ইহারাও পুনরুজ্জীবিত ভারত সাম্রাজ্যের শক্তিবলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী কালের হূন, পল্‌হব ও শক আক্রমণ ইহাপেক্ষা গুরুতর প্রকৃতির ছিল, এবং কিছুদিনের জন্য ইহা ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ইহা প্রবলভাবে কেবল পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যদিও তাহাদের আক্রমণের তরঙ্গ পশ্চিম উপকূলের মধ্য দিয়া আরও দক্ষিণে পৌঁছিয়াছিল, এবং কয়েকটি বৈদেশিক রাজবংশ হয়ত কিছুদিনের জন্য বহু দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই সমস্ত স্থানের জাতীয় প্রকৃতি কতটা প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত হয় নাই। প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ এবং জাতিতত্ত্ববিদগণ অনুমান করিয়াছেন যে, পাঞ্জাব শক জাতি দ্বারা পরিপ্লাবিত

হইয়াছিল, রাজপুতগণ ও এই শকগণ একই জাতিভুক্ত, আর তাহাদের আক্রমণের ফলে সুদূর দক্ষিণ দেশেও জাতিগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত অনুমানের অতি অল্প প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে, অথবা কোন প্রমাণ দ্বারাই ইহা সমর্থিত হয় নাই এবং অন্য অনেক মতবাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। এত বড় ফল উৎপাদন করিতে যত বেশী পরিমাণে লোক আসিবার কথা অসভ্য আক্রমণকারীগণের সংখ্যা কখনই তত বেশী হইয়াছিল কিনা, তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। ইহা আরও এইজন্য অসম্ভব মনে হয় এই তথ্যের জন্য যে, এক দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে আক্রমণকারীগণ পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল, সম্পূর্ণভাবে ভারতের ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের উচ্চতর সভ্যতার উপর অসভ্য জাতিসমূহ যেমন তাহাদের আইন-কানুন, রাষ্ট্রীয়পদ্ধতি, বর্বরোচিত আচার-ব্যবহার এবং প্রতিকূল বৈদেশিক শাসন স্থাপিত করিয়াছিল, ভারতে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এই সমস্ত আক্রমণের মধ্যে সাধারণভাবে এই অর্থযুক্ত তথ্য দেখা যায় যে, নিশ্চিত ইহা তিনটি কারণের কোন একটির অথবা সকলের জন্য ঘটিয়াছিল। প্রথম কারণ হয়ত আক্রমণকারীগণ জাতিগত হিসাবে আসে নাই, সৈন্যদল রূপে আসিয়াছিল; দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক অধিকার ও শাসন একাদিক্রমে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এজন্য তাহাদের নিজপ্রকৃতির ছাপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার সময় পায় নাই, কেননা প্রত্যেক আক্রমণের পরই ভারত সাম্রাজ্যের শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং বিজিত প্রদেশ পুনরধিকার করিয়াছিল; শেষ কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির সতেজ ও সজীব প্রকৃতি এবং বহিরাগত পদার্থকে পরিপাক করিয়া নিজভাবে পরিণত করিবার শক্তিতে বাধা দেওয়ার মত মানসিক বল আক্রমণকারীগণের ছিল না। অন্ততঃপক্ষে ইহা বলা চলে যে যদি এই সমস্ত আক্রমণ প্রভূত পরিমাণে আসিয়া থাকে, তবে ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষাকৃত তরুণ গ্রীস ও রোমের মিলিত সভ্যতা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে খাঁটি, সজীব ও দৃঢ় ছিল তাহা প্রমাণিত করিয়াছে, কারণ টিউটন ও আরবগণের অনুরূপভাবের আক্রমণে মিলিত গ্রীক ও রোমক জাতি পরাজিত হইয়াছিল, এবং নিম্নে থাকিয়া কোন মতে বাঁচিয়াছিল, বর্বরতার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হইয়া এমনই হীন অবস্থায় পড়িয়াছিল যে, তাহাদিগকে আর পূর্বের সে জাতি বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। রোমক সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের গর্ব যত বেশী থাকুক না কেন, ভারত সাম্রাজ্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দক্ষ ও কার্যকরী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে; কারণ পশ্চিম দিকে বিদ্ধ হইলেও ইহা এ উপদ্বীপের বিশাল জনগণকে নিরাপদে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আরবগণ কর্তৃক আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার বহু পরে মুসলমানগণের পুনরাক্রমণ সফল হইয়াছিল, এবং এই পরবর্তীকালের পতনের পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহা প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া রাখিয়াছে এরূপ কতগুলি ভুল ধারণা প্রথমে দূর করা যাক। দুই হাজার বৎসরব্যাপী কর্মপরায়ণতা ও সৃষ্টিকার্যের পর যখন প্রাচীন ভারতের প্রাণশক্তি ও সংস্কৃতি পরিক্লান্ত অথবা প্রায় অবসন্ন হইয়াছিল, এবং সংস্কৃত হইতে ভাবধারা জনসাধারণের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া, নিজেকে এবং নূতনভাবে গঠনশীল স্থানীয় জনগণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় চাহিতেছিল, সেই সময়ে এই পরাজয় ঘটিয়াছিল। এই মুসলমান বিজয় উত্তর ভারতে শীঘ্র বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকিলেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু দক্ষিণ দেশ যেমন পূর্বেকার দেশীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল, তদ্রূপভাবে মুসলমান কর্তৃক উত্তর ভারত জয়ের পরও অনেক দিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এবং বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হইতেও বেশী সময় লাগে নাই। রাজপুতগণ আকবর ও তাহার উত্তরাধিকারী-গণের সময় পর্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এবং অবশেষে যে সমস্ত রাজপুত জাতীয় রাজা সেনানায়ক ও মন্ত্রী রূপে গৃহীত হইয়াছিল, অংশত তাহাদের সাহায্যে মোগল সম্রাটগণ পূর্ব ও দক্ষিণ দেশ জয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। আবার এতটা সম্ভব হইবার কারণ এই যে, মুসলমান রাজত্ব অতি শীঘ্র আর বৈদেশিক শাসন রহিল না—এই কথাটি কিন্তু প্রায়ই লোকে ভুলিয়া যায়। এ দেশের বিশাল মুসলমান সমাজ জাতি হিসাবে ভারতীয় ছিল বা আছে; ইহাদের মধ্যে পাঠান তুর্কী বা মোগল রক্তের সামান্য মিশ্রণ মাত্র ঘটিয়াছে। এমন কি বিদেশাগত রাজা ও ওমরাহগণ মনে প্রাণে ও স্বার্থবুদ্ধিতে প্রায় অবিলম্বে সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। কতকগুলি ইউরোপীয় দেশ যেমন বহুশতাব্দী পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীনভাবে বৈদেশিক শাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, এ জাতি যদি সেরূপ করিত, তবে তাহা তাহাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার পরিচায়ক হইত; কিন্তু খাঁটিভাবে দেখিলে ইংরাজ শাসনই ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী প্রথম বৈদেশিক শাসন। মধ্য এসিয়া হইতে আগত ধর্ম ও সংস্কৃতি এ প্রাচীন সভ্যতাকে নিজের অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু নিজের গুরুভারে ইহাকে অবনত ও আবৃত করিয়াছে, কিন্তু সে চাপেও এ সংস্কৃতি মরে নাই, নানা দিক হইতে বিজয়ী শক্তি ইহার উপর আঘাত দিয়াছে, তবু আমাদের সময় পর্যন্ত ইহা অবনতি সত্ত্বেও সজীব রহিয়াছে, পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবার সামর্থ্য হারায় নাই; এইভাবে ইহা শক্তি ও দৃঢ়তার যে পরিচয় দিয়াছে তাহা জগতে মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে

অতি বিরল। আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইহা নিপুণ শাসক, রাজনীতিবিদ, সেনাধ্যক্ষ, রাজকার্য পরিচালক উদ্ভূত করিতে কখনও বিরত হয় নাই; অবনতির যুগে ইহার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা এরূপ পর্যাপ্ত ছিল না, এমন সংহত এবং দৃষ্টি ও কর্মে এমন তৎপর ছিল না, যাহাতে পাঠান, মোগল অথবা ইউরোপীয় আক্রমণ বিফল করিতে পারে, কিন্তু ইহা বাঁচিয়া থাকিবার এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রত্যেক সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল; ইহা রাণা সঙ্গের অধীনে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সাহসের সহিত প্রয়াস পাইয়াছে, বিজয়নগরের মত বৃহৎ শক্তিশালী রাজত্ব স্থাপিত করিয়াছে, রাজপুতনার পাহাড়গুলির মধ্যে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে বহু শতাব্দী পর্যন্ত নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে, এবং ইহার অবনতির চরম সময়েও দক্ষতম মোগল সম্রাটের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শিবাজীর রাজ্য গঠন ও রক্ষা করিয়াছে, মারাঠাদের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সংঘ এবং শিখ-খালসা স্থাপন করিয়াছে, বৃহৎ মোগল সাম্রাজ্যসৌধের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এবং পুনরায় একটি সাম্রাজ্য গঠনেব শেষ চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে চরম ও প্রায় মারাত্মক ধ্বংসের তীরে দাঁড়াইয়া বর্ণনাতীত অন্ধকার, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার ভিতর হইতেও রণজিৎ সিংহ, নানা ফড়নবিশ ও মাধোজি সিন্ধিয়ার জন্ম দিতে পারিয়াছে এবং ইংলন্ডের ভাগ্যলক্ষ্মীর অবশ্যম্ভাবী জয়যাত্রার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খাঁটিভাবে বুঝিবার ও সমাধান করিবার অথবা অদৃষ্টের যে এক প্রশ্ন তাহার কাছে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উত্তর দিবার অসামর্থ্যের যে অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনা হয়, এ সমস্ত ঘটনা তাহার গুরুত্ব লাঘব করে না ইহা সত্য, কিন্তু অবনতির যুগের ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে যথেষ্ট আশ্চর্যজনক বোধ হইবে, অনুরূপ অবস্থায় ইহার তুলনা মিলে না; ভারতবর্ষ সর্বদাই পরাধীন, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অক্ষম, স্থূল ভাবে এই যে কথা বলা হয় উপরোক্ত ঘটনাবলির আলোকে দেখিলে তাহা সমগ্ররূপে নিশ্চয়ই অন্য আকার ধারণ করিবে।

মুসলমান বিজয়ের ফলে যে প্রকৃত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈদেশিক শাসনের অধীন হওয়া এবং স্বাধীনতা পুনরায় লাভ করিবার সমস্যা নহে; সমস্যা ছিল দুইটি সভ্যতার ভিতর বিরোধ; এ দুইটির একটি প্রাচীন ও দেশজ অপরটি মধ্যযুগীয় ও বহিরাগত। এ দু-এর মধ্যে প্রত্যেক সভ্যতার একটি শক্তিশালী ধর্মের দিকে প্রবল অনুরাগ থাকার জন্য সমস্যাটি অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার একটি যুদ্ধপ্রিয় ও আক্রমণশীল, অপরটি পরমত-সহিষ্ণু ও নমনীয় বটে, কিন্তু নিজ মত সাধনায় একান্তভাবে অনুরক্ত, এবং সমাজব্যবস্থার একটি প্রাচীরের পশ্চাতে থাকিয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত। দুইভাবে ইহার সমাধান কল্পনা করা যায়; এ দুইটিকে সমন্বিত করিতে পারে এমন

একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবিষ্কার, এবং তাহার রূপ দান, অথবা যাহা ধর্মের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে একত্র করিতে পারে এমন এক রাষ্ট্রীয় স্বদেশপ্রেমের অভ্যুদয়। সে যুগে প্রথমটি অসম্ভব ছিল। মুসলমানের দিক হইতে আকবর ইহা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম আধ্যাত্মিকতা হইতে প্রসূত না হইয়া বিচারবুদ্ধি ও রাজনীতি হইতে জাত হইয়াছিল, এবং তাহার পক্ষে দুই সম্প্রদায়ের প্রবল ধর্মানুরাগী মনের সম্মতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা কখনই ছিল না। হিন্দুর দিক হইতে নানক ইহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম মতানুসারে সর্বজনীন হইলেও, কার্যতঃ একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। আকবর সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বদেশানুরাগ গঠনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা যে সফল হইতে পারে না তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকের মধ্যে একযোগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কর্ম করিবার সামর্থ্য ও একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন বা পরিচালনা করিবার জন্য যে শক্তি ও প্রকৃতির প্রয়োজন, মধ্য এসিয়ার প্রকৃতি ও মত অনুসারে গঠিত স্বেচ্ছা-তান্ত্রিক সাম্রাজ্য তাহা সৃষ্টি করিতে পারে না; ইহার জন্য জনসাধারণের সজীব সম্মতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শের জাগরণের ও তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের অভাবে সে সম্মতি নিষ্ক্রিয় ছিল। মোগল সাম্রাজ্য একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল, এবং ইহার গঠন ও রক্ষণের জন্য প্রভূত রাষ্ট্রীয় প্রতিভা ও মনীষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। মধ্যযুগের অথবা সমসাময়িক কোন ইউরোপীয় রাজ্য বা সাম্রাজ্য যতটা গৌরবোজ্জ্বল, শক্তিশালী ও লোকহিত-সাধনে রত ছিল, মোগল সাম্রাজ্য তাহাদের কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই সঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতাযুক্ত প্রবল আগ্রহ ও সক্রিয়তা সত্ত্বেও ধর্মবিষয়ে এই সমস্ত ইউরোপীয় দেশ হইতে ইহা অনন্তগুণে উদার ও পরমতসহিষ্ণু ছিল। এ সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে ভারতবর্ষ সামরিক ও রাষ্ট্রিক শক্তিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে এবং কলাবিদ্যা ও সংস্কৃতির গৌরবে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ইহা পূর্বের সাম্রাজ্যগুলির ন্যায় বরং তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় রূপে সেই একই ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—ভাঙ্গিবার কারণ বহিরাক্রমণ নয়, কিন্তু বিশ্লিষ্ট বা বিভক্ত হইয়া পড়িবার অন্তর্জাত প্রবৃত্তি। সামরিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে শাসন পরিচালনাকারী কোন সাম্রাজ্য ভারতে সজীবভাবে রাষ্ট্রীয় একত্ব আনিতে পারিত না। আর যদিও প্রদেশগুলির মধ্যে একটি নূতন জীবনের উদ্ভব হইতেছিল বলিয়া বোধ হয়, তথাপি ইউরোপীয় জাতির আক্রমণের ফলে তাহা নষ্ট হইয়া গেল, পেশোয়াগণের বিফলতা এবং পরবর্তী কালে যে অরাজকতা, যে অবনতি ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যে ঘোর বিশৃঙ্খলা

উপস্থিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবার যুগে পুরাতনের ছাঁচে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মনের পক্ষে নূতন জীবনের ভিত্তি স্থাপনের শেষ প্রচেষ্টার ফলে দুইটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখা যায়, কিন্তু ইহার কোনটিই এরূপ হয় নাই যাহাতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে। রামদাসের মহারাষ্ট্র ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শিবাজী কর্তৃক মারাঠা জাতির পুনরুজ্জীবনের যে রূপদান করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন যুগের প্রকৃতি ও রূপের যতদূর পর্যন্ত তখনও বুঝিতে পারা বা স্মরণে রাখা গিয়াছিল, তাহা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু অতীতের পুনরুদ্বোধনের সকল চেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য ছিল, এ চেষ্টাও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ইহার আরম্ভকালীন গণতান্ত্রিক শক্তিসকলের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তেমনি বিফল হইয়া গেল। পেশোয়াগণের প্রভূত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এ শক্তির প্রতিষ্ঠাতার মত দূরদৃষ্টি ছিল না, এবং তাহারা কেবল সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের একটি সমবায় বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সংঘ মাত্র গঠন করিতে পারিয়াছিল; তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ যে স্বদেশানুরাগ দ্বারা তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা ছিল প্রাদেশিক, তাহা নিজ সীমার বাহিরে ব্যাপ্ত হয় নাই, এবং সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জীবন্ত আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে শিখ-খাল্‌সা একটি অত্যাশ্চর্য মৌলিক ও নূতন সৃষ্টি, তাহার দৃষ্টি অতীতের দিকে নহে, ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত ছিল। ইহার অনন্যসাধারণ ধর্মগুরু এবং গণতান্ত্রিক প্রকৃতি ও গঠন যেমন ছিল, তেমনি ইহার প্রথম আরম্ভ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে হইয়াছিল, ইসলাম ধর্ম ও বেদান্তের গভীরতম উপাদানসমূহের মিলনের চেষ্টা ইহাতেই প্রথমে করা হইয়াছিল, তবুও ইহাতে মানবসমাজের তৃতীয় বা আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছিবার চেষ্টা অকালে করা হইয়াছিল, কারণ, যাহা আত্মা ও বাহ্যজীবনের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কার্য করিতে পারে তেমন সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিসমর্থ, চিন্তা ও সংস্কৃতির শক্তিসঞ্চারসমর্থ কোন মাধ্যম (medium) ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এইভাবে বাধা পাওয়ায় ও অপূর্ণ থাকায় ইহা স্থানীয় সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কার্য আরম্ভ ও শেষ করিয়াছে, ইহা গভীরতা লাভ করিয়াছিল কিন্তু বিস্তারলাভের শক্তি পায় নাই। এ বিষয়ে চেষ্টা সফল হইতে পারে এরূপ অবস্থা তখনকার দিনে আসে নাই।

ইহার পর রাত্রি আসিল এবং সাময়িকভাবে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যারম্ভ ও নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষে পশ্চিমের আদর্শ ও রূপের বিশ্বস্তভাবে দাসবৎ অনুকরণ ও অনুসরণের যে নির্জীব প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় মন ও প্রতিভার খাঁটি পরিচায়ক

নহে। কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সমস্ত কুয়াশার মধ্য হইতে পুনরায় একটি নূতন আলোক-বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; ইহা সন্ধ্যার পূর্ববর্তী প্রদোষালোক নহে, কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত ঊষার নূতন আলোক। যুগ যুগান্তরের ভারত মরে নাই অথবা তাহার সৃষ্টিশক্তির শেষ কথা বলে নাই; সে এখনও বাঁচিয়া আছে এবং তাহার নিজের ও সমস্ত জগতের জন্য এখনও তাহার কিছু করিবার আছে। যে জাতিকে এখন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে হইবে, তাহা ইংরাজীভাবাপন্ন, পাশ্চাত্যের বশীভূত, শিষ্যস্থানীয়, পশ্চিমদেশীয় সফলতা ও বিফলতার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরিতে বাধ্য এক প্রাচ্য জাতি নহে, কিন্তু তাহা স্মরণাতীতকালাগত এক প্রাচীন শক্তি, যাহা তাহার গভীরতম আত্মাকে পুনর্লাভ করিতে, আলোক ও শক্তির চরম ও পরম উৎপত্তিস্থানের দিকে তাহার মস্তক আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতে, এবং তাহার ধর্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ও বৃহত্তর রূপ আবিষ্কার করিবার দিকে ফিরিতে চাহিতেছে।

পরিশিষ্ট

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বহিঃপ্রভাব

ভারতীয় সভ্যতা ও তাহার নবজাগরণের কথা আলোচনা করিবার সময় আমি বলিয়াছি যে, সকল ক্ষেত্রেই আমাদিগকে প্রবলভাবে নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই আমাদের বৃহৎ প্রয়োজন, নবজাগরণের অর্থ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা। ভারত আধুনিক কালের জীবন ও ভাবনার প্রবল বন্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহা তাহার প্রায় বিপরীত অথবা অন্ততঃপক্ষে যাহা ভিন্নজাতীয় প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত তেমন এক প্রবল শক্তিশালী সভ্যতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র উপায় তাহার নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শের ছাঁচে ঢালিয়া, তাহার নিজস্ব প্রকৃতির উপযোগী নূতন দিব্যতর সৃষ্টিসমূহ সঙ্গে লইয়া, এই অর্বাচীন নবীন আক্রমণশীল ও শক্তিশালী জগতের সম্মুখীন হওয়া। এই আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার নিজের বৃহত্তর সমস্যাবলির সমাধান তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে, এ সমস্ত সমস্যা সে এড়াইতে পারে না—এমন কি এড়াইয়া যাওয়া কাম্য হইলেও,—আর সে সমাধান তাহার নিজস্ব পথে প্রাপ্ত তাহার নিজ সত্তা হইতে উত্থিত, তাহার নিজের গভীরতম ও বৃহত্তম জ্ঞান হইতে লব্ধ হওয়া চাই। এই উপলক্ষে পশ্চিম হইতে যে কিছু জ্ঞান, ভাব, শক্তি সে পরিপাক করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে পারে, তাহার প্রকৃতির যাহা উপযোগী, তাহার আদর্শের সহিত যাহার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জীবনের নবরূপায়ণের পক্ষে যাহা হিতকর, আমি বলিয়াছি—তাহা গ্রহণ ও আত্মস্থ করিয়া তাহার নিজের অঙ্গীভূত করা উচিত। অন্তর হইতে নূতন সৃষ্টির সঙ্গে বহিঃপ্রভাবের এই সম্বন্ধের প্রশ্ন একটা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়; আনুষঙ্গিকভাবে তাহা শুধু উল্লেখ করিয়া যাওয়াই যথেষ্ট নহে। আমরা গ্রহণ বলিতে কি বুঝি এবং পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিবার বাস্তব ফল কি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা গঠিত করা বিশেষ প্রয়োজন; কেননা এই সমস্যা এমন গুরুতরভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সমাধানের জন্য আমাদের স্পষ্ট ধারণা গঠন করিতে এবং বুঝিয়া শুনিয়া দৃঢ়ভাবে স্থির করিতে হইবে।

কিন্তু এ মত পোষণ করা যাইতে পারে যে যখন নবসৃষ্টি—পুরাতন রূপে

নিশ্চল ভাবে অবরুদ্ধ থাকা নহে—জীবনের একমাত্র পন্থা এবং পরিত্রাণের উপায়, তখন পাশ্চাত্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে; আমাদের নিজসত্তার মধ্যে একটা ভাঙ্গন না ধরাইয়া আমরা বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে কিছু গ্রহণ করিতে পারি না, আর তাহা করিতে গেলে সেই ভাঙ্গনের পথে পাশ্চাত্যের বাকি সব কিছু প্লাবনের ধারায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইবে। আমি যদি ভুল না বুঝিয়া থাকি, তবে তাহাই এই সমস্ত প্রবন্ধের উপর বাংলার এক সাহিত্যিক পত্রিকার* মন্তব্য, এ পত্রিকা এই আদর্শ পোষণ করে যে, এক নবসৃষ্টি জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী ভাবে জাতীয় ধারায় সম্পূর্ণ রূপে ভিতর হইতে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। লেখক এখানে যে ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন তাহা সাধারণ, তিনি বলেন মানবতা এক বটে কিন্তু বিভিন্ন জাতিগুলি সেই এক সাধারণ মানবতার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট আত্মরূপরাজি। যখন আমরা একত্ব দেখি তখন কোন জাতির বৈশিষ্ট্যজনক তত্ত্ব নষ্ট হয় না, বরং তাহার সমর্থন দেখিতে পাই; আমাদিগকে, আমাদের বিশিষ্ট শক্তি ও প্রকৃতিকে মুছিয়া ফেলিয়া আমরা জীবন্ত একত্ব লাভ করি না, বরং সেই বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করিয়া এবং স্বাতন্ত্র্য ও কর্মে তাহাকে উচ্চতম সম্ভাবনাতে উন্নীত করিয়া, সেই প্রাণবন্ত ঐক্যে আমরা পৌঁছিতে পারি। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক প্রকার রাষ্ট্রিক একত্ব প্রতিষ্ঠার যে ধারণা ও প্রচেষ্টা বর্তমান কালে দেখা দিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যেমন সামাজিক জীবনের পরিণতির আন্তর চেতনাগত বোধের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে, তেমনি কোন বিশিষ্ট জাতির জীবন ও সংস্কৃতির সকল অঙ্গ ও অভিব্যক্তির বিষয় রূপে, এই সত্যের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ জোরের সহিতই আমিও করিয়াছি। আমি নির্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিয়াছি যে সমরূপতা সজীব ও সত্য একত্ব নহে, তাহা এক মৃত একত্ব; সমরূপতা জীবন ধ্বংস করে, পক্ষান্তরে সত্য-একত্ব যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার মধ্যস্থিত শক্তির সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের ফলে, তাহা প্রাণবান সরল ও কার্যকরী হয়। কিন্তু লেখক এই সত্যের সঙ্গে আর একটা বিচারধারা যুক্ত করিয়াছেন, তাহা এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যস্থিত অত্যুত্তম বস্তু গ্রহণের চেষ্টাও একটা মিথ্যা ধারণা। তাহার জীবন্ত কোন সার্থকতা নাই; মন্দকে ত্যাগ করিয়া ভালকে গ্রহণ শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু এই মন্দ ও এই ভাল, এভাবে ইহাদিগকে পৃথক করা যায় না; তাহারা একই সত্তার পরিণতির সঙ্গে এমন জটিল ভাবে মিলিত যে, তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না, তাহা বিভিন্ন খন্ড পাশাপাশি রাখিয়া প্রস্তুত শিশুর খেলাঘরের মত সহজে যাহা বিযুক্ত করা যায় তেমন অংশসকলে গঠিত বস্তু নয়—তাহা

* শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত নারায়ণ।

হইলে তাহার কোন অংশকে কাটিয়া বাহির ও গ্রহণ এবং বাকি সব কিছুকে ত্যাগ করিবার অর্থ কি? যখন আমরা পাশ্চাত্য কোন আদর্শ গ্রহণ করি, যখন তাহার জীবন্ত যে রূপ আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে, আমরা তাহা গ্রহণ এবং সেই রূপের অনুকরণ করি, এবং তাহার প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির অধীন হইয়া পড়ি, তখন যাহাতে ভাল ও মন্দ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত ও গ্রথিত হইয়া আছে, সেই জীবন্ত পরিণত বস্তু আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, এবং তন্মধ্যস্থ ভাল ও মন্দ একযোগে আমাদিগকে অধিকার করে। বস্তুতঃ বহুদিন পর্যন্ত আমরা এই ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করিয়া আসিতেছি, তাহার অথবা তাহার অংশের মত হইতে চেষ্টা করিতেছি, আর সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা তাহাতে অকৃতকার্য হইয়াছি; কেননা কৃতকার্য হইলে যে সংস্কৃতি দেখা দিত তাহা হইত জারজ বা দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু ইংরেজ কবি টেনিসন তাহার লুক্রেসিয়াসের (Lucretius) মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর কোন স্বাভাবিক প্রকৃতি নাই, তাহা জারজ বা ভেজাল ও কৃত্রিম বস্তু, তাহা সত্যের মধ্যে অবস্থিত সুস্থ সংস্কৃতি নহে। পরিপূর্ণরূপে নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসাই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

আমার মনে হয়, এ মত সমর্থন ও কতকটা পরিবর্তনের জন্য এখানে অনেক কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত বাক্যাবলির তাৎপর্য কি তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে চেষ্টা করা যাক। গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিয়া আমাদের নিজেদিগকে পিঙ্গল বর্ণের এক প্রকার ইংরেজে পরিণত করিবার, আমাদের নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পশ্চিমের তক্‌মা বা সাধারণ পরিচ্ছদে (uniform) ভূষিত হইবার এক চেষ্টা চলিয়াছিল, এবং কোন কোন দিকে সে চেষ্টা এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু সে চেষ্টা যে ভ্রান্তিপূর্ণ ও অসঙ্গত ছিল, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ এক মত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, সে অবস্থায় কতকটা অনুকরণ— এমন কি বলা যাইতে পারে যে বৃহৎভাবে অনুকরণ—তখনকার পরিবেশে জীববিজ্ঞানসম্মত প্রয়োজন (biological necessity) ছিল, অন্ততঃপক্ষে মনস্তত্ত্বের দিক হইতে যে প্রয়োজন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন কোন নিম্নতর সংস্কৃতি উচ্চতরের সংস্পর্শে আসে কেবল তখন নয়, যখন কোন সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃতভাবে নিষ্ক্রিয় নিদ্রিত বা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, আরও বিশেষতঃ যদি সে জাগ্রত সক্রিয় প্রবলভাবে সৃষ্টিশীল কোন সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়, এবং তাহার সাক্ষাৎ সংঘাত গ্রহণ করে, যখন দেখে যে সে এক নবীন ও সফল শক্তি ও ক্রিয়াধারার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যখন সে বুঝে যে নূতন ভাবধারা ও রূপায়ণসমূহের পরম্পরা প্রবল ভাবে গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তখন সে জীবনের সহজ প্রবৃত্তিবশেই এই সমস্ত ভাব ও রূপ গ্রহণ

করে, তাহাদিগকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করে, এমন কি তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে এবং নিজের মধ্যে তাহার প্রতিরূপ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে, এবং কোন না কোন উপায়ে এই সমস্ত নূতন শক্তি ও সুযোগকে ভাল ভাবে বুঝিতে ও কাজে লাগাইতে চায়। জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অধিক বা অল্পমাত্রায় অংশতঃ বা সমগ্রভাবে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। কিন্তু অনুকরণ যদি শুধু যান্ত্রিক প্রকৃতির হয়, যদি অধীনতা ও দাসত্ব আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় বা দুর্বলতর সে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে, আক্রমণকারী অতিকায় দানব তাহাকে গিলিয়া ফেলে। যদি ততটা নাও ঘটে, তবু এই সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তুর উপর দুর্বল সংস্কৃতি যে পরিমাণে হেলিয়া পড়ে, সেই পরিমাণে তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বহিরাগত বস্তুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাহার চেষ্টা বিফল হয়, তাহা ছাড়া নিজের আত্মশক্তি হারাইয়া বসে। নিজের জীবনের হারাইয়া যাওয়া কেন্দ্রকে ফিরিয়া পাওয়া, এবং নিজ জীবনের ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা নিজের শক্তি ও প্রতিভায় করাই যে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কিছু নূতন রূপ স্বীকার ও গ্রহণ—কিছু অনুকরণও—যদি সকল প্রকার অনুরূপ রূপ গ্রহণকে অনুকরণ বলা যায়—অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাহিত্যে অন্যান্য অনেক বস্তু গ্রহণের মধ্যে নভেল, ছোট গল্প ও সমালোচনামূলক রচনা-পদ্ধতিকে আমরা দত্তক রূপে গ্রহণ করিয়াছি, বিজ্ঞানে কেবল নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলি নহে, কিন্তু তাহার পদ্ধতি ও ব্যাপ্তিমূলক অনুসন্ধানের (inductive research-এর) প্রণালীও গৃহীত হইয়াছে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্র, বক্তৃতামঞ্চ, রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ও অভ্যাস, জনসমিতি প্রভৃতির স্থান দিয়াছি। আধুনিক কালের এই সমস্তকে বিদেশ হইতে আমদানী বস্তু বলিয়া বর্জন বা নির্বাসন করিতে প্রস্তুত কোন লোক বাস্তবিক আছেন বলিয়া আমি মনে করি না—যদিও ইহাদের মধ্যে সকল গুণই অমিশ্র মঙ্গল উৎপাদক হয় নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইহাদের লইয়া আমরা কি করিব, আমরা ইহাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক সাধনযন্ত্রে পরিণত করিতে, আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ভাবে পরিবর্তন করিয়া নিজ প্রকৃতির ছাঁচে তাহাদিগকে ঢালাই করিতে পারিব কিনা? যদি তাহা সম্ভব হয় তাহা হইলে বুঝিব, তাহা খাঁটিভাবে গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিতে পারিলাম, আর তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে বলিতে হইবে অসহায়ভাবে কেবল অনুকরণমাত্র করা হইয়াছে।

কিন্তু বাহিরের কোন রূপকে গ্রহণ করাটাই সমস্যার প্রধান বিষয় নহে। যখন আমি গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিবার কথা বলিতেছি, তখন ভাবিতেছি ইউরোপ যাহা বৃহৎ সজীব শক্তির সহিত আনিয়া উপস্থিত

করিয়াছে, এমন কতকগুলি প্রভাব ভাবধারা ও শক্তির কথা, যাহারা আমাদের সংস্কৃতিগত ক্রিয়াবলি এবং সংস্কৃতিগত সত্তাকে জাগাইতে ও সমৃদ্ধ করিতে পারে, আর তাহা পারে যদি আমরা বিজয়ী শক্তি ও মৌলিকতার সহিত সেগুলিকে ব্যবহার করিতে পারি, যদি আমরা আমাদের বিশিষ্ট জীবনধারার অনুগত করিয়া আমাদের সত্তার গঠনক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারি। বস্তুতঃ আমাদের পূর্বপুরুষগণ বহিরাগত যে জ্ঞান ও শিল্পব্যঞ্জনাকে গ্রহণের উপযুক্ত বা ভারতীয় ভাবধারা গ্রহণে সমর্থ বিবেচনা করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক এই ব্যবস্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা নিজেদের মৌলিকতা মুছিয়া ফেলেন নাই, নিজেদের অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দেন নাই, কেননা তাঁহারা সর্বদা ভিতর হইতে সজীব ও সতেজ ভাবে সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি মন্দকে বর্জন করিয়া ভালকে গ্রহণ করিবার সূত্র একটি অপরিপক্ক সমাধান বলিয়া অবশ্যই মনে করি, বহিরঙ্গ মন যাহা সহজসাধ্য মনে করিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে চায় ইহা তেমন সূত্রগুলির মধ্যে একটি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সুস্থ মনের পরিচায়ক নহে। ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা কোন কিছু গ্রহণ করি, তবে তাহার মধ্যস্থ ভাল ও মন্দ উভয়ই এলোমেলো ভাবে একত্রে আসিয়া পড়িবে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, যাহা ভীষণ ও বিকটাকার এবং মানুষকে জোর করিয়া চালিত করে, সেই বিরাট আসুরিক সৃষ্টি ইউরোপীয় শ্রমশিল্পবাদকে (industrialism) যদি আমরা জাতীয় জীবনে স্থান দিতে চাই, তাহার রূপে বা তত্ত্বে যে ভাবেই গ্রহণ করি না কেন—দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ঘটনাচক্রে তাহা করিতে বাধ্য হইতেছি—তবে তাহা দ্বারা অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও অর্থনৈতিক সংস্থান হয়ত বাড়াইতে পারিব, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, সামাজিক বিরোধ ও সংঘর্ষ, নৈতিক ব্যাধি ও নিষ্ঠুর সমস্যাসমূহও সেই সঙ্গে আসিয়া পড়িবে, এবং জীবনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের কৃতদাস হওয়া ও আমাদের সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হারাইয়া বসা কিরূপে যে পরিহার করিব তাহা বুঝিতেছি না।

কিন্তু, তাহা ছাড়া এই সম্পর্কে ভাল ও মন্দ শব্দ দুইটির কোন নির্দিষ্ট অর্থ খুঁজিয়া পাই না, তাহারা আমাদিগকে সাহায্য করে না। নীতির নয়, জীবনের সঙ্গে জীবনের বিনিময়ের ক্ষেত্রে, যেখানে কেবল একটা আপেক্ষিক তাৎপর্য আছে, সেখানে যদি এই দুই শব্দ ব্যবহার আমাকে করিতে হয়, তাহা হইলে আমি এই সাধারণ অর্থে তাহা করিব যে, যাহা কিছু আমার নিজেকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে আরও মহৎ রূপে পাইতে সাহায্য করে, যাহাতে আমার আত্ম-প্রকাশক বিসৃষ্টির বৃহত্তর ও গভীরতর সম্ভাবনা আছে তাহাই ভাল; আর যাহা কিছু আমার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে আমাকে বিচ্যুত করে, যাহা

কিছু আমার শক্তি ঐশ্বর্য আমার আত্মসত্তার বিস্তার ও উচ্চতাকে হীনতর বা ন্যূনতর করে, তাহাই আমার পক্ষে মন্দ। উভয়ের ভেদ যদি এই ভাবে বুঝা যায় তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, যে সব কিছু বুঝিতে চায় এমন বিচারপরায়ণ চিন্তাশীল মনের কাছে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, বাহ্যিক খুঁটিনাটি দেখাই মূল কথা নয়—তাহার মূল্য শুধু এই যে, সে অন্য কোন কিছুর চিহ্ন মাত্র, উদাহরণ, বিধবা বিবাহ—আসল বিষয় হইল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, সাম্য, গণতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বাহ্য জীবনের ক্ষেত্রের বৃহৎভাবে কার্যকরী ভাবধারা সকলের ব্যবহার। আমি যদি এই সমস্ত ভাবধারার কোনটি গ্রহণ করি তাহার অর্থ ইহা নহে যে, তাহা আধুনিক বা ইউরোপীয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, কেবল তাহাই সে ভাবের সুপারিশপত্র নহে, আমি যে গ্রহণ করিতে চাই তাহার কারণ এই যে, তাহা মানবের সাধারণ গুণ, তাহা আমাদের নিকট সার্থক দৃষ্টিভঙ্গীসকল উন্মুক্ত করে, কারণ মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রগতির পক্ষে তাহার বৃহত্তম প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। গণতান্ত্রিকতার কার্যকরী ভাবধারা-গ্রহণ অর্থ আমি এই বুঝি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রায় কোন না কোন আকারে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া আমাদের পরিপুষ্টি ও পরিণতির পক্ষে প্রয়োজনীয়, প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিতে চাই যে, কোথাও গণতান্ত্রিকতা পূর্ণভাবে এখনও ফুটাইয়া তোলা হয় নাই, আর প্রাচীন ভারতে এবং প্রাচীন ইউরোপে সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি উপাদান রূপে তাহা বর্তমান ছিল। পরিপাক করিয়া নেওয়ার অর্থ এই যে, আমরা স্থূলভাবে ইউরোপীয় রূপে তাহা গ্রহণ করিব না, কিন্তু আমরা জীবন ও সত্তা সম্বন্ধে আমাদের আধ্যাত্মিক ধারণার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দেখিব, সেখানে ইহার অনুরূপ কি আছে, কি ইহার অর্থকে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করে এবং কি ইহার উচ্চতম উদ্দেশ্য সমর্থন করে, এবং সেই আলোকে ইহার প্রসার পরিমাণ রূপ এবং অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ, ইহার প্রয়োগবিধি কি হইবে, তাহা নির্ণয় করিব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব ভাবে নিজের উপযুক্ত ধর্ম অনুসারে যথাযথ প্রয়োজনানুরূপ ভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা মননশীলতা বা রসবোধের সক্রিয় উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতি বস্তুতে আমরা এই একই তত্ত্ব বা একই বিধান প্রয়োগ করিব।

সংঘগত জীবনেও প্রযোজ্য ব্যষ্টিসত্তার এই এক বিধান আমি স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করি যে, বাহির হইতে যাহা কিছু আসিবে তাহাই বর্জন করা বাঞ্ছনীয় নয় আর তাহা সম্ভবও নহে। ঠিক তেমনি ভাবে ইহাও আমি একটা স্বতঃসিদ্ধ বিধি মনে করি যে, কোন সজীব সত্ত্ব বহিরাগত পৃথক পৃথক বস্তু-সকল নিজের মধ্যে পিণ্ডাকারে শুধু জড় করিয়া বর্ধিত হয় না, বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভিতর হইতে আপনি গড়িয়া উঠা, এবং বহিরাগত উপাদানগুলিকে

পরিপাক করিয়া লওয়া; বহিরাগত বস্তুকে তাহার প্রাণ ও মনোময় দেহের ক্রিয়ার বিধান, রূপ ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের অনুযায়ী নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা তাহার পক্ষে অনিষ্টকর বা বিষময় তাহা বর্জন করিতেই হইবে,—যাহা পরিপাক করিয়া আপনার অঙ্গীভূত করা যায় না, তাহা ছাড়া এরূপ বর্জনীয় বস্তু আর কি হইতে পারে?—শুধু তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে যাহা তাহার আত্মপ্রকাশের উপযোগী উপাদান রূপে পরিবর্তন করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতমূলক শব্দ আত্মসাৎকরণ দ্বারা যাহা ঠিক বুঝা যায় ইহা সেই ব্যাপার, যাহাতে বহিরাগত বস্তুকে নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে এরূপে স্থান দেওয়া হয় যে, তাহা আমাদের আত্মসত্তার বিশিষ্ট রূপে পরিণত হয়। যাহা একত্ব হইয়াও বহুত্ব আমরা তাহারই এক রূপ বলিয়া পরিপূর্ণ বর্জন অসম্ভব; অসম্ভব কেননা অন্য সকল হইতে আমরা বাস্তবিক পৃথক নহি, আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু আছে তাহাদের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে, আর জীবনে এই সম্বন্ধ প্রধানতঃ পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের পদ্ধতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। পরিপূর্ণ বর্জন যদি কোন ক্রমে সম্ভবপর হয়, তবু তাহা কাম্য নহে, কেননা আমাদের সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকা ও বর্ধিত হওয়ার পক্ষে পরিবেশের সহিত পরস্পর বিনিময়ের প্রয়োজন রহিয়াছে; যে সজীব সত্তা এ ভাবের সকল বিনিময় বর্জন করে, সে শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং জাড্য ও অনশনজনিত অবসাদে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিশুদ্ধ নির্জনতার মধ্যে বাস করিয়া শুধু ভিতর হইতে আত্মপরিণাম দ্বারা মন প্রাণ ও দেহে আমি বিবৃদ্ধ হই না; আমি শুধু আপনাতে আপনি অবরুদ্ধ এক সত্তা নহি; আমার সত্তা এমন নহে যাহা নিজের অতীত হইতে, যেখানে তাহা ছাড়া কিছু নাই, যেখানে নিজের অন্তরের শক্তি ও চিন্তাধারা ছাড়া আর কোন কিছু ক্রিয়া করে না, তেমন এক নিজস্ব জগতে থাকিয়া এক নূতন সম্ভাবনার দিকে শুধু চলিয়াছে। প্রত্যেক ব্যষ্টিভাবাপন্ন জীবন দুই দিকের ক্রিয়াসম্মিলনে গঠিত হয়, একদিকে আছে তাহার নিজের মধ্য হইতে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার শক্তি, যাহা তাহার বৃহত্তম অন্তরঙ্গ বীর্য, যে শক্তির বলে সে নিজে যাহা তাহা হইয়াছে, অপর দিকে তাহাকে বহিরাগত ধাক্কা গ্রহণ করিতে এবং তাহার ব্যক্তিত্বের অনুগত বা উপযোগী করিয়া তাহা নিজের শক্তি ও পুষ্টির উপাদানে পরিণত করিয়া লইতে হয়। এই দুই ক্রিয়াধারার কোনটি একান্তভাবে অপরকে বর্জন করে না, অথবা যেখানে অন্তরের প্রতিভা এত দুর্বল যে তাহা পরিবেশ রূপে অবস্থিত জগতের সঙ্গে কারবার বিজয়ী বীরের মত চালাইতে পারে না সেখানে ছাড়া, দ্বিতীয়টি প্রথমটির ক্ষতিকারক নয়; পক্ষান্তরে তেজস্বী ও সুস্থ সত্তা বহিরাগত ধাক্কাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, যাহাতে তাহার আত্মগঠনশক্তি উদ্দীপিত হয়,

এবং আরও সুনির্দিষ্ট রূপে নিজস্ব বিশিষ্ট ধারায় আত্মপরিণামের পথে বৃহত্তর ভাবে অগ্রসর হইবার সহায়তা লাভ করে। প্রগতির পথে আমরা যত অধিক অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই যে, ভিতর হইতে মৌলিক গঠনের, সচেতন ভাবে স্বনির্ধারণের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, আর যাহারা প্রবল বীর্যবন্ত রূপে নিজেদের মধ্যে বাস করিতে সমর্থ, তাহাদের মধ্যে এ শক্তি আশ্চর্য রূপে এবং সময় সময় প্রায় দিব্য পরিমাণে বর্ধিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, বহির্জগৎ হইতে আগত ধাক্কা ও ব্যঞ্জনা গ্রহণ ও বিজয় করিবার মিত্র-শক্তিও ঠিক তেমনি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; যাহারা নিজেদের মধ্যে বৃহৎ-ভাবে বাস করিতে পারে, তাহারা আত্মার জন্য জগৎ ও তাহার উপাদানসমূহকেও প্রবল ভাবে ব্যবহার করিতে পারে—আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, সেইরূপ ব্যক্তিই অতি সফলতার সহিত জগৎকে সাহায্য ও তাহার নিজ সত্তা হইতে তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি অন্তরাত্মাকে আবিষ্কার করিতে এবং তাহার মধ্য হইতে পূর্ণরূপে বাস করিতে পারেন, তিনি বিশ্বকে পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া যান, যিনি স্বরাট ও স্বতন্ত্র, আত্মারাম ও স্বয়ংপ্রভু; আর তিনি যে জগতে বাস করেন তাহার উপর অধিকার প্রাপ্ত হইতে, তাহাকে গঠন করিবার শক্তি লাভ করিতে, তাহার সম্রাট হইয়া দাঁড়াইতে, পূর্ণরূপে সক্ষম হন; তিনি নিজ আত্মার মধ্যে সকলের সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হইয়া যাইতে পারেন। এই পরিণামশীল জীবন আমাদিগকে এই সত্য শিক্ষা দেয়, আর প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধানতম রহস্য-সকলের মধ্যে ইহা অন্যতম।

সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হইল নিজের মধ্যে বাস করা, নিজ সত্তার বিধান বা স্বধর্ম অনুসারে নিজ সত্তার কেন্দ্র হইতে নিজের আত্মপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা। ইহা করিতে সমর্থ না হওয়ার অর্থ হইল জীবন ভাঙিয়া পড়া, অপ্রচুর পরিমাণে ইহা করিবার অর্থ হইল অবসাদ, দুর্বলতা, শক্তিহীনতা, পারিপার্শ্বিক শক্তি-রাজির দ্বারা প্রপীড়িত ও পরাজিত হওয়ার বিপদ ও আশঙ্কা; নিজের অন্তরের উপাদান ও অন্তরের শক্তিকে প্রবলভাবে জ্ঞান ও বোধি দ্বারা বিভাবিত করিয়া ব্যবহার করিতে না পারিলে, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িতে এবং অবশেষে জীবনীশক্তির অবনতি ও বিলোপ ঘটিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, আমাদের চতুর্দিকে অবস্থিত জগৎ যে সমস্ত উপাদান আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, যথাযথভাবে ব্যবহার করিবার জন্য আমাদের বোধিজ্ঞান দ্বারা তাহাদিগকে বাছিয়া লইতে যদি অসমর্থ হই, এবং প্রবলভাবে তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার ও তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিবার শক্তি যদি না থাকে, তবে তাহার অর্থও হইবে যে, স্বভাবের মধ্যে গুরুতর অসম্পূর্ণতা ও ন্যূনতা এবং আমাদের জীবন বিপন্ন হইবার

আশঙ্কা রহিয়াছে। বহিরাগত ধাক্কা বা অন্তরে প্রবেশোদ্যত শক্তি, ধারণা বা প্রভাব স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এমনভাবে ক্রিয়া করিতে পারে, যাহাতে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ফলে তাহার আন্তর সত্তা বিরোধ অসামঞ্জস্য অথবা বিপদপাতের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার পর চলে একটা সংগ্রাম, জাগে একটা আবেগ ও বর্জনের প্রয়াস; কিন্তু এই সংগ্রাম ও বর্জন পদ্ধতির মধ্যেও পরিণাম স্বরূপ একটা পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি আসে, জীবনের শক্তি ও উপাদানের কতকটা বিবৃদ্ধি ঘটে; এইরূপ আক্রমণের ফলে সত্তার শক্তিরাজি সাহায্য পায় ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে; উত্তেজকরূপে ক্রিয়া করিয়া ব্যক্তির মনে নূতন কিছুর আভাস ফুটাইয়া তোলে, তুলনা করিয়া দেখিতে বাধ্য করে, এবং নিজ হৃদয়ের বন্ধ দ্বারে আঘাত দিয়া অন্তরস্থ নিদ্রিত শক্তিসমূহকে জাগাইয়া দেয়, ফলে সত্তার আত্মচেতনাতে একটা নূতন ক্রিয়াধারা জাগিয়া ও নূতন সম্ভাবনার একটা বোধ ভাসিয়া উঠিতে পারে। সত্তার মধ্যে ইহা এক সম্ভবপর উপাদানরূপে আসিতে পারে, তাহা হইলে তখন তাহাকে অন্তরের শক্তির এক রূপে পুনর্গঠিত করিয়া লইতে, আন্তর সত্তার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিতে, এবং নিজের বিশিষ্ট আত্মচেতনার আলোকে তাহাকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যাত করিয়া লইতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তনে অথবা প্রভাবসকলের বিশাল আক্রমণে, এই সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতিই একত্রে কার্য করে, এবং সম্ভবতঃ সাময়িকভাবে বিপুল বাধা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা আসিয়া পড়িতে পারে, সন্দেহাত্মক ও বিপদশঙ্কুল গতিধারার আশ্রয় নিতে হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহৎ আত্মোন্নতিসাধক রূপান্তর অথবা প্রবল ও সজীব নবজাগরণের সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংঘগত আত্মার ব্যষ্টি হইতে পার্থক্য কেবল এই যে, তাহা আপনাতে আপনি অধিকতরভাবে পূর্ণ, কেননা তাহা অনেক ব্যষ্টি সত্তার সমবায়ে গঠিত এবং নিজের মধ্যে সংঘগত নানা বৈচিত্র্য আনিতে সমর্থ। কোন জাতির সঙ্গে মানবমণ্ডলীর অন্য সব জাতির পরস্পর বিনিময় যখন খুবই সংকীর্ণ, তখনও বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তি ও শ্রেণীর একটা অন্যোন্যবিনিময় সর্বদা চলে, যাহা তাহার প্রাণশক্তি, পরিপুষ্টি ও পরিণামসাধক ক্রিয়াশক্তিকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। গ্রীক সভ্যতা—ঈজিপ্সীয়, ফোনিসিও এবং অন্যান্য প্রাচ্য প্রভাবের অধীনে থাকিয়া পরিপুষ্টি লাভের পর—নিজেকে অ-গ্রীক, "বর্বর" সংস্কৃতিসকল হইতে কঠোরভাবে পৃথক করিয়া লইয়াছিল, এবং নিজের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং নিজমধ্যস্থিত পরস্পরবিনিময়ের সাহায্যে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নিজের মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রীক সভ্যতার অনুরূপভাবে প্রবলরূপে নিজের মধ্য হইতে বাস করিয়া, চারিপাশের সকল সংস্কৃতি হইতে গভীরতর পার্থক্য রক্ষা করিয়া, এক সংস্কৃতি

গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহার নিজের মধ্যস্থিত অন্যোন্যবিনিময় ও বৈচিত্র্যের অধিকতর সম্পদ ও সমৃদ্ধি হইতেই তাহার পক্ষে এ প্রাণশক্তি লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। চীন দেশের সভ্যতায় এ-ব্যাপারের তৃতীয় উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ভারত কোন দিন বাহিরের প্রভাব একেবারে বর্জন করে নাই; পক্ষান্তরে বাহিরের উপাদানসমূহ নির্বাচিত করিয়া, পরিপাক করিয়া, নিজের অঙ্গীভূত করিবার, সে সমস্তকে অধীন করিয়া লইবার ও তাহাদের রূপান্তর-সাধন করিবার এক প্রবল শক্তি তাহার ছিল, এবং এই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করাই ছিল তাহার এক বৈশিষ্ট্য; বৃহৎ বা অভিভবকারী আক্রমণ হইতে সে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু যাহা তাহাকে আঘাত করিয়াছে বা তাহার মনের উপর দাগ কাটিয়াছে, তাহা সে বলপূর্বক অধিকার করিয়াছে, এবং নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে, আর অন্তর্ভুক্তির এই ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহাকে এক বিশিষ্ট পরিবর্তনের অধীন করিয়াছে, যাহাতে তাহার নিজ সংস্কৃতির প্রকৃতির সঙ্গে এই নূতন উপাদানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে অপর হইতে দূরে নিজের মধ্যেই প্রবলভাবে অবস্থান, যাহা এই প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে অন্য সকল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, আধুনিক কালে তাহা আর সম্ভব নয়; মানবের নানা জাতি এখন পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, এক প্রকার এক অনিবার্য প্রাণের ঐক্য তাহাদিগকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছে। এই বৃহত্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ চাপের মধ্যে বাস করিবার এবং ইহার সংঘাতগুলির উপর আমাদের নিজ সত্তার বিধান আরোপ করিবার আরও গুরুতর সমস্যার আমরা সম্মুখীন হইয়াছি।

ইহা সুস্পষ্ট যে ইউরোপীয় আক্রমণের পূর্বে আমরা যেখানে ছিলাম, ঠিক সেইখানে স্থির হইয়া থাকিবার চেষ্টা, অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর আধুনিক পরিবেশ ও প্রয়োজনের যে দাবি আছে, তাহা অস্বীকার করা যে বিফল হইবে তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে। যে যুগে আমরা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অথবা যে যুগে আমরা সে-দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের জীবনকে নিজস্ব বিশিষ্ট ভাবে দেখিতে চাহিয়াছি, মধ্যবর্তী সেই যুগদ্বয়ের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা যতই পরিতাপ করি না কেন, তখন যে অপরিহার্য কতকগুলি পরিবর্তন আমাদের উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই আর দূর করিতে পারি না—যেমন কোন লোক পারে না ফিরিয়া যাইতে ঠিক সেই জীবনে, কয়েক বৎসর পূর্বে যাহাতে সে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পারে না অপরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইতে, তাহার নিজের সেই অতীত জীবনের মননকে। কাল এবং তাহার প্রভাব কেবল তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় নাই, সে প্রবাহ তাহাকেও অগ্রে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের

সত্তার কোন অতীত রূপে আমরা আর ফিরিয়া যাইতে পারি না বটে, কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমরা নিজদিগকে আবার এমন ভাবে পুনরধিকার করিতে পারি যে, সেই নবগঠিত জীবনে আমরা মধ্যবর্তীকালের অভিজ্ঞতাগুলিকে আরও ভাল আরও সজীব আরও খাঁটিভাবে আরও আত্মস্থ হইয়া ব্যবহার করিতে পারি। তখনও আমরা আমাদের অতীত মহান প্রকৃতি এবং আদর্শের মূল অর্থ আলোচনা করিতে পারি; কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমাদের ভাবনার রূপ ও ভাষা এবং তাহার পরিণতি, নূতন ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে, আমরা সে সমস্তকে কেবল পুরাতনের আলোকে নয়, পরন্তু নূতন আলোকে দেখিতে পাইতেছি, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রাপ্ত শক্তি যোগ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে সমর্থন করিতেছি, এমন কি যে সমস্ত পুরাতন শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহাদের অর্থও পরিবর্তিত এবং আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। আবার ইহাও সত্য যে, বাহ্য জগতের ক্ষেত্রে সংকীর্ণভাবে "আমরা একাকী" থাকিতে পারি না, কেননা আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থিত আধুনিক জগতের হিসাব আমাদিগকে অপরিহার্যরূপে লইতে, এবং তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, নতুবা আমরা বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু এই ভাবের সকল হিসাব ও নূতন জ্ঞান আমাদের আন্তর সত্তাকে পরিবর্তিত করে। আমার মন ও যাহা কিছু তাহার উপর নির্ভর করে সে সমস্তই, সে-মন যাহা পর্যবেক্ষণ করে এবং যাহার উপর ক্রিয়া করে তাহাদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তিত হয় যখন এ সমস্ত হইতে চিন্তা ও ভাবনার নূতন উপাদান সে গ্রহণ করে, পরিবর্তিত হয় যখন তাহাদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নূতন ক্রিয়াবলির মধ্যে জাগিয়া উঠে, এমন কি তখনও পরিবর্তিত হয় যখন তাহাদিগকে অস্বীকার ও বর্জন করে; কেননা কোন প্রাচীন ভাবনা বা সত্য আমি যখন বিরোধী ভাবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করি, তখন এই উপস্থাপন ও বর্জনের চেষ্টার ফলে সে প্রাচীন চিন্তা আমার কাছে নূতন রূপে দেখা দেয়, তাহার নূতন বিভাবাবলি এবং তাহা হইতে নূতন উপসিদ্ধান্তাবলি দ্বারা তাহা বিভূষিত হইয়া উঠে। আমার জীবন অন্য যে জীবনের সম্মুখীন হয়, যাহাকে প্রতিরোধ করে, তাহার প্রভাবের দ্বারা একই রূপে সে নিজে পরিবর্তিত হয়। শেষ কথা এই যে আধুনিক জগতের বৃহৎ নিয়ামক ভাবধারা ও সমস্যাগুলি লইয়া কারবার করিবার হাত হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারি না। আজিও আধুনিক জগৎ প্রধানতঃ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, বর্তমান জগতে এখনও ইউরোপের মন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য রহিয়াছে। আমরা দাবি করি যে, এই অযথা প্রাধান্য দূর করিয়া এসিয়ার এবং আমাদের জন্য ভারতীয় মননধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিব, এবং এসিয়ার ও ভারতের সভ্যতার মূল্যবান মহান বস্তুসকলকে রক্ষা ও পরিবর্ধিত করিব। কিন্তু সফলভাবে এই সমস্ত

সমস্যার সম্মুখীন হইয়া, এবং যাহা তাহাদের নিজস্ব আদর্শ ও প্রকৃতি সমর্থন করিবে এমনভাবে তাহাদের সমাধান করিয়াই শুধু এসিয়ার ও ভারতের মনন-ধারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

যে তত্ত্বের কথা আমি দৃঢ়রূপে বলিয়াছি তাহা আমাদের প্রকৃতির প্রয়োজন এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজন এ উভয় হইতেই জাত হইয়াছে,—সে তত্ত্ব এই যে আমরা আমাদের স্বভাব, প্রকৃতি ও আদর্শে বিশ্বস্ত থাকিব, নূতন যুগে নূতন পরিবেশের মধ্যে আমাদের নিজস্ব বিশিষ্ট রূপাবলি সৃষ্টি করিব, কিন্তু তৎসঙ্গে বহিরাগত প্রভাবসকলকেও প্রবলভাবে জয় করিয়া তাহাদের সহিত কারবার করিব, তাহাদিগকে একেবারে পূর্ণরূপে বর্জন করিবার প্রয়োজন নাই, বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবও নহে; সুতরাং পরিপাক করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার সফল প্রচেষ্টার একটা উপাদান এ তত্ত্বের মধ্যে থাকিবে। একটি অতি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা এখনও বাকি রহিল—বিষয়টি এ তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে, কি পরিমাণে, কোন্ পন্থায়, কি কি নিয়ামক বোধ বা উপলব্ধি লইয়া প্রয়োগ চলিবে তাহার বিচার। সে বিচার ও মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং ভারতীয় প্রকৃতি ও আদর্শকে দৃঢ়ভাবে সর্বদা ধরিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনাসকলের উপর কিরূপে প্রতিক্ষেত্রে সে প্রকৃতি ও আদর্শের প্রয়োগ হইতে পারে, এবং কিরূপে তাহা বিজয়ীরূপে আমাদিগকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থ করিয়া তুলিতে পারে। বিচারের এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে মতাভিমানী হইলে চলিবে না। ভারতের প্রত্যেক সমর্থ মনকে ভাবিয়া ও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, অথবা আরও ভাল হয় যদি তাহার নিজের আলোক ও শক্তির সাহায্যে একটা সমাধান—তাহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বঙ্গদেশীয় চিত্রশিল্পীগণ কার্যতঃ যেরূপ সমাধান করিয়া তুলিয়াছেন—কিছু আলোক দান করিতে এবং কতকটা কার্য সম্পাদন করিতে পারে। ভারতের নবজাগরণের প্রকৃতি বা সার্বভৌম সেই কাল-শক্তি যাহা নূতন ও বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদের মধ্যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই বাকি প্রয়োজনীয় সব কিছু সাধিত করিয়া তুলিবে।

পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলির সূচী

পুস্তকসূচী

ব্যক্তিসূচী